

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমাথিক মাসিক পত্রিকা

ষোড়শ বর্ষ

[১৩৮২ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৩ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধব-গোড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য
ও শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ভট্টাচার্য্য বি, এস-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিজ্ঞানকর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ষোড়শ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক	প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
সজ্জন—বদান্ত	১১১	ভক্তি ও মুক্তি	৩৪৭
শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্দনা	১১২ক	শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সারার্থদর্শিনী	
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী ১১৩, ২১২২, ৩৪৪২, ৪৬৬২, ৫৮৮৩, ৬১০৩, ৭১২২২, ৮১৪৪২, ৯১৬৬২, ১০১৮৮২, ১১১২০২, ১২২২২২		টীকার বঙ্গানুবাদ	৩৫০
শ্রীমন্নহাপ্রভু ও তাঁহার পার্শ্বদগণ কর্তৃক প্রদর্শিত, আচরিত ও প্রচারিত		শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব	৩৫৫, ৪৭৮, ৫৯১
শ্রীনাম ও তাঁহার ভজন-প্রণালী	১১৫	বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন	৩৬০
সপার্বদ শ্রীমন্নহাপ্রভুর উপদেশামৃত	১১৬	সজ্জন—শুচি	৪৬১
ষোড়শ বর্ষারম্ভে	১১৮	অবতারী-তত্ত্ব	৪৬৪
মহতের বিষমবাবস্থার	১১১১	ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র	৪৭২
প্রাঙ্গ-উত্তর ১১১৪, ২১২৮, ৫৮৮৭, ১০১১১১		বিরহ-সংবাদ	
‘রামায়ণ’-প্রসঙ্গে	১১১৭	(পরলোকে শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)	৪৭৬
দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে		(শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ দাসাধিকারী, শ্রীপার্বসারথি দাসা-ধিকারী, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীপ্রমথ নাথ রায়)	৪৭৭-৭৮
বার্ষিক উৎসব	১১১৯	(স্বধামে শ্রীমৎ কৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী)	৬১২০
সজ্জন—মৃদু	২১২১	(পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ)	৯১১৭৬
ত্রিদিগ্‌বৈষ্ণব-সন্ন্যাস	২১২৪	(স্বধামে শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী)	১০১১২৫
শ্রীশ্রীগৌরাক্ষ ও শ্রীগৌরধাম	২১৩১	(লোকান্তরে শ্রীমধুসূদন সাহা)	১০১১২৬
সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা ২১৩৫, ৪৬৬৮, ৬১১১০, ৭১১৩০, ৮১১৫২, ১০১১৮৬		(ত্রিদিগ্‌বিশ্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-আচার বৈষ্ণব মহারাজ)	১১১২২০
Statement about ownership and other Particulars about newspaper		শ্রীল আচার্য্যদেবের ভ্রমণ-সূচী	৪৮০
‘Sree Chaitanya Bani’	২১৩৮	সজ্জন—সরোপকারক	৫৮১
বোলপুর রেলময়দানে বিরাট ধর্মসভা	২১৩৯	“কৃষ্ণ পাইয়ে ভজনে”	৫৮৪
আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ	২১৪০	১৯৭৪ সালে গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষার ফল	৫৯৫
সজ্জন—অকিঞ্চন	৩১৪১	শিলিগুড়িতে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাচার্য্য	৫৯৫
অবতার-তত্ত্ব	৩১৪৪	উত্তর ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৫৯৬

প্রবন্ধ-পরিচয়

সংখ্যা ও পত্রিক

প্রবন্ধ-পরিচয়

সংখ্যা ও পত্রিক

হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ৫১৮	
চয়ন—'The Deccan Chronicle' (Hyderabad), Thursday, June 3, 1976. Sree Chaitanya Gaudiya Math annual function held ৫১৯	
মেদিনীপুর জেলায় শ্রীল আচাধ্যদেব ৫১০০	
সজ্জন—শান্ত ৬১০১	
অবতারা—স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর ৬১০৪, ৭১২৬	
শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উত্তরোত্তর পরাবহু ৬১০৯	
যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মানসাত্মা মহোৎসব ৬১১৩	
আগরতলায় প্রসিদ্ধ 'শ্রীজগন্নাথবাড়ী' শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে হস্তান্তরিত ৬১১৪	
কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে রথযাত্রা মহোৎসব ৬১১৫	
কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব (ওড়িশ্যার মুখ্য জনপ্রিয় দৈনিক 'সমাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত — 'কথা ও কার্য এক হওয়া উচিত' কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ-সভায়—লোকসেবক মণ্ডল সভাপতি শ্রীবিষ্ণুনাথ দাসের উদ্বোধন) ৬১১৭	
কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের নবনির্মিত চতুর্থতল-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব ৬১১৯	
শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা ৬১২০	
সজ্জন—কৃষ্ণকশরণ ৭১২১	
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই—সর্বমূলত্ব ৭১২৪	
শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের উত্তোগে শ্রীপুরুষোত্তমধামে কান্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন (বিজ্ঞাপন) ৭১৩৬	
শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের উত্তোগে দক্ষিণ ভারত তীর্থ পরিক্রমা (বিজ্ঞাপন) ৭১৩৮	
সজ্জন—অকাম ৮১৪১	

হরিরেব গুরু: গুরুবেব হরি: ৮১৪২	
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ৮১৪৮	
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব ৮১৫৫	
কলিকাতা মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব ৮১৫৯	
শ্রীগৌরলীলায়ই শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্ণতমত্ব ৮১৫৯	
শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর সাদর সন্তোষণ ৮১৬০	
সজ্জন—নিরীহ ৯১৬১	
উপাস্ত, উপাসক ও উপাসনা-বিচার ৯১৬৫	
শ্রীবিজয়াদশমী-কৃতা ৯১৭৫	
সজ্জন—স্থির ১০১৮১	
সুপ্রাচীন ঋগ্বেদে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-কথা ১০১৮৩	
নিমন্ত্রণ-পত্র	
(শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড) ১০১৯৮	
(শ্রীনবদীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব) ১০১৯৯	
সজ্জন—বিজিত-বড়ুগুণ ১১২০১	
প্রেমবন্ত ভগবান ১১২০৫	
রাজা মহারাজার ঠাকুরবাড়ী ও শ্রীমঠমন্দির ১১২০৯	
কিমাণ্ড্যমতঃপরম্ ১১২১১	
শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে উজ্জ্বলব্রত, দামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা-পালন ১১২১৪, ১২২৩০	
সজ্জন—মিতভুক ১২২২১	
বর্ষশেষে বিজ্ঞপ্তি ১২২২৪	
শ্রীশ্রীনামসঙ্কীৰ্তন ১২২২৯	
দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব ১২২৩৫	
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেশ	
(শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী) ১২২৩৬	
যশড়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব ১২২৩৭	

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাযাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচস্পিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণায়ুতাম্বাদনং
সর্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮২।

১৩ গোবিন্দ, ৪৮৯ শ্রীগোরাঙ্গ ; ১৫ ফাল্গুন, শনিবার ; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬।

{ ১ম সংখ্যা

সজ্জন-বদান্ত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীগৌরসুন্দরের ছায় দানশীল আদর্শ চতুর্দশ ভুবনে
বা অস্ত্র কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ
সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহাই বিতরণ
করিতেও মুক্তহস্ত। যাহা সত্য, ত্রেতা, ষাণ্ময় যুগে
জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই,
সেই উন্নতউজ্জল-ভক্তিরসমাধুরী অযোগ্যজনেও সমর্পণ
করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা
ভজনপারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই প্রাপ্য,
কিন্তু আমাদের উপাশ্রু শ্রীশচীতলাল বদান্ত-শিরোমণি
বলিয়া হুর্দল, প্রাকৃত-মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া
অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমহর্ষভ ব্রজেন্দ্র-
নন্দনের নিগূঢ়সেবায় নিযুক্ত করিতে বাস্ত। বদ্ধ-
জীবকে অসচ্চারিত্র কপট শিক্ষকের কবল হইতে উদ্ধৃত্ত
করিবার জন্ত সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে—ভগবৎ-
সেবোন্মুখ সমস্ত জড়াভিনিবেশ-তাক্ত, মলিন জড়ীয়
জঞ্জালসমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোন
প্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর মঙ্গ বা পরা-
মর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন, তাহা
হইলে বিষয়বিষে জর্জরিত হইয়া গৌরভক্তের
অমলাসন হইতে অনন্তকালের জন্ত বিতাড়িত হইবেন।

আরাধ্যবস্তুরই গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তিনিই সকল ঈশ্বরের, জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর,
তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অনাদি, তিনি সকলের
আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু
কৃষ্ণই অপ্রাকৃতরসের একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়; শ্রীমতী
রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বল-
দেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-
বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তদ্রূপ-বৈভব-
সমূহে প্রাভব-প্রকাশ বাসুদেব-প্রমুখ ঐশ্বর্য্য-রসের
বিষয়বিগ্রহ। মূল্যশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-
বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতী-প্রমুখা প্রকাশ্যশ্রয়ন্দ,
দ্বারকাধিতে মহিবীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক
অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন।
পরমেশ্বর মহামাধুরীর একমাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ
যশোদাচল্লীল স্বীয় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকার নিজ
সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগোরাঙ্গ-
বিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়-ভাবাদীকারে কৃষ্ণের
স্বতন্ত্রাধিষ্ঠানে নিত্য লীলাবিলাস করিতেছেন। আশ্রয়-
ভাবাদীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্য-
লীলা নাই। বিষয়-ভাবাদীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরাস্বের

কোন নিতালীলা নাই। সেই মধুররসদাতা বদান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট “নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যায় গৌরস্বিষে নমঃ॥” বলিয়া নিত্য ভজনীয় আছেন। তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী-সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্ত সুমিষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন বদান্ত কবিরাজ গোঁস্বামী লিখিয়াছেন, —

“মধাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।

যাহা দেখি’ তুষ্ট হন গৌর-ভগবান্॥

প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।

দায় প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥

প্রভু কহে, মোর বশ নহে মোর মন।

প্রকৃতিসম্ভাবী বৈরাগী না কবে’ দর্শন॥

তবে শ্রীবাস তার (ছোট হরিদাসের) বৃত্তান্ত কহিলা।

যেছে সঙ্কর, যেছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥

শুনি হাসি’ প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।

প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

অমৎস্য ত্যাগ — এই বৈষ্ণব-অপচার।

যোবিসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর॥

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্ত।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি’ পণ্ডিত নাহি ভজে অন্ম॥”

কৃষ্ণের আশ্রয়-জাতীয় ভজনে বা গৌরলীলায় গোপনে কপটাত্মক ব্যাভিচার নাই,—এই পরমসত্য মহাবদান্ত শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌরনাগরীসহ ব্যাভিচারী নহেন।

যে-সকল ব্যক্তি গৌরভক্তের নামে সহজিয়া, বাউল, চুড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রূঢ় ভাষায় তাঁহাদের তায় জড়ীয় জানিয়া গালি দিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ গৌরনাগরী-গণ বদান্ত,—একথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই একমাত্র বদান্ত, তাহাও বুঝিবে। বদান্ত শ্রীকৃষ্ণ-

গোঁস্বামী নির্বোধ নয়মতাবলম্বী ভাবী বালকগণের ও দলপতিগণের জন্মই রসশাস্ত্র লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়গত রস স্তম্ভভাবে জানাইয়াছেন। সে-জন্ম অবদান্ত গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রহে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছা-ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যে লীলা আশ্রয়-ভাষাঙ্গীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই, সেই মিছানাগরীভাব, মিছাবল্লভ করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যক কি? মিছাভক্ত সাজিয়া সুনির্মল পবিত্র-চরিত্র গৌরোক্ত ব্যাভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্ব্যক্তি বা মহাজন-পথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণ-বিমুখিণী স্বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্তই মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন না। পাপ করিলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই, এ কথা মহাবদান্ত গৌরসুন্দর বলেন না। যিনি শুদ্ধ ভক্ত, তিনি হরিসেবাবিমুখ নিজ ফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয়ও দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্ম শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগতাৎপর্যাপর নদীয়া-নাগরীসহ ব্যাভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকা নাগরীর সহিত গৌরপার্শ্বদ হরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যাভিচার করেন নাই। মাতা মীরবাই শ্রীকৃষ্ণ গোঁস্বামী প্রভুর নাগরী নহেন। “অন্তঃ-কৃষ্ণ বহির্গৌর” শ্লোকের কুব্যাখ্যাবলে গৌরনাগরী-নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরোক্ত মহাবদান্ত জগদগুরু না বলিয়া গোপনে ব্যাভিচারী বলেন, ইহাই আশ্চর্য। কৃষ্ণলীলা ব্যাভিচারময়—একপ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগ-তাৎপর্যাপর গৌরনাগরীগণকে বিপথগামী করিয়া গৌরবিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্ত শুদ্ধ গৌরভক্ত মিছা গৌরভক্তগণকে রাইকাঙ্ক্ষর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড়ভোগতাৎপর্যাপর গৌরনাগরী দলের হৃদগত কাম বিনাশ করিবেন। এই কাঙ্ক্ষা করিলেই শুদ্ধ গৌরভক্ত-সজ্জনকে বদান্ত বলিয়া সকলেই জানিবে।

‘শ্রীচৈতন্যবাণী’-বন্দনা

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ ষোড়শ বর্ষে শ্রী মহিমায় প্রকাশিতা হইলেন। তাঁহার সর্ব-শুভদায়িনী শুভাবির্ভাব তিথিকে বরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি ধন্যভিক্ষু হইলাম। তাঁহারই শ্রীবিগ্রহস্বরূপ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন আমার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করতঃ আমাকে তাঁহার অহৈতুকী সেবায় সর্বদা নিয়োজিত রাখেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পরম প্রেম স্বরূপ এবং উদারতার চরম আদর্শস্বরূপ লীলা প্রকট করিয়া আমার হৃদয় দুর্জয়ত্বকেও তাঁহার শ্রীচরণের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অসীম কৃপা ও স্নেহস্রবেণে আমার চিত্ত সর্বদা তাঁহার অসমোদ্ধি প্রেমামৃত আশ্বাদনে প্রমত্ত হইতেছে না, জগতের কুংসিত বিষয়-রসেই প্রধাবিত হইতে চাহে। হে শ্রীচৈতন্যবাণী! আপনার অসমোদ্ধি অহৈতুকী দয়াবলে আমার এই পাষণ-হৃদয়কে ইতর বিষয়রস হইতে আকর্ষণ করতঃ আপনার নিকটে আবদ্ধ রাখিয়া জগতে আপনার অসমোদ্ধি দয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

স্বল্পকাল মধ্যে আপনার অহৈতুকী কৃপাবলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম ও অধর্মাবলম্বী, নীতি ও দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি-দিগকেও আপনি আশ্বসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু

এখনও বিশ্বে স্বরূপবিস্মৃত জড়সর্বস্ববাদী মনুষ্যাগণ ভয়সঙ্কুলচিত্তে অবস্থান করিতেছে। রজস্তমোগুণ-তাড়িত ব্যক্তিগণের দোরাওয়া এখনও নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে বিস্তার লাভ করিতেছে। শাসকবর্গ এবং শাসিতগণের মধ্যে কলির প্রভাব প্রবল ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। অধ্যাপক ও অধ্যাপিতগণও এই দুর্দ্দৈব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। অর্থলোলুপ ব্যবসায়িগণ অপরের স্বাস্থ্য-হানিকারক — এমন কি প্রাণ পর্যন্ত নাশক ভেজাল খাদ্য ও ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবার অভিসূচনা ইতর প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না। ধর্মের নামেও কাপট্যের তাণ্ডবনৃত্য এবং লোকবঞ্চনা পরম পবিত্র দেববন্দ্য ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেও প্রবল-ভাবে চলিতেছে। এমত দুর্ববস্থায় সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্যবাণীর আশ্রয় ব্যতীত কাহার আশ্রয়ে নিশ্চিতমুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন? অতএব হে শ্রীচৈতন্যবাণী! আপনি কৃপাপূর্বক আপনার প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করতঃ জগৎ-বাসীকে প্রেমামৃত রসাস্বাদনের নিমিত্ত সৌভাগ্য প্রদান করুন এবং জগতের প্রাণিগণকে পরম্পর কাম, ক্রোধ, লোভ এবং হিংসাদেহাদি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীতিমূত্রে আবদ্ধ হইবার সুযোগ প্রদান করুন। জগৎবাসীর অত্যন্ত দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং উহা দূরীকরণের আর অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে আপনারই শরণাপন্ন

হইতেছি। আপনি আমাদিগকে কৃপাপূর্বক প্রেমময় শ্রীচৈতন্যচরণে আকর্ষণ করতঃ আপনার অসমোদ্ধা ম্হিমা স্থাপন করুন।

এই নববর্ষে আমি আমার পারমাখিক হিতৈষী ও সাহায্যকারী বন্ধুগণকে স্মরণ করিবার জন্য নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর পরমার্থপ্রদ জীবন যেন আমরা অশু কোনপ্রকারে নষ্ট না করিয়া ভগবৎপ্রেমানুকূল জীবনযাপনের জন্যই সতর্ক থাকি। শ্রীভগবৎপ্রদত্ত শরীর, মন, ইন্দ্রিয়-সমূহ, বুদ্ধি আদি যেন আমরা তাঁহার সেবায়ই নিয়োজিত রাখি। সাধকগণ সর্বদাই সতর্ক ব্যবসায়ীর মত যেন হিসাব-নিকাশ করিয়া চলেন। বিগত বর্ষে সাধনপথে আমরা কে কতটা অগ্রসর হইয়াছি, ইহা নিজে নিজে পরীক্ষা করতঃ নিজেদের সাধনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অর্থাৎ লোকসানগুলি হইতে যেন আমরা বিশেষ সাবধান হই, উহা যেন পুনঃ পুনঃ করিয়া দেউলিয়া বা পতিত স্থলিত বা পথভ্রষ্ট না হইয়া পড়ি। পূর্বোক্ত কর্মের সংস্কারবশতঃ কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা যেন আমাদের চিত্তে কখনই আশ্রয় লাভ না করে। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত অশু আকাঙ্ক্ষা যেন ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপেও আমাদের চিত্তে স্থান না পায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, “যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”। শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়-বাঞ্ছাই অনর্থ। উহা স্বরূপত্রয় হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক জীবের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরাপ্রকৃতির অংশ

এবং দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি সকলই তাঁহার অপরা প্রকৃতির অংশ। এমতাবস্থায় জীব-মাত্রাই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতির অংশ হওয়ায় তাঁহারই সম্পত্তি। সুতরাং আমরা তদীয়। তদন্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্। তাঁহার সহিতই আমাদের জীবনে মরণে সর্বক্ষণ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জাগতিক কুটূষ বা প্রাণি-গণের সহিতও ভগবৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেই সেই সম্বন্ধ পরম্পরের সুখাবহ হয় এবং পরম্পরের মধ্যে পবিত্র প্রীতি বর্দ্ধন করে। তদ্বারা পরম্পরেরই ভগবৎপ্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যবাণী বিশ্বের পরম্পরের মধ্যে হিংসা-দ্রোহাদি বর্জনের নিমিত্ত সর্বত্র শ্রীভগবৎ প্রেমের বার্তা বিস্তার করিতেছেন; আত্ম-অসংইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক চেষ্টা বর্জন করতঃ সর্বব্য-কর্ষক ও সর্বানন্দ-বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-কেন্দ্রিক চেষ্টা করাই তাঁহার নিখিল উপদেশের সারমর্ম। প্রেমই সুখাবহ; কাম পরম্পরের উদ্বেগ, ভয়, হুঃখ ও শোক আনয়ন করিয়া থাকে, তাই শ্রীচৈতন্যবাণী মনুষ্যের অসং-সঙ্গজনিত হুঃখময় কামপ্রচেষ্টা হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত শ্রীভগবৎপ্রেমময় সাধুসঙ্গ গ্রহণের উপদেশ করিয়া থাকেন। অসংসঙ্গজনিত দোষ সাধুসঙ্গই হরণ করিতে সমর্থ।

শ্রীচৈতন্যবাণীর বাবতীয় সেবক-সেবিকা, পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে অশু শুভদিনে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা জয়যুক্ত হউন। শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্ত হউন। ইতি

নিবেদক—

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরতোগ, অশাদ্দ।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বানী

(নামকীর্তন)

প্রঃ—শুদ্ধহরিনাম-কীর্তনকারীর কি কি লক্ষণ থাকে আবশ্যিক ?

উঃ—“নিরপরাধেন হরিনামকৃতং বিষয়বিরজিজনিত-দৈন্তং নির্দ্বন্দ্বসরতালঙ্কৃতং দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, সর্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি।”

— শ্রীশিঃ — সঃ ভাঃ ৩

প্রঃ—হরিকীর্তন কিরূপ ক্রম-বিধিতে প্রপঞ্চে বিজয় লাভ করেন ?

উঃ—“জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপ-সংসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণানন্তরং যদা তৎকীর্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপবিক্রম এব লক্ষ্যতে — প্রপঞ্চে হরিকীর্তনবিজয়াশ্চৈবা প্রক্রিয়া।”

— শ্রীশিঃ — সঃ ভাঃ ১

প্রঃ—সংকীর্তনের তাৎপর্য কি ?

উঃ—“সঙ্কীর্তনাদির প্রয়াস — কেবল হৃদয় উদ্ঘাটন-পূর্বক প্রভুর নামোচ্চারণ। — ‘প্রয়াস’, সঃ তোঃ ১০৯

প্রঃ—কিরূপ বিধি অবলম্বন করিলে বিষয়-প্রতিবন্ধক দূর হইয়া নামামুশীলনের নৈরন্তর্য্য হয় ?

উঃ—“প্রথমে অত্যল্পকাল নির্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামামুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয়-প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে।” — ‘ভজ্ঞনপ্রণালী’, হঃ চিঃ

প্রঃ—অনর্থগ্রস্ত সাধকের পক্ষে নামামুশীলনে কোন উপায় অবলম্বনীয় ?

উঃ—“প্রতিদিন নির্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ-পূর্বক ভাবের সহিত নাম করিবে, ক্রমে ক্রমে ঐ কাধ্যের সময়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে সকল-সময়েই এক অদ্ভুতভাব উদ্ভিত হইবে, তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে।” — জৈঃ ধঃ, ৪০শ অঃ

প্রঃ—নিরন্তর নামকীর্তন কথাকে বলে ?

উঃ—“নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্বাহ-

কালে ও অন্য সময়ে সর্বদা শ্রীনাম-কীর্তন করার নামই নিরন্তর নাম-কীর্তন।” — জৈঃ ধঃ, ২৩শ অঃ

প্রঃ—শ্রীতুলসীর সংস্পর্শে কিরূপ বুদ্ধিতে হরিনাম গ্রহণীয় ?

উঃ—“তুলসী হরিপ্রিয়-বস্তু, স্মৃতির্যং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদ-বুদ্ধিপূর্বক নাম করিবে।” — জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

প্রঃ—আভিহীন হইয়া অধিক নাম গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ কি ?

উঃ—“নাম অধিক সংখ্যা হইবে — এই চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভারযুক্ত নাম-কীর্তন হয় — ইহার জ্ঞান যত্ন করা উচিত।”

— ‘প্রমাদ’, হঃ চিঃ

প্রঃ—জগতে কোন্ ধর্ম্মে সর্বধর্ম্মের পরিণতি হইবে ?

উঃ—“জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নাম-সংকীর্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, — ইহা নিশ্চয়-সত্য বলিয়া বোধ হয়।”

— ‘নিত্যধর্ম্ম-স্বর্ঘ্যোদয়’, সঃ তোঃ ৪১৩

প্রঃ—শ্রীভক্তিবিনোদের সম-সাময়িক যুগে কলিকাতায় কোন্ সময় প্রথম সংকীর্তন প্রচলিত হয় ? শুদ্ধভাবে কিরূপে হরিকীর্তন অনুষ্ঠিত হইতে পারে ?

উঃ—“শ্রীগৌরঙ্গ-সমাজের নেতৃপক্ষদিগের মনে একটা ভাব উঠিল। সেই ভাবঘারা চালিত হইয়া নগর-বাসীদিগের সাহায্যে বিডন ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে প্রথম সংকীর্তন হয়। অনেকানেক বৃদ্ধ-লোকের মতে — এইরূপ সংকীর্তন-মহোৎসব কলিকাতা মহানগরীতে আর কখনও হয় না ই।

* * * কি পাবও, কি ভগবন্ত — সকলেই একমনে শ্রীনাম-সংকীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে এইরূপ সমারোহে সর্বদেশে নাম-সংকীর্তন হওয়া

আবশ্যক। সেই মহোৎসব হইতে নগরবাসিগণ কীর্তনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এমত কি, অল্প সকল কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু-ব্যয় পূর্বক প্রত্যেক পল্লীতে একটি একটি কীর্তন দল স্থাপিত হইল। * * এটি বড় সুখের বিষয় যে, ভারতের সর্ব প্রদেশস্থ লোকেরা কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীনাম-কীর্তনে যোগ দিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমের লোকেরা যাহারা কখনও মহাপ্রভুর নাম শুনে নাই, তাহারাও শ্রীহরিনাম-কীর্তনে যোগ দিয়া নিত্যানন্দ-গৌরানন্দনামে উন্নত হইয়াছে। বড়বাজারের বহুর দোকানদার ও দালাল প্রভৃতি পশ্চিম-নিবাসিগণ বহু যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ের দ্বারা নগর কীর্তনের অল্প ঠান করিয়াছেন। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিবাসিগণ আপন আপন পল্লীতে মহাসমারোহে কীর্তন করিয়াছেন। * * * আমরা শ্রীগৌরান্দ-প্রভুর জন্মদিবসে কীর্তনের জন্মভূমি মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে নিযুক্ত ছিলাম। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া * * কয়েকটি কীর্তন দেখিয়া আমাদের মনে এই প্রকার ভাব হইল, * * যে কলিকাতায় ধর্ম একেবারে উঠিয়া যাইতেছিল, সেই কলিকাতায় প্রভুর শক্তিক্রমে সর্বধর্মের সারধর্ম যে হরিকীর্তন, তাহাই প্রবল হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু এই সকল কাৰ্য্যে উৎসাহ দিয়াও তাহার অভিত্তপ্ত রহিত যে প্রেম, তাহা এই মহানগরীতে বিতরণ করেন নাই। যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন ও আপনাকে প্রচার করিবার জন্য সর্বপ্রকার শোককে মতি দিয়াছেন, এমত অগ্ন্যস্ত সুখ পরিত্যাগেরও শক্তি দিয়াছেন; কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করেন নাই। কীর্তনকারীদিগের হৃদয়ে কীর্তনম্পৃহা দিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব মহাজনদিগের পথে অল্পগত হইবার জন্য প্ররুতি আজও দেন নাই। চন্দ্র-পাছকা ছাড়িয়া অনেকে খোল-করতালের সহিত কীর্তন করিতেছেন, তথাপি অনেকের গলায় তুলসী-মালা দেখিলাম না। যদিও কেহ কেহ ধারণ করিয়াছেন, সে মালাগুলিও নূতন, তাহাতে অনেক সন্দেহ হয়। অনেকের অঙ্গে দ্বাদশ ভিলক শোভা করিতেছে না। আজ নিমন্তলার

ঘাটে, কল্যাণোড়াশাকোর, আবার একদিন ঝামা-পুকুরে মহাজনী প্রণালীতে কীর্তন শ্রবণ করিবার জন্য গিয়া দেখি, কোথাও সেরূপ পাইলাম না। গাড়া, বাউল, যাত্রা, ধিষেটার, এই সকল সুরে রঙ্গের গান শুনিলাম, তাহাতে আমাদের যে-পরিমাণ হৃৎক হইল, তাহা মধ্যে মধ্যে ‘হরি’, ‘কৃষ্ণ’, ‘রাম’, এই সকল নিত্য নাম শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ দূর হইল। যাহাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই প্রাচীন নামের সুর ভালবাসেন। তাঁহারা বাজে কথা গান করিতে বা শুনিতে চান না। তাঁহারা প্রাচীনভাবে শুদ্ধ হরিনাম গান করেন ও শ্রবণ করেন। এই মহানগরীর পল্লী-বাসিগণ আজকাল সংস্কারভাবে শুদ্ধভক্তির স্বভাব সহজে লাভ করেন না। কাজে কাজেই তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। * * * যাহাই হউক, আমাদের শ্রীগৌরান্দ-প্রভু বড়ই দয়ালু। তিনি যখন কলিকাতা মহানগরীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া কীর্তনে মতি দিয়াছেন, তখন আমরা ভরসা করি যে, এই মহানগরবাসিগণের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করিবেন। কতকগুলি লোকে বলেন যে, নগরবাসিগণ প্লেগের আগমনে এই সকল কীর্তন-প্রথা স্থগিত করিয়াছেন। * * * যে-সকল লোক কীর্তন-বিরোধী, তাহারা দেশের যে পরম শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আর একটা কথা আছে। সঙ্কীর্তন হউক, কিন্তু পূর্বদিন অবলম্বন করা আবশ্যক। দর্শ পৌর্ণমাসী, একাদশী, গৌরপৌর্ণমাসী, কৃষ্ণাষ্টমী, কা্তিকমাস, বৈশাখ মাস, ভগবানের যাত্রা-সকল, সংক্রান্তি, এই সকল পূর্বদিন অবলম্বন করিয়া হরিকীর্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহাজনীসুরে খোল-করতাল ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্র লইয়া নিজে নিজে পবিত্র বৈষ্ণব-ভাবে শ্রীনাম-কীর্তন করিয়া নগর-বাসিগণ আমাদের হৃদয়ে পরমানন্দ দান করুন। * * * শ্রীগৌরান্দ—জগদগুরু। তিনি তাহাদিগকে ইচ্ছামত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন।”

প্রঃ—নামকীর্তনকারীর ভিক্ষা কি?

(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,

উঃ—“(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।

বলেন, যখন ও নাম গাই ॥”

—গী:

শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহার পার্শ্বদগণ কর্তৃক প্রদর্শিত, আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনাম ও তাঁহার ভজন-প্রণালী

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

—চৈ: ভা: আ: ১৪।১৪৫, ঐ ম ২৩।৬

“নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমঙ্গলসার নাম, — এই শাস্ত্রমর্ম ॥”

—চৈ: চ: আ ৭।৭৪

“অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ভজ্ঞে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥”

—চৈ: চ: অ ৬।২৩৭

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন —

“হরে-কৃষ্ণেতুচ্চৈ: স্মৃতিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসু ভগকটস্থত্রোজ্জ্বলকর:।

বিশালাক্ষ্যে দীর্ঘার্গলযুগলবেলাঙ্কিতভূজ:

স চৈতন্য: কিং মে পুনরপি দৃশোধাত্তি পদম্ ॥”

[উচ্চৈ: (উচ্চস্বরে) হরে-কৃষ্ণ ইতি (‘হরে কৃষ্ণ’

ইত্যাদি মহামন্ত্রগ্রহণে) স্মৃতিতরসন: (যাহার রসনা
নৃত্যরত), নামগণনাকৃতগ্রন্থিশ্রেণীসু ভগকটস্থত্রোজ্জ্বলকর:

(যাহার বামহস্ত উচ্চারিত নামসমূহের সংখ্যানির্ণয়ার্থ
রচিত গ্রন্থিশ্রেণীতে বিভূষিত কটস্থত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল),

বিশালাক্ষ্য: (যাহার নয়ন-যুগল আয়ত [এবং]

দীর্ঘার্গলযুগলবেলাঙ্কিতভূজ: (যাহার ভুজযুগল দীর্ঘ

অর্গলযুগলের দ্বারা সম্মুখে ও পার্শ্বদ্বারে লীলাবিলসিত

বা সঞ্চালিত হইতেছে), স: (সেই) চৈতন্য (শ্রীচৈতন্য-

দেব) পুন: অপি (পুনরায়ও) মে (আমার) দৃশো: পদং

(দৃষ্টি মার্গ) যাত্তি কিং (প্রাপ্ত হইবেন কি) ?]

অনুবাদ — ‘হরেকৃষ্ণ’ নাম উচ্চৈ:স্বরে উচ্চারণ
করিতে যাহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত

নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটস্থত্রে যাহার সুন্দর
বামহস্ত সুশোভিত, যিনি আয়তনেন্দ্র (কর্ণান্তনেন্দ্র) ও
অঙ্গাঙ্গুলস্থিতভূজ, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার
দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইবেন ?

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ জানাইতেছেন—

“নিজঘে গোড়ীয়ান্ পরিগৃহ প্রভুরিমান্

হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভো:।

ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্য: পরিদিশন্

শচীস্থঃ কিং মে নয়নশরণীং যাত্তি পুন: ॥”

[[যে] প্রভু: (প্রভু) জগতি (জগতে) ইমান্ (এই)

গোড়ীয়ান্ (গোড়ীয়গণকে) নিজঘে (আত্মীয়রূপে) পরি-

গৃহ (স্বীকার করিয়া) ভো: (হে গোড়ীয়গণ !) গণন-

বিধিনা (সংখ্যানির্ণয়-সহকারে) হরে কৃষ্ণ ইতি এবং

(হরে কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপ মহামন্ত্র) কীর্তয়ত (কীর্তন কর),

জনক ইব (পিতার দ্বারা) তেভ্য: (তাহাদিগকে) ইতি-

প্রায়াং (এইরূপ) শিক্ষাং (শিক্ষা) পরিদিশন্ (উপদেশ

করিয়াছিলেন), [সেই] শচীস্থঃ (শ্রীশচীনন্দন) পুন:

(পুনরায়) মে (আমার) নয়নশরণীং (দৃষ্টিমার্গ) যাত্তি

কিং (প্রাপ্ত হইবেন কি ?)]

অনুবাদ — যে প্রভু জগতে এই গোড়ীয়গণকে

তাঁহার নিজজনরূপে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে পিতার

দ্বারা “ হে গোড়ীয়গণ ! তোমরা সংখ্যানির্ণয়সহকারে

‘হরেকৃষ্ণ’ এই মহামন্ত্র কীর্তন কর, ” এইরূপ উপদেশ

করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি কি পুনরায়

আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে যে শ্রীরূপ-

রঘুনাথের আনুগত্য করিতে — তাঁহাদের শিক্ষা-

দীক্ষাগ্ৰন্থসংগ্রহ করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামিপাদের শিক্ষাসার উপরি উক্ত ‘হরেকৃষ্ণেত্বাচ্চৈঃ’ ইত্যাদি শ্লোকে এবং শ্রীরঘুনামদাসগোষ্ঠামিপাদের শিক্ষাসার উপরি উক্ত ‘নিজস্বৈ গোড়ীয়ান্’ ইত্যাদি শ্লোকে সুস্পষ্ট অভিযুক্ত হইয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতীরী সপার্ষদ শ্রীভগবান্ গৌরহরি নামভজনকেই ‘কৃষ্ণপ্রেম’ ও ‘কৃষ্ণ’ দিব্য সর্বশ্রেষ্ঠ মহাশক্তিধর বলিয়া জানাইয়াছেন। কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও কৃষ্ণস্বরূপ এক অভিন্ন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইলেও নামী হইতে নামেরই কক্ষণা অধিক ও শীঘ্র ফলপ্রদ। সূত্রাং অবিলম্বে সদ্গুরুপাদপদ্মশ্রয়ে নামভজনরত হওয়াই বিদূষাং পরামর্শঃ। নিরপরাধে নামগ্রহণফলে অতি শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমভক্তিলভের দোভাগ্য উদিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণগুরুর গোড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেববিভা-ভূষণ প্রভু উক্ত ‘হরেকৃষ্ণেত্বাচ্চৈঃ’ শ্লোকের ‘স্ববমানা-বিভূষণ’ ভাষ্যে লিখিয়াছেন —

“হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীক গ্রহণম্। বোড়শ-নামাত্মন্য ধাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈকককারিতেন স্কুরিতা কৃতনৃত্যারসনা জিহ্বা যন্ত সং।”

অর্থাৎ ‘হরে কৃষ্ণ’ এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ। বোড়শ-নামাত্মক ধাত্রিংশং (ষোল্লক্ষ্য বত্রিশ অক্ষর) অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় ধাত্রীর জিহ্বা স্কুরিত

হইতেছে অর্থাৎ নৃত্য করিতেছে।

এস্থলে ষোল্লক্ষ্য বত্রিশাক্ষরযুক্ত মহামন্ত্র নামগ্রহণই যে সপার্ষদ শ্রীমন্নামপ্রভুর অভিমত, অন্ত কোন সকপোল-কল্পিত নাম নহে, ইহাই সুস্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-রচিত “শ্রীশ্রীষড়্গোষ্ঠামাষ্টকম্” স্তবের নিম্নোক্ত বর্গ শ্লোকে গোষ্ঠামিষট্ঠকের সংখ্যা-পূর্বক নামগান-নতি দ্বারা কালাতিপাত করিবার কথাও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে —

“সংখ্যাপূর্বক নামগাননতিভিঃ কালাবদানীকৃতৌ
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্ত দীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্বতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥”

সাধকের নামভজন প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“নাম অধিক সংখ্যক হইবে — এই চেষ্টা করা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নাম হইবে, ইহার যত্ন করা উচিত।”

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—

“লক্ষ্যের ব্যতীত গৌরভক্তির আদর্শ গোড়ীয়গণ কেহই স্বীকার করেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ্যনাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন।”

সপার্ষদ শ্রীমন্নামপ্রভুর উপদেশামৃত

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপাগুরুর আচার্য্যাবধা পরমারাধা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালীন আদি মধ্য অন্ত্য — সকল লীলাতেই শ্রীমন্নামপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শুদ্ধনামভজনের আচার ও প্রচার — এই দুই প্রকার কার্যের আদর্শ প্রদর্শন করিলেও তাঁহার অন্তিম উপদেশে আরও স্পষ্ট করিয়া আমাদের স্ব স্ব স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় ও কৃত্য জানাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — “জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—

আমাদের সর্বস্ব। * * * জগতে শ্রীকৃষ্ণগ-চিন্তাশোভঃ প্রবাহিত হ’ক। সপ্তজিহ্বা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযন্ত্রের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা’তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্লেই সর্বার্থ-সিদ্ধি হ’বে। আপনারা শ্রীকৃষ্ণগগণের একান্ত আনু-গত্যে শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাতের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।”

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্নামপ্রভুর মহামন্ত্রকীর্ত্তনো-

পদেশ ও আদর্শ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

“আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিবে—॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু বলে,—কহিলাও এই মহামন্ত্র।

ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥

ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্বক্ষণ বল’ ইথে বিধি নাহি আর॥”

—চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৭৫-৭৮

এ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল তপন মিশ্রের প্রতি
শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্বোপদেশ—

“কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম-সংস্কীর্তন।

চারিযুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ॥

‘কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বিকীর্তনং॥”

—ভাঃ ১২।৩৫২

[অর্থাৎ “সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানকারি ব্যক্তির,
ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজ্ঞনকারীর এবং
দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর অর্চনে যে হরিতোষণরূপ ফল লাভ
হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরির কীর্তনপ্রভাবে সেই
সমস্ত ফল লাভ হয়।”]

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।

আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥

* * *

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ঘেঁকিছু সকল।

হরিনাম-সংস্কীর্তনে মিলিবে সকল॥

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরত্থা॥

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥’

এই শ্লোক নাম বলি’ লয় মহামন্ত্র।

ধোল-নাম বক্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥

সাদিতে সাধিতে যবে প্রেমাক্ষর হবে।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥”

—চৈঃ ভাঃ অ ১৪।১৩৭-১৩৯, ১৪৩-১৪৭

শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভুর বদনে নিরন্তর ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম ও
নয়নে অবিরাম জলধারা—

“নিরবধি শ্রীআনন্দধারা শ্রীনয়নে।

‘হরে কৃষ্ণ’ নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে॥

* * *

সর্বদা শ্রীমন্তক শোভিত চন্দনে।

নিরবধি ‘হরেকৃষ্ণ’ বেলে শ্রীবদনে॥”

—চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৬৪, ২০৬

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া
শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভুর শিক্ষা—

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’ ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংস্কীর্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পার প্রেমধন॥”

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

শ্রীল প্রকাশানন্দ প্রতি শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভু—

“কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত’ স্বভাব।

যেই জপে, তার কৃষ্ণ উপজয়ে ভাব॥”

—চৈঃ চঃ অ ৭।৮৩

সুতরাং শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভু নামসংস্কীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ
ভজন বলিয়াছেন, ইহা হইতেই সর্বসিদ্ধি এবং সাধ্য-
সাধনতত্ত্ব ও শ্রীরাম-রামানন্দ-সংবাদের সর্বগুহ্যতম
সাধ্যসার শ্রীরাধাপ্রেম স্বরস্তু লভ্য হইবে। নামভজনে
শৈথিল্য প্রদর্শন পূর্বক রসতত্ত্ববিচারে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন
করিতে গেলে অনধিকারচর্চাকালে মহদপরাধপক্ষে
নিমজ্জিত হইয়া অতি নিদারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ নরকপথের
যাত্রী হইতে হইবে। সদগুরুচরণাশ্রয়ে নিকপট নামাশ্রিত
ভক্তেরই গুরুরূপাজলে জড়বিষয়ালন নির্বাপিত হইয়া
শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদারবিন্দমকরন্দরসাস্বাদন-সৌভাগ্যের
উদয় হইয়া থাকে, তিনিই ধন্য হন—কৃতকৃতার্থ হন।
প্রাকৃতভাবনাবশ্বে লাম্যমাণ জড়রসরসিক কামকোদাসক্ত
বদ্ধজীবের অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর শুদ্ধ-
ভক্তজন্যস্বাভাব রসবিশেষের আশ্বাদন-দন্ত সুধীসজ্জন

সমাজে অত্যন্ত শোচ্য ও হাস্যাত্মক বলিয়াই বিচারিত হইয়া থাকে। সদগুরুচরণাশ্রিত নামাশ্রিত ভক্তই নাম-রূপাপূর্বক তদাশ্রিতের কৃষ্ণে ভাবোদয়ের সৌভাগ্য রূপাবলে পরতর্কে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন। প্রদান করেন।

ষোড়শ বর্ষারম্ভে

আমরা শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ — এই তিন বিঘ্নবিনাশন বাঞ্ছাকরতরু নিত্য মঙ্গলময় নিত্যারাধ্য-বস্তুর স্মরণ-প্রযত্ন-মূলে পঞ্চদশবর্ষব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবাচেষ্টা করিয়া বর্তমানে ষোড়শবর্ষীয় সেবার শুভা-রম্ভে আবার তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মের অর্হেতুকী রূপাপ্রার্থী হইতেছি এবং সকাঁতরে জানাইতেছি—

“বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
রূপা কর, ছোড়ত বিচার।

তব পদ-পঙ্কজ- সীধু পিবাওত,
অধম সেবকে কর পার ॥”

শ্রীম-কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বন্দনার এইরূপ ক্রমান্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন—

“বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীমুতপদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশচ
শ্রীকৃপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথাদিতং তং সজীবম্।
সাদৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিষাখাদিতাংশচ ॥”

অর্থাৎ আমি মন্বদীক্ষাগুরুর শ্রীপাদপদ্ম, শিক্ষাগুরুর, চতুর্গোহুত ভক্তভাগবত বৈষ্ণবগণ; অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামি-সহ তথা স্বভক্তসহ এবং রূপাশ্রয় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-সহ তথা নিজানুকম্পিত রূপাশ্রয় শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিসহ বিজ্ঞান শ্রীকৃপাগোস্বামী; শ্রীঅদৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও পরিজন অর্থাৎ আবরণ পার্শ্বদগণ-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং গণ সহিত শ্রীললিতা-বিষাখাদি-যুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

আমরাও ঐ ক্রমে তাঁহাদের বন্দনা ও রূপা-প্রার্থনা-মূলে ষোড়শ বর্ষারম্ভে মঙ্গলচরণ সম্পাদন করিতেছি এবং ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদানুগতো ভক্তিবিশ্ববিনাশন

শ্রীশ্রীসিংহপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি—

“স্বস্ত্যন্ত বিশ্বন্ত খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্ত ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্ৰং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্ততাং নো মতিরপ্যাহেতুকী ॥”

—ভাঃ ৫।১৮।৯

অর্থাৎ “নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক; খল ব্যক্তিগণ অল্পকূল হউক (দুর্মতি খলগণ তাহাদের ক্রুরতা বা ক্রোধাদি পরিত্যাগ পূর্বক স্মৃতি হউক—সাধুগণকে পীড়া প্রদান না করুক); প্রাণি-সকল বুদ্ধিযোগে পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করুক; তাহাদিগের মন মঙ্গল (উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিকামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেবে প্রতিষ্ট হউক।”

“শ্রীয়াং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।

তস্মিন্শ্রষ্টে জগত্তুষ্টং শ্রীণিতে শ্রীণিতং জগৎ ॥”

অর্থাৎ সর্বযজ্ঞেশ্বর পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি শ্রীত হউন। তাঁহার তুষ্টিতেই সমগ্র জগতের তুষ্টি, তাঁহার শ্রীতিতেই সমগ্র জগতের শ্রীতি। অর্থাৎ তিনি তুষ্ট বা শ্রীত হইলেই সমগ্র জগৎ তুষ্ট বা শ্রীত হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া থাকি আমাদের State (রাজ্য) নাকি Secular—ধর্মনিরপেক্ষ—not concerned with religion অর্থাৎ ধর্মের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।—‘Secularism’ শব্দার্থ অভিধানাদিতে লিখিত হইতেছে—“রাজ্য, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার মতবাদ”—“The doctrine that State, morality, education etc. should be separated from religion.” এই অর্থ মানিতে হইলে বলিতে হইবে, ইহাতে ধর্মের প্রকৃত মর্ম

অবধারিত হয় নাই। কোন বস্তুর ধর্ম বলিতে সেই বস্তুর স্বভাবকেই বুঝিতে হইবে। দেহ মন প্রভৃতি অনিত্য জড় বস্তুর ধর্ম বা স্বভাব অনিত্য, আত্মা নিত্য, অতএব তাহার ধর্মও নিত্য। বস্তুর নিত্যধর্ম বস্তুর সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত, তাহা কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অনিত্য ধর্মে নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু নিত্যধর্মে বা শুদ্ধ আত্মধর্মে দেশকাল-পাত্রাদিগত কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রবেশের অবকাশই থাকিতে পারে না। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গমাশ্রয়ক অনন্তকোটি জীবাশ্রয় নিত্য-ধর্ম একমাত্র ভগবদানুরক্তি। এইজন্ত মুনিবর ত্রীশাণ্ডিল্য ঈশ্বরে পরানুরক্তিমুলা ভক্তিকেই জীবাশ্রয় পরমধর্ম বলিয়াছেন। দেহাত্মবোধজনিত নিমিত্ত-সঙ্গত নৈমিত্তিক অসমঞ্জস ধর্মবিচারে অবশ্য কখনও কোন অবস্থায়ও প্রকৃত সামঞ্জস্য সংরক্ষিত বা ঐক্য সংসাধিত হইতে পারে না, তাহাতে সার্বদেশিক সার্বকালিক সার্বজনীন সংঘর্ষ অনিবার্যই হইয়া থাকে। এই সংঘর্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করাইতে গিয়া মনুষ্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনীষিগণ যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নাম দিয়া রাষ্ট্রকে বা রাষ্ট্রের শিক্ষা ও নীতিকে ধর্ম সম্পর্ক শূন্য করিবার বিচার বরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধারণা, যে উহাতে চাঁসনালার ধনিগহ্বরে জীবনাস্তক জলপ্রবাহ প্রবেশের স্থায় সমাজে নানা কুশিক্ষা ও কুনীতি প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যসমাজের প্রাণবায়ু অচিরেই রুদ্ধ করিয়া দিবে। আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত নিত্যধর্ম যে পরমাত্মাতে আনুরক্তি, তাহা হইতে তাহাকে স্থলিত বিচ্যুত বা পৃথগ্ভূত করিতে গেলে পরিণাম অত্যন্ত বিষময় হইয়া পড়িবে, ইহা সহজেই অনুমের। আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে উদ্ধৃত জীবের সেই ভূমা আনন্দই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু, নাগ্নে স্নানমতি—অন্ন সীমাবিশিষ্ট বস্তু দিয়া দুধের স্বাদ খোলে মিটাইবার বা চূর্ণগোলাকে দুধ বলিয়া বুঝাইবার অপ-চেষ্টা কখনই সমাজের কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে না। ভূমৈব পরমং স্নানম্। তজ্জন্ত ধর্মহীন শিক্ষায়তন অনন্ত শুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠা-দ্বারা কখনই মনুষ্য সমাজের

প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। আত্মার শুদ্ধ ভগবদনুশীলনপর নিত্যধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করিবার বিচারাবলম্বন দ্বারাই সমাজের প্রকৃত হিত সাধিত হইতে পারে, তাহাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত করা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—নরতল্ল ভজনের মূল, সেই নরদেহরূপ সুপটু তরণী, সৎগুরুরূপ কর্ণধার ও কৃষ্ণকৃপারূপ অহুকুল বায়ু পাইয়াও যাহারা এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্ত যত্ববান্ না হন, তাঁহারা আত্মঘাতী মহাপাপী।

“নৃদেহমাখং স্কলভং স্কলভং

প্রবং স্কলং গুরুকর্ণধারম্।

ময়ান্নকুলেন নভস্বতেরিতং

পুমান্ ভবাকিং ন তরেৎ স আত্মহা॥”

— ভাঃ ১১২০।১৭

ধর্মহীন শিক্ষা বা নীতি প্রচার দ্বারা ঐ মহাপাপে ইন্ধনই যোগান হয়। তদ্বারা কখনই প্রকৃত জীবহিত-চেষ্টা বা সমাজহিতৈষিতা সাধিত হইতে পারে না।

আস্তিক্য শব্দের আভিধানিক অর্থ—বৈদিক ধর্মে ঈশ্বরে বা পরলোকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—“আস্তিক্যং শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসঃ” (গী. ১৮।৪২ সারার্থবিবীণী)। ঐ গীতার ১৬শ অধ্যায়ের সারার্থবিবীণীতেও লিখিয়াছেন—“আস্তিক্য এব বিন্দুস্তি সঙ্গতিং সন্ত এব তে। নাস্তিক্য নরকং যাস্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ॥” অর্থাৎ আস্তিক্যগণই সঙ্গতি প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ইহা সাধু, আর নাস্তিকগণ নরকে গমন করিয়া থাকে—ইহাই গীতা ষোড়শ অধ্যায়ের সারার্থ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি আত্মবিনাশী নরকের দ্বারস্বরূপ, স্তবরাং নিঃশ্রেয়সার্থী মানবমাত্রকেই ঐ তিনটিকে সর্বপ্রযত্নেই ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই মানব শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবেন। যাহারা এই শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছাচারে রত হইয়া পড়েন, তাঁহারা কখনই কোন সুখ, সিদ্ধি বা পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। স্তবরাং কার্যাকাঙ্খা ব্যবস্থিতিতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপাদক। ভক্তিই শাস্ত্রের

মর্ম, তাহা অবগত হইয়া কাঁধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

শ্রীমন্মধবাচার্য্যপাদ স্বান্বাক্য ও নারদীয় পুরাণবাক্য উদ্ধার করিয়া শাস্ত্র কাঁহাকে বলিতে হইবে, তাহা জানাইয়াছেন। স্বন্দপুরাণবাক্য —

“ঋগ যজুঃসামাথর্কীশ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।

মূলরামায়ণকৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

যচ্চানুকূলমেতশ্চ তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্।

অতোহন্তগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবজ্জ্য তং॥”

অর্থাৎ “ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ক—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র — এই সকল ‘শাস্ত্র’ বলিয়া কথিত। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও ‘শাস্ত্র’ মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যেসকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত’ নহেই, বরং তাহাকে কুবজ্জ্য বলা যায়।

নারদীয় পুরাণবাক্য, যথা—

“পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা।

পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ (বা ‘বিষ্ণুবেদ’)

ইতীরিতঃ॥”

বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের তৃতীয় সূত্রে ‘শাস্ত্রযোনিভ্যং’ সূত্রে বলা হইয়াছে — যে পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, তিনিই জিজ্ঞাস্ত ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্ম অল্পমানবেত্তা নহেন, তিনি ঔপনিষদ অর্থাৎ উপনিষদবোধ্য বস্তু। বৃহদারণ্যক ঋতিতে বলা হইয়াছে — ‘তস্মৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি’, গোপালতাপনী ঋতিও বলিয়াছেন, তিনি বেদান্তবেত্তা, গীতোপনিষদও বলিতেছেন—বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেত্তা; অর্থাৎ তিনি বেদবেত্তা। সুতরাং ‘শাস্ত্রযোনিভ্যং’ বলিতে শাস্ত্র অর্থাৎ উপনিষদবোধহেতু অর্থাৎ জ্ঞানের উপায় বাঁহার। উপনিষদদ্বারা ‘যিনি প্রতিপাদিত হন, তিনিই ঔপনিষদ পুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে উত্তম শ্রেয়ো জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে শব্দব্রহ্ম বেদাদি শাস্ত্র ও বেদবেত্তা পর-ব্রহ্মে নিষ্কাত ভজনবিজ্ঞ উপশমাশ্রিত সদগুরুচরণাশ্রয়

করিতেই হইবে। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষচতুষ্টয়রহিত শব্দই মূল-প্রমাণ হওয়ায় ‘শ্রুতেশ্চ শব্দমূলভ্যং’ (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) সূত্রানুসারে অচিন্ত্যনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দদ্বারাই বোধ্য।

ধর্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক অপৌকষ্যের বাক্যই বেদ। ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা সেই বেদার্থ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য, বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্য ও সমগ্র বেদের সুবিস্তৃত অকৃত্রিম ভাষ্য — নিগমকল্পতরুর প্রপঞ্চকলস্বরূপ সর্ববেদান্তসার — সর্বশাস্ত্রমুকুটমণি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু অমলপুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবতই সেই পরমশিবদ তাপত্রয়োমূলক বাস্তববস্তুর সম্পূর্ণ সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবতকে ‘অমল প্রমাণরত্ন’ বলিয়া স্বীকারাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপ্রিয়তম শ্রীশ্বরূপরূপাদি পার্শ্বদ সকলেই এই শ্রীমদ্-ভাগবত অহুগমনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, আমাদের শ্রীকৃপানুগ গুরুবর্গেরও এই শ্রীমদ্ ভাগবতই যথাসর্বস্ব, চারিসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য ও তচ্ছিষ্য পরম্পরা সকলেই একবাক্যে এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে বহুমানন করিয়াছেন, আমরা শ্রীকৃপানুগগুরুশারম্পর্ষ্যানুসরণে সেই শ্রীমদ্ ভাগবত ও তদনুগ গোপাশ্রমিশাস্ত্রানুগমনে ‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার যথাসক্তি সেবাচেষ্টা করিয়া থাকি। বর্তমান ষোড়শবর্ষেও আমরা আমাদের হৃদয়ে সেইরূপ সেবাসঙ্কল্প সুদৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া লেখনী ধারণ করিতেছি। শ্রীশ্বরূপ-রূপানুগবর গুরুপাদপদের এবং শ্রীপত্রিকার পরমপূজনীয় প্রতিষ্ঠাতা — শ্রীশ্রীগুরুদেবের মনোহরীষ্টপরিপূরক পরমপ্রিয়তম নিজজন শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-প্রবর ত্রিদিগুগোপাশ্রমী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের অহৈতুকী রূপাই আমাদের এই সম্পাদক সঙ্ঘের একমাত্র বল ও ভরসা। শ্রীগুরুপাদপদের সঞ্চারিত রূপাশক্তিপ্রভাবে তিনি আজ আদ্যমুদ্র-হিমাচল সমগ্রভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উদ্ভটন করিয়াছেন — কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নামপ্রবর্তন। তিনি আমাদেরকেও রূপা ককন বাঁধাতে আমরা সেই

পতাকার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুগোরাঙ্গের এবং তন্নিকজন তাঁহার মনোহরীষ্ট সেবাসৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। শুদ্ধাসরস্বতী জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর

ও অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভ আবির্ভাব-তিথিপূজা বা শ্রীবাসপূজার শুভারম্ভ-মুখে এই পত্রিকার ষোড়শবর্ষের শুভারম্ভ জয়যুক্ত হউন।

মহতের বিষমব্যবহার

[মহোপদেশক শ্রীমদ্বজ্ঞাননিলায় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি, বিজ্ঞানভদ্র]

বিষম ব্যবহার অর্থে কেবল ব্যবহার কার্পণ্যকেই বুঝায় না, পরন্তু অতিরিক্ত, অত্যাস্চর্যজনক ও মারাত্মক ব্যবহারকেও বুঝায়। সীমাবদ্ধ জগদাধিপতি বদ্ধজীবগণের মধ্যে এই জাতীয় ব্যবহার কিছু আশ্চর্যজনক নহে, কেননা স্বল্প পরিসরতার মধ্যে স্বার্থের সংঘাত অবশ্যস্বাভাবী ও স্বাভাবিক। কিন্তু উদার চরিত্র শ্রীভগবানে, শ্রীগুরুদেবে ও শ্রীভগবদ্ভক্তেও ব্যবহারের বিষমতা কখনও কখনও পরিলক্ষিত হয়। কাজেই ব্যবহারের বিষমতা যখন একটা সার্বভৌম ও স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার তখন ইহাকে ত' উপেক্ষা করা যায় না বরং তাহার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে অভিনিবেশ প্রয়োগ করতঃ তদুদ্ভূত মঙ্গল-মঙ্গলের পরিমাণ নির্ধারণ করাই বুদ্ধিমত্তার কথা হইবে।

সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জগতে বিষম ব্যবহার হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে বহুতর অমঙ্গলের সূচনা হইতেছে কিন্তু তাহা হইতে পরম মঙ্গলেরও যে সূচনা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহারও পরিমাণ কিছু কম নহে, বরং ক্ষেত্রবিশেষে অপরিমিত বলিলেও কোন অতুক্তি হইবে না। যখন ইতর ব্যক্তিগণের ইতর ব্যবহার হইতেও শ্রেয়ঃ সাধক জগৎ বা জগজ্জীব কল্যাণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তখন প্রতিষ্ঠিত মহৎ, মহত্তর ও মহত্তমগণের বিষম ব্যবহার হইতে পরমমঙ্গল লাভের আশাতে আমরা বঞ্চিত থাকিব কেন? বিশেষতঃ মহতের বিষম ব্যবহার হইতে অমঙ্গল ত' হয়ই না, উপরন্তু যে-সমুদয় মঙ্গলের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তাহাতে অন্ধকারময় জগৎও বৈকুণ্ঠ-আলোকে সময় সময় উদ্ভাসিত হয়। মহতের বিষম ব্যবহারের আরতমো মঙ্গল শোভারও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

মায়ায় প্রপঞ্চে ব্যবহার-বৈষম্য না থাকিলে হয়ত অন্ধকার আরও গাঢ়তরই হইত। কাজেই মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতেই চরাচরে বিষমব্যবহারের উদ্ভব ব্রূহিতে হইবে। তাই ভক্ত ও ভগবানের কতিপয় বিষম ব্যবহারের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত ও তাহার উত্তর-ফল পরম সুখময় বর্ণন-করতঃ অংগুষ্ঠিক্রিয় প্রয়াস পাইতেছি।

একটি পৌরাণিক কথা। এক সময় ভগবান্ শ্রীনিবাস একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করতঃ শ্রীনারদ-সহ জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। একটি ধনাঢ্য বৈশ্যের গৃহে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহের চেষ্টা করিলে ধনমদে মত্ত গৃহস্থামী কর্তৃক তিনি অসৎকৃত হইয়া তাহাকে আলী-কান্দ (?) করিয়াছিলেন, 'তোমার গৃহ ধনধান্তে অধিকতর ভরিয়া উঠুক।' তদনন্তর তথা হইতে তাঁহার প্রস্থান করেন এবং পুনঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অপর একটি গৃহস্থারে আসিয়া ভিক্ষার্থে দণ্ডায়মান হন। এই গৃহটি কিন্তু বৈশ্যের দালানকোঠা নহে, ইহা অতীব সাধারণ একটি গরীবখানার ব্রাহ্মণের পর্ণকুটির। কুটিরের বহির্দ্বারে রজ্জ্ববদ্ধ একটি সুন্দরী গাভী। ভিক্ষকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিলেন এবং গৃহে যাহা কিছু গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সংগৃহীত ছিল, তৎসমুদয়ই পরম মর্যাদা-সংকারে ভিক্ষার্থীদের প্রদান করিলেন। ভিক্ষা পাইয়া ভিক্ষুক বেশী ভগবান্ ব্রাহ্মণকে অভিষাপ (?) দিলেন, "তোমার গাভীটা শীঘ্রই মরিয়া-যাউক।" অতঃপর তাঁহার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। শ্রীনারদ ভগবানের বিষম ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। পথচারণকালে নারদ ভগবান্কে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,

‘ভগবন্! আপনার এই প্রকার বিষম ব্যবহার কেন হইল? যাহাকে অভিশাপ দেওয়ার কথা তাহাকে করিলেন আশীর্বাদ, আর যাহাকে আশীর্বাদ করিবার কথা তাহাকে করিলেন অভিশাপ?’ জননিবাস শ্রীহরি ঈশ্বর হাস্য করিলেন, উত্তরে বলিলেন, ‘ধনমদমন্ত বৈষ্ণটীকে জগতের দুঃখ তাপ আরও দীর্ঘ দিন ভোগ করিতে হইবে বলিয়া তাহাকে এই জাতীয় আশীর্বাদ করিলাম, বস্তুতঃ ইহা আশীর্বাদ নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সংসার-দুঃখের অবসান হইয়াছে, তাহার আসক্তির বস্তু জগতে আর কিছুই নাই, কেবলমাত্র গাভীটা ছাড়া। কাজেই গাভীটা শীঘ্র মরিয়া গেলে ব্রাহ্মণের সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও আমাতে সার্বকালিক ধ্যান সম্ভব হইবে। ইহা বস্তুতঃ অভিশাপ নহে, আশীর্বাদ।’ যাহা হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ, তাহা বাহ্যতঃ যত অশুভই হউক অথবা শুভই হউক। শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি অনন্ত শঙ্কশাস্ত্রসমূহও এই জাতীয় বিষম ব্যবহারের দৃষ্টান্তস্বল। তৎসমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেও কথঞ্চিৎ উদ্ধৃত করতঃ বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার যত্ন করিব।

শ্রীরামায়ণ। শ্রীরামের বনবাস। সঙ্গে শ্রীসীতাদেবী ও অমুজ লক্ষণ। গভীর বন। বনমধ্যে ছোট একটি কুটির। একদিবসের একটি ঘটনা। কুটিরমধ্যে জগন্নাথ শ্রীসীতাদেবী। কুটিরের বহির্দেশে প্রহরারত আদর্শব্রত ও পরমশুশ্রূষ দেবর লক্ষণ। প্রিয়ার অভিলাব পূরণে মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবমান শ্রীরাম। কণকাল মধ্যেই গহন কানন হইতে শ্রীরাম-কণ্ঠস্বর শুনা গেল, ‘হা সীতা! হা লক্ষণ!’ বিপন্নের করুণ কণ্ঠস্বর। প্রিয়-অনিষ্টাশঙ্কিনী প্রিয়ার হৃদয় উষেগ ও আত্মিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শ্রীলক্ষণ কিন্তু হিমাদ্রির ছায় অটল অচল; বিশ্বাস শ্রীরামের কখনও অশুভ হইতে পারে না। দেবরকে জ্যোষ্ঠের সন্ধানে প্রেরণের ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র হইল। সীতাদেবীর হৃদয়ে অমূলক সন্দেহ উপস্থিত হইল। দেবরের উপর গিনি নির্দম ও বিষম ব্যবহার করিলেন। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাতাব্যাবিদ্ধ লক্ষণ কুটির ত্যাগ

করতঃ জ্যোষ্ঠের সন্ধানে গেলেন। এই অবসরে সন্ন্যাসী-ছদ্মে রক্ষঃকুলপতি রাবণ সীতা হরণ করিল। সাতকাণ্ড রামায়ণে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামের লীলা রচিত হইল। দুর্নীতিপর জগতে নীতির মান বাড়িল, অশান্তি কমিল। এই মহাকাব্যখানির পাত্রসংস্থাপন আগাগোড়া বিষম-ব্যবহারে পরিপূর্ণ অথচ পরমমধুর ও জগতের পরম আশ্রয়। এবস্ত্রপ্রকারই ঐতিহ্যপূর্ণ বিশাল ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের কাহিনীগুলিও আগাগোড়া বিষম-ব্যবহারে পূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলময় প্রকাশেরও একমাত্র নিমিত্ত হইল বিষম-ব্যবহার। পাণ্ডববংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিত ধর্মবৎসল, ধর্মতৎপর ও ধর্মজ্ঞ। তিনি গর্ভস্থ অবস্থায়ই বিষ্ণুচক্র কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া তাঁর অপর নাম বিষ্ণুরাত। বনমধ্যে যুগয়া করিতে গিয়া তিনি পিপাসার্ত হইলেন। অনেক অমুসন্ধানে বনমধ্যে একটি আশ্রম খুঁজিয়া বাহির করিলেন। আশ্রম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অমুভব করিলেন বিজনের অথও নীরবতা। রব করিলেন, ‘পিপাসার্ত! জল! জল!’ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হই মাত্র হইল, কোন দিক হইতে কোন উত্তর আসিল না। আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন রাজা। সেই অথও নীরবতার মধ্যে পরিলক্ষিত হইল ধ্যানমগ্ন নিমন্তক এক মুনিবর; শমীকমুনি। পিপাসাকাতর রাজার ধর্মবিভ্রম হইল। ক্ষুধাচিত্ত রাজা মুনির গলদেশে একটা মৃত সর্প ধম্বকের অগ্রভাগ দ্বারা জড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। মহতের বিষমব্যবহার পরিদৃষ্ট হইল। মুনিবরের অতিতেজস্বী পুত্র শূদ্রী তখন স্থানান্তরে অগ্নাত বালক সহ ক্রীড়ারত ছিলেন। তিনি জনৈক বালকমুখে পরীক্ষিত কর্তৃক তৎপিত্রাবমাননা। শ্রবণমাত্রই অত্যন্ত ক্ষুধাচিত্তে সেই সহচর বালকগণ সমক্ষেই কৌশিকী নদীজলে আচমন পূর্বক বাণবজ্র বিসর্জন করিলেন যে,—‘যে কুলোদ্ধার মর্যাদা লঙ্ঘন পূর্বক আমার পিতৃ অঙ্গে মৃত সর্প নিক্ষেপ-দ্বারা পিতার অবমাননা করিয়াছে, আমার আদেশক্রমে অত্ন হইতে সপ্তম দিবসে মহাবিষধর সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক তাহাকে দংশন করিবে। মৃতসর্পস্থলে জীবন্ত সর্প আসিয়া তাহাকে সংহার করুক।’ মুনিবালক এইরূপ

অভিশাপ দানান্তে আশ্রমে ছুটিয়া আসিয়া পিতৃদেবের গলদেশে সর্প বিলম্বিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখভরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুনিবর শমীকের ধ্যান ভঙ্গ হইল। গলদেশ হইতে মৃতসর্প অপসারিত করিলেন। পুত্রকে ক্রন্দন-কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পুত্র শূদ্রী সকলবৃত্তান্ত পিতৃদেবকে কহিলেন। মহা-রাজকে অভিসম্পাত করিবার কথা শুনিয়া মুনিবর অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে পুত্রকে অনেক ভৎসনা করিলেন। কিন্তু হায় অমোঘ ব্রহ্মশাপ! অভিশাপ শ্রবণে প্রজাবর্গের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রজাবৎসল ও ধর্মবৎসল রাজার আকস্মিক বিয়োগ আশঙ্কায় সাধারণ-প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় মুনিঋষি সকলেই প্রমাদ গণনা করিলেন। সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত প্রায়োপবেশনরত রাজার মঙ্গল চিন্তায় রত হইলেন। মহারাজ পরীক্ষিত হস্ত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ণার বৈশিষ্ট্য অনুভব করিলেন। তিনি পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রীশুকমুখে প্রকাশিত হইলেন। স্মৃতি-পুণ্ড শাস্ত্রতাৎপর্যবিদগণের নির্মলবোধ হইল “কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ম্” এবং পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, যাঁহা দেবজ্ঞান ও বেদজ্ঞান এবং যাঁহা বেদরজ্জ্বলে আবদ্ধ স্বর্গাদির মধুপুষ্টিবাক্যে প্রলোভিত মহা-মহা-শাস্ত্রজ্ঞগণের পক্ষেও দুস্ত্রাপ্য। যাঁহার আবির্ভাব সচরাচর ন্যূনোকে হয়ই না, সেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাসম্পদে জগতের স্রায় অজ্ঞান-অন্ধকার-ভূমিও আলোকিত হইল। জগতের শ্রীকৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইল।

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ পরমধার্মিক নরপতি। সমাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইলেও তিনি পরম নিকঙ্কণ সাধু পুরুষ। শ্রীভগবান্ বাসুদেব ও তাঁহার সাধু ভক্তে তিনি ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া রাজ্য ঐশ্বর্য ও সম্পদে তাঁহার কোন স্পৃহা নাই, কোন অভিমানও নাই। এহেন মহানুভব, শুশ্রূ ও মহাভাগবত অম্বরীষের প্রতি সম্যাসী মহাতপা ঋষি দুর্দামার বিষম-ব্যবহার পরিলক্ষিত হইল।

উত্তরকল শুভ হইল। রাজর্ষি অম্বরীষের শুদ্ধ বৈষ্ণব-জীবন প্রকাশিত হইল, যাঁহা জগতের পরম আশ্রয়। এবম্বিধ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের ও অম্বরকুলগুরু শ্রীশুক-চাণ্ড্যের বিষম-ব্যবহারে অম্বরকুলজাত শ্রীবলিমহারাজের প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণব-চরিত্র প্রকাশিত হইল। অম্বর সম্রাট হিরণ্যকশিপুর নিম্ম ও বিষম-ব্যবহারে ভুবনমঙ্গল শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রকাশিত হইল। দেবী পার্বতীর বিষমব্যবহারে মহাভাগবত রাজা চিত্রকেতুর তথা ব্রহ্মসুর দেহ প্রাপ্ত অভিশপ্ত চিত্রকেতুর ভক্তিময় চরিত্র প্রকাশ পাইল। এইমত শ্রীনারদের বিষমব্যবহারে কুবের পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীবের ভাগবত-জীবন লাভ হইল এবং শ্রীউত্তানপাদের বিষমব্যবহার শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হইল ইত্যাদি। এমনকি মহাবদান্ত শ্রীগৌর অবতারেও অসংখ্য বিষমব্যবহারের পরিচয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত শাস্ত্রগ্রন্থ পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রতি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি ঠান্ডাকাজির বিষম-ব্যবহার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তত্তত্তরকালে শ্রীমৎ লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিষমব্যবহার তদীয় শিষ্য শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি এবং শ্রীমদ্ হৃদয়চৈতন্য প্রভুর বিষম-ব্যবহার শ্রীমৎ শ্রীমানন্দ প্রভুর প্রতি, ইত্যাদি বহুতর বিষম-ব্যবহারের কথা আমরা অত্মপিও শুনিতে পাইতেছি। এতৎ সমুদয় ক্ষেত্রেই বিষমব্যবহারের ফল কেবল শুভই শুভ হইয়াছে, কোথাও কোন অমঙ্গল হয় নাই।

এতদ্বারা উপসংহারে ইহাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, এই জাতীয় বহুতর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বিষম-ব্যবহারের দৃষ্টান্তে জগতের শোভা বর্দ্ধিতই হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই বিষম-ব্যবহার হইতে আরম্ভ সর্ব প্রাণীরই মঙ্গল লাভ হইতেছে। বিষম-ব্যবহারে ভীত হইবার কিছুই নাই; বিশেষতঃ মহতের বিষম-ব্যবহারে সহিষ্ণু ব্যক্তি অধিকতর লাভবান্ হন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিময়ুখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ— চৈত্যাগুরু কি করেন ?

উঃ— ভগবান্ শ্রীহরি প্রত্যেক জীব হৃদয়ে চৈত্যাগুরু-রূপে (অন্তর্যামিরূপে) অবস্থান পূর্বক জীবের সদস্য-বৃত্তিকে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রয়োজককর্তৃত্বে চৈত্যা-গুরুই পরিলক্ষিত হয়। চৈত্যাগুরু মহাত্মগুরু নির্দেশ করিয়া দেন। চৈত্যাগুরুর রূপা ব্যতীত দীক্ষাগুরুর পাদপদ্মসেবা লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণপ্রসাদজ স্মৃতি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্যাগুরুর নিকপট রূপা লাভ করিতে পারে না।

জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাহা প্রবল থাকিলে জীব ভক্তিপ্রার্থী হইতে পারে না। ভাগ্যক্রমে ভগবচ্চরণাশ্রয়ের ইচ্ছা জাগিলে তখন চৈত্যাগুরু রূপা করিয়া দীক্ষাগুরুর প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ দান করেন।

চৈত্যাগুরুর রূপায় মহাত্মগুরু নির্দিষ্ট হন। চৈত্যা-গুরুর রূপা দ্বিবিধ। সেই দুই প্রকার রূপাকলে কেহ বা আধ্যাত্মিক, কেহ বা অধোক্ষজ সেবক। যাহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণই জীবের একমাত্র আরাধ্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই অজ্ঞানভিলাষী। তাঁহারা শ্রেয়ঃপথের পথিক না হইয়া ক্ষণিক সুখপ্রদ প্রেয়ঃপথের পথিক হন। ইহাই চৈত্যাগুরুর কপট রূপা। কপটাই কপট রূপা পায়; আর নিকপট ভক্তীচ্ছু সর্জনগণ চৈত্যাগুরুর অকপট রূপা লাভ করিয়া ধন্য হন। যে জীব ভগবৎ-সেবক হইয়া ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কিছু চায়, সে কপটী ব্যতীত আর কি ?

ভগবান্ শ্রীহরি চৈত্যাগুরুরূপে যাহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রিয় শুদ্ধভক্তকে মহাত্মগুরু বা সদগুরুরূপে জানিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। ভগবদনু-গ্রহক্রমে জীব মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণমধোশোভা

সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ— শ্রীমদ্ভাগবত নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যের প্রচারক। তাহা নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের পরমপ্রিয় বস্তু। গীতা Infant class এর course অর্থাৎ শিশুশ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থ। আর শ্রীমদ্ভাগবত—উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ Post Graduate শ্রেণীর (পারমার্থিক বি-এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ-গণের) পাঠ্য। যাহারা পারমার্থিকতার কোন কথাই জানেন না, তাঁহাদিগকে প্রবেশিকা-পরীক্ষার উপযোগী করবার জন্য গীতাশাস্ত্র। আর যাহারা পরা-বিভাগ M.A.Ph.D., শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁ'দেরই অধিকার।

নিরপেক্ষ সজ্জনগণ গীতা ও ভাগবতে কোন ভেদ দর্শন করেন না। গীতা বা ভারত-ধর্ম্মের পরিণতিই ভাগবতধর্ম্ম। অগতে যত কিছু শ্রেষ্ঠ বিশেষণ আছে, ব্যাকরণে যত তমপ্ প্রত্যয় আছে, তৎসমস্তই ভাগ-বতের চরণে শোভা পায়। ভাগবতে আত্মধর্ম্মের কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোদ্ধ পদবী কেহই একচুনও টলাইতে পারে না।

পরমার্থ-রাজ্যে নবীন প্রবেশেচ্ছুগণের জন্য—পর-মার্থবিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীর জন্য গীতাগ্রন্থ নির্দিষ্ট হইতে পারে। আর যাহারা গীতার অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন, তাঁ'রাই পরমার্থবিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ মহান্ত-ভাগবতের নিকট ভক্তিসহকারে শ্রবণ, শূর্য্যলগ্ন্যে সূর্য্যভাবে পাঠ ও বিচার ক'রে প্রচুররূপে লাভবান হ'তে পারবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান্—অধোক্ষজ বস্তু। তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। যাহা যত তুল্য ও পরমসত্য, তাহা ত' সুরক্ষিত। বিমূখ-

গণের নিকট ভাগবত আত্ম-প্রকাশ করেন না।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ—মন্ত্রগ্রহণ ক'রেও আমাদের মননধর্ম্য দূর হচ্ছে না কেন?

উঃ—মন্ত্র পূর্ণচেতন বস্তু। মন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবান্। মন্ত্র আমাদের মননধর্ম্য হ'তে জ্ঞান করতে পারেন, পাপপুণ্যময় মনোবর্ষ হ'তে পরিত্রাণ ক'রে পার-মার্থিক যোগ্যতা প্রদান করতে পারেন; মন্ত্রের এ শক্তি আছে। তথাপি আমাদের চিত্তচঞ্চলতা যাচ্ছে না কেন? আমাদের মন্ত্র গ্রহণ করা হয় নাই। মন্ত্র দেওয়া মানে কাণে ফুঁ দেওয়া নয়। দিব্যজ্ঞানলাভের নাম মন্ত্রদীক্ষা। এই দিব্যজ্ঞান আমাদের জন্মজন্মান্তরের অদিব্যজ্ঞানের সৌধগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সেখানে অধোকজ্ঞানের সৌধ নির্মাণ ক'রে দেয়। দিব্যজ্ঞান দিবার সময় ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলেন—আমিই Absolute Truth. এই Absolute Truth (বাস্তব সত্য) শক্তি দ্বারা সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিই — গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Agents বা Messengers জগতে এসে থাকেন। কিন্তু যে মহাশক্তিশালী Messenger sent by God to suit the adaptability of all the recipients, সেই Sole Agent এর নাম—গুরু। সেই Expert এর মধ্য দিয়ে Revelation হয়। সেইরূপ গুরুই আমার মননধর্ম্য দূর ক'রে আমার চেতনতার বৃত্তিতে যুগান্তর আনতে পারেন।

শ্রীগুরুদেবের নিকট থেকে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তা' আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute knowledge বা কৃষ্ণ, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সন্নিদ্বিগ্রহ। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—আত্মার কি জন্ম আছে?

উঃ—আত্মা অজ বস্তু, তাহার জন্মনী কেহ নাই। আত্মা নিত্য বস্তু। এজন্ত আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই। তাই গীতা বলেন—‘অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে।’

আত্মা ভগবানের নিত্য সেবক। ভগবৎ-সেবাই তাহার নিত্য ধর্ম্য বা কৃত্য। এতদ্ব্যতীত আত্মার অজ

কোন কার্য নাই। আত্মার বৃত্তি ভোগ বা ভোগ চাওয়া নয়—‘দেহি, দেহি’ কথা আত্মার নাই। আত্মা বিষ্ণু-পরতত্ত্বের Associated Counterpart. পরতত্ত্বের সুধাকামনা বা দাস্তাই আত্মার বৃত্তি, ধর্ম্য বা স্বার্থ। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—Duty (কর্তব্য বুদ্ধি) থেকে যা' করি, তা' কি ভক্তি নয়?

উঃ—Duty is but a regulation. যা' out of pure love নয়, সেটা শুদ্ধভক্তি নয়। কর্তব্য-বুদ্ধির ক্রিয়া মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের উপর, আর প্রেম, ভক্তি বা অমুরাগের ক্রিয়া আত্মার ভূমিকায়। অন্তরাত্মা হ'তে অমুরাগ বা ভক্তি প্রসূত হয়। আত্মার বৃত্তি —ভক্তি, আর আমার মনের বৃত্তি—কর্তব্যবুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি। আত্মধর্ম্য ব্যতীত আমাদের কল্যাণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—বিলাস ও বিরাগ মানে কি?

উঃ—বি পূর্বক লস্ ধাতু হইতে বিলাস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিলাস অর্থে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। বিরাগ সেই বিষয়রাগ বা ইন্দ্রিয়চালনা হ'তে তকাৎ হ'য়ে থাকা। বিলাসের অধিক্যে বিরাগের অভাব, আর বিরাগের অধিক্যে বিলাসের অভাব। ইহ জগতে বিলাস বা জড়সবিশেষবাদ এবং বিরাগ বা জড়নির্বিশেষবাদ উভয়ই অপ্ৰয়োজনীয়। বিলাস—ভগবৎসেবা, আর বিরাগ—কৃষ্ণপ্ৰীত্যে ভোগত্যাগ। ‘কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ শাস্ত্রের দুই গুণ।’ — এর নাম কৃষ্ণভক্তের বিরাগ, আর নিত্য নবনবায়মানভাবে চিল্লীলামিথুনের ইন্দ্রিয়তর্পণসাধনই বিলাস। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—যত মত তত পথ—এই কথাটা কি ঠিক?

উঃ—মত জিনিষটা মনোবর্ষ। ‘ভিন্নকচিহ্নিলোকঃ’ — অসংখ্য লোকের অসংখ্য মনের খেয়াল ও ক্রুচি। লোকের মনের খেয়ালে যে পথ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা কখনও আত্মধর্ম্য বা মনাতন-ধর্ম্য নহে। জগতে মনোবর্ষের অসংখ্য মত সৃষ্ট হইয়াছে ও হইবে, কিন্তু শাস্ত্রসম্মত শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

‘স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যস্যাত্মা স্প্রসাদিত ॥’

জগতের ‘যত মত তত পথ’ সমস্তই অক্ষজ-জ্ঞান-প্রসূত মত ও তদনুকূল পথ। কিন্তু অধোক্ষজ শ্রীহরিতে যে অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী ভক্তি, তাহাই জীবের পরমধর্ম, তাহাই আত্মধর্ম। আত্মা একমাত্র তদ্বারাই স্প্রসন্ন হন। অত্যান্ত ধর্মমত ও পথের দ্বারা দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা হয় বলিয়া দেহ ও মনোবর্ণ্য মানবগণ ঐ সকল প্রয়োজন ও পথকেই ‘মত’ ও ‘পথ’ বলিয়া বরণ করেন।

সত্য সত্য Living source হইতে পরম সত্যের কথা শ্রবণ করিতে হয়। তবেই জীবের নিত্য বাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে, নতুবা মানুষ প্রতিমুহূর্তে বিপথগামী হইবে। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—কেহ কেহ বলেন—শ্রীমূর্তিপূজা একটা means to an end অর্থাৎ সাধ্যলাভের উপায় মাত্র। ইহা কি ঠিক ?

উঃ—কখনই না। ইহাও একটা প্রকাণ্ড Blasphemy (অপরাধ)। ভগবান্ শ্রীগোরাঙ্গদেব ব’লেছেন—

‘প্রাকৃত করিমা মানে বিষ্ণুকলবর।

বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার।

সে শ্রীবিগ্রহে কহ—সঙ্কণ্ঠের বিকার ॥

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সে-ই ত’ পারণ্ড।

অম্পুশু, অদৃশু সে-ই হয় যমদণ্ড ॥’ (চৈঃ চঃ)

শ্রীবিষ্ণুমূর্তি চিন্ত্য। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইতর দেবতার তায় মানবকল্পিত নহেন। শাস্ত্র আরও বলেন—

‘নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিনে একরূপ।

তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ॥’ (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। ‘প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।’ শ্রীবিগ্রহ ভগবানের অর্চাবতার। নিজ হৃদয়দেবতাই বাহিরে শ্রীমূর্তিরূপে রূপা পূর্বক প্রকাশিত হইয়াছেন। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—আচার্য্য কে !

উঃ—আচার-প্রচার-পরায়ণ শুদ্ধভক্তই আচার্য্য।

আচার্য্য নিরপেক্ষ, মুক্ত। নিজে সম্পূর্ণ অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনের মহান আদর্শ দেখিয়ে যিনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে সকলকে অসৎসঙ্গ ত্যাগের কথা ব’লে অসৎসঙ্গ ছাড়াতে পারেন, তিনিই আচার্য্য।

প্রাণ না দিলে প্রচার হয় না। যিনি প্রাণ দিতে পারেন, তিনিই প্রচার করতে পারেন। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

উঃ—আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা আপনাদের নিকট নৈবেদ্যরূপে পরিবেশন করতে পারি মাত্র। এছাড়া আমাদের আর কোন যোগ্যতা নাই।

ভগবদ্বাক্ত অধোক্ষজ। তিনি Centre of All Love, আর আমি Part and Parcel of Infinite All Love. (প্রভুপাদ)

প্রঃ—পরতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতা কোথা থেকে আসলো ?

উঃ—আমরা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অণুচিৎ অংশ। এজন্ত পূর্ববস্তুর গুণ অণু-অংশে আমাদের মধ্যে আছে। কৃষ্ণে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবে পরিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতা আছে।

বিমুখতা হ্রস্বকম হ’তে পারে — একটা ভোগোন্মুখী, আর একটা ত্যাগোন্মুখী। জড়-বিলাসের পথটা ভোগের পথ, আর জড়-নির্বিশেষ পথটা ত্যাগের পথ। এ দু’টাই ত্যাজ্য। চিদবিলাসের পথ হ’লো সেবার পথ। ভোগ ও ত্যাগ ছেড়ে ভক্তিপথ বা সেবার পথ গ্রহণীয়। নিরপেক্ষ অবস্থায় বা তটস্থাবস্থায় কেহ দাঁড়াইতে পারে না, হয় মায়ায় দিকে, না হয় সেবার দিকে চ’লে যায়।

সত্যযুক্ত হয়ে প্রীতি পূর্বক ভজন করতে থাকলে আর আবরণ বা বিক্ষেপ আসে না। ভজনটি সত্য হওয়া চাই। নৈরন্তর্য্যের একটু অভাব হ’লেই সেই ছিদ্র বা অবকাশ পেয়ে মায়া আমাদেরিকে বিপন্ন করবে।

স্বতন্ত্রতা জিনিষটা ধারাপ নয়। স্বতন্ত্রতার সদ-ব্যবহার হ’লেই মঙ্গল, আর অপব্যবহার করলেই সর্বনাশ। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—মায়া মানে কি ?

উঃ—‘মা যা’—যাহা নহে, তাহাই মায়া। আর যাহা হয়, তাহা ভগবান—Positive something. ভগবদ্বাহিত্য বা Negative idea—মায়া।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ—ভক্তিই কি কলিযুগের সহজ ধর্ম?

উঃ—ভক্তি কলিযুগে কেন, সার্বকালিক, সার্বত্রিক ও সার্বজনীন ধর্মই ভক্তি। কর্মজ্ঞানযোগাদি প্রস্তাবিত নৈমিত্তিক ধর্ম মাত্র। তাহা জীবের সহজ বৃত্তি নয়। ভক্তি মূল্যবান গুণের একমাত্র নিত্যধর্ম। আর বদ্ধ জীব তাঁদের বদ্ধ ধারণায় অনর্থগ্রস্ত হ’য়ে যে-সকল

ধর্মের প্রস্তাব করে, তাহাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ ও ব্রত। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—আমাদের প্রভু অবিমান বা ভোক্তা-অবিমান কবে কাটবে?

উঃ—যতক্ষণ ভগবৎসেবক-অবিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ যোদ্ধারূপে (ভোগ্যরূপে) জগৎ দেখি, তখন আর ‘ঈশাবাস্ত’ জগৎ দর্শন হয় না। তখন প্রভু ব’লে একটা মেজাজ মাথায় ঢুকে থাকে। আমার ভোগের প্রবৃত্তি—আমার দুর্বুদ্ধি কেটে যেতে পারে একমাত্র দিব্যজ্ঞানের দ্বারা। (প্রভুপাদ)

‘রামায়ণ’-প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সংবাদ-পত্রাদিতে ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’াদির প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব লইয়া সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মহলে নানাপ্রকার গবেষণা চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন—বৌদ্ধ সাহিত্য ‘দশরথ জাতক’ হইতে রামায়ণের উপাখ্যান ধার করা হইয়াছে, কিম্বা ঋষি চ্যবনই রামায়ণের প্রথম রচয়িতা, সীতা রামের ভগ্নী, পরে পত্নী হন, বান্দীকি তাঁহার নিজ নূতন রুচি অনুযায়ী রামায়ণের গল্প রচনা করিয়াছেন ইত্যাদি কত কি! জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ‘রামায়ণের উৎস সন্ধান’ শীর্ষক (১৭-১৮ জালুয়ারী তারিখের) বক্তৃতায়ই এই ধরনের অনেক প্রলাপোক্তি করিয়াছেন। আগার ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার বলেন—‘বান্দীকিই রামায়ণের জনক। জাতকগুলি অধিকাংশই প্রচলিত কাহিনীর রূপান্তর। শ্রীবুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনার্থ রচিত জাতকগুলি রামায়ণ রচনার অনেক পরবর্তী কালের। রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্যের আদি যুগ প্রায় সমসাময়িক। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি বলিয়া তিনি অনুমান করেন। ঐ দুই কাব্যেই অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ পরে পরে যোজিত হইয়াছে। তবে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত অংশ কম, মহাভারতে অনেক বেশী।’

কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলিয়াছেন—‘রামায়ণ, মহাভারত—ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস’।

যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে, বদ্ধজীব ভ্রম-প্রমাদ (অনবধানত)-করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অগতুতা)-বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা)—এই দোষচতুষ্টয় ছষ্ট, তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাহা কিছু বিচার—গবেষণা করিতে যাইবেন, তাহা কখনই ভ্রমাদি দোষ পরিমুক্ত হইতে পারে না। ভ্রমাদি দোষমুক্ত আগ্র-বাক্যই যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক—প্রমাণ-যোগ্য। আগ্রপাদেশ—শব্দব্রহ্মই—মূল প্রমাণ। প্রত্যক্ষাত্মমানাদি সেই শব্দ-প্রমাণাত্মক হইলেই তাহা প্রমাণযোগ্য। নতুবা ‘অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞানে।’ “ঈশ্বরের রূপালেশ হয় ত’ যাংগে। সেই-ত’ ঈশ্বর-তত্ত্ব জানি-বারে পারে।” “অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ-মিত্রিয়েঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বরমেব স্মরত্যদঃ॥” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ ব্যাপার নহেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে তাহা স্বতঃ স্মর্ত হইয়া থাকেন।

মহাভারত ও মহাসংহিতায় কথিত হইয়াছে—ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ দ্বারা বেদার্থ স্পষ্ট

করিবে। নারদীয় পুরাণ বলেন—“বেদার্থাদধিকং মত্তে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাশ্রে সংশয়ঃ” অর্থাৎ পুরাণার্থ বেদার্থ হইতে অধিক বলিয়া বিচার করি। বেদ সমূহ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাণং পুরাণঃ অর্থাৎ বেদার্থ-পরিপূরক বলিয়া ইহার নাম পুরাণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—“বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়। পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়।’ ধর্মব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদে অর্থাৎ ধর্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্যই বেদ। এই ভুক্তের নিগূঢ় বেদার্থ বুঝাইবার জন্যই ইতিহাস ও পুরাণের আবশ্যকতা। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদবেদান্তদারমর্ষগ্রন্থ—অমল পুরাণ-শিরোরণি বলিয়া সর্বাচার্য্যাবন্দিত। শ্রীমদ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্য এই সংস্প্রদায়গাচ্যচতুষ্টয়—সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতকে বহুমানন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়ন বেদ-ব্যাসের সমাধিলক্ক বস্তু। সেই শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে ‘অবতার’ই বলা হইয়াছে। ঐ শ্রীভাগবতের নবম স্কন্ধে ১০—১২ তিন অধ্যায়ে শ্রীরামচরিত ও বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে। মুনিবর শ্রীপরশরও শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে শ্রীরামের ভগবত্তা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সংহিতায়ও শ্রীরামকে অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। দশাবতারস্তোত্রে শ্রীজয়দেব রামগুণ গান করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবান্ ষড়্ভুজ প্রকট করিয়া শ্রীরামাবতারের ধনুর্ধার, শ্রীকৃষ্ণাবতারের বংশী ও শ্রীগৌরাবতারের দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন, পুণীতে বহুকালাবধি ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎকালে অদ্বিতীয় নৈরাশ্বিক পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্কভোম, মহারাজ প্রতাপরুদ্র উভয়েই সেই শ্রীমদ্ভগবান্ ষড়্ভুজ স্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা পর্য্যন্ত প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবান্ ষড়্ভুজ অশেষশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকুলশিরোমণি পার্শ্বদ ভক্ত সকলেই শ্রীরামাবতার স্বীকার করিয়া গেলেন,

মহা মহা বিজ্ঞ নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদগণসহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীমদ্ভগবান্ ষড়্ভুজ স্বরূপ সেই শ্রীরামাবতারকে এবং শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের পরমভক্ত মুনিবর শ্রীবাণ্মীকিকে কালনিক বলিবার ধৃষ্টতা শ্রীভক্ত ও ভগবৎপদারবিন্দে অমার্জনীয় অপরাধ আধাহন করিয়াছে। সুনীতি বাবু সাহিত্য-কতা দেখাইতে গিয়া বৃদ্ধ বয়সে ভক্তিরহিত রাহিত্যিকরূপে পরিগণিত হইলেন এবং অনন্তকালের জন্য অতিশয় যাতনাপূর্ণ নিরয় বরণ করিলেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! অধোক্ষজ ভগবদত্তকে তাঁহার কৃপমণ্ডকোচিত ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানের গভীর মধ্যে পুরিবার দাস্তিকতা-দ্বারা ভগবদভক্ত বিশেষতঃ শ্রীরামভক্তগণের হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করতঃ তিনি অমার্জনীয় অপরাধ লিপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার এইরূপ ধৃষ্টতাকে সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করিতেছি। মার্জিতভাবায় তামিল নাড়ুর দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম দলের শ্রীরামবিরোধিতারই অনুকরণ করা হইয়াছে, তাহারই বিনীত অভিনয়! ধন্য কলিযুগ!

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের গত ১৬/১১/১৬ হইতে ২০/১১/১৬ পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসীয় সভার তৃতীয় অধিবেশন-দিবস প্রধান অতিথিরূপে বৃত্ত শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্যাদ্ভোকেট মহোদয় প্রকাশ সভায় ঐ দিবসের আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীতিবাবুর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবও সুনীতিবাবুর বিচারে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করেন। ঐ দিবসীয় সভায় উপস্থিত বক্তা শ্রোতা সকলেই অন্তরে তীব্র সন্তাপ অনুভব করিয়াছিলেন।

তথাকথিত শিক্ষিতাভিমानी লোকগুলিই তাঁহাদের শিক্ষার বদহজ্জমের উদগার দ্বারা জগতে নানা অনর্থ আনয়ন করিয়া থাকেন। নূতন নূতন আজগুণী কথা বলিয়া নাম জাহির করিবার জন্য উহার সমাজের বহু অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হন। অতাপি কিছুকালব্যবসায়ী দশগ্রীবদর্পহারী শ্রীরাম-কঙ্কর বজ্রাবলী মহাবীর শ্রীহনুমানজীই উহাদের উপযুক্ত প্রতিকার বিধান করুন।

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

পূর্ব পূর্ব বর্ষের স্তায় বর্তমান বর্ষেও নিখিলভারত শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদিগুণ্ডেশ্বরী শ্রীশ্রীমন্তকিনয়িত মাধব মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-রাধা-নয়ননাথ জিউর গত ৩রা মাঘ (১৩৮২), ১৭ই জানুয়ারী (১৯১৬) শনিবার পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্ট্যভিষেক যাত্রাবাসরে মহাভিষেক-পূজা-ভোগরাগ-আরাট্রিক ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মহোৎসব উপলক্ষে প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী গত ২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চক প্রতাহসন্ধ্যায় শ্রীমঠের সঙ্কীর্তনমণ্ডপে (বা নাটমন্দিরে) পাঁচটা মহতী ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং ৪ঠা মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে উক্ত শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরমা রথারোহণে বিরাট সংকীর্তনশোভা-যাত্রাসহ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। উক্ত পঞ্চদিবসীয় সভার বক্তব্যবিষয় ছিল যথাক্রমে—(১) শ্রীশ্রীতার শিক্ষা, (২) শ্রীকৃষ্ণভক্তির গুট মাংগা, (৩) আধ্যাত্মিক ও অর্থোক্ষজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, (৪) মানব-জাতির ঐক্যবিধানে ভাগবতধর্ম এবং (৫) শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া ও আশীর্বাণী। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন যথাক্রমে—(১) কলিকাতা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ শ্রীবিমলচন্দ্র বসাক, (২) ঐ জাষ্টিস্ শ্রীনির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৩) ঐ জাষ্টিস্ শ্রীসলিল রায় চৌধুরী, (৪) ওড়িয়া রাজ্যসরকারের ষাড, সরবরাহ, সংস্কৃতি ও পর্য্যটন বিভাগের মন্ত্রী—শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এবং (৫) কলিকাতা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ শ্রীসব্যাসাচী মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যথাক্রমে—(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী—শ্রীশঙ্কর বোব, (২) শ্রীনাগায়ণ মিশ্র, স্যাড্‌ভোকেট, পুরী, (৩) শ্রীদ্বন্দ্ব কুমার মুখোপাধ্যায়, স্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা, (৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ও (৫) বাদপুর বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীএ, এন্‌ বসু। বিশিষ্ট-বক্তৃক্ৰমে সম্মানিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে—১ম দিবস—শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েন্দা, ৩য়দিবস—ধানবাদের স্যাড্‌ভোকেট শ্রীনিরঞ্জন লাল ভাগানিয়া, ৪র্থ দিবস—পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র প্রাক্তন এম্‌-এল্‌-এ, কটক। চতুর্থ দিবসীয় সভায় ইউ, পি'র ভূতপূর্ব গভর্নর শ্রীবিষ্ণুনাথ দাস বিশিষ্ট বক্তৃক্ৰমে একটি সুন্দর ভাষণ দেন। তাঁহার এই ভাষণের মর্ম্ম ইং ২৬।১৭১৬ তারিখের উড্ডিয়ার মুখপত্র 'সমাজ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থদিবসের সভাপতি শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র মহোদয়কে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের পর বিশেষ জরুরী কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইতে হওয়ায় তন্নিবৃত্ত দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে পাব্লিক সাভিস কমিশন অধ্যক্ষ শ্রীহরিহর দাস মহোদয় সভাপতিরূপে সভার অবশিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু ভক্ত ও সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ কোলের গঙ্গস্থ শ্রীচৈতন্যদারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগুণ্ডেশ্বরী শ্রীমদ্‌ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ সভার ২য় দিবসে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। তিনি তদবধি দিবস-চতুষ্টয় প্রতাহ সন্ধ্যায় তাঁহার অপূর্ব সারগর্ভ গবেষণা-পূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। পূজাপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবও পঞ্চদিবসীয় সভায় প্রতাহই তাঁহার সর্বজনচিত্তাকর্ষক অকাটা যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় ভাষণ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতা দিয়াছেন—ত্রিদিগুণ্ডেশ্বরী শ্রীমদ্‌ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিকাশ হরীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ (পাঞ্জাব), শ্রীমদ্‌ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ (শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও শ্রীমঠের সাধারণ সম্পাদক) এবং শ্রীমদ্‌ ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদিগুণ্ডেশ্বরীসিদ্ধ।

ভক্তিবিশ্ববিনাশন ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেবের অল্পগ্রহে এবার পঞ্চদিবসীয় সভার যাবতীয় কৃত্যই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু শিক্ষিত ও শিক্ষিত শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। প্রত্যহই রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত সভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীমঠ-মন্দির বৈজ্ঞানিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী নাটমন্দিরটি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ উৎসবের দ্বিতীয় দিবস শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ গণের মঠাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। এইদিবস অগণিত পুরুষ ও মহিলা ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। সকলকেই মঠপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উৎসবের তৃতীয় দিবসেও মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির পর সমবেত সজ্জন ও মহিলা-বৃন্দকে বিচিত্র প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীননী-গোপাল বনচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডেশ্বরী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ প্রত্যহ সভায় উদ্বোধন ও উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

রথযানি বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র, পতাকা ও পুষ্পমালাদি মণ্ডিত হইয়া অতীব সুন্দর দর্শন হইয়াছিল। রথাগ্রে শ্রীমঠের নৃত্য-কীর্ত্তনরত সঙ্গীত-সজ্জন ও তদগ্রে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ২১০টি ব্যাণ্ড পাটি এবং পতাকাহস্তে বহু নরনারী শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বহু পুরুষ ও মহিলাভক্ত স্বেচ্ছায় রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে রথারূঢ় শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গরায়ানয়ননাথ জীউর যাবতীয় সেবা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। অপরায় আন্দাজ ৩ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ রথে আরোহণ করেন এবং দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ করিয়া নির্বিঘ্নে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। রথযাত্রার প্রাক্কালে এবং রথ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্তনকালে রথারূঢ়

শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সেবা বিহিত হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভগবান্দাস ব্রহ্মচারীজীর উপর এই সেবাভার গুস্ত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃদীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় (পরে শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্বা বোধায়ন মহারাজ) সহ রথোপরি শ্রীবিগ্রহ সমক্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবাদি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ভক্তবাহুপ্রকটক ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের কোনও বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। রথ-যাত্রাদি মহোৎসব নির্বিঘ্নে সুসম্পাদিত করাইয়া ভক্তচিহ্নে পরম সুখ দান করিলেন।

শ্রীমঠের এই বার্ষিক মহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট সজ্জন জরুরী কার্যাবশ্যতঃ যোগদানে অসমর্থতা নিবন্ধন পত্রদ্বারা প্রত্যভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি মাত্র নাম উল্লিখিত হইল :—

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী (এম্, পি — লোকসভা তাং ১০।১।১৬), পাঞ্জাব চণ্ডীগড় রাজভবন হইতে শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী গভর্নর (তাং ৩।১।১৬), শ্রীদিব্যালোচন শেখর দেও (মিনিষ্টার অফ্, ষ্টেট ইরিগেশন এণ্ড্, পাওয়ার — ভুবনেশ্বর তাং ১।১।১৬), শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস (মিনিষ্টার ত্রিপুরা, আগরতলা — তাং ৮।১।১৬) শ্রীদর্শনলাল আনন্দ প্রকাশজীর পার্সনাল সেক্রেটারী (তাং ১৫।১।১৬), শ্রীরামচন্দ্র উলক (মিনিষ্টার — ওড়িশা — ভুবনেশ্বর, তাং ৩।১।১৬), শ্রী পি, এন্ড্ গুপ্ত (লুধিয়ানা — তাং ১৪।১।১৬), শ্রীবি, পি আগরওয়ালা (পোঃ ধানসার, জেঃ ধানবাদ — তাং ১০।১।১৬), শ্রীভাগমল বিপন চাঁদ সুদ (চণ্ডীগড় তাং ৩।১।১৬), শ্রীধান চাঁদ হংসরাজ পক্ষে পার্টনার শ্রীগুলশান ওয়াখ্যা (জলন্ধর — তাং ১০।১।১৬)।

উৎসবের বিবরণ কলিকাতার বহুলপ্রচারিত দৈনিক পত্র ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র ৩।১।১৬ (বাং ১৭ মাঘ, ১৩৮২ শনিবার সহর সংস্করণ) তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচস্ত্রিকাবিতরণং বিছাবমুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতান্বাদনং
সর্বান্নান্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮২। { ২য় সংখ্যা
১৩ বিষ্ণু, ৪৯০ শ্রীগোরাধ; ১৫ চৈত্র, সোমবার; ২৯ মার্চ, ১৯৭৬।

সজ্জন-মুদ্র

[৩ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বিষয়ী বিষয়-সেবায় কঠিন হৃদয়। বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্তের আদৌ কোমলতা নাই। বিষয়ের ক্লেশ গুলির তীব্র কটাক্ষ সহ করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞান বা মূর্খতা তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানাপ্রকার কঠোর অভিজ্ঞানব্রতে পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করেন। নানাপ্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জরিত হইয়া ঐক্য শিদ্ধি করিয়া কোমলতা বর্জিত হন। তর্ক বিতর্ক শিদ্ধি করিয়া হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানান্তর বিচার না করিয়া তাকিককেশরী হইয়া বিজয়াজ্ঞা করেন। অন্তরে ব্যবহারাবলীতে ক্ষুদ্র হইয়া পরদোহময়-ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অমুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরি-পরায়ণগণের হৃদয় স্নেহপ নহে। তাঁহারা মুহু।

ভগবান বিষয়ীর নিকট বজ্রের স্তায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষাও মুহু। বিচারকের নিকট হঠকারী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরিমা স্নেহোন্মল-হৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয়। ভগবানের পরম মনোজ্ঞ কমনীয়তা-প্রভাবে তাঁহার নিজপ্রাপ্ত তদীয়গণে মুহুরে উৎস সর্বদাই

বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের সাধন-প্রণালীতে অনর্থ-নিবৃত্ত অবস্থায় ভাবের সমাগমে জড়বিষয়ে ক্ষান্তি বলিয়া একটি অবস্থা লক্ষিত হয়। ভগবদ্-বিষয়িনী ক্ষতি দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্বদাই আর্দ্র। অনর্থমুক্ত সজ্জন শুদ্ধস্ব-বিশোধায়ময়। ভগবদ্-বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়ালম্বনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে স্তম্ভভাবে উদ্ভিত। বিষয়াশ্রয় পরম্পরের উদ্ভীপনীর ভাবসমূহে চিত্ত আশ্রুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ার হৃদয় মুহুভাববিশিষ্ট। সেই মুহুভাবের অববোধক চিত্তের ভাবপ্রকাশকারী অমুষ্ঠানসমূহ তাহার কার্যরূপে প্রকাশ পায়। সজ্জনের কপটতা-রহিত গান ও নৃত্যাদিতে অপূর্ণ কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাবদ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সম্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধস্ব হইতে অষ্ট সাঙ্খিকভাবে উদয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশভাবের প্রকাশ করায়। কোনকালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্র-ভাবে অভাব নাই। সজ্জন নিত্যকাল মুহু। সাধন-কালে হরিবিরোধি-ভাবসমূহের দ্রুত ত্যাগ বাসনায় তিনি যে-সকল অমুষ্ঠানে ব্যাপ্ত থাকেন, তাহা

কঠিনহৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মূহুরের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সেকালেও তিনি মূহুরের বর্জিত নহেন। পরম মূহুর গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্বকাল মূহুর স্বভাব আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসহ্যবহার-মূহুর নহে।

রূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থিত নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সজ্জন ব্যতীত অন্ত্রে কখনই মূহুর হইতে পারে না। অসহ্যক্তি কোনকালে মূহুর নহে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী (নামাভাস)

প্রঃ — নামাভাসের দ্বারা কি শুভোদয় হয়?

উঃ — “নামাভাসের দ্বারা সর্বপাপ ক্ষয় হয়। সর্বপাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধনাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন; তখন শুদ্ধনাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।”

— ‘নামগ্রহণ বিচার,’ হং চিঃ

প্রঃ — মায়াবাদীর মুখোচ্চারিত কৃষ্ণ-নামাক্ষর কি কৃষ্ণনাম নহে?

উঃ — “মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয়; তাহা কেবল কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস-মাত্র। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে পতিত।”

— ‘মায়াবাদী কাহাকে বলে?’ সং: তোঃ ৫।১২

প্রঃ — প্রতিবিম্ব ও ছায়া-নামাভাসের ভেদ কি?

উঃ — “শাস্ত্রে অনেকস্থানে এইরূপ শব্দসকল পাওয়া যায় — নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি। সর্বত্র ‘আভাস’ শব্দের একটি সুন্দর অর্থ আছে, তাহাই এই প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ‘আভাস’ দুইপ্রকার — অর্থাৎ স্বরূপ-আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস, স্বরূপাভাসে বস্তুর পূর্ণকাস্তি সন্নিবিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়; যথা — মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বরূপাভাসের স্বরূপ-আলোক; প্রতিবিম্বাভাস — স্বরূপের বিকৃতি-মাত্র অঙ্কাকারে উদ্ভূত হয়; যথা — ‘আভাসস্ত মূষা-বুদ্ধিরবিজ্ঞা-কার্যমুচ্যতে।’ জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উচ্ছলিত হইয়া যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ। নামমূষা জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজাটিকা ও মেঘকর্কটক বতফণ আচ্ছাদিত, ততফণ সেই সূর্য্যের সঙ্ক-

চিত অতিক্রম আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভ ফল প্রদান করেন। সেই নামজ্যোতিঃ মায়াবাদ-হৃদ হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে মায়াজাদি ফল হইলেও নামের চরম ফল-রূপ প্রেম উৎপন্ন হয় না। এনামাভাসটি একটি প্রধান নামাপরাধ, এইজন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলিয়া চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, দুঃজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতি-বিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবাদক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাঁহার মায়াবাদ-অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাঁহাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায়। কেননা সংসঙ্গে তাঁহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্ণগত বালিশ বলিয়া কৃপা করিবেন। বিদেবী মায়াবাদীর দ্বারা তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধার অর্চা-মাত্র-পূজা-প্রবৃত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবৎ-ভাগবত-সেবোপযোগী সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ-বিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাঁহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন।”

— ‘নামাভাস-বিচার,’ হং চিঃ

প্রঃ — অনর্থ থাকিতে কি শুদ্ধ নাম হয়?

উঃ — “অসম্ভব, হৃদয়-দৌর্বল্য, অপরাধ।

অনর্থ — এসব মেঘরূপে করে বাধ ॥

নাম-স্বৰ্ঘ — রক্ষা ঢাকে, নামাভাস হয়।

স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণনামে সদা আচ্ছাদয়॥”

— হঃ চিঃ ৩য় পঃ

প্রঃ—সর্বশুভকর্মাপেক্ষা নামাভাস প্রশস্ততর কেন ?

উঃ—“নামাভাস জীবের প্রধান স্মৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম, ব্রত, যোগ, হুতাদি সর্বপ্রকার শুভ কর্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠফল-প্রদ।”

—‘নামাভাস-বিচার’ হঃ চিঃ

প্রঃ—নামাভাসের ফল কি ?

উঃ—“বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়।

বিশেষতঃ কলিযুগে সর্বশাস্ত্র কয়॥”

—‘নামাভাস-বিচার’, হঃ চিঃ

প্রঃ—নামাভাস কয়প্রকার ও তাহাদের ভারতম্য কি ?

উঃ—“সঙ্কেত, পরিহাস, সন্তোভ ও হেলা — এই চারি প্রকার কার্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই সেই কার্য-সহযোগে নামাভাস চারি প্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প-দোষাবহ।”

—‘নামাভাস-বিচার’, হঃ চিঃ

প্রঃ—নামাভাসের নিরুক্তিকাল কখন ?

উঃ—“সম্বন্ধ তত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।

তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয়॥”

— হঃ চিঃ ৩য় পঃ

প্রঃ—আভাস কতপ্রকার ?

উঃ—নামরূপ স্বর্ঘ্যের দুইপ্রকার আভাস অর্থাৎ নাম-ছায়া ও নাম-প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ ‘ভক্ত্যাভাস’, ‘ভাবাভাস’, ‘নামাভাস’, ‘বৈষ্ণবাভাস’, — এইসকল শব্দ অনুরূপ ব্যবহার করেন। সর্বপ্রকার আভাসই ‘প্রতিবিম্ব’ ও ‘ছায়া’-ভেদে দুই প্রকার।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

প্রঃ—‘বৈষ্ণবপ্রায়’ কাহাকে বলে ?

উঃ—“‘বৈষ্ণবপ্রায়’ শব্দের অর্থ এই যে, প্রকৃত বৈষ্ণবের আশ্রয় মালা-মুদ্রাদি ধারণ-পূর্বক ‘নামাভাস’ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা ‘শুদ্ধ-বৈষ্ণব’ ন’ন।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

প্রঃ—নামাভাস কোন অবস্থায় নামাপরাধ বলিয়া গণ্য হয় ? উহার ফল কি ?

উঃ—“শুদ্ধনাম না হইলেই ‘নামাভাস’ হইল। এই নামাভাস কোন অবস্থায় ‘নামাভাস’ বলিয়া উক্ত হয়, কোন অবস্থায় ‘নামাপরাধ’ বলিয়া উক্ত হয়। যে-স্থলে অজ্ঞতা-বশতঃ অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ-বশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সে-স্থলে কেবল ‘নামাভাস’; যে-স্থলে মায়াবাদাদি-জনিত ধূর্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সে-স্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটি নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরলতা, অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে-সমস্তই ‘নামাভাস’ মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধ-লক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না, নাম-অপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল উদ্ভিত হয় না।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

প্রঃ—সাক্ষ্য-নামাভাসের উদাহরণ-স্থল কি ?

উঃ—“অজামিল মরণ সময়ে স্বীয় পুত্রকে ‘নারায়ণ’ নামে আহ্বান করিয়াছিল—কৃষ্ণের নাম ‘নারায়ণ’ বলিয়া অজামিলের সাক্ষ্য-নাম-গ্রহণের ফললাভ হইয়াছিল।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

প্রঃ—স্তোভ-নামাভাসের উদাহরণ কি ?

উঃ—“একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতে ছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদম্বাশুভ-ভক্তি করতঃ বলিল,—‘হেঁ: তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে।’ ইহাই স্তোভের উদাহরণ। তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্যন্ত লাভ হইতে পারে, —নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

প্রঃ—কিরূপ ‘হেলনে’ নামাভাস হয় ?

উঃ—ধূর্ততার সহিত হেলন হইলে ‘অপরাধ’, আর অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে ‘নামাভাস’।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

প্রঃ—নামাভাসে কি কি ফলাভ হইতে পারে ?

উঃ—“ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্তর্গত পরম-পুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না।”
সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেরণ
— জৈঃ ধঃ ২৫ শ অঃ

ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস

মলমাসতষে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তীয় কৃষ্ণজন্মধণ্ডে (১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক) লিখিত আছে—

‘অশ্বমেধং গবালন্তং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।

দেবরেন স্তুতোংপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥’

অর্থাৎ কলিকালে কর্মকাণ্ডে অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবর দ্বারা স্তুতোং-পত্তি, —এই পাঁচটি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

‘সন্ন্যাস’ বলিতে এস্থলে কর্মসন্ন্যাসই নিষিদ্ধ। কায়-মনোবাক্য ভগবৎসেবার দণ্ডিত বা শাসিত করার নামই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস। বৈষ্ণবগণ সংসার বা জড় বিষয়-বিরক্তির নিদর্শন স্বরূপ এইরূপ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসবেষ ধারণ করিয়া থাকেন। মহাসংহিতায় ‘ত্রিদণ্ডী’ শব্দের এই-রূপ অর্থ কৃত হইয়াছে—

‘বাগ্‌দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডতথৈব চ।

যত্নেতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥’

—মহু সং ১২।১০

অর্থাৎ বাহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ ‘ত্রিদণ্ডী’ নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

ঐ শ্লোকের কুল্লকভট্টপাদকৃত টীকায় লিখিত হইয়াছে :

“দমনং দণ্ডঃ, যশ্চ বাঙ্‌মনঃ কায়ানাং দণ্ডঃ।
নিষিদ্ধাভিধানাঃ সংস্কল্প - প্রতিবন্ধ - ব্যাপার - ত্যাগেন
বুদ্ধাববস্থিতাঃ স ত্রিদণ্ডীত্যাচ্যতে ন তু দণ্ডত্রয় ধারণ-
মাশ্রোণ।”

অর্থাৎ ‘দণ্ড’ শব্দের অর্থ দমন। বাহার বুদ্ধিতে বাক্য, মন ও কায়ের দণ্ড অর্থাৎ বহির্বিবরণে অনবস্থান এবং সংস্কল্পের প্রতিকূল ব্যাপার হইতে বিরতি রহিয়াছে, তিনিই ‘ত্রিদণ্ডী’ বলিয়া কথিত হন, দণ্ড-ত্রয় ধারণ করিলেই ‘ত্রিদণ্ডী’ হওয়া যায় না। ‘বেণুভি-

র্ন ভবেদ্ যতিঃ’—কেবল বংশদণ্ড ধারণ করিলেই দণ্ডী যতি হইতে পারে না।

জাবালোপনিষদেও (৬ষ্ঠ খণ্ড) পরমহংসের আচরণ “ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যোতং সর্বং ভূত্বাহেতাপসু পরিত্যজ্যা-
আনমঘিচ্ছেৎ” ইত্যাদি কথন-প্রসঙ্গে ‘ত্রিদণ্ড’ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থাৎ পরমহংস ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, অলাবুনির্মিত ভিক্ষাপাত্র, দর্ভনির্মিত মেখলা, আচমনাদি জল-শোধনের জন্ত গৃহীত প্রাদেশপরিমিত শ্বেতবস্ত্র, শিখা, যজ্ঞোপবীত, ব্রহ্মহত্ব প্রভৃতি সমস্তই ‘ভূত্বাহা’ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তীর্থজলে নিক্ষেপ করতঃ সদ্-গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিয়া তদানুগত্যে পরমাত্মার অধেষণ করিবেন।

হারীতসংহিতায় (৬।২৩) ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-মাহাত্ম্য এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

“ত্রিদণ্ডভূয়ো হি পৃথক্ সমাচরোচ্ছনৈঃ শনৈর্বন্ত

বহির্মুখাফঃ।

সমুচ্য সংসার-সমস্তবন্ধনাং স যাতি বিমো-

রমৃতান্ননঃ পদম্॥”

অর্থাৎ যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-শব্দ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিলিপ্তভাবে এইপ্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার ভাঃ ১১।১৮।২৮ ও ভাঃ ১০।৮৬।৩ শ্লোকের ‘ভাবার্থদীপিকা’ টীকায় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের উল্লেখ ও সম্মান বিধান করিয়াছেন :—

“এবং বহুদকাদিধর্ম্মান্ উক্তা। পরমহংসধর্ম্মানাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি সাক্ষৈর্দর্শতিঃ। বহির্বিরক্তো মুমুক্শুঃ সন্

যো জ্ঞাননিষ্ঠো বা মোক্ষোপ্যানপেক্ষো মন্ত্ৰো বা স
সলিঙ্গান্ ত্রিদণ্ডাদি-সহিতান্ আশ্রমাংস্তজ্জমাংস্ত্যক্তা। তদা-
সক্তিং ত্যক্তা যথোচিতং ধৰ্ম্যং চরেদিত্যর্থঃ।” — ভাঃ
১১।১৮।২৮ ভাঃ দীঃ

“পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষম্” — ভাঃ ১০।৮৬।৩।

ত্রৈতাযুগে রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিদণ্ডীর বেষ ধারণ
করিয়া সীতা হরণ করিয়াছিল। ছাপরে অর্জুনেরও
ত্রিদণ্ডীর বেষ ধারণ পূর্বক সুভদ্রা-হরণের কথা প্রসিদ্ধ।
ত্রৈতাযুগ হইতেই বর্ণাশ্রমধর্ম্য প্রবর্তিত হইবার ইতিহাস
পাওয়া যায়। সূত্ররং বৈষ্ণবসন্ন্যাসবেষ ত্রিদণ্ডি-বেষের
পূজ্যতমত্ব বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

স্বয়ং কলিযুগপাণনাথতারী শ্রীমন্নহাপ্রভুও ত্রিদণ্ড-
সন্ন্যাসবেষের বিশেষ প্রশস্তি কীর্ত্তন-মুখে নিজেকেও
‘ত্রিদণ্ডী’ বলিয়া অভিমান করতঃ সেই সন্ন্যাসাশ্রমের
মুখ্যকৃত্য বাক্ত করিয়াছেন:—

“প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুকবচন।

মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥

পরায়নিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ।

মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥

সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।

কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভূতে বসিয়া।”

—চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৯

সন্ন্যাসের বেষ-ত্যাগপাণ—পরায়নিষ্ঠা এবং মুখ্যব্রত
—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণসেবা। শ্রীমন্নহাপ্রভু বাহুতঃ একদণ্ড
গ্রহণ করিলেও ঐ একের মধ্যেই যে সেবামুখ কার-
মনোবাক্যদণ্ডগ্রন্থ অন্তর্নিহিত, তাহা উপরিউক্ত ভিক্ষু-
গীতি-কীর্ত্তন-মুখে স্পষ্টই জানাইয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ
প্রভুরও একদণ্ডধারী শ্রীমন্নহাপ্রভুসহ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে
গমনকালে শ্রীসুবর্ণরেখা নদীতীরে তৎসমীপে রক্ষিত
শ্রীমন্নহাপ্রভুর একদণ্ডকে তিনখণ্ডে খণ্ডিত করিবার
লীলা হইতে ঐ একের মধ্যে তিনের অবস্থিতি
স্পষ্টরূপেই অভিযাক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে
লিখিত আছে—

“‘অহে দণ্ড, আমি ধীরে বহিয়ে হৃদয়ে।

সে তোমারে বহিবেক, এ’ত যুক্ত নহে।’

এত বলি’ বলরাম পরম প্রচণ্ড।

ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি’ করি’ তিনখণ্ড॥”

অবশ্য অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইতঃপূর্বে শ্রীধাম
মায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থানকালে শ্রীবাসপূজার
পূর্বরাত্রে নিজ সন্ন্যাস-দণ্ড-কমণ্ডলুও ভঙ্গ করিবার
লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—

“ * * * * *

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে।

কথো রাত্রে নিত্যানন্দ ছকার করিয়া।

নিজদণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥”

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫।৬৬-৬৭

উক্ত চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫।৬৭-৬৮ পরারের ‘বিস্তৃতি’তে
পরমাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

“প্রেমবিকারে বৈধীভক্তির উপাদানসমূহ ও বাহুনিষ্ঠা
তাক্ত হয়। তাই বলিয়া বিশৃঙ্খলতা সাধনকল্পে
‘এ’চড়ে-পাকা’ হইলে ‘রসিক’ নামে পরিচয় পাইতে
বাধ্য হয়।” “কেহ বলেন — ভগবদুপাসনার বিধি-চিহ্ন
প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই। রাগের পথে ঐগুলি
অস্তরায় মাত্র। অপর পক্ষ বলেন — রাগপথের
অস্তরায় জানিয়া অনধিকারীর বিধি-ভঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা
উপস্থিত হয়। ‘শ্রুতি-স্মৃতি-পুণ্যাগাদি পঞ্চরাত্রবিধিঃ বিনা।
ঐকান্তিহী হরেভক্তিৰূপতায়ৈব কেবলম্”

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তায় অবধূতপরমহংসের বৈধ যতির
ব্রহ্মচারী-চিহ্ন জগতের ধর্মদর্শনে নানাপ্রকার ভক্তি-
বাবক ধারণা উৎপন্ন করিবে, এজন্ম বর্ণাশ্রমের বিধি-
সমূহের অতীত প্রভুনিত্যানন্দের এইসকল আনুষ্ঠানিক
ব্যাপার অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া
যাঁহারা জড়াভিনিবেশবশতঃ আনুকরণিক সূত্রে
কৃত্রিমতাংশবশনে নিজ মহিমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে অধি-
কার বহির্ভূত কার্য্য করিবেন, তদ্বারা তাঁহাদের
কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সকল অনধিকারীই
কিছু অধিকারী নহে।

‘নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ।

বিনশ্চত্যাচরমোঢ্যাদৃ যথাহকৃদ্রোহক্লিজং বিধম্॥’

— ভাঃ ১০।৩৩।৩০

ইত্যাদি উপদেশের যেন অনাদর না হয়।

‘কো’ বেত্তি ভুমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্

যোগেশ্বরোত্তীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।

ক বা কথং বা কতি বা কদেতি

বিস্তারয়ন্ ক্রৌড়সি যোগমায়াম্॥’

—ভাঃ ১০।১৪।২১”

‘বিধিভক্তো ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি’ — এই মহাজন-বাক্যের দোহাই দিয়া অনেক অনধিকারী ব্যক্তিই ‘অধিকারী’ সাজিয়া বিধিমার্গ উল্লঙ্ঘন-পূর্বক রাগমার্গ অবলম্বনের দান্তিকতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে প্রায়শই উৎপথগামী হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ইষ্টবস্তুতে পরমাবিষ্টতাময়ী স্বারসিকী রতিই ব্রজ-বাগীর-রাগাঙ্ঘ্রিকা ভক্তি, সেই ভক্তির আনুগত্যে যে ভজন, তাহাই রাগাঙ্ঘ্রিকা ভক্তি। ‘ব্রজবাসীর কৃষ্ণে হয় স্বাভাবিকী প্রীতি। কৃষ্ণেরও স্বাভাবিকী প্রীতি ব্রজবাসী প্রীতি॥’ এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে পড়িয় থাকে না, ইহা বড়ই তুল্লভ। ইহা ক্রয় করিয়া লইবার একমাত্র মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে—লৌল্য বা লালসা। ব্রজবাসীর কৃষ্ণে অনুরাগ-ময়ী সেবার কথা শুনিতে শুনিতে যদি কোন ভাগ্য-বান্জীঘের তদবিষয়ে লোভ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিধিমার্গে স্বতঃই শৈথিল্য উপস্থিত হইয়া রাগবত্মচক্রিকানুসরণের সৌভাগ্য উদ্ভিত হইবে। তৎপূর্বে বিধিমার্গে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীনামব্রহ্মকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। ইহা হইতেই সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। “বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা-রত্নদানে রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগবশবর্তী হ’য়ে পারকীর-ভাবাশ্রয়ে লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥” অবশ্য, রাগোদয়েও নামভজনে বিরতি নাই, বরং তখন আরও অনুরাগের সহিত নাম গৃহীত হইতে থাকে।

উপরিউক্ত চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২০৮ পয়ারের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের স্নায় জিজ্ঞাসুগণের বিশেষ আলোচ্য বলিয়া আমরা এখানে তাহা যথাযথ উদ্ধার করিলাম:—

“কেবলাবৈধী পরমহংস-ব্রহ্ম একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডি-

গণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড-গ্রহণহলনা-লীলা প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ড-রূপে পরিণত করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহনভার ভগবৎ-সেবকগণের নিকট হস্ত করিলেন। তজ্জন্মই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে, তন্মধ্যস্থ ‘বাচো বেগম্’ শ্লোকটি ত্রিদণ্ড-গ্রহণের নিদর্শন ও যোগাত্মা সূচনা করে এবং ত্রিদণ্ডিগণেরই যে শ্রীকৃপানুগত, ইহা শ্রীকৃপা গোষ্ঠামিপ্রভু উপদেশামৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপায় দীক্ষিত প্রভৃতি প্রকল্প বোদ্ধ মতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ত্রিদণ্ডের বিরুদ্ধে ‘পরিমল’ নামক টীকার প্রচুর গালিগালাজ করিয়াছেন। ভাবিকালে মায়াবাদী অপায় দীক্ষিত ‘স্নায়রক্ষামণি’, ‘শিবাকর্মণিগীতিকা’ প্রভৃতি গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে সকল ভক্তিবিরোধী মতবাদ লিখিবেন, তাহার অযোগ্যতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। অভেদবাদী যেকৃপা মায়াবাদচিহ্ন একদণ্ড গ্রহণ করেন এবং শুদ্ধবৈত-মতাবলম্বিগণের শিষ্যপারম্পর্যে যে একদণ্ড গ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধবগোড়ীয় সম্প্রদায়ে অনুমোদিত নহে, ইহা জানাইবার জন্তই শ্রীবলদেব প্রভু সন্ন্যাসবেদী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিয়াছেন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মত ও গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার। ‘ত্রিদণ্ডী’ না হইলে কেহই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হন না। কর্মকাণ্ডীর ত্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ আছে। শ্রীকৃপা গোষ্ঠামিপ্রভু ত্রিদণ্ড-ব্যাপ্যায় কার্যমনোবাগ্‌দণ্ডের কথা পারমার্থিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগ ত্রিদণ্ডের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচারে পারমহংস-ধর্ম্মে একদণ্ডই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রয়ের সম্মেলনে ‘গুণবিধৌত অবস্থা’ নামক একদণ্ড, উহা একায়নপদ্ধতিতে কলঙ্ক-আরোপ করে বলিয়া ত্রিদণ্ডসম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে, ব্রহ্মাধ্ব-সম্প্রদায়ে ও

ব্রহ্মমাধবগৌড়ীয় সার্বজনীন বৈষ্ণবসমাজে সেই প্রথা চিরদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।

সুতরাং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আশ্রয়বিচারে শ্রীব্রহ্ম-মাধবগৌড়ীয় বিচার হইতে পার্থক্য স্থাপিত হইতে পারে না। এই সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ ‘গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডস্বামী’ বলিয়া কথিত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বৈধবিচারে মর্যাদাপথে সম্যাসগ্রহণ—শ্রীকৃষ্ণাভুগগণের পারমহংসবিচারে পরম্পর বৈষম্য উৎপাদন করে নাই। গৌড়ীয়গণ মর্যাদা-পথে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাভুগ বা শ্রীসনাতনভুগ পারমহংস ধর্মের বিরোধী নহেন। পারমহংসধর্মের বৈধ চিহ্ন সমূহের বৈষম্য বহিষ্কৃতরূপে গৃহীত হইলেও বহিষ্কৃতধারণে পারমহংস ধর্মের যাজন তদতিরিক্ত নহে। শ্রীসনাতনের অনুগমনে অপর পাঁচজন ব্রজ-বাসী গোস্বামী পরমহংসবেশ গ্রহণ করিলেও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী মর্যাদাপথে ত্রিদণ্ড সংরক্ষণ-পূর্বক শ্রীচৈতন্যচক্রামৃত নামক গ্রন্থে গৌড়ীয়বিচার সূত্ররূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন। অধুনা আচারভ্রষ্ট পরমহংস সক্রপতিত জনগণের আচরণ সংশোধন-কল্পে এবং শিষ্টাচার ও সদাচার সংরক্ষণ মানসে অনুরাগপথের পথিকগণের অসদ্ বিচারে আক্রান্ত হইবার দুর্যোগ পরিহারার্থ মর্যাদাপথের প্রবর্তনাবরণে শ্রীকৃষ্ণাভুগবিমলভজনচেষ্টা অর্কাটীনগণের নিকট অনাদরের ও বিরোধের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে ভগবৎপ্রকাশের মর্যাদা অতিক্রম করিয়া আকর-বস্তুর উপাসনায় ও তদনুষ্ঠানে নানাপ্রকার বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। মর্যাদাপথের তাৎপর্য না বুঝিয়া লজ্জনজনিত অমঙ্গলকেই মর্যাদা পথের উন্নত উদ্দেশ্য বলিয়া বিচারিত হয়। আবার, মর্যাদাপথের কেবল আবাহনে উন্নতপথ রুদ্ধ হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিবট্‌কের বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু গোস্বামিগণের অনুগতক্রব স্বল্পদৃষ্টি-সম্পন্ন জনগণ শ্রীপ্রবোধানন্দের বিচারকে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিচার জানিয়াছিল; তাহাতে তাদৃশ আদ্যন্তনিকগণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।”

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়ে যে অবন্তী-নগরীয় ভিক্ষু-গীতি কীর্তিত হইয়াছে, তিনি ত্রিদণ্ড-ভিক্ষু। ‘কেচিং ত্রিবেণু জগৃহঃ’ (ভাঃ ১১।২৩।৩৪) ইত্যাদি বাক্যে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগ-প্রভু ঐ ভিক্ষুগীতির নিম্নলিখিত শ্লোকটি কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে দিবসত্রয় অনাহারে অনিদ্রায় রাঢ়দেশের প্রসূরতুল্য কঠিন মাটিতে উন্নতের ছায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অনেক কৌশলে তাঁহাকে শাস্তিপুর অদৈতভবনে লইয়া গিয়াছিলেন—

এতাং স আস্থায় (বা সমাস্থায়) পরাশ্রয়নিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈ মর্ববিভিঃ।

অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্গু-নিষেবয়ৈব ॥

—ভাঃ ১১।২৩।৫৭

অর্থাৎ “অতএব আমি পূর্বতম মর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব।”

শ্রীমদ্ভাগপ্রভু তাঁহার সম্যাসগ্রহণ-নীলার পর ঐ শ্লোকটি কীর্তন-দ্বারা ত্রিদণ্ডসম্যাস যে তাঁহার অমুমোদিত এবং উহাই যে বৈষ্ণবসম্যাসবিধি, তাহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া গিয়াছেন।

সম্যাসে কেহ কেহ শিখাহত্যাদি বিসর্জনের বিচার প্রদর্শন করেন। কিন্তু স্বন্দপুরাণ স্ততঃসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

“শিখী যজ্ঞোপবীতী শ্রাতৃ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।

স পবিত্রশ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥”

অর্থাৎ “ত্রিদণ্ডযুক্তি শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায়বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।”

পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

“একবাসা দ্বিবাশাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।

কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো য়াতি তৎপরম্ ॥”

—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, আদি ৩১শ অধ্যায়

অৰ্থাৎ “একবস্ত্ৰ বা দ্বিবস্ত্ৰ-পরিধায়ী, শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলুযুক্ত বিদ্বান্ ত্ৰিদিগ্-সন্ন্যাসী সেই শ্ৰেষ্ঠপুরুষ ভগবান্কে প্রাপ্ত হন।”

ত্ৰিদিগ্গী সৰ্ব্ব আশ্ৰমস্থিত জনৈৰই প্রণম্য, তদকৰণে প্রত্যাবায়ভাগী ও প্রায়শ্চিত্তার্থ হইতে হইবে, ইহাই শাস্ত্ৰ-নির্দেশ—

“দেবতা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্ৰিদিগ্গিনম্।

নমস্কারং ন কুৰ্য্যাচ্ছেদ্রুপবাসেন শুক্ৰ্যতি ॥”

—একাদশীতম্বে ত্ৰিস্পৃশৈকাদশী প্রকরণস্থত স্মৃতি-বাক্য এই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পিতা আসিয়াও পুত্ৰকে নমস্কার করেন। ইহা সৰ্ব্বাশ্রম-বন্দিত—

“সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধৰ্ম্ম তাঁর।

পিতা আসি’ পুত্ৰেরে করেন নমস্কার ॥”

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮ম

সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীতে পরম্পর নমস্কার বিহিত আছে—

“সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥” —ঐ

এতাদৃশ সৰ্ব্বাশ্রম-বন্দিত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া যিনি ত্ৰীপুত্ৰাদি যে সমস্ত বিষয় ‘প্রৈষ’ শব্দ উচ্চারণের পূর্বে সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি তাহা পুনরায় গ্রহণ করিলে বাস্তাশী বা ছদ্মিতভোজী হইয়া সকলের নিন্দনীয় হন —

“যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূৰ্ব্বং ত্ৰিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।

যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বাস্তাশুপত্রপঃ ॥”

—ভাঃ ৭।১৫।৩৬

অৰ্থাৎ “যদি কোনও ব্যক্তি ধৰ্ম্মাদি ত্ৰিবর্গসাধক গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার গৃহধৰ্ম্মাদির সেবা করে, তবে সে বাস্তাশী (বমনভোজী) ও নির্লজ্জ।”

সন্ন্যাসী সন্ন্যাসব্রত কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগপূৰ্ব্বক বেগবটকের বিশেষতঃ উপস্থবেগের বশীভূত হইয়া পড়িলে

বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিই অতিভয়ঙ্কর নিরয়প্রাপক মহাশত্রু। ইহা হইতে সৰ্ব্বপ্রথমেই সাবধান হইতে হইবে।

“গৃহস্থ্য ক্রিয়াত্যাগো ভিক্ষাত্যাগো বটোরপি।

তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিঞ্জিয়-লোলতা ॥

আশ্রমাপসদা হেতে ধৰ্ম্মাশ্রম-বিড়ম্বনাঃ।

দেবমায়াবিমুচ্যাংস্তাহুপেক্ষেতাংলুকম্পয়া ॥”

—ভাঃ ৭।১৫।৩৮-৩৯

অৰ্থাৎ গৃহস্থের ক্রিয়া (স্ববর্ণাশ্রমোচিত বা অর্চনা-দি)-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রত (গুরুকুলবাসাদি বা গুরুসেবা)-ত্যাগ এবং বানপ্রস্থ্যশ্রমীর পুনগ্রামবাস ও ভিক্ষুর ইঞ্জিয়-লোলুপতা (অতীব নিন্দনীয়)। আশ্রমের কলঙ্কস্বরূপ ভগবন্মায়্য-বিমোহিত ঐ সকল ব্যক্তিকে অনুকম্পা পূৰ্ব্বক উপেক্ষা করিবে। (‘অনুকম্পা’ অৰ্থাৎ তাহাদিগের নিদট গিয়া তত্বেপদেশরূপ রূপা প্রদর্শন করিবে, না শুনিলে উপেক্ষা করিবে অৰ্থাৎ সঙ্গও করিবে না, ঘেঁষও করিবে না।)

সন্ন্যাসীর নিজজন্মস্থানে আত্মীয় স্বজনদের সহিত বাস নিষিদ্ধ :—

“সন্ন্যাসীর ধৰ্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।

নিজ জন্মস্থানে রহে কটুধূলঞা ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গুরু শিক্ষানুসরণে মঠাদি নিৰ্গুণ বাসস্থানে অবস্থান করতঃ লক্ষ্যনাম গ্রন্থ-মুখে কৃষ্ণানুশীলন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা ও সদগ্রন্থানুশীলনে নিখিলকাল যাপন করিবার চেষ্টাই সন্ন্যাসধৰ্ম্ম রক্ষা করিবার প্রধান উপায়। নতুবা নানা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার আসিয়া পারমার্থিক জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিবে। পরনিন্দা পরচর্চা সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ্য।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিত্রাজকাচার্য্য ত্ৰিদিগ্গিস্বামী শ্রীমন্তজ্ঞানমুখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—ভগবানের প্রতি নির্ভরতা কেন আসছে না?

নিজের আত্মস্তরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার

উঃ—যতদিন আমাদের নিজ শক্তির উপর—

উপর নির্ভর করার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবৎ-

চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি-বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত আমরা আরোহবাদকেই বহুমানন করি। যখন নিজের ধারকরা শক্তির ক্ষুদ্রতা — নিজের আত্মস্তরিতার অকিঞ্চিৎকরতা — নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। যখন আশাদের চিত্তে ভগবদাশ্রয়ের মহিমা উদ্ভিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে চিত্ত ধাবিত হয়। যে যেখানে আছি, সেখানে থাকাকালেই সাধুদিগের (কৃষ্ণভক্তের) মুখদ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্তা শ্রবণ করা কর্তব্য। তা' হ'লেই সব মীমাংসা হ'য়ে যাবে, ভগবানে নির্ভরতা আসবে।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— ভগবান্ কে ?

উঃ— ভগবান্ অধোকৃষ্ণ বস্তু। অধোকৃষ্ণ মানে জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত। Godhead is He who has reserved the absolute right of not being exposed to present human senses. তাঁহাকেই ভগবান্ বলা হয়, যিনি কখনও মনুষ্য বা প্রাণিজগতের জড় ইন্দ্রিয়ের অধীন হন না। তিনি এই অধিকারটি সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত রেখেছেন।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— অশুদ্ধ মন কি ?

উঃ— নক্ষত্রবিক্রান্তক-ধর্মবিশিষ্ট হৃদয়ই প্রাকৃত লোকের মন বা অশুদ্ধ মন, আর প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি ও ভ্যাগবুদ্ধি পরিহার ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবার নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধ মন।

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নাম — বিষয়। ইহাদের ভোক্তা-অভিমানকারী মনই বিষয়াবিশিষ্ট অশুদ্ধ মন। এই অশুদ্ধ মনে কখন পূর্ণস্বরূপের উপলব্ধি হয় না।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— মায়া জিনিষটি কি ?

উঃ— মীষতে অনয়া ইতি মায়া। যাকে মেপে নেওয়া যায়, সেটাই মায়া। ভগবান্ মায়াবীশ, তাঁকে মাপা যায় না। যেখানে ভগবান্কে মেপে নেবার চেষ্টা হয়, তাহাও মায়া — ভগবান্ নহে। মা — যা = মায়া।

খৃষ্টমতে যেমন Godhead একটি আলাদা, Satan একটি আলাদা; কিন্তু ভাগবতমতে মায়া সেরূপ নহে। ভাগবত-School এর মতে মায়া পূর্ণপুরুষ ভগবানে Condemned state এ (গহিতভাবে) আছে, — মায়াবশ্ত অগুচিৎ জীবের প্রতি দণ্ড বিধান করবার জ্ঞাত।

গীতোক্ত অপরা শক্তিই মায়াশক্তি। অপরা শক্তি মহামায়া নিরীশ্বর কপিলের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হ'য়ে, কখন বা বৈশেষিকের পরমাণু হ'য়ে, কখন জৈমিনীর অভ্যুদয়বাদ হ'য়ে, কখন গোতমের ষোড়শ পদার্থ হ'য়ে, কখন পতঞ্জলীর বিভূতি-কৈবল্যবাদ হ'য়ে, কখন বা ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনা নিয়ে অনাদিবিহির্গুণজীবকুলকে বাহ্যজগতের ক্রিয়ায় মুগ্ধ ক'রছে — misunderstanding (বুঝতে ভুল) করছে।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— জীবের কি Free will (স্বতন্ত্রতা) আছে ?

উঃ— নিশ্চয়ই আছে।

প্রঃ— তা' হ'লে 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে'র্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তাক্রাণি মায়ায়া ॥' — গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি ?

উঃ— গীতার এইবাক্য তা' ঐ কথায় সমর্থন করেন। বিষ্ণু সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। জীব হেতু-কর্তা, আর ঈশ্বর প্রযোজককর্তা। জীব নিজ কর্মের কর্তা হ'য়ে যে ফলভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্মের উপযোগী হ'চ্ছে, সে সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রযোজক-কর্তারূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব র'য়েছে। ঈশ্বর ফল-দাতা, আর জীব ফলভোক্তা।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— ভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেন কেন ?

উঃ— জীব চেতন বস্তু — নিত্যবস্তু, সৃষ্ট বস্তু নহে। চেতনমাত্রেরই স্বতন্ত্রতা আছে ও থাকবে। জীব বিভূ-চৈতন্য পরমেশ্বরের অণু অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম অনুপরিমাণে র'য়েছে। বিভূ ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র, অগুচিৎ জীবও তদনুরূপে স্বতন্ত্রতা র'য়েছে।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎপ্রেরণায় হয় ?

উঃ— ভগবৎপ্রেরণায় হ'লে ত' তদ্বারা ভগবৎ সেবাই হ'ত— ভগবদবিস্মৃতি হ'তো না। (প্রভুপাদ)

প্রঃ— তা' হ'লে সবই ভগবদিচ্ছায় হয় বা সবই ভগবৎরূপ—এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়?

উঃ— শ্রীমদ্ভাগবত এর জবাব দিয়েছেন—

‘তত্তেহ্নু কম্পাং সুসমীক্ষমাণো

ভুজ্ঞান এবাঅকৃতং বিপাকম্।

হৃদাগ্রবপুভিবিদধরমন্তে

জীবৈত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥’

ইহ জগৎ হ'তে যার ছুটি পাওয়ার যোগ্যতা হ'য়েছে, তিনি বিচার করেন—পরমমঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষারোপ করি, তবে সেবাপ্রবৃত্তির অভাব হওয়ায় কোন দিনই মুক্ত হ'তে পারবো না। কিন্তু চেতনময়ী সেবোন্মুখতাক্রমে যিনি সমস্ত অসুবিধাগুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিক আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী। (প্রভুপাদ)

প্রঃ— আমরা যে পাপ করি, তাহাও কি ভগবানের দয়া?

উঃ— না, তা' নয়। পাপের প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমাদের পরীক্ষা করার জন্য। যেমন শিশুর রুচি পরীক্ষা ক'রবার জন্য পিতামাতা কড়ি, ধাত্ত, ভাগবত-শাস্ত্র প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে তাহা গ্রহণ করে। দয়ার সাগর ভগবানকে বহিঃস্থ মানব-জ্ঞানে নির্দয় ব'লে মনে হ'চ্ছে। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে দয়াময়ের সবই দয়া। পিতার চুষন ও চপেটাঘাত যেমন দুইই দয়া, তজ্জপ। দয়াকে দণ্ড ব'লে মনে হ'লে Serving temper (সেবোন্মুখতা) বা attraction for God (ভগবানে আশ্রয়-প্রতিভা)-এর অভাব হ'চ্ছে বুঝা যায়। ভগবান্ সর্বাশ্রয়। তাঁর কাছে আশ্রয় পাব ব'লে যে আশা ক'রে যায়, ভগবান্ তা'র (আশ্রয়-প্রার্থীর) ঐকান্তিকতা পরীক্ষা ক'রবার জন্য তার নিকট অনেক অসুবিধা এনে ফেলেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম, তিনি পথ্য-মরিচাদির ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার ছুরিদি দিয়ে ফোড়াটা কেটে দিলেন। তা'তে

যদি তাঁ'দিগকে নির্দয় মনে করি, তা' হ'লে আমাদের বিচারটা ভুল হ'লো। অজ্ঞ আমি প্রকৃত মঙ্গল-কাজীকে—দয়াবান্কে অমঙ্গলকারী ও নির্দয় ব'লে ভুল ক'রলাম।

মায়া এ জগতে নানা প্রলোভনের জিনিষ সাজিয়ে রেখেছে। আমরা সেই টোপে আকৃষ্ট হ'য়ে কখন যথেষ্টাচারী অসৎকর্মী হ'ছি, কখন কখন লোকহিত-কর কার্য ক'রবার নামে সৎকর্মী সাজছি, কখন নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে কেই ভাল মনে ক'রছি, কখন শাক্যসিংহ, কপিল, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির মতকে আদর ক'রছি। এসব দ্বারা আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। একমাত্র ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ'লেই জীবের মঙ্গল হ'বে। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের অন্বেষণ নাই। ভগবান্ ক'রও স্বতন্ত্রতা বাধা দেন না। তিনি চেতনধর্মের হস্তারক নহেন, চেতনের বৈশিষ্ট্য বাধা দিলে তাঁর নির্দয়তার পরিচয় হ'তো। তিনি চেতন-বৃত্তির নিকট চেতনবৃত্তির সৎ ও অসৎ ব্যবহারের কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি জানা-ছেন—জৈমিনী ঋষির অভ্যুদয়বাদের কথা, দত্তাত্রেয়-শঙ্করাদির নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হ'য়ে না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম কর, —ভগবানের সেবা যা'তে না হয়, এরূপ কর্ম ক'বো না।

আমাদের কর্মশীল পুড়ে গ্যাছে। তাই আমরা ভগবৎসেবা ছেড়ে দিয়ে অল্প কাজে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ছি। সর্লক্ষণ ভগবৎসেবাই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য, এই নিখুঁত সত্য কথাটা আমাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। ভগবৎসেবা অপেক্ষা অল্প কাজকেই আমাদের বড় মনে হ'ছে — কর্তব্য ব'লে মনে হ'ছে। পুনঃ পুনঃ সাধুসঙ্গ ক'রেও আমাদের এই মারাত্মক ভুলটা আর ভাঙছে না। বহিঃস্থ আমাদের প্রবৃত্তি হ'ছে—মায়াতে আবদ্ধ হওয়া — মৎস্ত হ'য়ে টোপ খাওয়া, জী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-প্রপৌত্র যাদের সঙ্গে আর কোনকালে দেখা হ'বে না, তা'দের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে — মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তা'দের ভোগের ইচ্ছন যোগাড়

ক'রে রেখে যাওয়া। আমগাছ পুতলাম — বিষয়-সম্পত্তি
কিন্লাম — তাঁ'র ফল পাবে অন্তে — যা'র সঙ্গে আর
কখনও আমার দেখা হ'বে না — আমার বহু
কষ্টের সম্বিত ধনদৌলত যে একদিন উড়িয়ে দিবে,
তাঁ'র জন্তই সব চেষ্টা! আমাদের কি বিচারভ্রান্তি!

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— ভক্ত কি নিজের কোন কথা বলেন?

উঃ— আমাকে অনেকে বলছে — আপনাদের কথা
শুনে খুব উপকৃত হ'লাম। কিন্তু আমাদের নিজের
কোন বিজ্ঞা-বুদ্ধি নাই। গুরুদাসস্থানে আমরা শ্রীগুরু-
পাদপদ্মের কথাই বলে থাকি। আমরা নূতন কোন
প্রস্তাব করি না। তবে ভগবানকে পাখার জন্ত তদনু-
কূলে যে সকল কথা বলবার আছে, তাই মাত্র বলি।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ— এখন আমাদের কি ক'রতে হ'বে?

উঃ— গুরুর কাছে কথা শুনতে হ'বে। প্রথমে
গুরুর কাছে যে সব কথা শুনবো, সেগুলো বড়
revolting (বিপ্লবী) মনে হ'বে। আমার অভিজ্ঞান-
দ্বারা গুরুর অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা সাধন ক'র্বো — কোন
কোন ছর্ভাগ্যের এরূপ দুর্বুদ্বির উদয় হয়। কিন্তু গুরুদেবকে
বাহু জগতের চিন্তাশ্রোতঃ আক্রমণ ক'রতে পারে না —
তিনি এসকলকে অনন্তকোটি যোজন দূরে রাখতে
পেরেছেন। তাঁ'র Position (ভূমিকা) Shifting
(পরিবর্তনশীল) নয় বলেই তিনি গুরু অর্থাৎ সব
চেয়ে ভারী জিনিষ। আমার গুরু Absolute Truth এর
(বাস্তব সত্যের) সেবক — তাহা খণ্ডিত সত্য নহে
— তাহা Unchallengeable and Unchangeable.

(প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোবিন্দ

[পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিনিত্যস্বামী শ্রীমন্তপ্রিয়োদয় পুরী মহারাজ]

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার
শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—“একমেব
তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকচিন্ত্যশক্ত্য। সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-
বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্ভাবস্থিতি।” অর্থাৎ “সেই
একমাত্র পরমতত্ত্ব [‘অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন’
—চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২; ঐ আঃ ২।৬৫—‘অদ্বয়জ্ঞান-
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ’ অর্থাৎ ‘অদ্বয়জ্ঞান-শব্দ কৃষ্ণস্বরূপ-
স্থলীয় মূলতত্ত্ববস্তু’ (ঐ আঃ প্রঃ ভাঃ)] স্বাভাবিক,
মানবজ্ঞানাতীতশক্তিবলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপ-
বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চারিপ্রকারে অবস্থিত।”
দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিয়াছেন—“সূর্য্য-তদন্তর্যমণ্ডলস্থ তেজইব
মণ্ডল-তদবহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।” অর্থাৎ “সূর্য্য,
তাঁহার অন্তর্যমণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডলবহির্গত
কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি, এই চারিরূপ।” চ্যুটবটক-
তাই অচিন্ত্য, তাহা স্তব্ধাং প্রাকৃত মানবজ্ঞানাতীত।
সেই শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থ—এই তিন
প্রকার। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিপ্রভাবে শ্রীভগবানের পূর্ণ

স্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠগোলোক প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপ-
বৈভব ধাম, তটস্থ শক্তিপ্রভাবে চিন্ময় শুদ্ধজীব-
বিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রভাবে তৎসম্বন্ধীয়
বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধান (প্রাকৃতজগদ্) রূপে চতুর্ভা
অবস্থিতি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—

—“কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী। তিনি
প্রাভব ও বৈভব—এই দুই প্রকার ‘প্রকাশ’ রূপে,
অংশ ও শক্ত্যাবেশ —এই দুই প্রকার অবতার রূপে
এবং বালা ও পোগণ্ড—এই দ্বিবিধ বয়োধর্ম্মরূপে —
এই ছয় প্রকার স্বরূপবিলাসে বিশ্ব ভরিয়া লীলা
করিতেছেন। এই ছয় রূপের অনন্ত বিভেদ থাকিলেও
কৃষ্ণ এক অখণ্ড তত্ত্ব—‘অনন্ত রূপে একরূপ নাহি
কিছু ভেদ’। তাঁহার চিহ্নভক্তি বা স্বরূপ-শক্তির নামই
অন্তরঙ্গা শক্তি। এই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হইতেই
শ্রীভগবানের পূর্ণস্বরূপবিগ্রহ ও সেই স্বরূপ-বৈভবস্বরূপে
বৈকুণ্ঠাদি ধামের অনন্তবৈভব প্রকটিত হইয়াছে।
তাঁহার তটস্থাত্মা জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত ভেদে

অনন্তজীব এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব প্রকাশিত হইয়াছে। অবতারী স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সেই সকলের আশ্রয়, তিনিই আবার শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-সুবলিত কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্রসূত শ্রীনবদীপ-মায়াপূরচন্দ্র গৌরহরি।

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয়॥

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রহ্মেন্দ্রকুমার।

আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥”

—চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরচন্দ্র যেমন একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তাঁহাদের ধাম শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদীপ মায়াপূরও তদ্রূপ একই অখণ্ডতত্ত্ব, একই গৃহের যেন দুইটি প্রকোষ্ঠ-স্বরূপ। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলা, আর শ্রীধাম নবদীপ-মায়াপূরে তাঁহার ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যালীলা প্রকটিত। শ্রীগৌর-প্রিয়তম পার্শদপ্রবর শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—

“নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরদ্বিষে নমঃ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১২।৫৩

অর্থাৎ “মহাবদান্ত, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা, গৌরাক্ষরপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।” (অঃ প্রঃ ভাঃ)

তিনি যে উন্নত—সম্বদ্ধিত—সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জল শৃঙ্গার-রসমাধুর্য্য জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পদ—নিজপ্রেমশোভা দান করিবার জ্ঞাই অধুনা এই কলিযুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্র মহাবদান্তাগুণ—ইহাই তাঁহার অতুলনীয় পরমকরুণার পরিচয়; শিববিরিক্ষিজুল্লভ ব্রজভূমির কৃষ্ণপ্রেম বিতরণই তাঁহার ঔদার্য্যালীলা; স্বরূপতঃ তিনি সাক্ষাৎ গোপীজনবল্লভ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া বিশ্ব ধন্ত করিবার জ্ঞাই তাঁহার শেষলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম;

কান্তিতে তিনি শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-সুবলিত গৌরবর্ণ—
—অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর।

মহাপ্রভু মহাবদান্ত, তাঁহার ধাম, লীলাপরিষ্কর—সকলেই মহামহাবদান্ত। মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ পরম উদার-প্রকৃতি, তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান নাই। অমুদার সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণই স্ব-পর-ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ বিচার। তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গমান্নক সকল প্রাণীকেই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সম্বন্ধ জানিয়া তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার-নিপুণ।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামিকুলমুকুটমণি গৌরপার্শদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-গ্রন্থের প্রারম্ভেই শ্রীধাম নবদীপে অবতীর্ণ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্তব করিতেছেন—

“স্তুমন্তুং চৈতন্যকৃতিমতিবিমর্ষাদপরমা-

ভুতোদার্য্যং বর্ষ্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।

বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মাদমধুরপীযুষলহরীং

প্রদাতুং চাত্তেভ্যঃ পরপদনবদীপপ্রকটম্॥”

অর্থাৎ “ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেমসিক্তসমুখিত হর্ষাদি মধুর অমৃত লহরী আশ্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জ্ঞাত, যিনি নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ‘শ্রীনবদীপ’ নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্বাভার-শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অত্যন্তুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি।”

পরবর্তী শ্লোকে শ্রীমহাপ্রভুর কারুণ্যের পরিচয় আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতেছেন—

“ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে

দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু সত্যং সৃষ্টিষু কাপি নো সন্।

যদন্তশ্রীহরিরসসুখাস্বাদমন্তঃ প্রনৃত্য-

তুচ্ছৈর্গায়িত্যথ বিলুণ্ঠিত জ্যোতি তং কঙ্কির্দীপম্॥”

অর্থাৎ “ধর্ম্ম যাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই অর্থাৎ পুণ্যের লেশমাত্রও যাহাতে বিজ্ঞমান নাই, যে সর্বদা মহাপাপে নিমগ্ন, যে কখনও সাধুগণের রূপাকটাক্ষ লাভ করে নাই অথবা সজ্জন-প্রতিষ্ঠিত পাপপ্রবেশ-শূন্য কোন পবিত্র স্থলে কদাপি অবস্থান করে নাই, সেই পাপীয়া

ব্যক্তিও ষাঁহর প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসসীমাবাদনে প্রমত্ত হইয়া উদ্ধাম-মৃত্যু, উচ্চকীর্তন এবং ভূতলে বিলুপ্তন করে, তাদৃশ শক্তিমান কোন অনির্লচনীয়া পুরুষকে আমি স্তব করি।”

এমন দয়াময় গৌরহৃদয়ের সাফাৎ করুণাশক্তি অস্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আমাদিগকে সেই মহাবদান্ত পরমদয়াল গৌরহরির শ্রীপাদপদ্মের সন্ধান দিয়া তৎ প্রদর্শিত যে শুদ্ধভক্তিমার্গ বা ভজনমার্গ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই করুণার ঋণ আমরা অনন্ত জীবনেও পরিশোধ করিতে পারিব না। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যক্ষ আমাদিগকে প্রেমময় শ্রীমদ্ব্যাক্তির পরমোদার প্রেমধামে আকর্ষণ করিয়া নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ সেই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সৌভাগ্য প্রদানপূর্বক আমাদিগকে যুগপৎ সাধুগণ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস (অর্থাৎ ধামবাস) ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমুত্তিসেবনরূপ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গসমূহক যাজনের অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিতেছেন। মাদৃশ পতিত দুর্গত জীব-প্রতি তাঁহার এই করুণা ভাষাঘারা অবর্ণনীয় — অনির্লচনীয়া। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিকাশের পরও তাঁহার নিজজনগণ তাঁহার এই পরিক্রমা-ভক্ত্যঙ্গ-যাজনোপদেশ যথাবিধি পালনের প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। শ্রীধামমায়াপুর কৈশোতানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদিগোবাসী শ্রীমন্তক্তিদয়িত মাধব মহারাজও অপরিসীম উত্তমে শ্রীধামের এই নয় দিবসব্যাপী পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মমহোৎসব মহাসমারোহে পরিচালনা করিয়া থাকেন।

আত্মনিবেদনাধ্য ভক্ত্যঙ্গজনস্থল অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া শ্রবণভক্ত্যঙ্গজনস্থল শ্রীমীমন্ত-দ্বীপ, কীর্তনাধ্য ভক্ত্যঙ্গজনস্থল গোক্রমদ্বীপ, শ্রবণ-ভক্ত্যঙ্গজনস্থল মধ্যদ্বীপ, পাদসেবনাধ্য ভক্ত্যঙ্গজনস্থল কোলদ্বীপ, অর্চনাধ্য ভক্ত্যঙ্গজনস্থল ঋতুদ্বীপ, বন্দনাধ্য ভক্ত্যঙ্গজনস্থল জলদ্বীপ, দাস্তাধ্য ভক্ত্যঙ্গজনস্থল মোদক্রমদ্বীপ এবং সখ্যাধ্য ভক্ত্যঙ্গজনস্থল রুদ্রদ্বীপ— এই অষ্টদ্বীপ যথাক্রমে পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমণান্তে দিবসভ্রম শ্রীমঠে মহোৎসব হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধভক্তির অনুশীলন যত বৃদ্ধি পাইবে, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্য-মূল স্থল বা স্থল ভোগপ্রবৃত্তি ততই কমিতে থাকিবে। ‘পরং দৃষ্টা নিবর্ততে’। ইহা ব্যতীত জড় বিষয়াসক্তি দূর করিবার আর অত্ন কোন উপায়ই দৃষ্ট হয় না। শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মধ্যময় তাঁহার প্রার্থনার প্রথমেই পরম-দয়াল শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের রূপা প্রার্থনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিতাইরূপায় সংসার-ভোগবাসনা বা জড় বিষয়াসক্তি উপশমিত হইয়া মন শুদ্ধ হইলেই শ্রীমদ্ব্যাক্তি বা শ্রীমদ্বীপধাম দর্শন ও বাসলালসা হৃদয়ে জাগিবে, শ্রীরূপরঘুনাথাদি নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্বদগণের রূপালাভের জন্ম প্রাণ কাঁদিবে, তাঁহাদের - প্রদর্শিত অপ্রাকৃত রাগাধুগা ভজনপদ্ধতি জানিবার জন্ম এবং তদনুসরণের জন্ম হৃদয় ব্যাকুল হইবে, তখন পরম দয়াল শ্রীগুরুদেব তাহা যে কোন উপায়ে হউক জানাইবার ব্যবস্থা করিবেন। অনধিকার-চর্চায় প্রবৃত্ত না হইয়া শ্রীগুরুগোবিন্দগোবিন্দ নামভজনে রত হইলে শ্রীনামই আমাদিগের সকল আশা পূর্ণ করিবেন— সকল কল্যাণ বিধান করিবেন। ‘ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার’— এই মহাজনবাণী অনাদর করিয়া নামে রতিবুদ্ধির পূর্বেই রাগমার্গ অবলম্বন করিতে গেলে ফল-বৈপরীত্যই লাভিত হইবে। আমাদের পরমকরণ গুরুপাদপদ্ম এবং তন্নিজজন—বৈষ্ণবগণ—সকলেই নাম-ভজননিষ্ঠ হইবারই পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন ও প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী সাধককে প্রত্যাহ অন্ততঃ লক্ষ নাম-গ্রহণের জন্ম বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের সুপট উপদেশ—“সপ্তজিহ্বা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা’তে একান্ত বর্জ্যমান অনুরাগ থাকিলেই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে।” ‘নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ’। কিন্তু নাম ভজনে প্রকৃত নিষ্ঠা কোথায়? শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা-কালে সম্বৎসরান্তে ভজন-বিজ্ঞ শুদ্ধভক্ত-সমাগমে ভজনের নিগূঢ় রহস্য — সাধ্যসাধনতত্ত্বাদি ইষ্টগৌরী বিশেষ

সুযোগ উপস্থিত হয়। “সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর
অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে স্নেহ মানস।”
সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতৎক্ষণজিহ্বাসা। নিবিশেষজ্ঞানাত্ম-
শীলনের দ্বায় নিরর্থক নহে। রাগমার্গ অনুসরণ
করিতে হইলে শ্রীমদ্রূপগোষ্ঠামি-কৃত ‘ভক্তিরসামৃত-
সিন্ধু’ বিশেষভাবে অনুশীলনীয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ
ঠাকুর বৈষ্ণবসভায় যখন এই গ্রন্থ পাঠ করিতে
যাইতেন, তখন বালকরূপী পরমারাধ্য প্রভুপাদ তদনু-
গমনে প্রত্যহ সেই গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইবার
সৌভাগ্য বরণের এবং বিশেষ মনোনিবেশ-সহকারে
তাহা শ্রবণ করিবার মহাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।
মহামুগ্ধরিত ভগবৎকথা। শ্রবণে কখনও কোন
প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে হইবে না। অনেক
অকালপক সাধককল্পের শৌচনীয় পরিণাম আমাদের
বিশেষভাবে জানা আছে। তজ্জন্ত আমরা নিজের
সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয়ঃপিপাসু সজ্জনমাত্রকেই তদ্বিষয়ে
সাধারণ হইবার জন্ত বিশেষভাবে অনুরোধ করি।
‘নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার’। নামের নিকট
শুদ্ধরাগভজনলালসা জ্ঞাপন কর। নামাত্মরাগ বর্দ্ধনের
সঙ্গে সঙ্গে নাম প্রভুই রূপা করিয়া প্রকৃত নিঃশ্রেয়সের
সন্ধান দিবেন। তখন নাম-ভজ্ঞন-নিষ্ঠায় অনাদর
প্রদর্শনের পরিবর্তে আরও বর্দ্ধমান অনুরাগের সহিত
নাম গ্রহণ করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধির যোগ্যতা
উদ্ভিত হইবে।

শ্রীগৌরধাম গৌরনাম বড় উদার বড় করুণাময়।
ধামরূপায় ‘মায়াপুর হেন স্থান জিহুবনে নাই,’ ইহা
সাক্ষাদভাবে উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য
এইরূপ যে,—“নবদ্বীপে বসি’ যেই মন্ত্র জপ করে।
শ্রীময় চৈতন্য হয়, অন্যায়সে তরে ॥ শতবর্ষ সপ্ততীর্থে
মিলে যাহা ভাই। নবদ্বীপে একরাত্র বাসে তাহা
পাই ॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়। নবদ্বীপ
সর্বতীর্থ অবতংস হয় ॥ কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য
হ্রসীর। গৌর নাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার ॥ **ভাগীরথী**
পূর্বভায়ে হয় মায়াপুর। মায়াপুরে নিভ্য
আছেন আমার ঠাকুর ॥ লোকদৃষ্টো সন্ন্যাসী হইয়া

বিশস্তর। ছাড়ি’ নবদ্বীপ ফিরে দেশদেশান্তর ॥
বস্ত্রতঃ গৌরাজ মোয় নবদ্বীপ ধাম। ছাড়িয়া
না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম ॥” শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-
কিশোরের ক্রীড়া-নিকেতন। শ্রীল সরস্বতীপাদ
লিখিতেছেন—

“ভূমির্ভিত্তি সুকোমলা বহুবিধ প্রত্যোভিত্তিতৃচ্ছটা
মানাচিত্র মনোহরং খগমুগাত্যাক্ষর্যাগাশ্রিতম্ ॥
বল্লাভুরহজাতয়েহাঙ্কুততমা যত্র প্রসূনাভি-
স্তম্বে গৌরকিশোর কেলিভবনং মায়াপুরং
জীবনম্ ॥”

অর্থাৎ যেখানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জল
রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর
শোভায়ুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য
শ্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের
আশ্চর্য্যনিনাথে মুগ্ধরিত, যেখানে ফুলফলে তৎসঙ্গতারাজি
পরমাদ্বিত্য শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌর
কিশোরের ক্রীড়াবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন।

কিন্তু হায়, ‘চক্ষুচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম’।
চিকামের চিন্ময় সৌন্দর্য্য সেবাস্থব ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ী-
ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

“নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজ্ঞমব্যয়ম্ ॥”

—গীতা ৭।২৫

অর্থাৎ যোগমায়াবারা সমাজ্জাদিত থাকায় আমি
সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। এই জন্ত মুঢ় লোক
আমার মায়িকজ্ঞানাদি-শূন্য গ্রামস্থলবাকার বস্তুদেবাত্মজ
আমাকে অব্যয়স্বরূপ বলিয়া জ্ঞানিতে পারে না।

শ্রীভগবানের চিন্ময়ধামও ঐ প্রকার যোগমায়া-
সমাজ্জাদিত। তিনি কৃষ্ণ-বিমুখ জীবকে দণ্ড দেন,
শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তজ্জপবৈভব ধামকে দর্শন করিতে
দেন না। কোন ভাগ্যোদয়ক্রমে সাধুসঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হইলেই,
যোগমায়া তাঁহার আরণ্যক সম্বরণ করিয়া দান।
“তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে,
পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” —(চৈঃ চঃ)। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও

গাহিয়াছেন — ‘মাঝারে করিয়া জয় ছাড়ান’ না যায়।
সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥’ শ্রীল ঠাকুর
ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

“ধামের উপরে জড়মায়া পাতি’ জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যা’র নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে।
প্রৌঢ়ামায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে॥

যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তার॥
বৈষ্ণবচরণে মোর এই সে প্রার্থনা।
শ্রীগৌরসম্বন্ধ মোর হউক যোজনা॥
শ্রীগৌরসম্বন্ধ-সহ নবদ্বীপে বাস।
হউক অচিরে মোর এই অভিলাষ॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি’।
আবরণ সম্বরবে কবে বিশ্বোদরী॥
বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়।
চিক্কাং আমার চক্ষে হউন উদয়॥”

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরবন্ধ

[মহোপদেশক শ্রীমদ্বজ্রলিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি, বিজ্ঞানজ্ঞ, ভক্তিশাস্ত্রী]

[১]

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ, অনন্ত ব্রহ্মাদির গণ, অনন্ত দেবগণ ও অনন্ত চরিত্র জীবগণ। সর্বোপরি সর্বকারণ- কারণ ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের চরিত্র ও অনন্ত, অদ্বিত ও অপার। শ্রীহরিসম্বন্ধ-হুত্রেই মাত্র সবাকার পরিচয়। শ্রীহরিসম্বন্ধের বাহিরে কাহাবও কোন পরিচয় নাই এবং পরিচয় দিবারও কিছুই নাই। পরিচয় আছে বলিয়া যাহা মনে করা যায়, দেখা যায় ও শুনা যায় তাহা পরিচয়ের মায়া বা ছায়া মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া যে জাগতিক পরিচয় এবং তজ্জনিত যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহার মধ্যে মৌলিকত্ব কিছুই নাই, পরস্তু সর্বৈব কৃত্রিমতার ভরা। জগৎ-সম্বন্ধে জী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, প্রভু-ভৃত্য ইত্যাদি সকলেই পরস্পরের দেখাশুনার বান্ধব, মৌলিক প্রীতির আশ্রয় ইহারা কেহই মহেন। জীবে জীবে যে প্রীতি, তাহা যে কোন সম্বন্ধেই হউক, কৃত্রিম প্রীতি। তাহারই অপর নাম কাম বা মোহ, নৈরাশুই মাত্র যাহার পরিণাম। পক্ষান্তরে চরাচরে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি নিত্যসিদ্ধ ও মৌলিক বস্তু। অদ্বয়বস্তু শ্রীভগবানে অনন্ত বিশ্ব চরাচর সকলই স্থিত, সকলই তাঁহার অংশ—কেহ স্বাংশ, কেহ বা বিভিন্নাংশ। স্বাংশে অনন্ত অবতারণালীর পরিচয়

এবং বিভিন্নাংশে জীবসমূহের গণনা। অংশ অংশীর পরস্পরের প্রীতি স্বাভাবিক ও মৌলিক। “নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্যা কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়” (চৈঃ চঃ)। তথাপি সারগ্রাহী পরমহংস- গণ জগতের এই কৃত্রিম সম্বন্ধ হইতেও সার সংগ্রহ করিয়া মায়ামুগ্ধ জীবগণকে উপদেশকালে তাঁহাদের চক্ষে অঙ্গুলী নির্দেশ করতঃ দর্শাইয়া থাকেন, দেখ জীব! সম্বন্ধ ছাড়া প্রীতির কোন কথাই নাই। সম্বন্ধ হইলে প্রীতি করিতে কষ্ট হয় না অথবা কম কষ্ট হয়। যেখানে যত প্রিয় সম্বন্ধ বা সম্পর্ক, সেখানে প্রীতিরও তত আধিক্য দেখা যায়। এমনকি, প্রিয় বা প্রিয়ার সম্বন্ধ ধারণকারী একটি জড় পদার্থও, যেমন কাপড়- চোপড়, শিশুর খেলনা ইত্যাদি সকলই প্রিয় বোধ জাগ্রত করায়। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর সীমাধীন জড়বস্তুতে নব্বীর প্রীতি কেবল হৃৎপিণ্ডকেই হয়, প্রীতিকারীকে বা প্রীতির আশ্রয়কে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। ইহাতে প্রীতির তাৎপর্য যে সুখলাভ, তাহা চরমে পাওয়া যায় না। তাহার মুখ্য-কারণ সম্বন্ধগুলি স্বল্পে সত্য হইলেও সম্বন্ধগুলির Resting Platform (আশ্রয়) জগতে নাই। এই জন্ত জগতের সম্বন্ধকে ও তত্ত্ব

প্রীতিকে অনেক সময়েই অলীক অথবা কাল্পনিক বলা হয়। কিন্তু এই জাতীয় হতাশার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় যদি সম্বন্ধটিকে নম্বর জগৎ হইতে উঠাইয়া লইয়া সর্বাত্ম ও সর্বময় শ্রীহরিতে যোজন্য করা হয়। কেননা, বস্তুতঃ “কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ সবার”। যদি ভগবানে প্রীতি লাভ হয়, তবে তাঁহার প্রিয়সম্বন্ধ ধারণকারী তদীয় স্বাংশ ভগবদবতার সমূহে এবং বিভিন্নাংশ জীবসমূহেও সাহজিক প্রীতির উদয় হয়, যাঁহার ফল পরম অমৃত ও পরম মধুর। শ্রীভগবান্ সর্বজন প্রিয়, আশ্রয় (নিয়ন্তা) ও সুহৃদ বুলিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় চরাচরে প্রীতিটাই প্রেমাম্পদগণের পরমাদরের বস্তু। ইহাকেই জীবের প্রতি জীবের শুদ্ধা প্রীতি বলে। এই প্রীতিতে জৈব জগৎও পরম্পরের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধগুলি পুষ্টিলাভ করে এবং স্থায়ী হয়। যেমন দৃষ্টান্তরূপ বলা যায়, ধ্রুকের শ্রীউত্তানপাদ-নন্দন বা সুনীতি-নন্দন নামেই প্রসিদ্ধি। শুদ্ধ ভগবন্তন্তুপুত্র সম্পর্কে পিতা-মাতৃদির পরিচয়ও নিত্য পরিচয়ে পরিগণিত হয়। এইমত শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীবলি মহারাজাদি বহু সিদ্ধ ভগবন্তন্তু সম্পর্কেও বলা যাইতে পারে। শ্রীভগবানের সম্বন্ধে ইহাদের পরম্পরের সম্বন্ধগুলি নিত্য, নামগুলি নিত্য এবং পরম্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রীতিও অক্ষয়, অব্যয়। এই ভাগবতীয় পরম পবিত্র চিন্তাধারা জগতের বাজারে নামকরা Philanthropists দের জীব-প্রেম বা ঈশ্বর-সেবা নহে। ইহা জাগতিক মাপের চিন্তাশ্রোত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বস্তু। এই পরম-পবিত্র নির্মল চিন্তাশ্রোত ষণ্ডভূমি জগতের সীমাবদ্ধতার মধ্যে কখনও জাত হয় না। ইহা অঞ্চ ও দেশ, কাল ও পাত্রের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠ-ব্যাপার-বিশেষ। তবে জগতে ছায়া সম্বন্ধ ও ছায়া প্রীতিকে একেবারে মিথ্যা না বুলিয়া, তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ-প্রীতির একটা অতীব সাধারণ Introduction (ভূমিকা) অথবা বৈকুণ্ঠবস্তুরই একটি Hypothesis মাত্র জ্ঞান করিয়া বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধের অমুসন্ধান ও তাঁহাতে প্রবেশ লাভ বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে। এই Hypothetical (জগৎ) বিষয়ে অধিক অভিনিবেশই জীবের পুরু

হঃখের কারণ বুলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। “জগদশেষম-সংস্করণং.....সদিবাবভাতি ॥” (শ্রীভাগবত ব্রহ্মস্তুতি) ॥ তজ্জন্ম “স্বষ্ট্যাদিক কার্য্য তাঁর লীলার সহায়” বিচারটা হৃদয়ে অনুভব করিলেই সুখ হইবে। সাধু শাস্ত্র দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা যায়, শ্রীভগবান্ লীলাই মুখ্য ও একমাত্র বস্তু এবং বাকী স্বষ্ট, অস্বষ্ট যাঁহাকিছু, তদীয় লীলারই অঙ্গ ও ব্যতিরেকভাবে সহায়ক, বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছুই নাই, মায়ামাত্র। আরও, শ্রীহরিলীলা বলিতে মুখ্যতঃপার্শ্বে ভগবানের তদীয় ভক্তকে সুখ দেওয়া এবং ভক্ত-ভক্তিজনিত সুখ স্বয়ং আন্বাদন করাকেই বুঝায়। এককথায় প্রেমপুষ্টিই ভগবানের লীলা। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার অনন্ত লীলার আবিষ্কার।

শুদ্ধজীব বাৎসল্যাদি যে-কিছু সদৃশ বিন্দুরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহাদেরই অবধি এবং ততোধিক গুণাবলী ভগবান্ শ্রীহরিতে বিদ্যমান। শ্রীহরি অখিলকল্যাণ-গুণধনি। তাই কল্পনাময় শ্রীগৌরহরির সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন —

শ্রীগৌরসুন্দরঃ,

“সৌন্দর্য্যে কামকোটি: সকলজনসমাহ্বাদনে চন্দ্রকোটি-বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরোদার্য্যাসারে। গান্তীর্ঘ্যেহঃস্তাধিকোটির্মধুরিমনি স্বধাক্ষীরমাধ্বীককোটি গৌরোদেবঃ স জীয়াং প্রণয়রসপদে দর্শিগাশ্চর্য্যকোটি: ॥”

[যিনি সৌন্দর্য্যে কোটি কন্দপতুল্য, যিনি কোটি চন্দ্রের ত্যায় সকলের আনন্দজনক, যেহে যিনি কোটি মাতৃসদৃশ, যিনি কোটি কল্পবৃক্ষসম বদান্ত এবং কোটি সমুদ্রের ত্যায় গন্তীর স্বভাববিশিষ্ট, সেই অমৃতের ত্যায় মধুর ও কোটি কোটি অদ্ভুত প্রণয়রসের প্রদর্শক শ্রীগৌর-সুন্দর জয়যুক্ত হউন।] এই জন্ম যে-কোন সম্বন্ধে শ্রীভগবদ্রস কিঞ্চিৎ আন্বাদনের বিষয় হইলেই জীবের আর তদিতর রসে কোন প্রয়াস থাকে না। — “* রস-বর্জ্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥” “* * * যদ্ গজান নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” “* * * মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্তে ॥” ইত্যাদি শ্রীগীতাবচন প্রবিধানযোগ্য।

অনুশ্রম-চরিত্র ভক্তবাৎসল্য শ্রীগৌরহরি একদা পদব্রজে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। গঙ্গা তীরে তীরে পথ। পথে প্রয়াগে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতা বনভ্রমসহ প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভক্তিতত্ত্বের গূঢ়-বিষয় উপদেশ করিলেন। অতঃপর প্রভুর অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতাসহ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন এবং প্রভুও কাশীর পথ ধরিলেন। পূর্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন শ্রীচন্দ্রশেখর, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি প্রভাতে উঠিয়া প্রভুর জন্ম গ্রামের গাছের পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান। প্রভুও সেই গ্রামের পথ ধরিয়াই কাশীতে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুকে পাইয়া পরমানন্দে নিজালায়ে লইয়া আসিলেন। শ্রীতপনমিশ্রও তথায় আসিয়া মিলিলেন। তপন মিশ্রের প্রার্থনা, প্রভু যাবৎ কাশীপুরে অবস্থান করিবেন, তাবৎ তাঁহার গৃহেই ভিক্ষা নির্বাহ করিবেন। মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন।

একদিন প্রাতঃকাল। স্মৃতিবদন শ্রীগৌরহরি চন্দ্রশেখরের গৃহের ভিতর-বারান্দায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে রাস্তার পার্শ্বে গৃহের বহির্বারান্দায় আসিয়া বসিলেন রাজবন্দী শ্রীসনাতন। সুদীর্ঘ কারাবাসে তাঁহার দেহশ্রী মলিন ও ক্ষীণ, কেশ ও নখ বর্জিত এবং দরবেশের বেশ। অনেক ছদ্ম করিয়া তিনি রামকেলী হইতে কাশীতে আসিয়াছেন। হৃৎকের মধ্যও সনাতনের আনন্দিত মন, প্রভু তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন, শুনিতে পাইয়াছেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি তথায় আসিয়া বসিয়া আছেন। মহাপ্রভু আজ্ঞা করিলেন, “দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাঁহারে।” চন্দ্রশেখর নিবেদন করিলেন, “প্রভু! বৈষ্ণব নাহিক দ্বারে।” “কেহ হয়?” “এক দরবেশ হয় প্রভু!” প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। দরবেশকে অঙ্গনে দেখিযানাত্র মহাপ্রভু তৎপর হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাবিষ্ট

সনাতন গদগদবাক্যে কেবল উচ্চারণ করিলেন, “মোরে না ছুঁইহ প্রভু!” প্রভু ভৃত্যের অপূর্ণ মিলন! উভয়ের গলাগলি ভাব, অদ্ভুত রোদনাদি। চন্দ্রশেখর তদর্শনে বিস্ময়াগিত ও চমৎকৃত। মহাপ্রভু সনাতনকে হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। একটি পিণ্ডার উপরে নিজপার্শ্বে তাঁহাকে বসাইলেন। শ্রীহস্তে তাঁহার অঙ্গমলা মার্জন করিলেন। সনাতনের প্রেমাবিষ্ট চিত্তের একই পরিভাষা “মোরে না ছুঁইহ প্রভু!!” “তোমা স্পর্শি আত্ম-পবিত্রিতে। ভক্তিবলে পাণ্ডু তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥” — মহাপ্রভু বলিলেন। প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইলেন। তপন মিশ্রের বাড়ীতে সনাতনেরও নিমন্ত্রণ হইল। প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন ক্ষৌর করতঃ গঙ্গা-স্নান করিলেন। তপন মিশ্রের পুরাতন পরিবেশ হইতে ছইখানি বহির্বাস ও ডোর-কোপীন করিলেন। নূতন বস্ত্র দিতে চাহিলেও সনাতন গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভু লক্ষ্য করিলেন, মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর সনাতন মাধুকরি বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। “সনাতনের বৈরাগ্যো প্রভুর আনন্দ অপার। ভোটকঞ্চল পানে প্রভু চাহে বায়ে বার॥” রাজমন্ত্রী সনাতন সহজেই অনুমান করিলেন, এই ভাল ভোটকঞ্চলটি, যাহা তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত পথে তাঁহাকে আগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, দেখিয়া প্রভুর সুখ হইতেছে না। তিনি অতি সত্বর একটি বৈরাগীকে তাহা দিয়া তাঁহার অতীব সাধারণ কাঁথাখানি গলায় জড়াইয়া প্রভু পার্শ্বে আসিলেন। প্রভু সনাতনের মুখ হইতে আত্মপ্রাপ্ত সকল শুনিয়া সুখী হইলেন। বলিলেন, “ইহা আমি করিয়াছি বিচার। বিষয়-ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ সে তোমার॥ সে কেন রাশিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ। রোগ ঋণ সঙ্কট না রাখে শেষ রোগ॥ তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরি গ্রাস। ধর্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥” পারমাধিক মেহ বা ভক্তবাৎসল্য বলিতে ইহাকেই বুঝায়। কেন-না, বৈরাগ্য ছাড়া পরতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ ও সংরক্ষণ সম্ভব নহে। বিষয়-ভোগের কামনা হইতেই জীব দুর্বল হইয়া জগতে পড়িয়া রহিয়াছে। কাজেই উক্ত ভোগের

পিপাসা চিত্তের মধ্যে পুষ্টিয়া রাখিয়া পরমার্থের কোন অনুশীলন সম্ভবপর হয় না এবং এই জাতীয় মনোবৃত্তিতে অপর কোন ব্যক্তিকেও পরমার্থে সাহায্য করা যায় না। আবার “অন্তঃশাক্ত বহির্গৌরঃ” কপটবৈষ্ণব-বেশ ধারণেও কোন কাজ হয় না। “আপনি আচারি’ ধর্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান’ না যায় ॥” এই শিক্ষাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। অতঃপর শ্রীসনাতন নিষ্কিঞ্চন জীবনের সঙ্কল্প গ্রহণ ও নিষ্কিঞ্চনের বেশ ধারণ করতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রভুর এইপ্রকার বাৎসল্যরসময়মূর্তি শ্রীরাপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী আদি বহু ভক্তেরই দর্শন সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীতও কল্পণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহার আগত ও অনাগত ভক্তগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন, “কাঁথা করদ্বিয়া মোর কাঙাল ভক্তগণ। বৃন্দাবনে যাইলে তাঁদের করিহ পালন ॥” এই সকল ঘটনাবলী হইতে কল্পণাময় শ্রীগৌরহরির ভক্তবাৎসল্যের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র।

Statement about ownership and other particulars about newspaper ‘Sree Chaitanya Bani.’

- | | |
|---|--|
| 1. Place of publication : | Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |
| 2. Periodicity of its publication : | Monthly |
| 3 & 4. Printer's and Publisher's name : | Sri Mangalniloy Brahmachary |
| Nationality : | Indian |
| Address : | Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |
| 5. Editor's name : | Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj |
| Nationality : | Indian |
| Address : | Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |
| 6. Name & address of the owner of the newspaper : | Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 29. 3. 1976

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY

Signature of Publisher

বোলপুর রেলময়দানে বিরাট ধর্মসভা

বিগত বর্ষের জ্যৈষ্ঠ এবং ঐশ্বিন্যর মাসে নিখিলভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরম পূজনীয় ত্রিদিগ্বিশিখিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে বোলপুর রেলময়দানে গত ২১ ফাল্গুন, ১৩৮২; ইং ৫ মার্চ, ১৯৭৬ শুক্রবার হইতে ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ, রবিবার পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। দিবসত্রয়ের বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যথাক্রমে— (১) ‘বিশ্বসমস্তা-সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব’, (২) ‘মানবজাতির ঐক্যবিধানে ভাগবতধর্ম’ এবং (৩) ‘ভবব্যাপির মহৌষধ বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ’। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন যথাক্রমে— (১) ডক্টর শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী—অধ্যাপক বিশ্বভারতী, (২) ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী—অধ্যাপক বিশ্বভারতী এবং (৩) ডাঃ শ্রীচঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দিয়াছেন—পূজ্য-পাদ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব স্বয়ং এবং শিউড়ী শ্রীনিত্যানন্দ গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, রিষড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হরীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদিগ্বিশিখিতগণ।

ভাষণের পূর্বে ও পরে উদ্বোধন ও উপসংহার সঙ্গীত কীর্তন করিয়াছেন— শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহে ৮।৩।৭৬ সন্ধ্যায়ও সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এইদিবসের সভার সভাপতিত্ব করেন—কালীকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—“মানব জীবনের মুখ্য কর্তব্য।” বক্তৃতা দিয়াছিলেন—ত্রিদিগ্বিশিখী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হরীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীমদ্ সুবীর কৃষ্ণ ঘোষ,

ত্রিদিগ্বিশিখী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। চারি-দিবসের সভায়ই সভাপতির ভাষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের ঘটিকাধিককালব্যাপী শাস্ত্রীয় সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ উল্লসিত ও লাভবান হইয়াছেন। শ্রীপাদ হরীকেশ মহারাজের সঙ্গীত সম্বলিত ভাষণও শ্রোতৃবৃন্দের হৃৎকর্পকরসায়ন হইয়াছে।

সভার দ্বিতীয় দিবস—২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ শনি-বার অপরাহ্নে বাসন্তীতলা হইতে এক বিরাট নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া প্রথমে শ্রীমন্মহা-প্রভুর মন্দিরে যান। অতঃপর বোলপুর সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ভ্রমণ করিয়া রেলময়দানস্থ সভার প্রত্যাভর্জন করেন। বহু সম্রাস্ত নরনারী নগর কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের সংকীর্তনসম্বন্ধে পক্ষ হইতে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ উদাত্তকণ্ঠে স্তম্ভুর নামকীর্তন-দ্বারা বোলপুর সহরের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিলেন। আরও ৩৪টি কীর্তনদলও কীর্তন করিয়াছেন। দিবসত্রয়ব্যাপী অহো-রাত্র নামকীর্তনেরও ব্যবস্থা ছিল। ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ সোমবার বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহুসংখ্য নরনারী আবাংল-বৃন্দ-বনিতা তুল্য হরিধ্বনিসহ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। আমরা আশা করি বোলপুরবাসী সদ্ধর্মপিপাসু সজ্জন-বৃন্দ ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তদঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু—শ্রীচৈতন্যমুখোদ-গীর্ণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে ও শুদ্ধভক্তিরসামুতা-স্বাদনে উত্তরোত্তর অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। বীরভূম পরমদয়াল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরমপরিচ্ছন্ন শুভাবির্ভাবক্ষেত্র, স্মৃতরাং তদেশবাসী সকলকেই প্রেম-দাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইয়া সেই প্রেমগ্রহীতা হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম।

উৎসবের উদ্বোধন কর্ত্তী প্রণতপাল দাসাধিকারী, সুবীরকৃষ্ণ ঘোষ (অধ্যাপক), বীরচন্দ্র দাসাধিকারী, নিত্যানন্দ রায়, কালীচাঁদ রায়, মধুসূদন রায়, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দয়াল চন্দ্র সাহা, চন্দন গুপ্ত, সুবোধ

সাহা, রাধাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, ভোলা-নাথ ঘোষ, ননীলাল সিংহ, মেজর সিং, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, ডি, পি, গোস্বামী, মধুসূদন সাহা প্রমুখ সজ্জনগণের অদম্য উৎসাহ ও উত্তম—সর্বোপরি শ্রীভগবদনুগ্রহে বোলপুর রেলময়দানে আয়োজিত ধর্মসভা ও মহোৎসবাদি এবার নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দানন্দ-পাদপদ্মে বোলপুরবাসী সজ্জনগণের শুভভক্তিমার্গে ক্রমবর্দ্ধমান অমুরাগ প্রার্থনা করি।

দিবসচতুষ্টয়বাণী সভায় ডাঃ শর্গেশ চন্দ্র সরকার, ডাঃ চন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজবল্লভ দে (মার্কেট), শ্রীকাশীনাথ দে, শ্রীকুমার চন্দ্র সেনগুপ্ত

(কংগ্রেস সেক্রেটারী) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সজ্জন ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী মহোদয় একদিবস সপার্বদ পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবকে পরমসাদরে তাঁহার বাসগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার ঘোড়শোপচারে পূজা ও আরা-ত্রিকাদি বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল চন্দ্র ও শ্রীরাধাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টো-পাধ্যায় প্রমুখ সজ্জনগণও সপার্বদ পূজ্যপাদ মহারাজকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়া যথাশক্তি পূজা বিধান করিয়া-ছেন। আরও অনেকেই তাঁহাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও সময়ভাবে তাঁহার পক্ষে সকলের প্রার্থনা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ আসামপ্রদেশে তেজপুত্র, গোয়াল-পাড়া, গোহাটি, সরভোগস্থ চারিটি মঠের বার্ষিক উৎসবে এবং কামরূপ জেলাভ্যন্তরিত হাউলি বন্দরে বিরাট ধর্মসম্মেলনে যোগদানান্তে বিগত ৯ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রু-য়ারী রবিবার গোহাটি হইতে বিমানযোগে আগরতলায় শুভদর্শন করেন। বিমানবন্দরে মঠের ভক্তবৃন্দ এবং স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া তিনি চন্দ্রপুরস্থ শাখামঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আগরতলায় শুভাগমনোপলক্ষে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় পাঁচটি ধর্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের উপজ্ঞাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীহরিচরণ চৌধুরী, খাতমন্ত্রী শ্রীতড়িংমোহন দাশগুপ্ত, আগরতলা বিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা মহারাজের ভ্রাতা কুমার সহদেব বিক্রমেন্দ্র কিশোর দেবদর্শন বাহাদুর দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান

অতিথিরূপে বৃত্ত হন। ‘মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীমমহাপ্রভুর অবদান’, ‘ঈশ্বর ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপকারিতা’, ‘ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায়’, ‘ভাগবতধর্মের সর্বোত্তমতা’, ‘ভবব্যাবির মহোষধ বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ’ নিন্দা-রিত বক্তব্যবিষয়ের উপর শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদ তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, প্রতিষ্ঠানের অগ্রতম বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, স্থানীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজও বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে পদাবলী কীর্তন ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন অম্লষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন ও মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবার উত্তম ও আগ্রহ দর্শনে শ্রীল আচার্য্যদেব পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। সর্বশ্রী নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, বিশেষ্বর ব্রহ্মচারী, বৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, ছদ্দৈবমোচন ব্রহ্মচারী, রামকুমার ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টাও প্রশংসার্হ।

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জ্জনং তব-মহান্যাবাস্তি-নির্বাপণং
শ্রোয়ঃ কৈরবচাস্ত্রিকাবিতরণং বিভাববুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাস্বল্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮৩।

১৪ মধুসূদন, ৪৯০ শ্রীগৌরাদ; ১৫ বৈশাখ, বুধবার; ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৬।

{ ৩য় সংখ্যা

সজ্জন-অকিঞ্চন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যিনি অহংগ্রহোপাসনামতে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্মফললাভের জন্য উদগ্রীব নহেন এবং যিনি ভগবন্তের অপবস্ত্র প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহার জ্ঞান-সম্পত্তি, কর্ম-সমৃদ্ধি এবং লৌকিক সুখলাভে চিত্ত বাগ্ন নহে। এই জড়জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে অস্বহায়া হইয়া নির্বিশেষজ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গসুখাদিতে ভোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্বাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া তত্তৎফললাভের উদ্দেশে কখনও বা তাগীর বেশে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেষ্টাচারের প্রবল ভাড়নায়, আমার ছিল, আমার আছে বা আমার চাই বলিয়া “কিছু” অধেষণ করেন। যেকাল পর্য্যন্ত জীব “কিছু” পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন, তখন পর্য্যন্ত “কিছু” তাঁহাকে ছাড়ে না। “কিছু” সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে। যাহার “কিছু” নাই, তিনিই অকিঞ্চন; তিনিই সজ্জন। তাঁহার কিছু অধেষণ করিতে হয় না। কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া দৌড়িতে হয় না। াজাস্বজি সেই “কিছুট” আশ্রয় জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং সুনিস্কল আশ্রয়-জাতীয় হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্বকে বিবর-জাতীয়ের

অভিন্ন জানিয়াছেন, স্তবরাং আশ্রয় বা অবলম্বন অনু-সন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয় লাভের জন্য চুড়িতেছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় এবং ভগ-বান্ই তাঁহার একমাত্র নিত্য বিষয় একথা ভুলিয়া-ছেন। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অকিঞ্চনতার উপলক্ষি না হয়, তৎকালাবধি তিনি সাকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী কর্মী বা অজ্ঞাভিলাষী। ভগবানের শুদ্ধভক্তই অকিঞ্চন। অকি-ঞ্চন তৃণাপেক্ষা সূনীচ অর্থাৎ জড়ের কোন উপাধিকে তিনি নিজ সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞানেন না। অকিঞ্চন তরু অপেক্ষা মহাগুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আক্রমণের যোগ্য বলিয়া আপনাকে জ্ঞানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পত্তিমান জ্ঞানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। সজ্জনই একমাত্র অকিঞ্চন। তিনি সুবিমল কৃষ্ণসেবাপরায়ণ। সজ্জন হিংসা-ষেধ-বর্জিত পরাপেক্ষা-রহিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগ-বতের “যশ্চাত্মকিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভোম ইজাধীঃ। যতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্চিজ্জনেষ-ভিজ্জেষু স এব গোখরঃ॥” শ্লোকটির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অকিঞ্চন বা সজ্জন হইয়াছেন। বিনাশী অসদবস্তুর প্রতি তাঁহার কোন অভিনিবেশ নাই। তিনি প্রপন্ন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাবী

(নামাপরাধ)

প্রঃ—নামাপরাধের গুরুত্ব কতদূর ?

উঃ—“নাম যেক্রপ সর্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেই-
ক্রপ সকল-প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন।
সর্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়-মাত্রেই দূর হয়,
নামাপরাধ তত সহজে যায় না।” — জৈঃ ধঃ ২৪শঃ অঃ

প্রঃ—কোনও প্রকার পাপের সহিত নামাপরাধের
তুলনা কিস্তি ?

উঃ—“পঞ্চবিধ পাপ কোটিগুণিত হইলেও নামা-
পরাধের তুল্য হয় না।” — জৈঃ ধঃ ২৪শঃ অঃ

প্রঃ—অপরাধ-পরিভাষা যত্ন না করিয়া নাম-
গ্রহণের অভিনয়ে নামের ফল পাওয়া যায় কি ?

উঃ—“নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে
মনে করেন যে, নাম—অক্ষরময়; অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া
নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজ্ঞা-
মিলের ইতিহাস ও ‘সাক্ষ্যতাং পারিহাস্যং বা’, ইত্যাদি
শাস্ত্র-বচনের উদাহরণ দেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে
যে, নাম—চৈতন্য-রসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। সে-
স্থলে নিরপরাধে নামরস আশ্রয় না করিলে নামের
ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম
উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে
পারে। অতএব ছুটক্রপে অর্থবাদ করিয়া নামকে
জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে যাহারা কর্মকাণ্ডের অঙ্গ
বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্মুখ
ও নামাপরাধী।” — ‘শ্রীহরিনাম’

প্রঃ—অবৈধ-যোগিত্তকে নামাশ্রিত করিবার অভিনয়
করিয়া নাম-বলে যৌবিত্ত-সঙ্গের সুযোগ করিয়া লওয়া
কি নামাপরাধ নহে ?

উঃ—“কোনও ভিক্ষুপ্রমগত বৈষ্ণব-পুরুষ কোনও
সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিলেন। অবশেষে
পাপ-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া এই স্থির করিলেন—
‘যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে
হরিনাম-শিখ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে
কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে

অবশ্যই ক্ষয় হইবে; বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী
হইল, বৈষ্ণব-সঙ্গ—দুর্লভ; আবার উহার সঙ্গে গোপী-
ভাবেরও অনেক শিক্ষা হইবে; এক্ষণ দুর্লভ-সঙ্গ কোথায়
পাওয়া যায় ? —এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে
বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণব-সেবা গ্রহণ করিলেন। এস্থলে
নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল।”

—‘নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ’, সঃ ভোঃ ৮৯

প্রঃ—হরিনাম নীচ ফলজনক না হইবার কারণ
কি ?

উঃ—“সেই সর্বশক্তি-সম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ,
জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষণ্ড-মধ্যে পতিত হইলে নীচ
ফলজনক হয় না। এই প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ
সামান্য ও বৃহৎ। সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত
নাম ‘নামাভাস’ হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান
করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম ‘নামা-
পরাধ’ হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত
হয় না।” — জৈঃ ধঃ ২৪শঃ অঃ

প্রঃ—অনন্তভক্তিহীন ব্যক্তির লক্ষণ কি ?

উঃ—“শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অনাদর, অসৎসঙ্গ, অর্থাৎ
অবৈধ-সঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তি-
শাস্ত্রের নিন্দা, নাম-নামীতে ভেদ-জ্ঞান, অল্প শুভ
কর্মের সহিত নামের সাম্য, জড়-দেহের অহংতা-
মমতা-বশতঃ নামে স্রীতির ধর্মতা, নাম-বলে পাপা-
চরণ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তি-বিরুদ্ধ আচার নিম্নিত
আছে, তাহা যে-ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে
শ্রীকৃষ্ণে অনন্তভক্তি লাভ করিয়াছেন,—একপ বলা
যায় না।” — ‘কুটিনাটী’, সঃ ভোঃ ৩৭

প্রঃ—দশবিধ নামাপরাধ কি কি ?

উঃ—“নামাপরাধ দশবিধ—(১) সাধুনিন্দা,—যাহারা
একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা
বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন,
জ্ঞান-যোগ-প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এক্ষণ মনে
করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়।

(২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্বেশ্বর, অস্তিত্ব দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অস্ত্র দেবদেবীর ভজন হয়—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অস্ত্র এক ঈশ্বর, —এইরূপ স্বতন্ত্র-শক্তি-সিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়। (৩) গুরুবজ্ঞা—যিনি নাম-তত্ত্বের সর্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনি নামগুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অস্ত্র সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলেই অপরাধ হয়। সকল কর্মের চরম ফল নামতত্ত্ব-লাভ, তাহা যাহার হইয়াছে, তাঁহার অস্ত্র কিছুই প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই। (৪) ভ্রান্তি-নিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-স্বচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাস-মূলক ঘেঁষা-বহন করিলে নামাপরাধ হয়। (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থ্যাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের রূপ-নাম-গুণ-কর্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়। (৬) নাম-বলে পাপ—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটি পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসার যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৭) শুভকর্ম-সাম্য—অর্থ্যাৎ ধর্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি ক্ষেত্রপ শুভকর্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভকর্ম-বিশেষ, অতএব যে-কোন একটি শুভকর্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নাম আশ্রয় না করা অপরাধ। (৮) প্রমাদ—নামে অনবধান, অর্থ্যাৎ উদাসীন, জাড়া ও বিক্ষিপ্ত থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নাম-গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা করাই উদাসীন, নাম-গ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপ-মালার স্মৃতি-প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড়োর লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্তী হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-

মন্ত্রদান—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্ত অর্থ-লোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অকঃপাতিত হন। (১০) ‘অহং মম’ ভাব—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিবরাসক্তির আধিক্য-বশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিভাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তন করিলে নামের ফলে গ্রেম-লাভ হয়।”

—‘বিশুদ্ধভজন’, সঃ তোঃ ১১।৭

প্রঃ—প্রথম নামাপরাধের স্বরূপ কি?

উঃ—“প্রথম অপরাধ এই যে, যে-সকল সাধু একমাত্র নাম আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়; কেননা, যাহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরাধ সাধু-দিগের নিন্দা পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহাদিগকেই সর্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম-কীর্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।” —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—দ্বিতীয় নামাপরাধের কয়টি ভেদ?

উঃ—“দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা দুইপ্রকার—প্রথম প্রকার এই যে, —দেবোত্তপাদ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইহাদের গুণ-নামাদি সকলই বুদ্ধিধারা-পৃথগ-রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়; তৎপরা এই যে, সদাশিব একটি পৃথক্ স্বতন্ত্রশক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটি পৃথক্ ঈশ্বর —এরূপ কল্পনা করিলে কল্পাধারবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্ত-ভক্তির বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তি-সিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে,—শিবরূপ অর্থ্যাৎ সর্বমঙ্গল-স্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণ-

নাম, কৃষ্ণশব্দ ও কৃষ্ণলীলা—সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করত কৃষ্ণনাম করিবার বিধি।”

— জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ— তৃতীয় নামাপরাধ — গুরুবজ্ঞার লক্ষণ কি ?

উঃ—“নামগুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নাম-শাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু ঐহারা বেদান্ত-দর্শনাদি অধিক জানেন, তাঁহারা নাম-শাস্ত্র-গুরু অপেক্ষা

শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত ; তিনি নামাপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চ গুরু নাই, তাঁহাকে তদ্রূপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হইবে।”

— জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ— শ্রীগুরুদেবকে কিরূপ মনে করা উচিত ?

উঃ—“শ্রীগুরুতে সামান্য জীব-বুদ্ধি করিবে না, — কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-পুষ্ট ‘কৃষ্ণপরিকর’ বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করাও মার্যবাদীর মত, — শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়।” —‘গুরুবজ্ঞা’, হঃ চিঃ

অবতার-তত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিআমী শ্রীমন্তকিশোরমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার সংক্ষেপভাগবতামৃত (পূর্বখণ্ড ২।১) লিখিয়াছেন—

“পূর্বোক্ত বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।

দ্বারান্তরেণ রাবিঃ সুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥”

অর্থাৎ সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীভগবান্ যখন বিশ্বহিতার্থ স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা অপূর্ব অর্থাৎ নূতনের দ্বার জগতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে ‘অবতার’ বলা হয়।

নিত্য অস্তিত্ববান্ বাস্তব-বস্তু যখন রূপাপূর্বক প্রপঞ্চাভীত গোলোকধাম হইতে ভুলোকে অবতরণ করেন, তখনই তিনি ‘অবতার’ বলিয়া কথিত হন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (২৯ সংখ্যা) লিখিয়াছেন — ‘অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভববৎ-তরণমিতি’। শ্রীল বলদেব বিদ্যাতৃষণ প্রভু সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতটীকায় লিপিতেছেন—“অপ্রপঞ্চং প্রপঞ্চেত্ব-তরণং ধরবতারঃ” অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে বা বিশ্বে অবতরণই ‘অবতার’ বলিয়া কথিত।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় লিখিত হইয়াছে (গীঃ ৪।৭-৮) —“যখন যখনই ধর্ম্মের প্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আমার নিত্যসিদ্ধ দেহকে নৃপদেহের মত প্রদর্শন করি। আমার একান্ত ভক্ত-

গণের পরিব্রাজ্যার্থ অর্থাৎ আমার অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যাহারা দুষ্কৃতিশালী অর্থাৎ আমার ভক্তলোকের দুঃখদায়ী, সেই সকল আমি ব্যতীত অন্তের অবধ্য রাবণ-কংস-একশী প্রভৃতি অসুর-গণের বিনাশ-হেতু এবং মনুষ্য ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্যা-সংকীর্ণনরূপ ধর্ম্ম সম্যকপ্রকারে স্থাপন করিবার নিমিত্ত আমি প্রতিযুগে আবির্ভূত হই।”

শ্রীভগবান্ এইরূপে অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অব-তরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে প্রাপঞ্চিক বা প্রাকৃত মনুষ্যাদির দ্বার হইয়া পড়িতে হয় না। তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাপূর্বক এই জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখোক্ত “অজোহপি সন্ন্যাসাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধি-ষ্ঠায় সন্তবাম্যাঅমায়য়া॥” ও “জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেব যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন॥” শ্লোকদ্বয়ে (গীঃ ৪।৬, ৭) তাহা স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাঅ-মায়য়া” এই ৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামি-পাদ লিপিতেছেন —

“স্বাং শুদ্ধস্বাদ্বিকং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিপু-কোজ্জিত সম্মুখ্যা স্বেচ্ছাধারতামীত্যর্থঃ।”

অর্থাৎ স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া — স্বীকার করিয়া। বিশুদ্ধ উজ্জল সম্বন্ধিত্ব প্রকট করতঃ আমি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই — ইহাই অর্থ।

ঐ গীতাতেই (গীঃ ৯।১১-১২) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন — “অবিবেকিজনগণ আমার মাহাত্ম্যকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত ভাব বা তত্ত্বই যে উৎকৃষ্ট, তাহা না বুঝিয়া সর্বভূতের মহান্ ঈশ্বর আমাকে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা নিষ্ফলকাম, নিষ্ফলকর্মা, নিষ্ফলজ্ঞান ও বিবেকবিহীন হয় এবং মোহজনক রাক্ষসী ও আত্মরী প্রকৃতি অর্থাৎ তামস ও রাজস স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

আবার ইহাও জ্ঞাতব্য — শ্রীভগবান্ ও তাহার প্রেরিত ভক্ত উভয়েই কর্মকলবাধ্য জীবের ত্রায় জন্মগ্রহণ করেন না।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন —

“অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।

সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যানেন তথাই ॥

ধর্ম-কর্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।

পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥”

— চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৭৩-১৭৪

“যথা সৌমিত্রিভরতো যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।

তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্যালোকং যদুচ্চয়া ॥

পুনন্তেনৈব যান্তস্তি তদ্বিক্ষোঃ শাস্বতং পদম্।

ন কস্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥”

— পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২৫৭।৫৭-৫৮

[অর্থাৎ যেক্ষণ স্মিত্ত্বানন্দন লক্ষণ ও (কৈকেয়ীনন্দন)

ভরত আর যেক্ষণ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহ সকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রাপ্তে প্রোদ্বৃত্ত হন, তদ্রূপ ভগবৎপার্বদ বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই সহিত আবিভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ত্রায় কর্মবন্ধন-জনিত জন্ম নাই।]

শ্রীমদ্ ভাগবতে (ভাঃ ১০।১০।৩৪) শ্রীকৃষ্ণরূপাপ্রাপ্ত কুবেরাশ্রদ্ধাঘের স্তুতিতে কথিত হইয়াছে —

“যশাবতারো জায়ন্তে শরীরিষশরীরিণঃ।

তৈত্তৈরতুল্যাশ্রিত্যৈবীর্ষ্যদেহিষসজ্জৈঃ ॥”

অর্থাৎ “[আশ্রিত্যেত অর্থাৎ আপনা হইতে প্রকাশিত গুণ দ্বারা (মায়িকগুণ দ্বারা নহে) শ্রীভগবানের মহিমা বা স্বরূপ মেধাবৃত রবির ত্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। দুজ্জৈয় স্বরূপ তাঁহার। তাহা হইলে পূর্বপক্ষ হইতে পারে — ‘অথোহহমীশ্বর ইতি কুতো জ্ঞাতঃ?’ অর্থাৎ অহো আমি যে ঈশ্বর, ইহা কি করিয়া জ্ঞাত হইল? তাহাতেই বলিতেছেন —] “প্রাকৃত শরীরে যেসকল বীর্ষ্য (পরাক্রম) অসম্ভব, মংস্ত্র, কুর্শ প্রভৃতি বিগ্রহধারী প্রাণীর মধ্যে সেই সকল অসমোদ্ধ গুণযুক্ত পরাক্রম-দর্শনে লোকসকল তাঁহাদের মধ্যে প্রাকৃত শরীর-রহিত অপ্রাকৃত মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুমান করিতে পারেন।” [হে ভগবন্! আপনিই সেই সর্বকল্যাণদাতা সর্বাবতারাবতারা মহাপুরুষ — স্বয়ং ভগবান্। সম্প্রতি সমস্ত জীবের সম্পদ ও মোক্ষ প্রদানের জন্ত পরিপূর্ণ স্বরূপে (‘অংশভাগেন’ — অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশে। যত্র তেন পূর্বেন স্বরূপেণেতি — শ্রীচক্রবর্তী-টীকাধৃত ‘ভাবার্থদীপিকা’ ভাঃ ১০।২।৯, ১৬ দ্রষ্টব্য) অবতীর্ণ হইয়াছেন।]

মহাজলাশয় (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ‘অবিদ্যাসিনঃ’ — উপ-ক্ষয়শূন্য সরসঃ সকাশাৎ অর্থঃ অক্ষয় সরোবর হইতে — এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।) হইতে যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় নির্গত হয়, তদ্রূপ সম্বন্ধি শ্রীহরির অসংখ্য অবতার। (ভাঃ ১০।২।৬ দ্রষ্টব্য)।

শাখা-চক্র-স্থানে কেবল দিগদর্শনার্থ শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণের ষড়্বিধ অবতারের কথা বর্ণন করিয়াছেন :— (১) পুরুষাবতার, (২) লীলাবতার, (৩) গুণাবতার, (৪) মনুষ্যাবতার, (৫) যুগাবতার ও (৬) শক্ত্যাবেশাতার। (১) পুরুষাবতার — মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণাক্রিয়ায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী — এই তিন মূর্তি; (২) লীলাবতার — মংস্ত্র, কুর্শ, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন, বরাহাদি; (৩) গুণাবতার — ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; (৪) মনুষ্যাবতার — স্বায়ম্ভবে ‘যজ্ঞ’, স্বারোচিষে ‘বিভু’, উত্তমে ‘সত্যমেন’, তামসে ‘হরি’, রৈবতে ‘বৈকুণ্ঠ’, চাক্ষুবে

‘অজিত’, বৈবস্বতে ‘বামন’, সাবর্ণ্যে ‘সার্কভোম’, দক্ষ-সাবর্ণ্যে ‘ঋষভ’, ব্রহ্মসাবর্ণ্যে ‘বিষ্কসেন’, ধর্ম্যসাবর্ণ্যে ‘ধর্ম্য-সেতু’, রুদ্রসাবর্ণ্যে ‘সুধামা’, দেবসাবর্ণ্যে ‘ঘোগেশ্বর’ ও ইন্দ্রসাবর্ণ্যে ‘বৃহদভাঙ্ক’ — চৌদ্দ মন্বন্তরে এই চৌদ্দ অবতার [কিন্তু এই চৌদ্দটি অবতার ব্রহ্মার একদিনে মাত্র প্রকটিত হন। ব্রহ্মার দিনকে ‘কল্প’ বলে। ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ অবতার, একবৎসরে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে ৫০৪০ অবতার, শতবৎসরাত্মক ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার।]; (৫) **যুগাবতার** — সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ জটাবন্ধলধারী ব্রহ্মচারি-বেশ, ধর্ম্য — ধ্যান; ত্রেতাযুগে — ভগবান্ রক্তবর্ণ চতুর্ভাঙ্ক ঞ্জকৃষ্ণাবাদি যজ্ঞচিহ্নধারী, ধর্ম্য — যজ্ঞ; দ্বাপরযুগে — ভগবান্ অতসীপুষ্পদঙ্কাশ শ্রীমবর্ণ, পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধ, শ্রীবৎসাদিচিহ্ন ও কোমলভ্রমণি প্রভৃতি বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ [এখানে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিতেছেন, — ‘সকল দ্বাপরেই স্বয়ং-রূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে অবতার ঘটে না; শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ববর্তী অত্যাশ্চর্য্য দ্বাপরযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণের অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, — ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, শ্রীহরিবংশে ও মহাভারতাদিতে শুনা যায়।’ — চৈঃ চঃ ম ২০।৩৩৫ অনুভাষ্য], ধর্ম্য — কৃষ্ণপদার্কন এবং কলিযুগে — ভগবান্ পীতবর্ণধারী, কলিযুগধর্ম্য — কৃষ্ণনামসংকীর্তন প্রবর্তন এবং ভক্তগণ-সহ লোকসমূহকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিশ্রাদান। এতৎপ্রসঙ্গে ‘আসনবর্ণাশ্রয়ো’ (ভাঃ ১০।৮।৯), ‘কৃষ্ণবর্ণং বিবাহকৃষ্ণং’ (ভাঃ ১১।৫।২০), ‘কলেদেবানিধেঃ’ ও ‘কৃতে যক্ষা-য়তো বিষ্ণুং’ (ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২), ‘কলিং সভাজয়-ন্ত্যর্থাঃ’ (ভাঃ ১১।৫।৩৩), ‘ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেঃ’ (বিষ্ণুপুরাণ ৬ষ্ঠ অং ২ অঃ ১৭শ শ্লোঃ) ইত্যাদি শাস্ত্রবাচ্য কীর্তন পূর্বক শ্রীমদমহাপ্রভু তাঁহার বাক্যের প্রামাণিকতা প্রদর্শন করিলে ‘গৌরলীলাতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণ-ভজন-চতুর ‘রাজমন্ত্রী সনাতন — বুদ্ধো বৃহস্পতি’ সदैন্তে স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে তাঁহার অবতারো-দেহ জ্ঞানিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন — ‘কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার?’ তাহাতে

মহাপ্রভু কহিলেন — অত্যাশ্চর্য্য অবতারের জ্ঞায় কলিযুগা-বতারও শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানীয় যায়। অবতার কখনও বলেন না — ‘আমি অবতার’; তত্ত্বকোবিদগণ জীবের পক্ষে হুঃসাধ্য, অসমোদ্ধ ও অলৌকিক বীর্ষ্য-লক্ষণ-দ্বারা ভগবদ্বস্ত্র নির্দেশ করেন। ‘যত্নাবতারা’ জায়ন্তে’ ইত্যাদি ভাগবতীয় প্রমাণ আলোচ্য (পূর্বে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ-দ্বারা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বরূপ — এই তিনটি স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ এবং কার্য্য-দ্বারা জ্ঞানই তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ ইত্যাদি প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ-দ্বারা অপ্রাকৃত বাস্তব-বস্তু পরমেশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। সত্য ও পরং শব্দদ্বয়ে স্বরূপলক্ষণ এবং বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে বস্তুজ্ঞান-প্রকটন, অর্থাভিজ্ঞতা ও স্বরূপশক্তিতে মায়া দূরীকরণ প্রভৃতি কার্য্য-দ্বারা তটস্থলক্ষণ ব্যক্ত করিয়া মূল বস্তুতত্ত্ব — পরমেশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন। এই দুই লক্ষণ দ্বারাই দেশিকগণ অবতার নির্ণয় করিয়া থাকেন। ‘আকৃতি — আকার, প্রকৃতি — স্বভাব, স্বরূপ — মূর্তি — এই তিনটিই স্বরূপ বা মুখ্যলক্ষণ; সেই বিভ্রাহের ব্যবহার বা কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ।’ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৫৫ দ্রষ্টব্য) ভজনচতুর শ্রীসনাতন এই স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণের কথা শুনিয়া ব্যক্ত করিয়াই কহিলেন —

“সনাতন কহে, — ‘যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।

পীতবর্ণ, কার্য্য — প্রেমদান-সঙ্কীর্তন ॥

কলিকালে সেই ‘কৃষ্ণাবতার’ নিশ্চয়।

স্বদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয়’ ॥”

— চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৬২-৩৬৩

অর্থাৎ শ্রীগৌরপার্বদপ্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামি-পাদ কহিলেন — যাহাতে ঈশ্বর-লক্ষণ — পীতবর্ণ (কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ, — আকৃতি — পীতবর্ণ, প্রকৃতি বা স্বভাব — মহাবদান্ত, স্বরূপ বা মূর্তি — অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, ‘রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ’, রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ) এবং তটস্থ লক্ষণ — প্রেমদান ও

সঙ্কীৰ্ত্তন—কার্য্য, কলিকালে তিনিই নিশ্চয় কৃষ্ণাবতার।
প্রভো, এবিষয়ে স্মৃঢ় করিয়া স্পষ্টভাবে বলুন, তাহা
হইলেই আমরা সংশয়নির্মুক্ত হইতে পারি।

প্রিয়তম ভক্তের নিকট ভগবানের সত্যস্বরূপ ব্যক্ত
হইয়া পড়িল। তাই “প্রভু কহে, — চতুরালি ছাড়,
সনাতন। শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥” বলিয়া
আত্মগোপনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য শক্ত্যাবেশ
অবতারের দিগ্‌দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৬) শক্ত্যাবেশাবতার — ‘শক্ত্যাবেশ — গোণ ও
মুখ্যভেদে দুইপ্রকার; যাহাতে সাক্ষ্য শক্তির অবতার,
— তিনিই মুখ্য শক্ত্যাবেশ-অবতার; এবং যেস্থলে শক্তির
আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায়, সেস্থলে গোণশক্ত্যাবেশ
অবতার।’ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৬৩ অঃ প্রঃ ভঃ)
সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, জীবরূপ ব্রহ্মা,
বৈকুণ্ঠে শেখ, ভূধারী অনন্ত — ইহারা মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার।
সনকাত্মে ‘জ্ঞান’-শক্তি, নারদে ‘ভক্তি’-
শক্তি, ব্রহ্মায় ‘সৃষ্টি’-শক্তি, অনন্তে ‘ভূ-ধারণ’-শক্তি,
শেখে ‘স্ব-সেবন’-শক্তি, পৃথুতে ‘পালন’-শক্তি, পরশুরামে
‘দ্রষ্টাশ’-শক্তি, সঞ্চারিত হইয়াছে। লঘুভাগবতানুসারে
আবেশাবতারের সংজ্ঞা এইরূপ:—

“জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যথাবিষ্টো জনাৰ্দ্দনঃ।

ত আবেশা নিগতন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥”

অর্থাৎ জ্ঞানশক্ত্যাদিকলাদ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ,

সেই মহত্তম জীবসকল ‘আবেশ-অবতার’ বলিয়া গণিত হন।
কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশই শ্রীগীতার ‘বিভূতি’ বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছে:—

“যদ্যদ্বিভূতিমং সৰ্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাংগচ্ছ তং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাংমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন হি স্থিতো জগৎ॥”

— গীঃ ১০।৪১-৪২

[“ঐশ্বর্য্যযুক্ত, (সৌন্দর্য্য বা) সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভা-
বান্দির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই
আমার ‘বিভূতি’ বলিয়া জানিবে। সে সমুদয়ই আমার
প্রকৃতিতেজোহংশসম্ভূত।”

“হে অৰ্জুন, অধিক কি বলিব, সংক্ষেপতঃ আমার
এই প্রকৃতি — সর্বশক্তিসম্পন্ন; তাহার এক এক প্রভাব-
দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান। জড়-
প্রভাব-দ্বারা জড়ীয়-সত্তার এবং জীবপ্রভাব-দ্বারা জৈব-
জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্টজগতে সাম্বন্ধিকভাবে
বর্তমান আছি।” অর্থাৎ “আমার এক অংশ যে
পরমাশ্রা, তদ্বারা আমি সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া
সমস্ত বিভূতি প্রকাশ করিয়াছি।”]

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারাবলীর দিগ্‌দর্শন
প্রদর্শিত হইল।

ভক্তি ও মুক্তি

শ্রুতিগণ স্তব করিয়া বলিতেছেন—

“দুঃখবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-

শ্রুতিতমহামুতাক্শিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ।

ন পরিলম্বন্তি কেচিদপবর্গমপীধ্বর তে

চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥”

— ভাঃ ১০।৮৭।২১

অর্থাৎ “হে ঈশ্বর, জীবকুলকে দুর্কোষ আশ্রিত
জ্ঞাপনের জন্য প্রকটতমুষ্টি আপনাদের চরিতরূপ মহামুত-

সমুদ্রে যাহারা অবগাহন-দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়াছেন
এবং আপনাদের পাদপদ্মে হংসতুল্য-বিচরণশীল ভক্ত-
গণের সঙ্গবশতঃ গৃহতাগ করিয়াছেন, তাহারা মহা-
পুরুষগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না।”

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ ঐ শ্লোকের ‘ভাবার্থদীপিকা’
ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন —

“অংকথামুতপাখোধো বিহরন্তো মহামুদঃ।

কুর্কন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ধর্গং তুণোপমম্॥”

[অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমার কথাসমূহে মহানন্দে বিহরণকারী কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি (ভজনবিজ্ঞভক্ত) ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ — এই চতুর্ভুজকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন ।]

“শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিকাং ভক্তেদর্শয়তি । যথাহ — যং সর্বৈ দেবা নমস্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি । ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞে-ভাষ্যকৃষ্ণিঃ—‘মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষ্টা ভগবন্তং ভজন্তে’ ইতি ।”

[অর্থাৎ শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন । যথা শ্রুতিবাক্য — যাহাকে অর্থাৎ যে ভগবান্কে সকল-দেবতা, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বন্দনা করেন । সর্বজ্ঞ ভাষ্যকারও (শিবাবতার আচাৰ্য্য শঙ্করের গুরুদেব) ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মুক্তগণও লীলাবশতঃ শরীর ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন ।]

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও তাঁহার ‘সারার্থ-দর্শিনী’ টীকায় উল্লিখিত স্বামিতীকা ও শ্রীমদ্বাচাৰ্য্য-যুত নিয়লিখিত অত্র শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—

‘মুক্তা স্বেতমূপাসতে । মুক্তানাংপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী’ ইত্যাত্মাঃ ।

‘অমৃতস্ত ধারা বহুদাদোহমানঞ্চরণং’ লোকে সুধিতাং দধাতু ও তৎসং ইত্যাত্মাশ্চ ।’

[অর্থাৎ মুক্তগণ ইহাকে (ভগবান্কে) উপাসনা করেন । ভক্তি নিশ্চিতই মুক্তগণেরও পরমানন্দরূপিণী ইত্যাদি ।

অমৃতের ধারা-স্বরূপ সেই প্রণবব্যঞ্জিত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত বহুপ্রকারে বিগলিত হইয়া জগতে অমৃতত্ব দান করুন ইত্যাদি]

এই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ শাস্ত্রে মুক্তি হইতে ভক্তিরই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ ‘ধর্মঃ প্রোজ্জিতকৈতবোহব্র পরমো’ শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—“অত্র শ্রীমতি সূন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্মো নিরূপ্যতে ইতি । পরমত্বে হেতুঃ প্রাকর্ষণে উজ্জিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ । প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ।

কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্মো নিরূপ্যতে ইতি ।” অর্থাৎ “এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে । পরমত্বে হেতু—প্রকৃষ্টরূপে উজ্জিত (তাত্ত্ব বা বর্জিত) হইয়াছে কৈতব অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিলক্ষণ কপট যাহাতে, সেই ধর্ম । প্র-শব্দদ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে । কেবল ঈশ্বরারাধনলক্ষণাত্মক ধর্মই ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে ।”

‘কৈতব’ শব্দার্থ — ছল, প্রলারণা । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উহাকে ‘অজ্ঞানতমঃ’ ও ‘দুঃসঙ্গ’ বলিয়াছেন । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ভুজকে ‘কৈতব’, তন্মধ্যে আবার মোক্ষাভিসন্ধিকে ‘প্রধান কৈতব’ বলা হইয়াছে—(চৈঃ চঃ আদি ১১০, ১২ এবং মধ্য ২৪১৬) । আবার “দুঃসঙ্গ কহিয়ে ‘কৈতব’, ‘আত্মবঞ্চনা’ । কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অত্মকামনা ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪১৪) । পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন — “ছলনাবিশিষ্ট আত্মবঞ্চকই ‘দুঃসঙ্গ’ । কৃষ্ণ-কাম ও কৃষ্ণভক্তিকামনাব্যতীত অপর সমস্ত কামই ‘দুঃসঙ্গ’ ।” “‘সাধুসঙ্গ’, ‘কৃষ্ণরূপা’, ‘ভক্তির স্বভাব’ । এ তিনি সব ছাড়ায়, করায় কৃষ্ণে ‘ভাব’ ॥” (চৈঃ চঃ ম ২৪১৯) — অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত সাধুজন-সঙ্গ, কৃষ্ণরূপা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি—এই তিনটি বস্তু জীবকে সকল ‘দুঃসঙ্গ’ ছাড়াইয়া কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট করতঃ কৃষ্ণে রতিবিশিষ্ট করেন ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের প্রার্থনামুসারে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু “আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ” (ভাঃ ১৭।১০) শ্লোকের যে একষষ্টি (৬১) প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞানমার্গের উপাসক দুই প্রকার বলিয়া জানাইয়াছেন, যথা — ‘কেবল ব্রজোপাসক’ ও ‘মোক্ষাকাঙ্ক্ষী’ ।

কেবলব্রজোপাসক তিন প্রকার :—‘প্রাপ্তব্রজলয়’, ‘ব্রহ্মলয়’ ও ‘সাধক’ । প্রাপ্তব্রজলয় অর্থাৎ ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত — ব্রহ্মভূত সাধক ভক্তিব্যতীত কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না জানিয়া ভক্তি সাধন করেন । ভক্তিসাধন উপস্থিত হইলে ভক্তির স্বভাব প্রকাশ পায় । সেই স্বভাবক্রমে ভক্তি সাধককে ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া দিব্যদেহ দিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করান । ভক্তদেহ পাইলে কৃষ্ণের সকল

শুণের স্মরণ হয় এবং সেই শুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণের নির্মল-ভজন-সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহাই সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার— ‘মুক্তা অপি লীলয়া’ ইত্যাদি (অর্থাৎ মুক্তগণও লীলাবশতঃ ‘ভক্তদেহ’ লাভ করিয়া সেই অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে নির্মলভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন—এইরূপ) বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ‘ব্রহ্মায়’ — শ্রীশুকদেব ও চতুঃসনাদি। শ্রীব্যাসকৃপায় শ্রীশুকদেব কৃষ্ণশুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজন করিয়াছেন [‘হরেণ্ড’ গাক্ষিপ্তমতিঃ’ (ভাঃ ১।৭।১১) এবং ‘পরিনিষ্ঠিতো-হপি নৈশ্চরণ্যে’ (ভাঃ ২।১।১২) শ্লোক দ্রষ্টব্য।]। চতুঃসনও (সনক-সনাতন-সনন্দ-সনৎকুমার) শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তদশুণাকৃষ্ট হইয়া তদীয় নির্মলভজনরত হইয়াছিলেন [যথা— ‘তস্ত্রা-বিন্দনয়নশ্চ’ (ভাঃ ৩।১৫।৪৩) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে —চতুঃসন পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির পাদপদ্মে মস্তক বিলুপ্তি করিলে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর অর্চিত তুলসীচন্দন-গন্ধযুক্ত বায়ু নাসারজ্জযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মূনিবৃন্দের চিত্তে অতিশয় হর্ষ ও গাত্রে বোমাক্ষ উৎপন্ন করিল অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিরসাপ্লুত হইলেন।]। ‘সাধক’ — জ্ঞানী নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মা-শিব-নারদমুখে কৃষ্ণশুণ শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণশুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ভজন করিয়াছিলেন।

‘মোক্ষাকাঙ্ক্ষা’ জ্ঞানীও ‘মুমুকু’, ‘জীবমুক্ত’ ও ‘প্রাপ্তস্বরূপ’ — এই তিন প্রকার। ‘মুমুকু’ জ্ঞানিগণ শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গক্রমে ভগবৎশুণকৃতি-হেতু মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভজন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে শৌনকাদি ঋষিগণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহাদের ভাঃ ১।১।৪ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন — প্রথমে শৌনকাদি ঋষির সকামকর্ম্মগরত্ব ছিল, পরে রোমহর্ষণ হৃত সঙ্গ নানা পুরাণাদি শাস্ত্রশ্রবণমননাদি দ্বারা তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত হয়। তৎপর রোমহর্ষণহৃত সাধু উগ্রশ্রবঃ হৃতসঙ্গক্রমে ভক্তিরসে স্পৃহা জাগে। যেমন ঋষিগণ অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা-ভরে হৃৎগোষ্ঠামীকে সস্বোধন করিয়া বলিতেছেন —

“হৃত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীবিশদং যশঃ।

যন্তঃ শংসসি কৃষ্ণস্ত মর্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥

কর্ম্মগান্ধিরনাশাসে ধুমুহ্রাস্মনাং ভবান্।

আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু ॥”

— ভাঃ ১।১৮।১১-১২

অর্থাৎ হে সৌম্য হৃত, আপনি অনন্তকাল জীবিত থাকুন, কারণ আপনি মরণশীল মানব আমাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অমৃতস্বরূপ নির্মল যশোগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

আমরা যে যজ্ঞকর্ম্ম করিতেছি, ইহাতে অঙ্গ-বৈশুণ্যাদিজনিত বিঘ্ন-বাহ্যল্যবশতঃ ফললাভের কোন নিশ্চয়তা নাই, এজন্ত ইহা অবিশ্বসনীয়। যজ্ঞীয় ধূমে বিবর্ণশরীর আমাদিগকে আপনি শ্রীগোবিন্দচরণার-বিন্দের মধুর মকরন্দ (অর্থাৎ শ্রীহরির কথামৃত) পান করাইয়া স্নহ করিতেছেন।

“তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥”

— ভাঃ ১।১৮।১৩

অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গী ভক্তগণের সহিত ‘লব’ (নিমেষ-কাল — ১১। সওয়া এগার লবে এক সেকেণ্ড) —মাত্র কাল সঙ্গপ্রভাবে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত আমরা কাম্যকর্ম্মফল-স্বরূপ স্বর্গ ও নির্বিশেষ জ্ঞানফলস্বরূপ মোক্ষের তুলনাও করিব না। যখন স্বর্গ ও মোক্ষেরই তুলনা সম্ভব হয় না, তখন মরণশীল মানবের অতি তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর কি বলিব ?

এইরূপে শুদ্ধভক্তসাধুকৃপায় ভক্তিরসাস্বাদসৌভাগ্যো-দয়ে মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষাদি অতি তুচ্ছ বলিয়া অনুভূত হয়। ভক্তি — ‘মোক্ষলঘুতাক্ষং’ অর্থাৎ মোক্ষকেও তুচ্ছবুদ্ধিকারিণী (ভঃ রঃ সিঃ পৃঃ ১ম লঃ)।

কাহারও কাহারও বা কখনও কৃষ্ণদর্শনে, কখনও বা কৃষ্ণকৃপায় মুমুক্ষা দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং তখন পূর্বাচরিত জ্ঞানপ্রয়াসে বহুকাল বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে, এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয়।

‘জীবমুক্ত’ জ্ঞানী দুইপ্রকার :—(১) ‘ভক্ত্যে জীবমুক্ত’ ও ‘জ্ঞানে জীবমুক্ত’। ভক্ত্যে অর্থাৎ ভক্তিতে বা ভক্তিকলে জীবমুক্তে অবরোহপন্থীভক্ত কৃষ্ণশুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবানন্দ লাভ করেন। আর শুক বা নির্বিশেষ-

জ্ঞানজনিত আরোহণহী জীবমুক্তাভিমানিগণ কৃষ্ণপাদ-
পদ্মে অপরাধফলে অধোগতি লাভ করেন। এই
শ্রেণীর ব্যক্তিগণই কিছুকাল ভক্তির ভাণ দেখাইয়া
পরে নিজেই অবতার সাজিয়া বসেন।

‘প্রাপ্তস্বরূপ’ জ্ঞানী — ভক্তিবলে দিব্যচিদানন্দময়
দেহ লাভ করেন এবং সেই অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণ-
গুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করতঃ কৃষ্ণরূপা
প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তির স্বরূপ বা লক্ষণ এইরূপ
কথিত হইয়াছে, যথা—

“মুক্তিঃ স্বাভাব্যরূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।”

অর্থাৎ “অন্তপ্রকার রূপ পরিত্যাগপূর্বক স্ব-স্বরূপে
ব্যবস্থিতির (বিশেষভাবে অবস্থানের) নামই ‘মুক্তি’।”

‘অন্তপ্রকার হিত্য’ এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রামি-
পাদ লিখিতেছেন — অবিদ্যাদ্বন্দ্বং কর্তৃত্বাদি হিত্য
অর্থ্যাৎ অবিদ্যাদ্বারা অধিরোপিত বা আরোপিত কর্তৃত্ব
পরিত্যাগ পূর্বক। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিতেছেন —
অন্তপ্রকারং মায়িকং স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয়ং হিত্য স্বরূপেণ —
শুদ্ধজীবস্বরূপেণ, কেবাঞ্চিদ ভগবৎপার্ষদরূপেণ চ
ব্যবস্থিতির্মুক্তিরিতি অর্থ্যাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয়
পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধজীব-স্বরূপে (কাহারও কাহারও
ভগবৎপার্ষদরূপে) অবস্থানের নাম — “মুক্তি”।

এইরূপ মুক্ত অবস্থায়ও উপরিউক্ত সাধক, ব্রহ্মময়
ও প্রাপ্তব্রহ্মলয় এবং মুমুকু, জীবমুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ —
এই ছয়প্রকার আত্মারাম কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ভজন
করেন। ইথহুতগুণো হরিঃ। কেবলমাত্র শ্রীভগবানে
ভক্তিশ্রুত বিমুক্তাভিমানী অবিশুদ্ধবুদ্ধি (ভাঃ ১০।২।২৬)
ও শ্রেয়ঃস্মৃতি (স্মৃতি—সরনি বা পথ) ভক্তি পরিত্যাগ-
পূর্বক কেবল অর্থাৎ ভক্তিশ্রুত জ্ঞানলাভার্থ ক্লেশ স্বীকার-
কারী (ভাঃ ১০।১৪।৪) দান্তিক জ্ঞানীই কৃষ্ণবহির্মুখ
হইয়া স্ব-পর-বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপ ভক্তিত্যাগী
“জ্ঞানী জীবমুক্তদশা পাইলু করি মানৈ। বস্ত্তঃ
বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনৈ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২২)।
ভক্তি ব্যতীত জীব কখনই মুক্তির অধিকারী হইতে
পারে না, আবার প্রকৃত মুক্তি পাইলে সেই মুক্ত-
জীব অবশ্যই কৃষ্ণভজন করিবেন। মায়াই (বহিরঙ্গা)
জীবকে কৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষ-দুষ্ট করে। কৃষ্ণভক্তসঙ্ক-
্রমে কৃষ্ণোন্মুখতার উদয়ে জীব সেই মায়া মুক্ত হয়।
মায়ামুক্তজীবই, শুদ্ধভাবে—নিরূপটে কৃষ্ণভজনাধিকার
লাভ করিয়া ধন্য হন। মায়ামুক্ত জীবগণই নিজ-
দিগকে ‘অবতার’ সাজাইয়া কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইবার
হুভাগ্য বরণ পূর্বক আত্মবঞ্চিত হন ও লোকবঞ্চনা
করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের

সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ

[শ্রীমদ্রদা কুমার দাস]

[শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটি মঙ্গলাচরণ-শ্লোক।
ইহাতে স্বাক্ষরে অনেক তত্ত্বের ও অর্থের সমাবেশ
থাকায় অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে ইহার যথাযথ আশ্বা-
দন অতীব দুষ্কর ব্যাপার। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ
ঠাকুর সারার্থদর্শিনী টীকায় রসিক ভক্তগণের চমৎ-
কৃতিসম্পাদনকারিণী পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান
করিয়া শ্লোকটির অর্থগ্রহণ বহুলাংশে সুগম করিয়া
দিয়াছেন। ‘শ্রীচৈতন্যমঠের’ প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতে এই

পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যাই সারমর্ম পাওয়া যায়। তাহা
সংস্কৃত-না-জানা পাঠকের বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে,
সন্দেহ নাই। তথাপি বিস্তৃত মূল টীকাটির অস্থ-
ধাবন করিতে না পারায় অনেক পাঠকের মনে যেন
একটা অভুপ্তি থাকিয়াই যায়। ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গে
এইরূপ অমুতৃত হওয়ায় এবং নিজের অশুশীলনের
ইচ্ছাবশতঃ এই টীকাটির একটি যথাসম্ভব আক্ষরিক
বঙ্গানুবাদ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। নিম্ন-প্রদত্ত অনুবাদটি

তাহারই ফল। ‘শ্রীচৈতন্যবাণী’র পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্ত ইহা কিছুটা কাজে লাগিতে পারে এই ভাবিয়া অনুবাদটা তাঁহাদের সেবার উৎসর্গীকৃত হইল।

এই অনুবাদে টীকাকারের প্রাথমিক মঙ্গলাচরণ ও অবতারণিকা অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। টীকার দ্বিতীয় শাস্ত্রবাক্যসমূহের অনুবাদ অথবা সারমর্ম প্রয়োজন-বোধে কোন কোন স্থলে দেওয়া হইয়াছে—সর্বত্র নহে। তাহা করিলে এই অনুবাদের দৈর্ঘ্য আরও অনেক বাড়িয়া যাইত। অলমতিবিস্তরণে।]

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ —

“জন্মান্তর যতোঽঘ্নাদিতরতশ্চাত্ত্বৈভিজ্ঞঃ স্বরাট
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবসে মুহুর্ন্তি যৎ স্মরয়ঃ।
তেজোবারিমূদাঃ যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো যুধা*
ধায়া শ্বেন সদা নিরন্তরুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
*পাঠান্তর—“ত্রিসর্গোহুযুধা”।

টীকার অনুবাদ

(১) শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতা আচার্য্য-ডামণি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রথমতঃ স্বাভীষ্ট দেবতার ধ্যান-রূপ মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—‘সত্যঃ’ সর্বদেশ-কালবর্তী যে পরমেশ্বর, আমরা তাঁহার ‘পরং’—অতিশয় ধ্যান করি (ধীমহি=ধ্যায়েমঃ=আমরা ধ্যান করি)। ক্রিয়াপদে বহুবচনের ব্যবহার দ্বারা শ্রীব্যাসদেব কাল-দেশ-পরম্পরাগ্ৰাপ্ত সকল জীবকেই নিজের অন্তরঙ্গ করিয়া নিজ শিক্ষাদ্বারা তাহাদিগকে ধ্যানের উপদেশ দিবার জন্তই ক্রোড়ীভূত করিয়া লইতেছেন। ইহা দ্বারা “অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” — এই ব্রহ্মহত্বের অর্থই ফলতঃ বিবৃত হইল; কারণ ধ্যানই জিজ্ঞাসার ফল। সেই স্বাভীষ্টদেবের পরমেশ্বরের কথা বলিতেছেন — ‘জন্মান্তর যতঃ’, এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ধায়া হইতে, তাঁহার ধ্যান করি।

পূর্বপক্ষ। — তবে কি কালের ধ্যান করিতেছেন? (কালের প্রভাবেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, ইহাই এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ভাব)।

তদ্বত্তরে বলিতেছেন — না, ‘অঘ্নাদিতরতশ্চ’ — অঘ্ন ও ব্যতিরেকভাবে, অর্থাৎ ঘটে যেমন মৃত্তিকা অস্থিত আছে কিন্তু মাটিতে ঘটের ব্যতিরেক রহিয়াছে (অর্থাৎ অঘ্ন নাই) সেইরূপ; [কারণের সত্যের কার্যের সত্তা অঘ্ন, কারণের অসত্যের কার্যের অসত্তা ব্যতি-রেক, পরমেশ্বরের সত্যের জগতের সত্তা, পরমেশ্বরের অসত্যের জগতের অসত্তা, এইজন্ত পরমেশ্বরই জগতের উপাদান কারণ—যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান।] ইহা দ্বারা ধ্যেয় বস্তু পরমেশ্বর জগতের উপাদান-কারণ এই অর্থ প্রকাশিত হইল। স্কন্ধে যে চন্দ্র (ইতরতঃ চ) আছে, তাহা দ্বারা তিনি যে জগতের নিমিত্ত-কারণও তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। কারণ, যে কালকে নিমিত্ত-কারণ মনে করা হয়, তাহা সেই পরমেশ্বরেরই প্রভাবস্বরূপ।

অথবা, ‘অঘ্নাৎ’ ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা অল্প-রূপেও হইতে পারে। ‘অঘ্নাৎ’—প্রলয়ে বিশ্ব পর-মেশ্বরে অনুপ্রবিষ্ট (লীন) হয় বলিয়া; ‘ইতরতঃ’ — এবং সৃষ্টিকালে তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া। ক্ষিতি-নামক মহাভূতের অধিষ্ঠান-কারণ যেমন জল, জলের যেমন তেজ, পরমেশ্বরও সেই প্রকার এই বিশ্বের অধিষ্ঠান-কারণ — ইহাই অর্থ। (শাস্ত্রে আছে, সৃষ্টিকালে তেজ হইতে জলের এবং জল হইতে ক্ষিতির উদ্ভব হয়।)

অথবা, ‘অঘ্নাৎ’—কারণরূপে যৎ-কর্তৃক অনুপ্রবেশ বশতঃ এই বিশ্বের জন্ম, কর্মফলদাতারূপে যৎকর্তৃক অনুপ্রবেশবশতঃ স্থিতি ও সংহারক রূদ্ভ-রূপে যৎকর্তৃক অনুপ্রবেশবশতঃ প্রলয় ঘটে, সেই পরম সত্যের ধ্যান করি। এই স্থলে কারণের কার্যে যে সমন্বিতত্ব (ব্যাপ্তি), তাহাই কার্যে অনুপ্রবেশ বলিয়া জানিতে হইবে। পরমেশ্বরের কার্যরূপ বিশ্বের তৎ (পরমেশ্বরের) স্বরূপতা বারণ করিবার জন্ত (শাস্ত্রানুসারে ভগবানের মায়িক রূপ এই বিশ্ব তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন) শ্রীব্যাস-দেব বিশেষতঃ বলিতেছেন ‘ইতরতঃ’—সৃজ্য, পালা ও সংহার্য্য বিশ্ব হইতে স্বরূপশক্তিপ্রভাবে যিনি ভিন্ন, সেই পরমেশ্বর হইতেই এই বিশ্বের জন্মাদি। চন্দ্র

দ্বারা পরমেশ্বর মায়াশক্তিদ্বারা বিশ্ব হইতে অভিন্নও, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে “জন্মান্তর যতঃ” (ব্রঃ ১।১।২) এবং “তত্ত্ব সমধ্বয়াং” (ব্রঃ ১।১।৩) এই দুই ব্রহ্মহুত্রে উক্ত হইল।

পূর্বপক্ষ — পরমেশ্বর বিশ্বের উপাদান হইলে তাঁহার বিকার দুর্ব্বার হইয়া পড়ে (ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ)। অতএব প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান, কিন্তু পরমেশ্বর নিমিত্ত— ইহাই বলুন?

ইহার উত্তর—না, এরূপ বলা যাইতে পারে না। শ্রুতি পরমেশ্বর সম্বন্ধে বলেন—‘যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ’ (মুণ্ডক ১।১।২), ‘তিনি আলোচনা করিলেন—লোক-সমূহ সৃজন করিব’ (ঐ ১।১।১), ‘তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহুরূপে প্রকাশিত হইব’ (ছাঃ ৩।২।৩)। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা চেতনেরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদনহেতু পরমেশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যেহেতু প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি এবং শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ (অর্থাৎ শক্তি শক্তিমান হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে), অতএব প্রকৃতিদ্বারেই পরমেশ্বরের উপাদানত্ব। কিন্তু স্বরূপে পরমেশ্বর প্রকৃতির অতীত বলিয়া তাঁহার নির্বিকারত্বের হানি হয় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(পরমকারণ আত্যন্তিক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত কার্য্যস্বরূপ—) সত্যরূপে প্রতীয়মান এই বিশ্বের উপাদান (ত্রিগুণময়ী) প্রকৃতি, সৃষ্টিকর্তা। পর-পুরুষ ইহার আধার (অধিষ্ঠান), (গুণক্ষোভ-দ্বারা) ইহার অভিব্যক্তিসম্পাদক কাল—এই তিনরূপে আমিই বিরাজ করিতেছি (অর্থাৎ ইহারা আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে) (ভাঃ ১।১২৪।১২)।

প্রকৃতির স্বতন্ত্ররূপে জগদুপাদানত্বই শাস্ত্রের অসম্মত। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকেই স্বতন্ত্ররূপে জগৎকারণ বলা হয়, জড়া প্রকৃতিকে নহে। সুতরাং শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন ‘অর্থেষু অভিজঃ’ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও অসূক্ষ্ম বস্তুদ্বয়েই যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহার ধ্যান করি। ইহা দ্বারা “ঈক্ষতে নীশবদ্” (ব্রঃ ১।১।৫) এই ব্রহ্মহুত্বের অর্থ উক্ত হইল। সেই অর্থ এই — প্রকৃত ব্রহ্মই জগতের কারণ। কিসে? “ঈক্ষতেঃ”, ঈক্ষণহেতু, —জগৎকারণত্ব-

প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহে তাঁহারই বিচারবিশেষায়ক ঈক্ষণের কথা শ্রুত হয় বলিয়া। অতএব ব্রহ্মবস্তু “নীশবদ্”—অশব্দপ্রমাণক নহে বিস্তৃত শব্দপ্রমাণকই বটে। এই বিষয়ে শ্রুতিসমূহ —

“তদৈক্ষত বহু ভান্” (ছাঃ ৩।২।৩);

“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৩।২।১);

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” (ছাঃ ১।১।১);

“তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মান আকাশঃ সত্ত্বতঃ” (তৈঃ আঃ ১);

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” (তৈঃ ভূঃ ১)

ইত্যাদি।

স্মৃতির প্রমাণও আছে—

“যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।

যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যাস্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥”

—সৃষ্টির প্রথমে যীহা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয় এবং প্রলয়কালে যীহাতে ভূতগণ প্রবেশ করে।

পূর্বপক্ষ — আচ্ছা, সেই সময়ে (প্রকৃতির বিকার) মহাদির অল্পপত্তিহেতু তাঁহার ঈক্ষণাদি সাধন ত’ সম্ভবপর হয় না? (অর্থাৎ প্রাকৃত নয়ন-মন ত’ তখনও উৎপন্ন হয় নাই, সেই সময়ে পরমেশ্বর ঈক্ষণাদি ব্যাপার সাধন করিলেন কিরূপে?)।

ইহার উত্তরে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—তিনি ‘স্বরাট্’, স্ব-স্বরূপেই তিনি সেই সেই প্রকারে বিরাজ করিতেছেন (অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতি-বিকারজ করণাদির অপেক্ষা নাই)। স্বৈতান্বিত উপনিষদে (শ্বেঃ ৬।৮) “ন তত্ত্ব কার্য্যং করণঞ্চ বিস্ততে” ইত্যাদি প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—“স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ” (তাঁহার প্রাকৃত দেহেজিয় না থাকিলেও তাঁহার স্বরূপাত্মবিক্রিনী জ্ঞান, বল বা সত্তা ও ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ সধ্বিৎ, সন্ধিনী ও হল্যাদিনীরাপা অপ্রাকৃত শক্তি আছে)।

পূর্বপক্ষ — আচ্ছা জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে ত’ ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য ও ঐশ্বর্যের কথা জানা যায়। শ্রুতি বলেন, “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাঞ্চে ভূতন্ত্ৰ জাতঃ পতিরেক আসীৎ।” অতএব সেই হিরণ্যগর্ভাধ্য ব্রহ্মাই ধোয় হউন?

এতদন্তরে শ্রীভাগবতকার বলিতেছেন—‘তেনে ব্রহ্ম’ ইতি। আদি কবি ব্রহ্মার নিকট যিনি বেদ বা স্বতন্ত্র

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধ্যান করি। ইহা হইতে ব্রহ্মারও পারতন্ত্র্য জানা গেল।

পুনরায় পূর্বপক্ষ — ব্রহ্মার অল্প কাহারও নিকট বেদাধ্যয়নাদির কথা অপ্রসিদ্ধ।

তদন্তরে বলিতেছেন— তাহা ঠিক। কিন্তু পরমেশ্বর সেই বেদ ‘জ্ঞান’—মনের দ্বারাই, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। —

“প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী

বিতম্বতাজন্ত সতীং স্মৃতিং হৃদি।

স্বলক্ষণা প্রাহরভূৎ কিলান্ততঃ।”—ভাঃ ২।৪।২২, *
কিংবা “স্বদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব”—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে এইরূপই জানা যায়।

* [শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়া স্মৃতি বাহ্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, বাহ্যদ্বারা প্রেরিত। বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে (সেই জ্ঞান-প্রদাতৃগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার—শ্রীশুকদেবের—প্রতি প্রসন্ন হউন)। সরস্বতী কথজুতা—‘স্বলক্ষণা’, যিনি শ্রীকৃষ্ণকেই উপাশ্রয় লক্ষ্য করিয়া থাকেন (স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাশ্রয়েন দর্শয়তীতি সা। যজুস্তং ভগবতৈব—“ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তে ধর্মো যন্তাং মদাত্মকঃ” ইতি। { অর্থাৎ ‘সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে মৎস্বরূপ-ধর্মের উপদেশ যে বেদবাণীতে করিয়াছিলাম।’ } —বিখ্যাত ১।)]

ধোয় পরমেশ্বরকে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলায় গায়ত্রীর অর্থও দর্শিত হইল। সেই জন্তই মৎস্রপূরণে উক্ত হইয়াছে—যাহাতে গায়ত্রীকে বিষয়ীভূত করিয়া ধর্ম বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে ব্রহ্মস্বর-বধের বর্ণনা আছে, তাহাকেই ভগবত বলা হয়। পুরাণান্তরেও উক্ত হইয়াছে—যে গ্রন্থে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ও দ্বাদশটি স্কন্ধ আছে, যাহাতে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিজ্ঞা (অশ্বমুখ দধীচি মুনি কর্তৃক প্রবর্তিত নারায়ণ-বন্দ্যধা ব্রহ্মবিজ্ঞা) এবং ব্রহ্মবধ বর্ণিত হইয়াছে, অপিত যাহার সমারম্ভ গায়ত্রী দ্বারা, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে কথিত হয়।

পূর্বপক্ষ — সৃষ্ট ব্যক্তি জাগরিত হইলে যেমন তাহার

স্মৃতি ফিরিয়া আসে, সেই প্রকার নিদ্রান্তে ব্রহ্মাও স্বয়ং বেদ বা তত্ত্বজ্ঞান পুনরায় লাভ করিয়াছেন এই-রূপই সিদ্ধান্ত হউক?

তদন্তরে বলিতেছেন—‘মুহুন্তি যৎ স্বরয়ঃ’, যে বেদে—তদীয় তত্ত্বে—স্মরণগণও (পণ্ডিতগণও) মোহ প্রাপ্ত হন; অতএব সেই বিষয়ে ব্রহ্মার স্বতঃসিদ্ধ শক্তি নাই। ইহা বলায় “নেতরোহনুপপত্তেঃ” (ব্রঃ ১।১।১৬) এই সূত্রের অর্থ বিবৃত হইল।

পূর্বপক্ষ — আচ্ছা, “সত্যং পরং ধীমহি” এই বাক্যে পরমেশ্বর ধ্যানের বিষয়ীভূত হওয়ার তাহার সাকারত অভিপ্রেত হইতেছে। কিন্তু আকারসমূহ ত্রিগুণস্বষ্ট হওয়ার অনিত্য, অতএব পরমেশ্বরেরও অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল?

অতএব বলিতেছেন—“তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ”—তেজ, জল ও স্মৃতিকার যেমন বিনিময় অর্থাৎ বিপর্যায়—অল্প বস্তুতে অল্প বস্তুর অবভাস বা প্রতীতি। অজ্ঞদের তেজে বারিবুদ্ধি, বারিতে স্থলবুদ্ধি, স্মৃতিকার এবং কাণাদিতে বারিবুদ্ধি যেমন মিথ্যা (মৃধা), সেই প্রকার ‘যজ্ঞ’—যে পূর্ণচিন্ময়াকারে—‘ত্রিসর্গঃ’ অর্থাৎ সর্ব, রজঃ ও তমঃগুণের সৃষ্টি এইরূপ বুদ্ধিও মিথ্যা। ভগবদ্বিগ্রহ যে ত্রিগুণাত্মক বা মায়িক নহে, তাহার বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। —

“তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনমুর-
ভূরহতলামীনম্।”—গোপালতাপনী শ্রুতি।

“অর্দ্ধমাত্রাঙ্কো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ।”

—রামতাপনী।

“ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহম্।”

—নৃসিংহতাপনী।

“নির্দোষঃ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতত্ত্বো নিশ্চৈতন্যাত্মক-
শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দ মাত্র মুখপাদসরো-
রুহাদিঃ।”

—ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ।

“নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।”

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

“সর্বো নিত্যঃ শাশ্বতশ্চ দেহান্তস্ত পরাশ্রয়নঃ।

হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ।”

—মহাবরাহপুরাণ।

এতদ্ব্যতীত “স্বৈচ্ছাময়ন্ত ন তু ভূতময়ন্ত”, “ববন্ধ প্রাকৃতং যথা”, “স্বযোব নিত্যস্বধবোধনো”, “শাখং ব্রহ্ম বপুর্দধং”, “সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসমুর্ভয়ঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রবাক্য হইতেও পরমেশ্বরের আকারের অমায়িকত্ব জ্ঞান যায়। আবার “অনিঙ্গিয়া অনাহারা অনিপ্পায়াঃ স্নগন্ধিনঃ। একান্তিনন্তে পুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ।” (নারায়ণীয়ে), “দেহেন্দ্রিয়াস্ব-হীনানাং বিকুণ্ঠপূরবাসিনাম্” (সপ্তমন্ধকে)—এই সকল বাক্য হইতে শ্বেতদ্বীপ ও বিকুণ্ঠপূরবাসী তদীয় ভক্তগণেরও সাকারত্বের কথা জানা যায় এবং ‘অনিঙ্গিয়াঃ’ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের মায়িক আকারত্বের নিবেদনও দেখা যায়। সুতরাং ভগবদাকারের অমায়িকত্ব সংশয় কি?

পূর্বপক্ষ — যদি বল, তথাপি ত’ কেহ কেহ এই বিষয়ে বিবাদ উত্থাপন করেন?

তাহাতে শ্রীভাসদেব বলিতেছেন—‘ধামা’ ইত্যাদি। ‘ধামা’—স্বরূপশক্তিদ্বারা, অথবা স্বভক্তনিষ্ঠ যে নিজ-বিষয়ক অমুভব তাহার প্রভাবে, অথবা পদে পদে যাঁহা হইতে মাধুর্য ও ঐশ্বর্য্য সমুচ্ছলিত হয়, সেই ‘স্বেন’—অসাধারণ স্বীয় শ্রীবিগ্রহ দ্বারা, ‘সদা’—কালত্রয়েই ‘নিরন্তকুহক’—নিরন্ত হইয়াছে কৃতকনিষ্ঠব্যক্তিগণ (কুহকাঃ) যদ্বারা, যৎকর্তৃক,—অর্থাৎ যিনি স্বীয় স্বরূপ-শক্তি দ্বারা অথবা ভক্তনিষ্ঠ অমুভবপ্রভাবে কৃতকিক-গণকে নিরাস করিয়াছেন—এমন যে সত্য-স্বরূপ পর-মেশ্বর, তাঁহার ধ্যান করি। ইহা দ্বারা “তর্কাপ্রতি-ষ্ঠানাং” (ব্রঃ ২।১।১১) এই ব্রহ্মহত্যের অর্থ স্থচিত হইতেছে। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য শুশ্রুষ আত্মা বিরূণুতে তনুং স্বাম্” (মুঃ ৩।২।৩) এই শ্রুতিতে স্ব-শব্দের দ্বারা তনুর স্বরূপভূতত্ব লক্ষ্য হইতেছে। আবার প্রকৃতিক্ষেপভেদে পূর্বেই “বহু ভ্রাম্” (ছাঃ ৬।২।৩), “স ঐক্ষত” (ঐ ১।১।১) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাঁহার মনোনয়নাদির অমায়িকত্ব জ্ঞান যাইতেছে। “পরাস্ত শক্তিবিরোধে প্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (শ্বেতঃ ৩।৮) এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহার শক্তির স্বাভাবিকত্ব প্রকটভাবেই উক্ত হইয়াছে। “অচিন্ত্যাঃ থলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্॥”

(মহাভাঃ ভীষ্ম-পর্ব) এই বাক্যে ‘ন যোজয়েৎ’ কথাটিতে বিধিলিঙের প্রয়োগ হেতু কৃতকের অবতারণা নিষিদ্ধ হইয়াছে। “পরদারান্ ন গচ্ছেৎ” (পরদার গমন করিবে না) এই বাক্যে যেমন নিবেদন বুঝায়, ‘ন যোজয়েৎ’ এই কথায়ও তেমনি নিবেদন বুঝায়। এই সব শাস্ত্রবাক্য-সম্বন্ধে যদি অল্পাদি তাঁহার শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া যুক্তিশর সন্ধান করিতে ইচ্ছা করে এবং তাহার ফলে নরকেই পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাই হউক। তাহাদের সঙ্গে সংলাপের প্রয়োজন নাই।

(২) এই ভাগবতশাস্ত্রে বলা হইয়াছে “দশমন্ত বিপ্ত-দ্ব্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্”; অতএব দশম যে আশ্রয়তত্ত্ব, তাহারই অঙ্গ অর্থাৎ প্রাধান্য (বাকী নয়টা) তত্ত্ব তাহার অঙ্গ। আবার শ্রীকৃষ্ণরূপেই আশ্রয়-তত্ত্বের মূখ্যত্ব। এই কারণে ভাগবতের এই প্রথম পত্রে তাঁহার অসা-ধারণ ধর্মের প্রস্তুতিও (বর্ণনা, প্রকৃষ্টজ্ঞতিও) উচিত বটে। অতএব এই শ্লোকের তদেকপর ব্যাখ্যাস্বরের অবকাশ আছে। নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাক্যগুলি হইতে শ্রীকৃষ্ণই যে আলোচ্য শ্লোকে উদ্দিষ্ট (“সত্যং পরং”), তাহা প্রমাণিত হয়—

শ্রীকৃষ্ণজন্মবৃত্তান্তের আরম্ভে ভাগবতে (১০।২।২৬) “সত্যব্রতং সত্যপরম্” বলিয়া আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে “সত্যাত্মকং যাং শরণং প্রাপন্নাঃ।” মহাভারতে উত্তোগ-পর্বে শ্রীকৃষ্ণনামসমূহের নিরুক্তি প্রসঙ্গে সঞ্জয় বলিয়াছেন—“সত্যো প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যং সত্যঞ্চ গোবিন্দ স্তম্মাং সত্যো হি নামতঃ॥” ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন—“সত্যং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম।” গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—“তন্মাং কৃষ্ণ এব পরো দেবন্তং ধ্যায়েৎ।”

(অতঃপর) ‘স্বেন ধামা’—শ্রীমথুরাধ্য ধাম দ্বারা এবং প্রকটলীলাকালে (তদানীং) রূপাপূর্বক সর্বত্র দর্শিত শ্রীবিগ্রহদ্বারা যাঁহা কর্তৃক ‘কুহক’, জীবসমূহের অবিভা, নিরন্ত হইয়াছে; তাঁহার ধ্যান করি। এতৎসম্পর্কে নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাক্যসমূহ দৃষ্ট হয়—

“মধ্যাতে তু জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎ-সারভূতং যদ্ যন্তাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥”

— গোপালোত্তরতাপনীতে প্রসিদ্ধ।

“শ্রবণাং কীৰ্ত্তনাক্যানাং পুষ্পস্তব্ধস্তবসামিনঃ। তব ব্রহ্মময়শ্চৈব কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ॥” — ভাঃ ১০।৭০।৪৩।

“গৃহ-দেহ-ষিট্-প্রভাবা-ধামানীত্যমরঃ” — অমরকোষ অভিধান মতে গৃহ, দেহ, জ্যোতিঃ, প্রভাব এইগুলি ধাম শব্দের অর্থ।

পূর্বপক্ষ — যদি বল — শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রাপক্ষিক লোকের দৃশ্য এবং বাহ্য বাহ্য দৃশ্য, তৎসমস্ত ঘটবৎ অনিত্য, — এই ন্যায়ানুসারে সেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল ?

তদ্বত্তরে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—যাহাতে তেজ, বারি ও মৃত্তিকা এই তিনটি দৃশ্যভূত বস্তুর যথাযথ (যথা = যথাবৎ = যথাযথ) ‘বিনিময়’ অর্থাৎ পরস্পর মিলন আছে, সেইরূপ (ত্রিসর্গঃ) ত্রিগুণসৃষ্ট (প্রাপক্ষিক) দেহ ‘মুখা’, মিথ্যাই; আবার, যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে সেইপ্রকার ত্রিগুণসৃষ্ট বলে সে মিথ্যাই বলে না (অর্থাৎ নিজ বিকৃত উপলব্ধি অনুসারে সে সত্যই বলে)। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রাপক্ষাতীত বস্তু হইলেও প্রাপক্ষিক অস্বরগণ কর্তৃক তাঁহার যে দর্শন, তাহা তন্মাধুর্য্যের অল্পভববিহীন — পিতৃদুঃখিত-রসনাযুক্ত ব্যক্তির রসনায় যেমন মিছুরির মিষ্টত্ব অনুভূত হয় না সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাসাদিকা হস্তক-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই ইহার কারণ। সেই অস্বরগণ ব্যতীত অত্র জনগণের

তদর্শন তাঁহার হস্তকরূপপ্রভাবে তন্মাধুর্য্যের অল্পভববৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভাগবতের (১০।৮৬।২১) — “অন্তে চ তন্মুখসরোজমুদারহাসনিষ্কেক্ষণং নৃপ পপূর্দৃশিভিন্-নাথ্যঃ। তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিশ্রদৃগ্ভ্যাঃ ক্ষেমং ত্রিলোক-গুরুবর্ধদৃশঞ্চ যচ্ছন।” — এই উক্তি হইতে তিনি অদৃশ্য হইলেও তাঁহার যে দৃশ্য, তাহা তাঁহার রূপারই মতৈ-স্বৰ্থ জানাইতেছে, ইহাই জানিতে হইবে। অতএব ভাগবতানুযাতে এই নারায়ণাধ্যাত্ম-বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে— “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্ দৈক্ষ্যতে নিজ-শক্তিভ্যঃ। তামুতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥” — ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও তাঁহারই নিজশক্তিতে তিনি দৃষ্ট হন। তদ্ব্যতীত পরমানন্দমুক্তি সেই অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায়? তত্ত্বতা কারিকায়ও উক্ত হইয়াছে — তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্যা স্বয়ং প্রকাশ-শক্তি দ্বারা নেত্রে অভিব্যক্ত হন, কিন্তু (প্রাপক্ষিক বস্তুর মত) নেত্রের বিষয়ীকৃত হন না। “তাংসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী হি” — ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, তদ্ব্যমাদি ব্রহ্মভূত হইলেও এইরূপেই তাহাদের দৃশ্য। অতএব ভাগবতভিজ্য ব্যক্তিগণ চিত্তিঃ বাহ্য বাহ্য দৃশ্যবস্তু, তাহা ঘটবৎ অনিত্য বলিয়া অনুমান করেন (অনুমিত)।

ক্রমশঃ

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোত্তানন্দ মূল শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ ও সমগ্র ভারতবাণী তৎশাধামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগি গোস্থামী শ্রীমদভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকন্ঠে পূর্ব পূর্ব বর্ষের জায় এবারও শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব শ্রীশ্রীগৌরানন্দরূপায় মহাসমা-রোহে নির্বিঘ্নে স্ফুটমান হইয়াছে। পূঃ আচার্য্যদেব শ্রীমৎ তীর্থমহারাজ ও ভারতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদিগি-বতিগণসহ গত ৮৩ তারিখে বোলপুর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করেন। শ্রীমদভক্তিবিকাশ হরীকেশ মহা-

রাজ, শ্রীমদভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রমুখ সেবকগণও বোলপুর হইতে ৯৩ তারিখে আসিয়া যোগদান করেন। ঐ দিবস (৯৩।৭৬) সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ঠাকুরদাস প্রভু অনেকক্ষণ যাবৎ অধিবাস কীর্ত্তন করেন। নাটমন্দিরে মহতী সভার অধিবেশন হয়। পূঃ আচার্য্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীমদভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মহাত্ম্য গ্রন্থের ১ম হইতে ৩য় অধ্যায় পাঠ করেন। পরিক্রমা সময়ে অষ্টাদশাধ্যায়-অন্য এই ধামমহাত্ম্যগ্রন্থ নিয়মিত ভাবে তদ্বারা সম্পূর্ণ-রূপেই পঠিত হয়। পূঃ আচার্য্যদেব শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও

ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহাদের অষ্টৈতুকী
রূপাপ্রার্থনামূলে শ্রীধাম-পরিক্রমণার্থ সমাগত ভক্তবৃন্দকে
সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং ভক্তিবিশ্ববিনাশন
ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে, মহোৎসবের নির্বিঘ্ন
পরিসমাপ্তি প্রার্থনা পূর্বক সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতঃ
সংক্ষিপ্তসার বর্ণনামুখে শ্রীধামতত্ত্ব, শ্রীধামপরিক্রমার
উদ্দেশ্য, বিধি, পরিক্রমাকালে অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী
প্রভৃতি কীর্তন করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্ত্য-
লোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী
মহারাজ তথা শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃদীকেশ মহারাজ ও
শ্রীগৌরনাম গৌরধাম ও গৌরমনোহভীষ্টসেবা সম্বন্ধে
কিছু কিছু বলিলে নামসংকীর্তন-মুখে অধিবাস-কীর্তনোৎ-
সব সুসম্পন্ন হয়।

১০।৩।৭৬ বুধবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়।
প্রথম দিবসেই প্রায় সংসারিক যাত্রীর সমাগম দেখা
যায়। প্রত্যহ সকাল ৭টা বা ৭।১৫টা পরিক্রমা বাহির
হয়। প্রথম দিবস—আত্মনিবেদনাধ্য ভক্তাঙ্গ যজ্ঞস্থল
অন্তর্দীপ পরিক্রমা। শোভাযাত্রার পুরোভাগে মঠনামাক্তিত
পতাকা, তৎপশ্চাৎ বাণপাটী, তৎপশ্চাৎ সুন্দর সুসজ্জিত
শিবিকারোহণে শ্রীমদ্ব্যগ্রপ্রভু ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তদনু-
গমনে শ্রীমঠের উদ্বগুনর্তনকীর্তনরত সঙ্কীর্তন-সজ্জ, তৎ-
পশ্চাৎ রঞ্জিত পতাকাহস্তে অগণিত নরনারী ভক্তবৃন্দ।
শোভাযাত্রা শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে প্রথমে
শ্রীনন্দনাচাৰ্য্যভবন পরিক্রমণান্তে যোগপীঠে গমন করেন।
তথায় শ্রীমদ্ব্যগ্রপ্রভুর বড় মন্দির, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
মন্দির, নিম্বরক্ষ, শিশুনিমাইএর মন্দির, শ্রীক্ষেত্রপাল
শিবমন্দির ও শ্রীনৃসিংহমন্দিরাদি প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া
যোগপীঠপ্রাক্ষণে আসিয়া বসি হয়। এখানে শ্রীল
আচার্যদেব শ্রীধামমাংগা হইতে শ্রীঅন্তর্দীপমাংগা
কীর্তন-মুখে ঈশোত্তানমাংগা বিশেষভাবে কীর্তন
করেন। পরে শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ ও শ্রীমদ্-
ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীযোগপীঠ মাংগা কিছু
কিছু বলেন। শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের
সুললিত কীর্তন খুবই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। এখান
হইতে শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅষ্টৈতবন ও শ্রীগদাধর অঙ্গন

যথাক্রমে পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে যাওয়া হয়।
শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণান্তে শ্রীমৎ
পুরী মহারাজ উক্ত স্থানত্রয়েরই মাংগা পাঠ করেন।
শ্রীচৈতন্যমঠে প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী
শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন বন্দনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের
সমাধিমন্দিরে যাওয়া হয়, তথায় গুরুষ্টককীর্তনমুখে
বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে মন্দির সমক্ষে
বসিয়া ‘শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ’ ও ‘গুরুদেব, রূপাবিন্দু দিয়া’
প্রভৃতি পদাবলী কীর্তন করিতে করিতে গুরুদেবের
রূপ প্রার্থনা করা হয়। এস্থান হইতে শ্রীল গৌর-
কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদক্ষিণ ও
বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের মূল উনত্রিশ চূড়ার মন্দির
প্রদক্ষিণ করা হয়। মন্দিরের চারিকোণে চারিটি
মন্দিরে দক্ষিণাবর্তক্রমে শ্রীমদ্ব্যগ্রপ্রভু ও শ্রীচতুর্ভু-
ব্রজা, শ্রীমদ্বিকৃষ্ণামিষাদ ও শ্রীকৃষ্ণদেব, শ্রীমদ্বিশ্বাদিত্য ও
শ্রীচতুঃসন এবং শ্রীমদ্ব্যগ্রপ্রভু ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর
শ্রীমূর্তি এবং মূল মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীগৌরানুগত-গোড়ীয়া-
রাধ্য শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দগান্ধিকাগিরিধারীজিউর নিত্যসেবা
বিরাজিত। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতীক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্থানী প্রভুপাদ ঐ সেবা স্বয়ং প্রকট
করিয়া গিয়াছেন। মন্দির-সমক্ষে শ্রীঅবিভাহরণ নাট-
মন্দিরও তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়া
মঠাধ্যক্ষ আচার্যদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটকালীয়
স্বতিতে বিহ্বলচিত্ত হইয়া ভক্তবৃন্দসহ অনেকক্ষণ যাবৎ
ঐ নাটমন্দিরে নৃত্যকীর্তন করতঃ শ্রীগৌরপার্বদ হনু-
মদবতার শ্রীমুরারিগুপ্ত ভবনভিমুখে যাত্রা করেন।
এখানে একটি মন্দিরে শ্রীদীতারাম ও শ্রীহনুমানজীর
নিত্যসেবা বিরাজিত। শ্রীমন্দির পরিক্রমণ, বন্দন ও
স্থানমাংগা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ এস্থান হইতে শ্রীশ্রীগুরু-
গৌরানুগত্যে বরাবর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়া
মঠে প্রত্যাবর্তন করত মহাপ্রসাদ সন্মান করেন।
সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে সভার
অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে
শ্রীপাদ হৃদীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভ্রমর তীর্থ মহারাজ,

শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদ্ভক্তানিলয় ব্রহ্মচারীজী যথাক্রমে আত্মনিবেদনাধ্য ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। পরিশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব অত্কার পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য কীর্তন-মুখে বলেন — শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদনের উপরই অত্যান্ত সকল ভক্ত্যঙ্গ যাজনের গুরুত্ব নির্ভর করে। আমরা যেন অত্কার বিষয়ের গুরুত্ব অনুক্ষণ হৃদয়ে অবধারণ করি। অতঃপর তিনি আগামীকাল্যাকার পরিক্রমার প্রোগ্রাম (অনুক্রম) জ্ঞানাইয়া যাত্রাগণকে প্রোৎসাহিত করেন। তৎপর শ্রীমদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজও অত্কার বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিলে ‘আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি,’ ‘এখন বুঝিছ প্রভো তোমার চরণ’ প্রভৃতি ‘শরণাগতির’ গীতি ও মহামন্ত্র কীর্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। যাত্রাগণ প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

১১।৩।৭৬ বৃহস্পতিবার—পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস—প্রাণাধ্য ভক্ত্যঙ্গসম্বন্ধে শ্রীসীমন্তদীপ পরিক্রমা। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-রাধামদনমোহনচরণ বন্দনা করিয়া প্রথমে বৃদ্ধশিব ঘাট মহাপ্রভুর নিজঘাট, মাধাইএর ঘাট ও বারকোণাঘাট পরিক্রমা করি। মহাপ্রভুর ঘাট-তটে ঐ চারিঘাটের মাংগায়া কীর্তন করা হয়। অতঃপর শ্রীল জয়দেবের শ্রীপাটহলে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক পশ্চিমধ্যে একস্থানে গঙ্গানগরোদ্দেশে গঙ্গানগরের এবং পৃথুগুণ্ড বা বঙ্গালগৌড়িকা প্রভৃতির মাংগায়া কীর্তন করা হয়। এস্থান হইতে বঙ্গালটিবি দেখা যায়। ইহা প্রাচীন নবদ্বীপের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমরা এস্থান হইতে বিষ্ণুকরিণী অভিমুখে যাত্রা করি। পশ্চিমধ্যে একস্থানে সীমন্তদীপে শ্রীসীমন্তিনীদেবীর গৌরপদ-ধূলি সীমন্তে ধারণমাংগায়া পাঠ করা হয়। তথা হইতে আমরা বরাবর বিষ্ণুকরিণীতে বা বেলপুকুরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর গৃহে গমন করি। এখানে একটা জীর্ণ কুটীরে তৎসেবিত শ্রীমদন-গোপাল শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও বন্দনান্তে আমরা ঐ কুটীর-প্রাঙ্গণে স্থগীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করি। শ্রীধাম-মাংগায়া হইতে বিষ্ণুকরিণী-মাংগায়া কীর্তিত হইলে প্রথমে পূজাপাদ দ্ব্যেক্ষ মহারাজ ও তৎপর শ্রীমৎ তীর্থমহারাজ

ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন। শ্রীমদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ কীর্তন করেন। এখানে পরিক্রমার যাত্রাগণ মঠবাসি-ভক্তগণোদ্দেশে প্রচুর ডাব, বেল ও কলা অর্পণ করেন। আমরা এস্থান হইতে শোনডাঙ্গার যাই এবং গড়াই মহাশয়দের গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে নিষবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করি। তথায় শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে প্রতিবৎসর কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। এস্থান হইতে আমরা শ্রীজগন্নাথমন্দিরভিমুখে যাত্রা করি। পশ্চিমধ্যে একটি আমবাগানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়, সেই সময়ে তথায় মেবারচরের মাংগায়া বলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পৌছিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথবলদেবসুভদ্রাজীউর প্রাচীন মূর্তি দর্শন, শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় পরিক্রমা ও মাংগায়া কীর্তন করা হয়। শ্রীমন্দির সমক্ষে একটি ছোট নাট-মন্দির নির্মিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দ অনুভব করিলাম। প্রাচীন সেবাট সংরক্ষণার্থ যাত্রাগণের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু প্রণামী দিলেন। আমরা এস্থান হইতে সকলে শ্রীশ্রীধামদনে যাই। তথাকার সেবার অবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা বাজিল। এমন সুন্দর মন্দির, সেবকগণ, ফলফুলের বৃক্ষাদি সকলই পাণিষ্ঠ চোর-দস্যুগণের উৎপীড়নে নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। মানুষের এতই হীনপ্রবৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে যে ঠাকুরসেবাও রাখিতে দিবে না! এমনই কলির প্রভাব! ভক্তরাজ শ্রীধরের মাংগায়া শ্রাবণ করিয়া আমরা ক্রমশঃ ভক্ত চাঁকাজীর সমাবস্থলে উপস্থিত হই। প্রায় পাঁচগত বৎসরের গোলোকচাঁপা বৃক্ষ এখনও প্রাচীন নবদ্বীপের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এখানে যাত্রাগণের মধ্যে এক ভক্ত প্রচুর বাতসা ভোগ দিলেন, সকলকেই প্রদাদ বিতরণ করা হইল। এখানকার মাংগায়া কীর্তন করা হইলে আমরা এখান হইতে বরাবর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করি, পৌছিতে বেলা প্রায় ৩টা বাজিয়া যায়।

সন্ধ্যারাত্তিকের পর পূর্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে পূজাপাদ আচার্য্যদেব, ক্রমশঃ তন্নির্দেশানুসারে

শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীধামবৃন্দাবনের শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, উদালা শ্রীবার্ধভানবী-দয়িত গোড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ গিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রবণভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ পরিক্রমার তৃতীয় দিবসের প্রোগ্রাম বলিয়া দিলে শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী উপসংহার সঙ্গীত কীর্তন করেন।

১২।৩।৭৬ শুক্রবার—পরিক্রমার তৃতীয় দিবস একাদশী শ্রীহরিবাসর—অত্র কীর্তনাধ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোক্রম-দ্বীপ ও স্রবণাধ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীমধাদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসুরভিকুঞ্জ, শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, আমঘাটা, স্রবণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারানসী, দেবপল্লী প্রভৃতি শ্রীগোক্রম-দ্বীপান্তর্গত। আশ্রমট বা আমঘাটার প্রতিদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আশ্রমহোৎসব লীলাকথা শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৭শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। মধ্যদ্বীপ অপভ্রংশ ভাষায় মাজিনা বলিয়া কথিত হয়। এই দ্বীপে সপ্তর্ষি (সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু)-ভজনস্থলী, নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণপুষ্কর, উচ্চহট্ট (হট্টডাঙ্গা বা হাটডাঙ্গা বা কুরুক্ষেত্র) ইত্যাদি বর্তমান আছে। ইহা শ্রীবিষ্ণুস্রবণের পীঠস্থান বলিয়া ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ স্রবণাধ্য ভক্তিধারী শ্রীমুসিংহদেবের রূপা এইস্থানেই লাভ করিয়াছেন, ইহা বলা হইয়া থাকে। আমরা প্রাতে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির বন্দনা করিয়া পূজাপাদ আচাৰ্য্যদেবের আনুগত্যে বিরাট সঙ্কীৰ্ত্তনশোভাযাত্রাসহ পরিক্রমায় বাহির হই। অত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরেই অবস্থান করিতেছেন। আমরা প্রথমে শ্রীপাদ যাবাবর মহারাজের শ্রীভাগবতমঠ, তৎপর শ্রীপাদ মধুদন মহারাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ বন্দনা করিয়া শ্রীবৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপালমন্দিরে উপনীত হই। তথায় শ্রীক্ষেত্রপাল শিব জিউর পূজা ও প্রণতিবিধান পূর্বক আমরা তথা হইতে ক্রমশঃ শ্রীসরস্বতী নদী পার হইয়া শ্রীগোক্রম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হই। অস্মদীয় সতীর্থ শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ তাঁহার সংকীৰ্ত্তনসম্বসহ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জাভ্যন্তরে নৃত্যকীর্ত্তনরত থাকায় আমরাদিগের শ্রীকুঞ্জপ্রবেশে একটু বিলম্ব

হইয়া গেল। তাঁহার বাহির হইয়া গেলে আমরা শ্রীকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীসমাধিমন্দির বার-চতুষ্টয় পরিক্রমণান্তে নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হই। পূজাপাদ আচাৰ্য্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হরীকেশ মহারাজ কীর্ত্তন করেন, অতঃপর শ্রীল আচাৰ্য্যদেব শ্রীকুঞ্জ-মাংগল্য কীর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-লেখনীগ্ৰন্থত শ্রীগোক্রম-মাংগল্য পাঠ করেন। অতঃপর আমরা এখান হইতে শ্রীস্রবণবিহার গোড়ীয় মঠে যাই, তথায় শ্রীস্রবণবিহারী গৌরহরির মন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ মন্দির সান্নিধ্যে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করা হয়। এই সময়ে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাংগল্য পাঠ করেন। তৎপর এখান হইতে বরাবর দেবপল্লী গমন করিয়া তথায় ভক্তবৎসল শ্রীমুসিংহপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দন করা হয়। আমরা উপস্থিত হইবার পূর্বেই সতীর্থ শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সংকীৰ্ত্তনসম্বসহ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এজ্ঞ আমরাদিগকে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অতঃপর আমরা শ্রীল আচাৰ্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করতঃ শ্রীমুসিংহপাদপদ্মে সাক্ষাৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক বিশাল তিস্তিডী বৃক্ষ-চ্ছায়ায় উপবেশন করি। এই সময়ে শ্রীল আচাৰ্য্যদেব স্বয়ং ভাবগদগদচিত্তে ভক্তিবিশ্ববিনাশন শ্রীশ্রীমুসিংহদেবের অষ্টৈতুকী রূপা প্রার্থনামুখে কিছুক্ষণ ভাষণ দান করিলে তন্নির্দেশানুসারে শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হরীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী কিছু কিছু বলেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাংগল্য পাঠ করিয়া শুভান। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচাৰ্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীমুসিংহপাদপদ্ম পূজা করত ফলমূল-মিষ্টান্নাদিসহ পরমাশ্রমে নিবেদন করেন। (পরমাশ্রম

ভোগ পৃথগ্ভাবে রক্ষা করতঃ শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া গিয়া পরদিবস উহা দ্বারা দ্বাদশীর পার্বণ সম্পাদন করা হয়।) অতঃপর আমরা শ্রীনৃসিংহদেবের কলমূলাদি প্রসাদ দ্বারা শ্রীএকাদশী-রাতের অন্নকল্ল বিধান করি। তৎপর অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় আমরা শ্রীনৃসিংহপাদপদ্ম বন্দনা করতঃ শ্রীহরিহরক্ষেত্রে যাই। এখানকার পূজারী শ্রীভূগাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন—তঁাহারা কৃষ্ণনগর রাজবংশের ৭৬ পুরুষের পুরোহিত। এই শ্রীহরিহর-ক্ষেত্রেই কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদি বসতবাটা। শ্রীহরিহর রাজবংশের আদি সেবা। মন্দিরটি জরাজীর্ণ। মহারাজী জ্যোতির্ময়ী দেবী হরিহরকে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলে স্বপ্নে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প স্থগিত রাখেন। রায় বাহাদুর মহারাজ ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায়েরই মহিষী জ্যোতির্ময়ী দেবী। ক্ষৌণীশচন্দ্রের পিতা বোধকরি ক্ষিতীশ চন্দ্র। শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী ঐ মন্দির সংস্কারার্থ ১০০০০ দশহাজার টাকা দান করেন। কিন্তু কন্টাক্টর লোভে পড়িয়া বহু মুদ্রা আত্মদান করতঃ অতিভয়ঙ্কর দেবস্বাপহরণ-পাপলিপ্ত হন এবং অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত ও নির্লংশ হন। জ্যোতির্ময়ী দেবী এখনও নাকি জীবিতা আছেন, কিন্তু সংজাহীনা হইয়া মৃতপ্রায়া। শ্রীহরিহর খুব জাগ্রত ঠাকুর, প্রতিবৎসর ইঁহার এবং অগ্ন্যস্ত্র বিগ্রহের অঙ্গ-রাগ সম্পাদিত হয়। শ্রীহরি ও হর মিলিত তহু। শ্রীহর শ্রীহরির পরমপ্রিয়তম ভক্ত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—‘গুরুভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্ত চ শ্রীভগবতাসহ অভেদত্বং তৎপ্রিয়-তমত্বেনৈব বীক্ষন্তে’ অর্থাৎ গুরুভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের শ্রীভগবানের সহিত অভেদত্ব তৎপ্রিয়তমত্ব হেতু বলিয়াই বিচার করিয়া থাকেন। যাহা হউক হরিহর বড় সুন্দর দর্শন। একই শ্রীবিগ্রহের এক অর্দ্ধ অঙ্গে তুলসীদল ও অপরাধে বিরদল দ্বারা পূজা হয়। শ্রীভুবনেশ্বর শিবও এই প্রকার হরিহর মিলিত তহু। এখানে শ্রীহরিহরের বামে পার্শ্বতী দেবী, তাঁহার বামে বুড়োশিব, হরিহরের দক্ষিণে মহালক্ষ্মী দেবী, নিম্নে সম্মুখভাগে মঙ্গলচণ্ডী, তাঁহার বামপার্শ্বে

শ্রীমদনমোহন, তাঁহার বামে পঞ্চশিবলিঙ্গ, মদন-মোহনের সম্মুখে মধ্যবিষ্ণু শ্রীগদাধর বিষ্ণুপাদপদ্ম (দক্ষিণ পদচিহ্ন), উক্ত পঞ্চশিবলিঙ্গ সম্মুখে শ্রীশীতলা দেবী, সিংহাসনের দুই পার্শ্বে শ্রীজলেশ্বর শিব, পূর্বাদিকে শ্রীজগন্নাথ দেব। এই মন্দিরের পূর্বাদিকে আর একটি ছোট ভগ্নমন্দিরে শ্রীধনুমান্জী, শ্রীসিদ্ধিদাতা গণেশ এবং চতুর্ভুজ কুকুরবাহন কালভৈরব বিরাজিত। পূজারাজী বলিলেন—হরিহর মিলনে ৩৩ কোটি দেবতা মিলিত হন। শ্রীমনসা দেবী, সূর্য্যদেব, বিশ্বনাথ, বহুকালের শ্রীদামোদর শালগ্রাম, কুর্মদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি ১০৮ মূর্ত্তি শালগ্রাম আছেন। মহারাজের সময়ে কোন্ কোন্ বিগ্রহ ও পরবর্ত্তিকালে কোন্ কোন্ বিগ্রহ মিলিত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শ্রীভবানন্দ মজুমদার—যাঁহার গৃহে সাফাৎ শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী আবিস্কৃত হইয়াছিলেন, সেই ভবানন্দের দোহিড়ি সন্তান মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। মন্দিরের পিছন দিকে আজও সেই ভবানন্দের ভিটা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ ভিটার অনেকাংশ জবর দখল হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ক্রমশঃ লুপ্ত না হইয়া যায়, তৎপ্রতি মাননীয় সরকারের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীহরিহরক্ষেত্রের এই প্রাচীন জরাজীর্ণ মন্দির যাহাতে পুনরায় উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়া বঙ্গের স্প্রাচীন ব্রাহ্মণরাজবংশের লুপ্তপ্রায় গৌরব পুনরুজ্জীবিত ও অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি আমরা ভারত সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমরা শ্রীধামমাংগ্ধ্যা হইতে শ্রীহরিহরক্ষেত্র-মাংগ্ধ্যা পাঠ করিয়া এখান হইতেই শ্রীমধ্যদ্বীপ মাংগ্ধ্যা পাঠ সমাপ্ত করতঃ উদ্দেশ্যে মধ্যদ্বীপকে প্রাণাম জ্ঞাপন করি এবং শ্রীঅলকানন্দার জল মস্তকে দারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যগোড়ায়মঠাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি। পশ্চিমমধ্যে পুনরায় শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ বন্দনা করতঃ সরস্বতী পার হইয়া শ্রীমঠে উপস্থিত হই। রাত্রিতে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে ভাবণ দান করেন। শ্রীপাদ হরীকেশ মহারাজ কীর্ত্তন করেন। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন

১৩৮২ বঙ্গাব্দ গত হইয়া অগ্নি ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের শুভারম্ভ ১লা বৈশাখ—মহাপূর্ণিমা। ‘Morning shows the day’—চারায়ুসারে অগ্নি শ্রীমধুপূর্ণিমা—শ্রীবলরামের রাসযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের বসন্তরাস এবং শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীমানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব-স্মৃতি-মুখে আমাদের নববর্ষের শুভারম্ভ বিধোবিত হইলেন। আমরা এই শুভদিনে আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণীর গ্রাহক গ্রাহিকা—পাঠক-পাঠিকাবর্গ—সকলকেই আমাদের নববর্ষের হার্দ্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণারবিন্দে একান্ত বর্দ্ধমান অনু-রাগই আমাদের প্রতি-দিন-ক্ষণ-মাস-বৎসর-ব্যাপিয়া—কেবল একজীবনের জন্ত মাত্র নহে,—অনন্ত জীবনের এক-মাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। অনন্তকল্যাণগুণসমুদ্র শ্রীভগবান্‌ই আমাদের প্রকৃতকল্যাণবিধাতা। আমি মূর্খাদপি মূর্খ হইয়াও—অবিচার মধ্যে নাকানি চোবাণি ধাইয়াও নিজেকে ধীর বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিতে কতই না সচেষ্ট—কতই না উৎসাহী! “অবিচার্য্যামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং বীরাঃ পণ্ডিতশতমানাঃ।” কিন্তু হায়, আমি কি আমার নিজের প্রকৃত কল্যাণ নিজে নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারি? ‘কিসে হয় ভাল, কড়ু না বৃষ্টি, তাই হেন মম গতি।’ শ্রেয়ঃ ছাড়িয়া প্রেয়ঃকেই হিতকর বলিয়া বাছিয়া লই। তাই তাঁহার পাদপদ্মেই আত্মনির্ভর করতঃ তাঁহাকেই আমার প্রকৃত কল্যাণবিধাতা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই আমি প্রকৃতকল্যাণগুণসম্পন্ন হইতে পারিব না।

সদগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্বক গুরুপদিশ্রবণকীর্তনাদি সাধনপথ অবলম্বনে লব্ধভক্তি সাধকেরই ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অলসপ্রকৃতির সাধন-ভজনবিহীন ব্যক্তি ভগবৎসম্বন্ধে কোন ধারণাই লাভ করিতে পারেন না।

আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তম্যং কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং বিশ্রুন্তেন গুরোঃ সেবা—ইহাই সাধকের সর্বগ্রহে অনু-ধাবনীয় বিষয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা-ব্যতীত সাধনভজনে একপদ পরিমিত স্থানও অগ্রসর হওয়া যায় না। তাঁহাতে ঘৃণাকরেও মর্ত্যবুদ্ধি আসিয়া গেলে তদন্ত মন্তজপাদি শিক্ষানুশীলনাদি—যাবতীয় সাধনচেষ্টা সমস্তই কুঞ্জরশোচন্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তাই আজ বর্ষারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মে সর্বগ্রহে নিকপট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি হে প্রভুপাদ, আপনার এ পতিত শিষ্যধর্মের জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত সকল ত্রুটি বিচ্যুতি অমায়িক ক্ষমা করিয়া তাহাকে আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের সেবাযোগ্য করিয়া লউন, আপনার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত মাদৃশ জীবধর্মের ত’ আর দ্বিতীয় কোন উপায়ই নাই। হে অদোষদরশী প্রভো! এ অধম ছরাচারের সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আপনার প্রদর্শিত সাধনভজনপথে অগ্রসর হইবার বল দান করুন। ‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ কীর্তনের যোগ্যতা দান করুন। শ্রীনামভজনে রতিমতি প্রদান করুন। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বুদ্ধিবার শক্তি দান করুন।

শ্রীমদ্ব্যপ্রভু নামভজনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য বলিয়াছেন। নিরপরাধে নামগ্রহণ করিতে পারিলেই নামে প্রেমোদয় সম্ভব হইবে এবং সেই প্রেমোদয়রঞ্জিত ভক্তিনৈরুদ্বারাই শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার এবং শ্রীভগবানের মাদুর্ঘ্যাত্তর্য্য স্তম্ভভাবে সম্পাদিত হইতে পারিবে।

আজ বর্ষারম্ভ হইতেই যাহাতে আমরা সেই নাম-ভজনের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইতে পারি, তজ্জন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্ম ও শ্রীভগবৎপদারবিন্দে আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের স্মরণ-প্রভাবেই আমাদের সকল ভজনবিঘ্ন অপসারিত হইয়া অনায়াসে বাঞ্ছিত ফলোদয়ের সৌভাগ্য উদ্ভিত হইবে—তাঁহাদেরই প্রথিতকৃপায় আমাদের শ্রীরাধিকামাধবাংশা সফল হইবে।

শ্রীচৈতন্য-বর্ষা

“চেতোদর্পণমার্জনং শুব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচল্লিকাবিতরণং বিজ্ঞাবমুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণায়ুত্বাদনং
সর্বাস্বল্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩। { ৪র্থ সংখ্যা
১৬ ত্রিবিক্রম, ৪৯০ শ্রীগোরাঙ্গ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার; ২৯ মে, ১৯৭৬।

সজ্জন-শুচি

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

রুচিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাঁহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অগ্নাভিলাষী যাঁহাকে পবিত্রবোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করেন, তাঁহা ভগ-বদ্ভক্ত স্বীকার করিতে পারেন না। কৰ্ম্মিগণ যাঁহাকে শুচি বলিয়া নির্দেশ করেন তাঁহাও সজ্জনের শুচি সংজ্ঞার সহিত একত্ব লাভ করে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাঁহা শুচি, তাঁহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-শাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন। অগ্নাভিলাষীর স্বার্থ, কৰ্ম্মীর ফলভোগ-পিপাসা, জ্ঞানীর ত্যজনেচ্ছা ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না। সজ্জনগণ বলেন, অসজ্জনের রুচির বশবর্তী হইয়া তাঁহারা শুচি বিষয়ে নির্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে-স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই, সেই স্থানই অশুচি; যে-কালে হরিসেবন নাই, সেই কালই অশুদ্ধ; যে-পাত্র ভজনের অমুঠানে বিরত, তিনিই অশুচি। পরম পবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে হরি সর্বত্রই গীত হইয়াছে। এই সকল পবিত্র গ্রন্থে হরিগুণ গানের কথা আছে বলিয়া, এই সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং এই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া

জীবগণ ধন্য হইবেন। সজ্জনগণ বলেন, যেখানে হরিকথার আদর নাই, সেখানে অশুচি অবস্থান করে। সজ্জনগণ সর্বদা তাঁহাদের সকল-চেষ্টায় হরিকে বিষয়রূপে বরণ করেন। যে-স্থলে হরি বিষয় নহেন, সে স্থলে সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণের বিষয়কে সাধুগণ সর্বদা অশুচি-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। ভগবান্ই একমাত্র সর্বশুচির অধার। যেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গের অভাব, তাঁহাই অশুচি-পূর্ণ-বিষয়। মায়িক দর্শনে কৰ্ম্মী জল, অগ্নি ও হৃদ্যে শুচিত্ব আরোপ করেন, বস্তুতঃ তাঁহাতে হরিসম্বন্ধ না দেখিলে ঐগুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না। সজ্জনগণ বলেন, কৃষ্ণের বিষয়ই অশুচির বাধীন। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কলা, মূলা, খোড়ের শুচি অশুচি বিচার, আতপ ও উষ্ণের শুচি অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ শুচি-বিচারে অবধারিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরিসম্বন্ধি-বস্তুতে শুচি এবং হরিসেবার প্রতিকূল-বস্তুগুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি অশুচির ধারণাগুলি তাৎকালিক; বৈষ্ণবের নিত্য ধারণা সর্বভোভাবে-শৌচাচার পুষ্ট।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাবী

(নামাপরাধ)

প্রঃ—চতুর্থ নামাপরাধটি কি ?

উঃ—“সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম-মাংগাত্ম্য দৃষ্ট হয়; এই সকল শ্রুতির নিম্না করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে ভূর্তাগাবশতঃ শ্রুতির অত্যাচার উপদেশকে অধিক সম্মান করতঃ নামার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ; সেই অপরাধ-ক্রমে তাহাদের নামে ক্ষতি হয় না।”

— জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—নামে ‘অর্থবাদ’ অপরাধটি কিরূপ ?

উঃ—“যাহারা নাম-মাংগাত্ম্য-বাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-সমূহে অর্থবাদ আছে — এই কথা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত।” — জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—নামে অর্থবাদ-কল্পন কাকে বলে ?

উঃ—“অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নাম-সম্বন্ধে যে মাংগাত্ম্য বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্ত একরূপ ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে ক্ষতি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্ত বাক্যে বিশ্বাস-পূর্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে; যাহারা অর্থবাদ করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে না; এমনকি, হঠাৎ তাঁহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এইরূপ শিক্ষা শ্রীগৌরাজ দিয়াছেন।”

— জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—হরিনামকে কল্পিত মনে করিলে কি হয় ?

উঃ—“ভগবানের নাম-সকলকে কল্পিত মনে করিলে নামাপরাধ হয়। মায়াদিগণ এবং কন্মজ্জড়-সকল মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্বিকার ও নাম-রূপ-শূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি নাম কার্যাসিদ্ধির জন্ত ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন — যাহাদের একরূপ সিদ্ধান্ত, তাঁহারা নামাপরাধী।” — জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—নামবলে পাপবুদ্ধি-নামাপরাধের স্বরূপ কি ?

উঃ—“যাহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যে-সকল পাপ

করা যায়, তাহা যম-নিয়ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না; কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ-ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।”

— জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—হরিনামে ও পাপে কাটা কাটির চেষ্টাকে কি বলে ?

উঃ—“‘হরিনামও করি, পাপও করি, জমাখরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না’ — এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্বক নূতন পাপ করেন, তাঁহাকে কপটা ও নামাপরাধী বলা যায়।”

— ‘নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ’, সং. তোঃ ৮৯

প্রঃ—কিরূপ আচরণ-ফলে নামবলে পাপ-বুদ্ধির উদয় হয় ?

উঃ—“কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল ‘নামাভাস’ হয়, (শুদ্ধ) নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্ব পাপের ক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে ক্ষতি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব-অভ্যাস-ক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি একরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি, তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে — এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।”

— জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—অন্ত শুভক্রিয়ামায়া অপরাধটি কিরূপ ?

উঃ—“হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফল-কালে স্বয়ং উপেষ; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সংকল্পের তুলনা নাই। যাহাদের মনে অন্য সংকল্পের সহিত হরিনামের অনন্তবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী।” — জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—নামে রতি না হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক কি ?

উঃ—“অন্ত সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও,

অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না।”

— ‘উৎসাহ’, সং: ভোগ: ১১১

নামেতে অনবধান স্বভাবত: হয়।”

— ‘প্রমাদ’, হং: চি:

প্রঃ— প্রমাদ বা অনবধান কয় প্রকার?

উঃ— “প্রমাদ অনবধান— এই মূল অর্থ।

ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ।

ওঁদাসীন্ত, জাড্য আর বিক্ষেপ— এ তিন।

প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীণ॥”

— হং: চি: ১২শ পং:

প্রঃ— বিক্ষেপ-প্রমাদসত্ত্বগণের চেষ্টা কিরূপ?

উঃ— “যাহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদসত্ত্ব, তাঁহারা নিরূপিত নামসংখ্যা যতশীঘ্র শেষ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। নাম-সাধনে যাহাতে সেরূপ অল্প না হয়— ইহা বার বার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক।”

— ‘প্রমাদ’, হং: চি:

প্রঃ— অনবধান-অপরাধ দোষের আঁকর কিরূপে?

উঃ— “চিত্ত একদিকে, আর অস্ত্রদিকে নাম।

তাঁহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম॥

লক্ষ্যনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যামাল্য গণি’।

হৃদয়ে নহিল রসবিন্দু গুণমণি॥

এই ত’ অনবধান-দোষের প্রকার।

বিষয়-হৃদয়ে প্রভু বড় ছনিবার।”

— হং: চি: ১২শ পং:

প্রঃ— কি উপায়ে জাড্য দূর হয়?

উঃ— “অব্যর্থকালত্বধর্ম সাধুর চরিত।

দেখিলে তাঁহাতে কুচি হইবে নিশ্চিত॥

মনে হ’বে আশা কবে ইহার সমান।

স্মরিব, গাইব নাম হয়ে’ ভাগ্যবান॥

সেই ত’ উৎসাহ আসি’ অলসের মনে।

জাড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে॥”

— ‘প্রমাদ’, হং: চি:

প্রঃ— হরিনামে ওঁদাসীন্ত আসে কেন?

উঃ— “কমক, কামিনী আর জয়-পরাভয়।

প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্যবৃত্তি তাঁহার নিলয়॥

এসব আকৃষ্ট হৃদে হইলে উদয়।

প্রঃ— অশ্রদ্ধাধানে নামোপদেশ কিরূপ?

উঃ— “যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃত-সেবায়

বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে কুচিহীন, তাঁহাদিগকে

হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।”

— জৈঃ ধং: ২৪শ অঃ

প্রঃ— ‘অহং মম’ ভাবাপরাধ কিরূপ?

উঃ— “যিনি এই জড়ীয় সংসারে ‘আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার’— এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদাচিত্ কোন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নাম-মাধ্যম শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত, তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী।”

— জৈঃ ধং: ২৪শ অঃ

প্রঃ— দীক্ষিত-ব্যক্তির ভক্তি-পথ হইতে চ্যুতির কারণ কি?

উঃ— “দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমতাবুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হন।” — ‘অহংমম ভাবাপরাধ’, হং: চি:

প্রঃ— ‘অহংতা-মমতা’ দূর করিবার উপায় কি?

উঃ— “নিষ্কিন্ধভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।

বিষয় ছাড়িয়া করে নামসংকীর্ণন॥

সেই সাধুজনে অঘেষিয়া তাঁ’র সঙ্গ।

করিবে, সেবিবে ছাড়ি’ বিষয়-তরঙ্গ॥

ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।

অহংতা-মমতা যা’বে, মায়া হ’বে পার॥”

— ‘অহংমম-ভাব’, হং: চিঃ

প্রঃ— নামাপরাধীর লভ্য কি?

উঃ— “নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নাম উচ্চারণ করেন, নাম সেইসকল ফল তাহাকে দিয়া থাকেন; কিন্তু কখনই তাঁহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গ সঙ্গ তাঁহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়।

— জৈঃ ধং: ২৫শ অঃ

প্রঃ—কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয়?

নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়।

উঃ—“কৃষ্ণের শ্রীমুক্তিপ্রতি অপরাধ করি।

অবিশ্রান্ত নাম লইলে সর্বসিদ্ধি হয়॥”

নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি’॥

— ভঃ রঃ ২য় যামসাধন

অবতারী-তত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবতারের অবতারী — অংশী। শ্রীমদ্রূপগোষামিপাদ তাঁহার গুণবর্ণনপ্রসঙ্গে তাঁহাকে ‘অবতারা বলীবিজ্ঞ’ বলিয়াছেন। “অবতারা বলীবিজ্ঞমবতারী নিগততে” অর্থাৎ অবতারা বলীবিজ্ঞকেই ‘অবতারী’ বলা হয় (ভঃ রঃ সিঃ দক্ষিণ-বিভাগ, বিভাবলহরী দ্রষ্টব্য)। যেমন গীতগোবিন্দে উক্ত হইয়াছে — “যিনি মৎস্বরূপে বেদোদ্ধার, কুর্মরূপে পৃষ্ঠে পৃথিবী (মন্দারপর্বত) ধারণ, বরাহরূপে দন্তোপরি ভূগোল-ধারণ, নৃসিংহমূর্তিতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ, বামনরূপে বলিকে ছলনা, পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়কুলনিধন, দাশরথিরাম-রূপে রাবণ-বধ, বলরাম রূপে হলধারণ, বৃদ্ধমূর্তিতে কারুণ্যবিস্তার এবং কল্কিরূপে স্নেহ নিধন করিয়া থাকেন, সেই-দশাবতার প্রকটনকারী হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করিতেছি।”

শ্রীলশ্রীজীবগোষামিপাদও উহার টীকায় লিখিয়াছেন— “সর্বেভ্যোহবতারেভ্যঃ পূর্ণদ্বাং। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেঃ।” অর্থাৎ সর্ব অবতার হইতে পূর্ণবৈতু কৃষ্ণই অবতারী। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।৩।২৮) উক্ত হইয়াছে — ইংহা পুরুষের অংশকলা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীল গোষামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবন্ত। সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ সুবিস্তৃত সারগর্ভ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তন্মধ্য হইতে সাংক্ষতিকয়েকটি কথা নিয়ে আলোচনা করিতেছিঃ—

‘পুরুষ’ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার — কারণাক্ষিপায়ী মহাবিশ্ব। ‘এতে’ বলিতে পূর্বে ভাঃ ১।৩।৬—২৫ শ্লোক পর্য্যন্ত যে (১) চতুঃসন (সনক, সনন্দন, সনাখন ও সনৎকুমার), (২) বরাহ, (৩) দোষি

নারদ, (৪) নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, (৫) কপিল (দেব-হুতিনন্দন—সেখর সাংখ্য-প্রবর্তক), (৬) দত্তাত্রেয় (বিশ্বুর অবতার হইলেও দত্তাত্রেয়ের মত বৈষ্ণব-মত নহে), (৭) যজ্ঞ, (৮) ঋষভ, (৯) পৃথু, (১০) মৎস্ত, (১১) কুর্ম, (১২) ধর্ম্মতরি, (১৩) মোহিনী, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) বামন, (১৬) পরশুরাম, (১৭) কৃষ্ণদৈবায়ন বেদবাসী, (১৮) দাশরথি রাম, (১৯) শ্রীবলরাম, (২০) শ্রীকৃষ্ণ, (২১) বৃদ্ধ (সুর-দেবী তামসিক লোকগণের সম্মোহনার্থ অবতার) এবং (২২) কল্কি — এই বাইশটি অবতার কথা বলা হইয়াছে এবং ‘চ’ শব্দদ্বারা শ্রীহর্যগ্রীব, হরি, হংস, পৃথিবী, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্কভোম, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদভ্যু প্রভৃতি এবং শুক্লাদি যে সকল অবতার উক্ত হন নাই, সকলেই প্রথমোক্ত পুরুষ কারণাক্ষিপায়ীর অংশ এবং কলা অর্থাৎ কেহ কেহ অংশ, কেহ কেহ কলা — বিভূতি। অংশ হইপ্রকার — সাক্ষাৎ অংশ ও অংশের অংশ। মৎস্ত-কুর্ম-বরাহাদি সাক্ষাৎ অংশ, কুমার (চতুঃসন), নারদাদি জ্ঞানশক্ত্যাদি কলাবিষ্ট আবেশাবতার। মহা-শক্তি ও অল্পশক্তি হিসাবে আবেশ হইপ্রকার। কুমার-নারদাদি মহাশক্ত্যাবিষ্ট, ইংহা অবতার বলিয়া কথিত। মরীচি-মণাদি অল্পশক্ত্যাবিষ্ট, ইংহা ‘বিভূতি’ বলিয়া জ্ঞেয়। — (ভাঃ ১।৩।২৮ বিশ্বনাথও দ্রষ্টব্য)। প্রথমোক্ত ষাটবিংশতি অবতারগণ মধ্যে যিনি বিংশতিতম অবতার-রূপে কথিত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। তিনি অংশ নহেন বা অংশী ‘পুরুষ’-ও নহেন, কিন্তু পুরুষেরও অবতারী যিনি ভগবান্, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীহৃতগোস্বামী অবতারকথা-প্রারম্ভেই কহিয়াছেন -
 “জগুহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ।
 সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিস্কফয়া ॥”

— ভাঃ ১।৩।১

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব সৃষ্টির অভি-
 প্রায়ে মহত্ত্বাদির সহিত মিলিত ষোড়শকল্যাবলু পুরু-
 ষাবতার গ্রহণ করেন। সাহিত্যতত্ত্বাদিতে ‘বিষ্ণোস্তু জীবি
 রূপানি’ ইত্যাদি শ্লোকে ষাঁহার মহত্ত্বের স্রষ্টা প্রথম
 পুরুষাখ্য রূপ শুনা যায়, ব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে ষাঁহাকে
 কারণার্ণবশায়ী সর্ববর্ণ-রূপে জানা যায়, শ্রীভগবান্
 সেই পুরুষরূপই ‘জগুহে’ অর্থাৎ প্রকট করিলেন।
 ‘ষোড়শকল’ বলিতে সম্পূর্ণ শক্তিবলু হইলেও এই পূর্ণ
 আপেক্ষিক অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের তুলনায় ইনি
 সর্বশক্তিবলু। পরন্তু শ্রীভগবান্ তাঁহার অংশী, তিনি তাঁহার
 অংশবিশেষ, প্রকৃতির অন্তর্ধামী; তিনিই আবার দ্বিতীয়
 পুরুষাবতার গর্ভোদশায়িক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-
 জীবাস্তর্ধামী এবং তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়িক্রমে
 তিনিই ব্যষ্টি-জীবাস্তর্ধামী। এইরূপে এই শ্লোকে অংশী
 শ্রীভগবান্ ও অংশ পরমাত্মত্ব নিরূপিত হইয়াছে।
 অংশাবতার কখনও অংশী হইতে পারেন না, অংশ
 চিরকালই অংশ, অংশী সর্বদাই অংশী। তবে নিরকুণ
 ইচ্ছাময় অংশী কখনও স্বেচ্ছাক্রমে অংশরূপে প্রকটিত
 হইতে পারেন, কিন্তু অংশ কখনই অংশীরূপে প্রকটিত
 হইতে পারেন না।

ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে —

“রাগাদিমুত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্

নানাবতারমকরোদ্ভবনেষু কিস্ত্বে।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমং ভজামি ॥”

অর্থাৎ “যে পরমপুরুষ স্বাংশকল্যাদি নিয়মে রাগাদি
 মুক্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ
 করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন,
 সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।”

“অনুবাদমহুত্বে ন বিধেয়মুদীরয়েৎ” অর্থাৎ অনুবাদ
 না বলিয়া বিধেয় বলিবে না, তাহা হইলে বাক্যে

‘অবিমুষ্টবিধেয়াংশ’ এই আলাঙ্কারিক দোষ উপস্থিত
 হইবে। যেমন ‘এই বিপ্র পরম পণ্ডিত’ এই বাক্যে
 বিপ্র ‘অনুবাদ’ অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তু, পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত,
 ইহাই ‘বিধেয়’। অনুবাদ অগ্রে বলিয়া পশ্চাৎ বিধেয়
 বলিতে হইবে, নতুবা বাক্য দোষহ্রষ্ট হইবে। “এতে
 চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” এই শ্লোকাঙ্কে
 ‘এতে’ শব্দ অনুবাদ, ‘পুরুষের অংশ’ ইহাই বিধেয়।
 সেই প্রকার কৃষ্ণ-শব্দ অবতার মধ্যে জ্ঞাত হইলেও
 তাঁহার বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকে বলিয়া অগ্রে
 অনুবাদরূপে কৃষ্ণ-শব্দ কহিয়া পশ্চাৎ বিধেয় স্বরূপে
 তাঁহার স্বয়ং ভগবত্ত্ব কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণ অংশ,
 নারায়ণ অংশী হইলে হৃতবাক্যে বিরোধ সম্ভাবিত
 হইত। অর্ধবিজ্ঞবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও
 বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয় থাকিতে পারে না।
 এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন—

“ধীর ভগবত্ত্ব হইতে অতের ভগবত্ত্ব।

‘স্বয়ং ভগবান্’-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥

দ্বীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জলন।

মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥”

(চৈঃ চঃ আ ২।৮৮-৮৯)

হৃতবাং শ্রীকৃষ্ণই—স্বয়ং ভগবান্—মূল অবতারী,
 নিখিল ভগবৎসত্তা তাঁহা হইতে প্রকটিত হন। তিনি
 কখনই তাঁহার পুরুষাবতার হইতে প্রকাশিত হন নাই।
 ‘স্বয়ং’-পদ উল্লেখদ্বারা তাঁহার মূল অবতারিত্বই প্রকাশ
 পাইতেছে। তিনি স্বয়ংই ভগবান্, ভগবান্ হইতে
 প্রাজুর্ভূত হইয়াছেন বলিয়া বা ভগবত্ত্বের আবেশ-
 হেতু তিনি ভগবান্ নহেন। ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং’
 এই বাক্যটি—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতি। অবধারণা (অব-
 ধারণ অর্থ—নিশ্চয়, নির্ণয়, স্থিরীকরণ)-শ্রুতি অতিশয়
 বলবতী। সাধারণতঃই প্রকরণ হইতে শ্রুতি প্রবল।
 তাহাতে আবার এই সাধারণা শ্রুতি প্রয়োগ করায়
 অবতার-প্রকরণে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বাধিত
 হইয়া সাধারণা শ্রুতান্ত স্বয়ং ভগবত্ত্বই নিঃসংশয়িত-
 ভাবে নিশ্চয় হইল।

পূরূপক্ষ হইতে পারে — শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ভগবান্ হইন, তাহা হইলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন কেন? তত্ত্বেরে বলা যাইতে পারে — হাঁ, অত্যাশ্চর্য অবতার যেমন তাঁহাদের প্রপঞ্চাভীত নিত্যধাম হইতে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, আশ্চর্যী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ ষেতবরাহকল্পে বৈবস্বত-মঘন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্ধুগে দ্বাপরের শেষভাগে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

“পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।

গোলোকে ব্রজের সহ নিত্যবিহার ॥

ব্রজার একদিনে তিহৌ একবার।

অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি — চারিযুগ জানি।

সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥

একান্তর চতুর্ধুগে এক মঘন্তর।

চৌদ মঘন্তর ব্রজার দিবস ভিতর ॥

বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মঘন্তর।

সাতাইশ চতুর্ধুগে গেলে তাঁহার অন্তর ॥

অষ্টাবিংশ চতুর্ধুগে দ্বাপরের শেষে।

ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥”

— চৈঃ চঃ আদি ৩৫—১০

অর্থাৎ “গোলোকে ব্রজসেবের সমস্ত উপকরণ-সহ নিত্য বিহার করেন, ইহারই নাম অপ্রকটবিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রজার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকট বিহার করেন।”

(ঐ অঃ প্রঃ ভাঃ)

কলিযুগের পরিমাণ — ৪৩২০০০ সৌরবর্ষ। ইহার দ্বিগুণ — দ্বাপর, তিনগুণ — ত্রেতা, চারগুণ — সত্য। ইহাদের সমষ্টি ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। ইহাকেই মহাযুগ বা দিব্যযুগ বলে। ৭১ মহাযুগে এক মঘন্তর। ১৪ মঘন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকালপরিমিত সন্ধি-সহ সহস্রযুগে ব্রজার একদিন বা এক কল্প। বর্তমানে ষেতবরাহকল্প ও সপ্তম মঘন্তর চলিতেছে। এই বৈবস্বত মঘন্তরের ২৭ চতুর্ধুগ বা মহাযুগ গত হইলে ২৮শ চতুর্ধুগে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের

ব্রজসেবের সমস্ত উপকরণ-সহ আত্মপ্রকাশ করেন। অত্যাশ্চর্য অবতারের দ্বায় প্রকটিত হন বলিয়া প্রাকট্যাংশে একা থাকায় অবতার-মধ্যে কীভূত হইলেও তিনি সর্ব অবতারের অবতারী — স্বয়ং ভগবান্। অত্যাশ্চর্য অবতারবৎ কোন জাগতিক কার্যাবলীরোধে — যেমন ধর্মের মানি অপনোদন বা অসুরমারগাদি ক্ষত তাঁহার আবির্ভাব নহে, পৃথিবীর ভার হরণাদি কার্যও তাঁহার কৃত্য নহে, পুরুষের অবতারসকল দ্বারাই ঐ সকল কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। তবে যে তাঁহাকে ভূভারহারী বলা হয়, তাঁহার তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন অংশাবতারসমূহও তাঁহাতে প্রবিষ্ট হন। তাঁহাদের দ্বারাই ভারহরণ ও অসুরমারগাদি কার্য নিষ্পন্ন হয়। তাঁহাদের কৃতকার্য স্বয়ং ভগবানে আরোপ করিয়া ঐরূপ ভূভার-হরণ, ধর্মসংস্থাপন, অসুর-মারগাদি কার্য কৃষ্ণ কর্তৃকই কৃত হইয়াছে, এইরূপ বলা হয়। এজন্ত শ্রীলীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণান্দর্ভে (২৮ সংখ্যা) স্বয়ং ভগবানের অবতারের হেতু এইরূপ বলিয়াছেন —

“ততশ্চাত্ম্যাবতারেষু গণনাত্মু স্বয়ং ভগবান্‌প্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুঙ্খন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্তৌ ভবতীতাপেক্ষয়ৈবেত্যাত্মম্।”

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপস্থ অর্থাৎ স্বীয় নিরপেক্ষ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যাভিচার না ঘটাইয়া নিজপরিজনসমূহের আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা-বিধানার্থ নিজ জন্মাদিলীলাদ্বারা কোন অনির্কচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করতঃ স্বেচ্ছায় কখনও কখনও সকললোকের দৃষ্টিগোচর হন, ইহাই তাঁহার অবতরণের হেতু।

সর্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানের জগদুগত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণলীলা — ইহা প্রকাশার্থই অবতারগণমধ্যে তাঁহার উল্লেখ হইয়াছে; পরন্তু তাঁহাকে অংশাবতারবিশেষরূপে প্রতিপাদনার্থ ঐরূপ উল্লেখ করা হয় নাই। ব্রহ্মসংহিতোক্ত ‘রামাদি-মূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্’ ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্ট

করিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে যে, সেই পরমপুরুষ গৌবিন্দ
স্বামীদি মুক্তিতে স্বাংশ-কলাদি নিয়মে স্থিত হইয়া নানা
অবতার প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রক-
টিত হইয়াছেন। আবার অবতার-শব্দের অর্থ কেবল
‘অংশ’ নহে—

“অবতারঃ প্রাকৃতবৈভবেহবতরণমিতি।”

অর্থাৎ প্রপঞ্চাভীত শ্রীধাম হইতে ভগবৎস্বরূপবৃন্দের
প্রাকৃতবৈভবে অবতরণকে ‘অবতার’ বলে। এতৎপ্রসঙ্গে—

“শ্রীকৃষ্ণসাহচর্যেণ শ্রীরামশ্রাদ্ধি পুরুষাংশস্বাত্ম্যো
জ্ঞেয়ঃ।”

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়কারী বলিয়া শ্রীবল-
রামেরও পুরুষের অংশত্ব খণ্ডিত হইল। শ্রীমত গোস্বামী
এই অভিপ্রায়েই ১৯শ ও ২০শ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ
— এই উভয় অবতারকে ভগবান্ বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, যথা —

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃক্ষিষু প্রাপ্য জন্মনী।

রামকৃষ্ণবিত্তি ভুবো ভগবান্ হরদ্বৈতম্। (ভাঃ ১।৩।২৩)

অর্থাৎ “উনবিংশ ও বিংশ অবতারদ্বয়ে ভগবান্ শ্রীহরি
যজ্ঞকুলে রাম ও কৃষ্ণনামদ্বয় গ্রহণ করিয়া জগতের
ভার হরণ করিয়াছিলেন।”

শ্রীল শ্রীজীবগাদ আরও বলিতেছেন — ‘এতে
চংশকলাঃ’ শ্লোকোক্ত ‘তু’ শব্দ অংশ, কলা এবং পুরুষ
হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য বুঝাইতেছে। অথবা ‘তু’
শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সাধারণীভূতি ও প্রতীত করা হইতেছে।
(এজ্ঞ ‘তু’ শব্দে ‘এব’ অর্থ করিয়া ‘কৃষ্ণই স্বয়ং
ভগবান্’ এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে।) সাধারণীভূতি
বলবতী — এই চারাত্মসারে মহানারায়ণাদির স্বয়ং
ভগবত্তা গুণীভূত অর্থাৎ অপর ভগবৎস্বরূপের অপেক্ষায়
পূর্ণ ভগবান্, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় নহেন, ইহাই
প্রতিপাদিত হয়।

এইরূপে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণদন্দর্ভে
শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে বহু অপূর্ণ চমৎকারিতাপূর্ণ
সুসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
গোস্বামীও গোস্বামিবট্টকের অনুসরণাদর্শ প্রদর্শন করিয়া
কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

“স্বয়ং ভগবান্মের কৰ্ম নহে ভার-হরণ।

স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন ॥

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।

ভারহরণকাল তা’তে হইল মিশাল ॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতারে যেইকালে।

আর সব অবতার তাঁ’তে আসি’ মিলে ॥

নারায়ণ, চতুর্বিংশ, মৎস্তাভবতার।

যুগ-মহত্তরাবতার, যত আছে আর ॥

সবে আসি’ কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।

এহে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।

বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অস্তুর সংহারে ॥

আনুগম্য-কর্ম এই অস্তুর-ধারণ।

যে লাগি’ অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥

প্রেমরস-নির্ঘাস করিতে আনন্দন।

রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম-করণ।

এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥”

—চৈঃ চঃ আদি ৪।৮—১৬

অর্থাৎ ব্রজ-প্রেমরসনির্ঘাস আনন্দন ও রাগমার্গীয়
শুদ্ধভক্তি লোকে প্রচারার্থই পরমরসিক ও পরমকারমিক
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বিবিভক্তি-
প্রচারার্থ শ্রীবিষ্ণুর অবতার। কিন্তু ‘বিবিভক্ত্যে ব্রজভাব
পাইতে নাহি শক্তি’ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২৫)। এজ্ঞ
প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্তগণকে ব্রজের নির্মল প্রেমরস
আনন্দন করাইবার জন্মই পরম কৰ্মাময় স্বয়ংরূপ
শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। অবতারগণের মধ্যে
কেহ কেহ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির অংশ, কেহ
কেহ অংশাবেশ এবং কেহ কেহ বা কলা বা অংশের
অংশ — বিভূতিস্বরূপ। যেমন—

“ঋষয়ো মনবো দেবো মনুপ্রা মনোজসঃ।

কলাঃ সর্কে হরেরেব সপ্রজাপত্যঃ স্রষ্টাঃ ॥”

ভাঃ ১।৩।২৭

অর্থাৎ প্রজাপতিগণ, মধ্যবীর্ষ্যশালী মুনীগণ,

মনুগণ, দেবতারূপ এবং মানবগণ — সকলেই

শ্রীহরির কলা বা অংশবিভূতিস্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তিত।
 পুরুষ অর্থাৎ মহাবিশ্বের অবতারগণ “ইন্দ্রারিব্যাকুলং
 লোকং মূড়য়ন্তি যুগে-যুগে” (ভাঃ ১।৩।২৮ দ্বিতীয়ার্দ্ধ)

অর্থাৎ প্রতিযুগে যখন যখনই জগৎ দৈত্য-পীড়িত হয়,
 তখন তখনই জগতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্য-প্রপীড়িত
 জগৎকে নিরুদ্ধেগ করেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানমন কৃষ্ণ
 স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব।

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমদ্বজ্ঞানিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী]

[২]

আরও কত লীলা করেন গৌরারায়! এক এক
 লীলার মধ্যে তাঁহার কতলীলারই না সূচনা হয়!
 কিন্তু কিজ্ঞান কি করেন তাহার স্তম্ভ নির্ণয় ব্রহ্মাদিরও
 অগম্য। প্রভুর গম্ভীর হৃদয় সম্পূর্ণ বুঝেই বা কোন
 জন? কোনসময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শনে রীতিমত
 ভয়েরই সঞ্চার হয়, আবার যখন তিনি শিশু-
 স্নলভ বাৎসল্যরসমাধুর্য প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে
 নিকটে আকর্ষণ করেন, তখন ভক্ত-চাতক আনন্দে
 বিভোর হইয়া প্রভু-মুখ-মাধুরী পান করিতে করিতে,
 নাচিতে নাচিতে প্রভু-সমিধানে গমন করেন, প্রাণ-
 ভরিয়া প্রভুর শ্রীমুখকমল দর্শন করেন, শ্রীপদকমল
 স্পর্শন করেন, পরমাশ্রয়বোধে শ্রিজ্ঞানের রায়ও তাঁহাদের
 সঙ্গে কত কথা বলেন, কত কথা শুনেন তাঁহাদের,
 কত যুক্তিপরিামর্শ করেন তাঁহাদের সঙ্গে; ভক্তগণকে
 কতভাবে কতই না সুখ দেন প্রভু এবং নিজেরও ভক্ত-
 ভক্তি-জনিত সুখে কতই না সুখী হ'ন! ভক্ত-ভক্তি-সুখ
 আশ্বাদনের জন্তই ত' তাঁহার গৌরকান্তি, রাখাভাব-
 ত্র্যাসুখলিত কৃষ্ণচন্দ্রই ত' শ্রীগৌরহরি। ভক্তিসুখ
 আশ্বাদনের ব্যাকুলতায়ই ত' তিনি সর্বসারথ্য হইয়াও
 আজ সর্বসারথক সজ্জায় 'তৃণাদপি স্নানীচেন' শ্লোকের
 উদগাতা, লোক-শিক্ষক জগদগুরু, আচার্য্য — ‘আপনি
 আচরি’ ধর্ম জীবেরে শিখায়। তাহারই ত' উত্তর-
 ফল — দেববিরিঞ্চিরও বাঞ্ছিত নিম্নল প্রেমধনের
 অধিকারী আজ একটি ক্ষুদ্র কাঞ্চাল জীবও! শ্রীগৌর-
 হরির দয়া এমনই দয়া! মহাবদন্ত যে তিনি!

ভগবান্ যখন জগতে আসেন, তখন নিজ পার্শদ-

গণকে সঙ্গে লইয়াই আসেন। পার্শদ ছাড়া তাঁহার
 গম্ভীর লীলা বুঝিবে কে? জগদ্বাসীকে বুঝাবে কে?
 লীলার বেগ ধারণ করিবে কে? নির্দোষ পার্শদগণ ক্ষেত্র-
 বিশেষে লোকশিক্ষার্থ ‘বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি
 কুসুমাদপি’ লীলাময় প্রভুর কঠোর শাসন পাইয়াও
 শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম হইতে ক্ষণমাত্রও বিচলিত হ'ন না,
 অধিকন্তু অধিকতর প্রেমের আশ্পদই হইয়া থাকেন।
 পার্শদগণ সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াও প্রভু-লীলাপুষ্টিতে
 নিজদিগকে সর্বদোষের আকরজ্ঞান করেন, আবার
 কোনসময়ে তাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ,
 কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই মাত্র প্রভু তাঁহাদিগকে
 দোষী করিয়া শাসন করিতেছেন। ইহাতে উভয়
 পক্ষের প্রীতির মধ্যে কোন বৈষম্য লক্ষিত হয় না।
 জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ অথবা দেশ-কালের কোন ধণ্ডতা
 বা দোষ-স্পর্শ শ্রীভগবন্তলীলার মধ্যে নাই। ইহা বিবিধ
 তাৎপর্য্যে নিতানুতন। “অত্মাপিও সেই লীলা করেন
 গৌরা রায়। কোন কোন ভাগব্যান্ দেখিবারে পায়।”
 পার্শদ ভিন্ন লীলার হৃদয় তাৎপর্য্য অন্তের বোধগম্যই
 হয় না, সহনশীলতারও অভাব আছে।

দেশে বিদেশে একটি প্রবাদ আছে—“ঝিকে মেরে
 বোকে শিখায়”। ঝি অর্থাৎ আত্মজ্ঞা কণ্ঠা, জননী
 যাহাকে নিজস্ব সম্পত্তি-বিশেষ বলিয়া জ্ঞান করেন
 এবং কণ্ঠাও স্নেহময়ী জননীর অন্তর জানেন। কণ্ঠাতে
 জননীর স্বাভাবিকী মমতা ও প্রীতির গাঢ়তা আছে,
 কিন্তু অন্তের কণ্ঠা যখন পুত্রবধু হইয়া বাড়ীতে আসেন,
 তখন ধর্মশ্রীকুরাণী তাঁহার উপর সরাসরি নিজ কণ্ঠার

দাবী রাখিতে সন্মোচ পাইয়া গৃহস্থানীর কিছু শিক্ষা দিবার আবশ্যকতাবোধে নব বধুকে সরাসরি কিছু না বলিয়া নিজ কন্ঠাকেই উপলক্ষ করিয়া পুত্রবধুকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রয়োজনবোধে নির্দোষ নিজ কন্ঠাকে চাপড় মারিয়াও বধুকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহাতে কন্ঠারও বুদ্ধিতে বাকী থাকে না এবং বধুও বুদ্ধিতে বাকী থাকে না যে, চাপড়টি বস্ত্রতপক্ষে কাহার গাত্রে পড়িল, কন্ঠার অথবা বধুর? বধুমাতা সরাসরি চাপড়টি সহ্য করিতে পারিবেন না, কিন্তু নির্দোষ হইলেও কন্ঠা পারিবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহাই চিরাচরিত প্রথা। ভক্ত ভগবানের লীলার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পার্শ্বদগণ ভগবানের নিজ সম্পদ, তদ্ব্যতীত অপরাপর সকলেই কেহ বা নবাগত, কেহ বা আগমনেচ্ছু, কেহ বা সম্পূর্ণ বহির্মুখ। কাজেই পার্শ্ব ছাড়া লীলা হয় না, শিক্ষা বিস্তারও হয় না।

শ্রীমদ্রাধু প্রভুর গভীর ভাব প্রভুপ্রের্ত মুকুট কীর্তনীয়। ছোট-হরিদাস বুলিলেন, বুলিলেন অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণ, না বুলিল মৃত! প্রভুর গভীর লীলাপুষ্টির জ্ঞান লোকদৃষ্টিতে নিজ প্রাণ-পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াও হরিদাস প্রভুপাদপদ্ম হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না, অধিকন্তু প্রভুর অধিকতর প্রেমাস্পদরূপে দিব্যদেহে প্রভুপার্শ্বে আসিয়া প্রভুকে কীর্তন শুনাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-দামোদরাদি প্রভুপার্শ্বদগণও হরিদাসের দেহত্যাগের পর তাঁহার দিব্যকণ্ঠের কীর্তন শ্রবণ করিলেন। লোক-শিক্ষার্থ প্রভুর লীলার সার্থকতা সম্পাদিত হইল। বিশেষতঃ বৈরাগ্যপর আশ্রমগুলির গান্ধীর্ষ্য ও দায়িত্ব অধিকতর বোধের বিষয় হইল। প্রভু খেদের সহিত জগৎকে জানাইলেন, — “নিষ্কলনশ্চ ভগবত্ত্বজ্ঞানোন্মুখশ্চ পারং পরং জিগমিষোভাসাগরশ্চ। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্য-সামু।” [হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার ইচ্ছা, এরূপ ভগবত্ত্বজ্ঞানোন্মুখ নিষ্কলন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও জী সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসামু।] “আকারাদপি ভেতব্যং জীণাং

বিষয়িণামপি। যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তত্কারুতেরপি॥” [যেদ্রুপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে—মনের ক্ষোভ জন্মে, সেরূপ জীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।] নিজজনমাধ্যমে এই গভীর লীলার প্রদর্শনে মহাপ্রভু ধর্মধ্বজী, কপটী যোষিৎসঙ্গি-গণকে বিশেষতঃ সংসারত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসিগণকে শিক্ষা দিলেন, — “বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারে। আমি তাহার বদন॥ দুর্বীর ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু-প্রকৃতি হরে মনেরপি মন॥” ‘মাত্রা স্বপ্না দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেং। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি’ কথতি॥’ (ভাগবত)। [‘মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জনে কখনও থাকিবে না; কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।’] প্রভু কহে,—“মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতিসম্ভারী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥” ছোট হরিদাসের আত্মহত্যার সংবাদ-শ্রবণে,—“শুনি’ প্রভু হাদি’ কহে সুপ্রসন্ন-চিত্ত। ‘প্রকৃতি’ দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥” (১৫: ৮: অঃ ২য় পঃ)

শ্রীমদ্রাধু প্রভুর ছোট-হরিদাসের প্রতি দণ্ডপ্রদান-লীলার গুঢ় মর্ম্মানুভবে বুদ্ধিমান, ধীর বিচক্ষণ ভক্তগণই সমর্থ হন, সাধারণ মূঢ়বী ব্যক্তিগণের বিচার তাঁহাদের স্ব স্ব হৃদয়দোষলোরই পরিপোষক বা সমর্থক হইয়া পড়ে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্রাধু প্রভুর উক্ত দণ্ডপ্রদানলীলার শিক্ষণীয় বিষয় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন —

“আপন-কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ।

স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ॥

তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাৎ।

এক-লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত॥

মধুর চৈতন্যলীলা — সমুদ্র গভীর।

লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ‘ভক্ত’ ‘ধীর’॥”

— ১৫: ৮: অন্ত্য ২১৬৮-১৭০

পরমার্থাধ্য শ্রীশ্রীপরমগুরুপাদপদ্ম উহার অনুভাবে লিখিয়াছেন —

“প্রভু কর্তৃক ছোট-হরিদাসকে দণ্ডপ্রদানলীলা-দ্বারা শুদ্ধগৌরকৃষ্ণভজনেচ্ছু সাধক মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা লক্ষ্য করিবেন—

১। ভগবান্ গৌরমুন্দর জীবের প্রতি পরমকারণিক হইয়া নিজপার্শ্বদত্ত ছোট-হরিদাসকেও প্রকৃতভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কলিকালের দুর্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম ও উপধর্মকে ‘বৈষ্ণবধর্ম’ জ্ঞান করিয়া নরকে পতিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপজীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের ধর্মগৌরবৈষ্ণব্য করা কর্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেরূপ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ ‘বৈরাগ্য’ শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শহল এবং (শুদ্ধ) সম্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমনোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক-পরিমাণে ছিল, তাহা ‘দেখাইবার জ্ঞান’ তাঁহার সামান্য ক্রটিও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাধা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকলপ্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখলালসা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌর-হরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে, অপরাধাদি মাফিত ও মুক্ত হইয়া তাহার স্মৃতি ও সন্মান লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জ্ঞান নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।”

শ্রীগৌরলীলা গম্ভীর অথচ বাৎসল্যময়। নিজে আচরণ করিয়া ও নিজ পার্শ্বদগণ দ্বারা আচরণ করাইয়া জগৎকে শিক্ষাদান! শ্রীগৌরলীলাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে! শ্রীগৌরমুন্দরের এমনই লীলা! যাহা শ্রবণে বদ্ধ জীবকুলও—যাহারা কেবল কামেরই দাস, যাহারা প্রকৃত আনন্দ বলিয়া কি বস্তু কিছুই জানে না, তাহারাও উত্তম প্রেমের তথা নিত্য নির্ম্মল আনন্দের অধিকারী হয়।

শ্রী-ভূ-লীলা (নীলা)-শক্তি-পরিষেবিত শ্রীগৌরতমু। শক্তিগণ প্রভুর ইচ্ছা বুঝিয়াই তাঁহার বিবিধ সেবা করেন, প্রভুকে তজ্জ্ঞ কোন নির্দেশও দিতে হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত প্রেমোপাধিক্যপূর্ণ কয়েকটি গৌরলীলা এখানে কীর্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। এক দিবসের একটি ঘটনা। শ্রীপুরীধামে কালী মিশ্রের উত্থান। উত্থান মধ্যে নির্জন-কক্ষ—গম্ভীরা। রাত্রিকাল। প্রগাঢ়-প্রেমোৎকর্ষায় কক্ষ-মধ্যে প্রভু বিরাজিত। কক্ষটি ভিতর হইতেই অর্গলমুক্ত, বাহিরে আসিবার স্বতন্ত্র কোন পথ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভু বোদন করিতেছেন, কখনও আন্তর্ভরে নাম-কীর্তন করিতেছেন। প্রভুর অবস্থা বিবেচনা করিয়া কক্ষের বহির্দ্বারে সজাগ পার্শ্বদবর্গ। মহাপ্রভুর উচ্চারিত শব্দ তখনও কাণে আসিতেছে। হঠাৎ সকলেই নিশ্চল হইল। রাত্রিও গম্ভীর। সুদীর্ঘ নিশ্চলতার মধ্যে সকলেই আশঙ্কিত হইলেন। শ্রীস্বরূপদামোদর আর বিলম্ব না করিয়া কক্ষের কপাট দূর করিলেন। দেখিলেন, তিন দ্বারই দেওয়া আছে, কিন্তু কক্ষ মধ্যে প্রভু নাই। সকলেরই মুখ ম্লান, সকলেই চিন্তায় ব্যাকুল। অন্ধকাররাশি ভিতরে বাহিরে পরিব্যাপ্ত; ভিতরে বাহিরেই প্রভু অন্বেষণ চলিতেছে। সকলের হাতেই একটি করিয়া দেউটা। প্রভু নাই বা প্রভু অন্তর্দান করিয়াছেন, ইহাই সকলের অনুমান। তথাপি আশানুরক্ত। অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদরজার পার্শ্বে আসিয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। দেউটার আলোক ক্ষীণ হইলেও স্বতঃ-প্রকাশমান-বস্তু শ্রীগৌরহরি আর্তি ভক্তগণের দর্শনপথে আসিলেন। শ্রীসিংহদরজার উত্তরদিকের একটি স্থান স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। মহাপ্রভু তথায় অচৈতন্যাবস্থায় (?) পড়িয়া আছেন। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ১৪।৬৪-৬৮) —

“প্রভু পড়ি’ আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ-ছয়।
 অচেতন দেহ, নাশায় শ্বাস নাহি বয়।
 এক এক হস্ত-পাদ — দীর্ঘ তিন-হাত।
 অস্থি, গ্রন্থিভিন্ন, চর্ম আছে মাত্রতাত।
 হস্ত, পাদ, গ্রীবা কটি, অস্থি, সন্ধি যত।
 এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞাছে তত।
 চর্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
 দুঃখিত হইল। সবে প্রভুরে দেখিয়া।
 মুখে লাল-ফেন, প্রভুর উত্তান নয়ন।
 দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ।”

প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ বাধাভাব-বিভাবিত
 প্রভুর লীলাচরিত্র্য বৃত্তিতে পারিলেন—

“কৃষ্ণের বিষোঙ্গে গোপীর দশ দশা হয়।
 সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়।”
 “চিন্তাত্ত জাগরোধোগো তানবং মলিনাক্রতা।
 প্রলাপো ব্যাধি-ক্লমাদো মোহো মৃত্যুদশা দশ।”
 (উজ্জলনীলমণি)

[চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাক্রতা,
 প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশটি দশা]
 —(১৮: ৮: অঃ ১৪।৫০-৫৩)

সময় বুরিয়া অনতিকালমধ্যে স্বরূপ ভক্তগণসহ উচ্চ
 করিয়া কৃষ্ণনাম করতঃ প্রভুর কর্ণগোচর করাইতে
 লাগিলেন (১৮: ৮: অঃ ১৪।৬২-৭১) —

“স্বরূপ-গোপাশ্রিত তবে উচ্চ করিয়া।
 প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা।
 বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিল।
 ‘হরিবোল’ বলি’ প্রভু গজিয়া উঠিল।
 চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল।
 পূর্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল।”

প্রভু স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিলেন। ভক্তগণের
 প্রাণ আসিল। এবস্থি নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যেই
 আবার এক সময়ে গভীরার কক্ষে অবস্থানকালেই
 গভীর রাত্রিতে দ্বার উন্মোচন না করিয়াই তিনটি
 প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক প্রভু সিংহদরজার পার্শ্বে তৈলঙ্গী

গভীর মধ্যে কমঠাকারে পড়িয়াছিলেন।

“পেটের ভিতর হস্ত পাদ—কৃষ্ণের আকার।
 মুখে ফেন, পুলকান, নেত্রে অশ্রুধার।
 অচেতন পড়িয়াছেন—যেন কুশাণ্ড-ফল।
 বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল।”

(১৮: ৮: অঃ ১৭।১৬-১৭)

এমতাবস্থায়ও প্রভুর কর্ণে উচ্চ করিয়া শ্রীনাম-
 সংকীৰ্ত্তন করিলে পর প্রভুর বাহুদশালাতে পূর্ববৎ
 যথাযোগ্য শরীর লাভ হইয়াছিল। আবার কোন এক
 সময়ে শরজ্যোৎস্না রাত্রিতে মহাপ্রভু আইটোটা হইতে
 সমুদ্র দর্শনপূর্বক তাহাতে যমুনাত্রমে বাঁপাইয়া
 পড়িলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি লীলাস্বাদনই এই
 লীলার তাৎপর্য। প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় প্রভু সমস্ত রাত্রিই
 সমুদ্রগর্ভে ছিলেন। ভাসিতে ভাসিতে যখন কোণার্কের
 দিকে যাইতেছিলেন, তখন রাত্রিশেষে এক জালিয়ার
 জালে আবদ্ধ হইয়া তীরে উঠেন। জালিয়া তাহার
 জালের মধ্যে একটি বড় মাছ অনুমান করিয়া আস্তে
 আস্তে আনন্দান্তঃকরণে তাহা তীরে উঠাইল। জাল
 উন্মোচন করিয়া দেখিল মৎস্য নহে, অচৈতন্য অবস্থায়
 বিকারপ্রাপ্ত বিশালকায় একটি মনুষ্য শরীর। তাহার
 দর্শন ও স্পর্শনে জালিয়ার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলেও জালিয়া
 নিজকে ভুতে পাইয়াছে অনুমান করিয়া অবশেষে কৃষ্ণ-
 নাম করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিক্লিপ্তচিত্তে সমুদ্রপথে
 দৌড়াইতে লাগিল। তাহার মনের ভাব, সে ওঝার
 নিকটে গিয়া ভুত ছাড়াইবে, তাহার পরিবারবর্গকে
 পালন করিবে। এদিকে সমস্ত রাত্রি প্রভু-অধেষণে
 ব্যগ্র শ্রীস্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ সেই পথ ধরিয়াই প্রভু সন্ধান
 যাইতেছিলেন। জালিয়ার হাবভাব ও মুখে কৃষ্ণনাম
 উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া সহজেই প্রভুসম্বন্ধ অনুভব
 করিলেন। জালিয়ার সহিত বাক্যালাপে প্রভুর
 সন্ধান পাইয়া যেখানে জালিয়া জাল ছাড়িয়া
 ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে সেইখানে সমস্ত গিয়া প্রভু
 দর্শন করিলেন। দর্শনে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ হইল।
 বহুক্ষণ সকলে মিলিয়া শ্রীনামসংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে
 প্রভু বাহুদশা লাভ করিলেন। এতৎসমুদয় ঘটনাবলীর

উল্লেখে জগদগুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অমর লেখনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অন্তর্দৃশ্য তথা প্রেমের মহাভাবাবস্থার অপূর্ব লক্ষণ, অপূর্ব আশ্বাদন বর্ণন করিয়াছেন। কখন কিভাবে প্রভু এই সকল অভূতপূর্ব অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহা লীলা-ময় প্রভুর অজ্ঞাত হইলেও তাঁহার লীলাশক্তিই তাঁহার

মনোহলীষ্ট পূর্ণার্থে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ লইয়া এই সকল লীলা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা ও শ্রীরাসাদিক লীলাও এই লীলাশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। লীলাশক্তি — বিভূতা ও কারুণ্যাদি ভেদে বিবিধ। “পরাসু শক্তিবিবিধৈব ক্ষয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।” (স্বৈতন্যঃ ৬।৮)।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র

[শ্রীআতনাথ চক্রবর্তী বি-এ, বি টি]

ভারতবর্ষে শ্রীখট্টাঙ্গ মহারাজ নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি শেষজীবনে মুহূর্ত-কাল-মাত্র অর্থাৎ ৪৮ মিনিট হরিভজন করিয়া ভগবান্কে লাভ করিয়াছিলেন। এই ভারতসম্রাট শ্রীখট্টাঙ্গ মহারাজের বংশেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব।

শ্রীখট্টাঙ্গ মহারাজের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র মহাযশস্বী রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজ মহারাজের পুত্র দশরথ মহারাজ। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন — ইহারা দশরথ মহারাজেরই পুত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত (৯।১০।১-২) বলেন—

“খট্টাঙ্গাদীর্ঘবাহুচ রঘুন্তম্যং পৃথুপ্রবঃ।

অজন্ততো মহারাজন্তমাদশরথোভবৎ ॥

তস্তাপি ভগবানেব সাক্ষাদব্রহ্মময়ো হরিঃ।

অংশাংশেন চতুর্ধাগং পুত্রং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।

রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া ॥”

দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় অংশ ও অংশাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারিমুণ্ডিতে দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু-কৃত লঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থে পাই — বৈবস্বত-মন্ডন্তরে চতুর্বিংশ চতুর্ধূগের ত্রেত্য চৈত্র-শুক্র-নবমীতিথিতে অযোধ্যা-ধামে মধ্যাহ্নকালে শ্রীরামচন্দ্র দশরথ হইতে কৌশল্যাদেবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে তৎসঙ্গে ভরত কৈকেয়ীতে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রাতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হৃদপুরাণীয় রামগীতাতে শ্রীরামচন্দ্রকে আদিবৃহ বাসুদেবরূপে এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে সঙ্ঘর্ষণ, প্রহ্মাণ্ড ও অনিরুদ্ধরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ভরত শ্রীমবর্ণ এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন গৌরবর্ণ।

শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অবতার। শ্রীবলদেবের অবতার হ'লেন—লক্ষ্মণ। ভরত প্রহ্মাণ্ডের অবতার এবং শত্রুঘ্ন অনিরুদ্ধ-বিষ্ণুর অবতার। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন — ইহারা সকলেই ঈশ্বর-তত্ত্ব, কেহই জীব নহেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবা শান্ত, দান্ত, সপ্য ও বাৎসল্য—এই চারি রসে হইয়া থাকে। মধুর-রসে পতিভাবে রামচন্দ্রের সেবা হয় না। কারণ শ্রীরামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধর। তিনি সীতাদেবী ব্যতীত অপর কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করেন না। কিন্তু স্বয়ং-ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা শান্ত, দাস্য, সপ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসে সর্বতোভাবে হইয়া থাকে।

শ্রীদশরথ-কৌশল্যা বাৎসল্য-রসের ভক্ত। তাঁহারা পুত্ররূপে শ্রীরামের সেবা করিয়া থাকেন। রামভক্ত শ্রীহুমান্জী দাস্যরসের ভক্ত। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য-সিদ্ধ পার্শ্ব ও বীরভক্ত। রামভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশ ভক্তই দান্তরসে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেন।

শান্ত্র বলেন —

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা অপেক্ষা শ্রীসীতারামের সেবা শ্রেষ্ঠ। শ্রীসীতারামের সেবা অপেক্ষা শ্রীরাধা-নাম কৃষ্ণের সেবা ততোহধিক শ্রেষ্ঠ। নারায়ণ-নাম বৈকুণ্ঠ

অপেক্ষা রাম-ধাম অযোধ্যা শ্রেষ্ঠ। অযোধ্যা অপেক্ষা
কৃষ্ণধাম বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। নারায়ণ-ভক্ত অপেক্ষা রামভক্ত-
গণ শ্রেষ্ঠ, রামভক্ত অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তগণ শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণনাম যেমন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, রামনামও তদ্রূপ
সাক্ষাৎ রামচন্দ্র। ভগবানের নাম ও নামীতে এবং
দেহ ও দেহীতে কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণনাম যেমন
কৃষ্ণের স্থায়ী শক্তিশালী, রামনামও তদ্রূপ রামচন্দ্রের
স্থায়ী শক্তিসম্পন্ন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অস্ত্য ৩২৫৫) বলেন —

“মুক্তিহেতু তারকব্রহ্ম হয় ‘রাম-নাম’।

‘কৃষ্ণনাম’ পারক হঞা করে প্রেম দান ॥”

পদ্মপুরাণে বৈষ্ণবরাজ শ্রীশিবজী বলিয়াছেন —
“তারকাঙ্কায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাত্।” মুক্তি-
দাতৃত্ব-হেতু রামনামের তারক-সংজ্ঞা এবং প্রেমদাতৃত্ব-
হেতু কৃষ্ণনামের পারক-সংজ্ঞা। তারক হইতে মুক্তি
এবং পারক হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। এই
শ্রীশিববাক্যের তাৎপর্য এই যে — রামনামে মোচকতা-
শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষ-সুখতিরঙ্গারি-প্রেমান-
ন্দ-দানশক্তি অত্যধিক। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অংশী ভগবান। শ্রীরামচন্দ্র
শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা অবতার। শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম ভগবান,
মহা-ভগবান, আর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র — পূর্ণব্রহ্ম।
শ্রীকৃষ্ণে ৬৪ গুণ পরিপূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, কিন্তু শ্রীরাম-
নারায়ণাদিতে ৬০ গুণ বিद्यমান। পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী
পার্কীতীদেবীকে বলিয়াছেন —

“কৈলাস-শিখরে রম্যে নানারত্নবিভূষিতে।

একাগ্রঃ প্রযতো ভূষা বিষ্ণুমারাধ্য ভক্তিতঃ ॥

উপবিষ্টন্ততো ভোক্তুং পার্কীতীং শঙ্করোহরবীং।

পার্কীত্যোহি ময়া সাদ্বিং ভোক্তুং ভুবনবন্দিতে ॥

তমাহ পার্কীতীদেবী জপ্ত্বা নাম-সহস্রকম্।

ততো ভক্ষ্যাম্যহং দেব ভুজ্যতাং ভবতা প্রভো ॥

ততস্তাং পার্কীতীং গ্রাহ প্রহসন্ শ্রীমহাদেবঃ।

ধৃষ্টাসি কৃতপুণ্যাসি বিষ্ণুভক্তাসি পার্কীতি ॥

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।

সহস্রনামভিস্তল্যং রামনাম বরাননে ॥

রামেত্যুক্তা মহাদেবি ভুজ্জু সাদ্বিং ময়াধুনা।

ততো ভুক্তা মহাদেবী পতিনা সহ সংস্থিতা ॥”

একদিন শ্রীশিবজী কৈলাসে ভক্তিপূর্বক ভগবানের
আরাধনা করতঃ প্রসাদ-সেবনার্থ উপবিষ্ট হইয়া শ্রীদুর্গা-
দেবীকে বলিলেন — হে পার্কীতি, এস, আমরা আজ
উভয়ে একসঙ্গে প্রসাদ পাইব। তদুত্তরে শ্রীপার্কীতীদেবী
বলিলেন — আমি বিষ্ণু-সহস্রনাম পাঠ না করিয়া
কিছু পাই না। এখন আমার তাহা পাঠ করা হয়
নাই। সুতরাং আপনি আগে প্রসাদ পান, আমি
তৎপরে প্রসাদ পাইব। একথা শুনিয়া শ্রীশিবজী
বলিলেন — হে পার্কীতি, একবার রামনাম উচ্চারণ
করিলে বিষ্ণু-সহস্রনাম-পাঠের ফল হয়। শ্রীশিবজীর
কথা শুনিয়া শ্রীপার্কীতীদেবী একবার রামনাম উচ্চারণ
করিয়া পতির সঙ্গে মহাপ্রসাদ-সেবা করিয়া আনন্দিতা
হইলেন।

পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী আরও বলিয়াছেন —

“বিষ্ণোরৈককন্যামপি সর্ববেদাধিকং ফলম্।

তাদৃণ্ডনাম-সহস্রেভ্যো রামনাম পরং মতম্ ॥”

চারিবেদ পাঠ করিলে যে ফল হয়, বিষ্ণুনাম একবার
উচ্চারণ করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে।

“রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।

সহস্রনামভিস্তল্যং রামনাম বরাননে ॥” (পদ্মপুরাণ)

হে পার্কীতি! আমি রামনাম কীর্তন করিয়া অত্যন্ত
আনন্দ পাই। এক রামনাম বিষ্ণুর সহস্রনাম-তুল্য ফল-
প্রদ অর্থাৎ বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করিলে যে ফল হয়,
একবার রামনাম উচ্চারণ করিলে সেই ফল হইয়া থাকে।

মহাপ্রভু-হরিদাস-সংলাপে পাই —

“একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।

তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি’ তাঁহােরে পুছিল ॥

“হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।

গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহাহরাতার ॥

ইহা-সবার কোনমতে হইবে নিস্তার ?

তাহার হেতু না দেখিয়ে, — এ ছুঃখ অপার ॥”

হরিদাস কহে, — “প্রভু, চিন্তা না করিহ।

যবনের সংসার দেখি’ ছুঃখ না ভাবিহ ॥

যখন সকলের 'মুক্তি' হবে অনায়াসে।
 'হারাম, হারাম' বলি' কহে নামাভাসে॥
 মহাপ্রেমে ভক্ত কহে, — 'হা রাম, হা রাম'।
 যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম॥
 যতপি অতত্ত্ব সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
 তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩৪৯-৫৫)

“দংষ্ট্রিদংষ্ট্রীহতো স্নেহো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।

উক্তাপি মুক্তিমাশ্রোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণ্ণ ॥”

(নৃসিংহ-পুরাণ)

কোন স্নেহে কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্তৃক দস্তাঘাত প্রাপ্ত
 হইয়া ঘৃণাপূর্বক মৃত্যুকালে 'হারাম', 'হারাম' এই
 শব্দ বলিয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছিল। 'হারাম'-শব্দে
 'হা রাম' এই 'সাক্ষেতিক 'রাম'-শব্দ থাকায়, সেই
 স্নেহ নাম-সঙ্কেতে (নামাভাস-বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল।
 সুতরাং-শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি অপূর্ণ
 ফল হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অষ্টা ৩৫৭-৫৯) বলেন —

“অজামিল পুত্রে বোলায় বলি' 'নারায়ণ'।

বিষুদ্বৃত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥

'রাম' হই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।

প্রেমবাণী — 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥

নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব।

ব্যবহিত-নৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব॥”

পদ্মপুরাণ বলেন —

“নামৈকং যন্ত বাচি স্বরূপপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
 শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্॥

তচ্চেদেহ-দ্রবিশ-জনতা-লোভ-পাশবৃন্দমধ্যে

নিষ্কিপ্তং স্ত্রাম কলজনকং শীঘ্রমেবাং বিপ্র ॥”

একটি হরিনাম ঘাঁহার মুখে উদ্ভিত, স্বরূপপথগত
 বা শ্রোত্রমূলপ্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা
 অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিত হইলে নাম-গ্রহী-
 তাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন। হে বিপ্র, নামের
 এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেখ,
 দ্রবিশ, জনতা, লোভ ও পাশবৃন্দ অর্থাৎ দশনামাপরাধ

মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না।

শাস্ত্র বলেন —

“নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপ-ক্ষয়।

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥” (চৈঃ চঃ)

“ত্রিমাণো হরেনাম গৃণ্ণ পুত্রোপচারিতম্।

অজামিলোহপ্যাগাকাম কিমূত শ্রদ্ধয়া গৃণ্ণ ॥”

(ভাঃ ৩২।৪২)

পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই মুমূর্ষু অজা-
 মিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধা করিয়া
 নাম লইলে যে কি ফল হয়, তাহা বলিয়া শেষ
 করা যায় না।

গৌরভক্ত শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীহরুমানজীর অবতার।
 তাঁহার রামনিষ্ঠা অপূর্ণ ও আদর্শ-স্থানীয়। এইরূপ নিষ্ঠা
 না হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। “নিষ্ঠা হইতে উপজন্ম
 প্রেমের তরঙ্গ।”

ভগবান্ শ্রীগৌরঙ্গদেব শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুর নিষ্ঠা-
 সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যথা, (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৩৮-১৫৬) —

“পূর্বে আমি ইহা করে লোভাইল বার বার।

পরম-মধুর গুপ্ত, ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ — সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়।

বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্বরসময় ॥

সকল-সদগুণ-বৃন্দ রত্ন-রত্নাকর।

বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥

মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।

চাতুর্ধ্য, বৈদগ্ধ করে ধীর লীলারস ॥

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।

কৃষ্ণ বিনা অস্ত্র-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥

এইমত বার বার শুনিয়া বচন।

আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥

আবারে কহেন, — আমি তোমার কিস্কর।

তোনার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর ॥

এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্ৰিকালে।

রঘুনাথ-তাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ!

আজি রাত্রে প্রভু মৌর করাই মরণ!

এইমত সর্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
 মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ।
 প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
 কান্ধিতে কান্ধিতে কিছু করে নিবেদন।
 'রঘুনাথের পায়ে মুক্তি বেচিয়াছে' মাথা।
 কাটিতে না পারি মাথা, মনে পাই বাথা।
 শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
 তব আঞ্জা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়!
 তাতে মোরে এই রূপা কর, দয়াময়।
 তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়'।
 এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলু'।
 ইহায়ে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈলু'।
 সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার স্নেহ ভজন।
 আমার বচনহে তোমার না টলিল মন।
 এইমত সেবকের শ্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
 প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়।
 এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
 তোমায়ে আগ্রহ আমি কৈলু' বারে বারে।
 শাক্য হুমানু তুমি শ্রীরাম-বিক্ষা।
 তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-বনল।"

ভক্ত-মাত্রেয়ই এইরূপ নিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন।
 নিষ্ঠা ব্যতীত সিদ্ধি হইতেই পারে না। রামভক্ত শ্রীহু-
 মানের রামনিষ্ঠা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীহুমান্জী
 বলিয়াছেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাশ্রমি।

তথাপি মম সর্বদাঃ রামঃ কমললোচনঃ।"

শ্রীনাথ নারায়ণ ও জানকীনাথ রামচন্দ্র উভয়েই
 ভগবান্ এবং একই তত্ত্ব; তথাপি কমললোচন শ্রীরাম-
 চন্দ্রই আমার সর্বস্ব।

শ্রীহুমান্জীর রামনিষ্ঠা-সম্বন্ধে আমরা আরও পাই,
 যথা, (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৭৭ টীকা) —

"শ্রীহুমান্জীর নিষ্ঠা দেখাইবার জন্য শ্রীদেবকী-নন্দন
 কৃষ্ণ গরুড়কে বলিলেন—'হে গরুড়, তুমি কিম্পূরুষবর্ষে গমন-
 পূর্বক শ্রীহুমান্কে আমার নিকট লইয়া এস।' গরুড়
 সেখানে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে হুমান্,

ভগবান্ যাদবেল্ল তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তুমি সম্বর
 তথায় আইস।' শ্রীহুমান্ রামনিষ্ঠ বলিয়া গরুড়ের বাক্যে
 আদর করিলেন না। তাহাতে শ্রীগরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া জোর-
 পূর্বক হুমান্কে ভগবানের নিকট আনিবার জন্ত ধরিলে,
 হুমান্ লেজের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাকে নিক্ষেপ করায়
 গরুড় স্তম্ভবর্তী দ্বারকায় আসিয়া পড়িলেন। গরুড়কে
 বিহ্বল দেখিয়া ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, — 'গরুড়,
 তুমি আবার যাও এবং বল যে, ভগবান্ রাঘবেল্ল
 তোমাকে ডাকিতেছেন।'

গরুড়কে পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের রামচন্দ্র হইলেন,
 বলরামকে লক্ষ্মণ এবং কৃষ্ণী দেবীকে সীতারূপ ধরিতে
 বলিলেন। এদিকে গরুড় হুমানের নিকট গিয়া
 সব বলিলে, হুমান্ পরমানন্দে গরুড়কে পৃষ্ঠে লইয়া
 লক্ষ্য দিয়া দ্বারকায় আসিলেন এবং তথায় ভগবান্কে
 শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করিয়া সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।"

ভগবান্ শ্রীগোরাঙ্গদেব যখন দক্ষিণদেশে শুভবিজয়
 করেন, সেইসময় একজন রামভক্ত-বিপ্র সীতাহরণ-বৃত্তান্ত
 চিন্তা করিয়া মনের হৃৎথে উপবাস করিতে থাকিলে
 কক্কাগময় মাংসপ্রভু সেই বিপ্রকে উপদেশমুখে আশ্বাস
 দিয়া বলেন, (চৈঃ চঃ মঃ ২।১১১-১১৪) —

"প্রভু কহে, — এ ভাবনা না করিহ আর।

পণ্ডিত হঞা কেনে না করহ বিচার।

ঈশ্বর-প্রেরণী সীতা — চিদানন্দমুখি।

প্রাকৃত-ইন্দ্రిয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি।

স্পর্শিবার কার্য আছুক, না পায় দর্শন।

সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ।

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দান কৈল।

রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল।"

কৃষ্ণপুরণ বলেন —

"সীতারাবিতো বহিঃছায়া-সীতামজীজনং।

তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহুপুংগতা।

পরীক্ষা-সময়ে বহিঃ ছায়া-সীতা বিবেশ সা।

বহিঃ সীতাং সমানীয *তৎ-পুংস্তাদনীনয়ং॥"

সীতাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত
 করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ

করিয়াছিল ; মূল সীতা ‘অগ্নি-পুরে’ রহিলেন। রামচন্দ্র যখন অগ্নি পরীক্ষা করেন, তখন ছায়াসীতা অগ্নিমধ্যে-প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

“পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।

জগতের মাতা সীতা — রামের গৃহিণী ॥

রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।

রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥

‘মায়াসীতা’ — রাবণ নিল, শুনিয়া আখ্যানে।

শুনি’ মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥

সীতা লঞা রাগিলেন পার্শ্বতীর স্থানে।

‘মায়াসীতা’ দিয়া অগ্নি বঞ্চিল রাবণে ॥

রঘুনাথ আসি’ যবে রাবণে মারিল।

অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥

তবে মায়াসীতা অগ্নো কৈল অন্তর্ধান।

সত্য-সীতা আনি’ দিল রাম-বিশ্বমান ॥

(১৫: ৮: মধ্য ৯২০১-২০৬)

পরলোকে শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২১ শে বৈশাখ, ১৩৮৩; ইং ৪ঠা মে, ১৯৭৬ খ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপাদের আবির্ভাব তিথি শুক্লাপঞ্চমী মঙ্গলবার দিবস পূর্বাহ্ন ৮।০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ২৯, পার্ক সাইড্‌ রোড্‌, কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৭৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে, শ্রীভগ-বৎসপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্ত-বৃন্দের সংকীর্্তনায়ুগমনে তাঁহার দেহ প্রথমে উক্ত মঠদ্বারে আনীত হইলে শ্রীমন্দির হইতে প্রসাদী মালা-চন্দন দেওয়া হয়, পরে তথা হইতে ঐ সংকীর্্তনায়ু-গমনে তাহাকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লইয়া গিয়া যথাবিধি ঔদ্ধৈহিক কৃত্য সম্পাদন করা হয়। একাদশাহে তাঁহার কৃতী পুত্রস্বয় — তাঁহাদের উক্ত কলিকাতাস্থ বাসভবনে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাস্তরিত দেওভোগ গ্রামে। তাঁহার পিতৃ-দেব পরলোকগত — শ্রীসীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতৃদেবী পরলোকগতা — শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী। তাঁহার জন্ম-তারিখ — ২৫ শে বৈশাখ, ১৩০৫; ইং ৮ই মে, ১৮৯৮। তাঁহার শিক্ষাস্থল ছিল — ঢাকা ও কলিকাতা। তিনি চাকুরী জীবনে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ ভূমি-রাজস্ব বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ইং ১৯৬০ সালে

অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর কালব্যাপী চাকুরী জীবনে স্বীয় অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার সহকর্মী এবং অন্তঃকর্মীদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চাকুরী জীবন হইতে অবসর



গ্রহণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের দিন পর্য্যন্তও তিনি কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থিত শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয় বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক এবং ৩৫, সত্যীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

তাঁহার একক প্রচেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বিদ্যামন্দির ও গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় বিদ্যামন্দিরটি প্রাইমারী বিদ্যালয় থাকাকালীন তিনি উহার সম্পাদকরূপে বৃত্ত হন, পরে তাঁহারই ঐকান্তিকী সেবাচেষ্টায় উহা প্রথমে জুনিয়ার হাইস্কুল, ক্রমে হাইস্কুলরূপে পরিণত হয়। গ্রন্থাগারেরও বহু দুস্তাপ্য ধর্মগ্রন্থ তিনি বিভিন্ন প্রদেশের লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারটি বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি পরম পুত্র চরিত্র, স্বধর্মপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, সদালাপী সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। সগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যাদেব তাঁহার ছায় শ্রীমঠের একজন অকৃত্রিম হিতৈষী বান্ধবের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। 'স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈল সঙ্গ ভঙ্গ'। স্নহদ্বর্গে বিচিত্র অদৃষ্টবিশিষ্ট, তাঁহাদের সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। ধরশ্রোতা নদীতে শোতোবেগে কাষ্ঠতৃণ

রাশি কখনও কখনও একত্র মিলিত হইয়াও আবার শোতোবেগে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই তত্বরূপে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদূষী কথা শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার স্বধামপ্রাপ্ত জামাতা শ্রীস্বধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায় মহোদয় পূজ্যপাদ আচার্য্যাদেবের শ্রীচরণাশ্রিত। শান্তি দেবী পিতার স্বধাম প্রয়াণের পর চতুর্থ দিবসে (২৪ শে বৈশাখ) দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীমদ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্বিতা তাঁহার পিতার পারলৌকিক কৃত্য — চতুর্থী শ্রাদ্ধ সম্পাদন এবং ঐ উদ্দেশ্যে শ্রীমঠে মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তৎপর বিগত ২৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার পুত্রদ্বয় ও তাঁহাদের পিতার পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে উক্ত মঠে একটি মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া উপস্থিত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপুণ্ডরীকাক দাসাধিকারী — পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যাদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত হাওড়া — ১৬ নং নিত্যধন মুখার্জী রোড, নিবাসী শ্রীপুণ্ডরীকাক দাসাধিকারী মহাশয় গত ২১ শে চৈত্র, ১৩৮২; ইং ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৬ রবিবার শুক্লাপক্ষমী তিথিতে শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের শুভাবির্ভাব বাসরে সন্ধ্যা ৭-৩০ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় শ্রীভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিণীও শ্রীল আচার্য্যাদেবের শ্রীচরণাশ্রিত। তাঁহার তিন পুত্র একাদশাহে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়-সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সাততপ্তাশ্রবিধানানুসারে ভগবৎপ্রসাদদ্বারা পারলৌকিককৃত্য সম্পাদন করেন। চতুর্বিধপ্রসাদ-

বৈচিত্র্যদ্বারা বৈষ্ণবসেবাও বিহিত হয়। শ্রীপুণ্ডরীকাক প্রভু বড় বিনয়ী নম্র সরলপ্রকৃতির বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীগুরুদত্ত দীক্ষাশিক্ষানুসরণে তিনি অদম্য উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। আমরা আশাকরি তাঁহার কৃতী পুত্রগণও বৈষ্ণব পিতার আদর্শ অনুসরণপূর্বক কুলের পবিত্র ধারা অক্ষয়-রাখিবেন।

শ্রীপার্বদারবি দাসাধিকারী—ইনি শ্রীল আচার্য্যাদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, তান্ত্রগৃহ শিষ্য। গত ২৫ শে চৈত্র, ১৩৮২; ইং ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৬ বৃহস্পতিবার শুক্লানবমী তিথিতে (অষ্টমী প্রাতঃ ৬৪৫, পরে নবমী) ইনি সকাল ৭-৩০ সাড়ে সাত ঘটিকায় শ্রীভগবান্নাম স্মরণ করিতে করিতে নিজ বাসস্থিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ইনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-পত্রিকা-মুদ্রণালয় 'শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রেস'-এর

বিবিধ সেবা মিঠার সহিত সম্পাদন করিয়া শ্রীশঙ্ক-
বৈষ্ণবের প্রচুর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। পরমকরুণাময়
শ্রীশঙ্ক-গোরাঙ্গের শ্রীচরণে প্রার্থনা, তাঁহার কৃপাপূর্বক
তাঁহার পরমকল্যাণ বিধান করুন।

শ্রীনারায়ণদাস — এই ভক্তবর কৃষ্ণনগর (নদীয়া
জেলা সদর) তালপুকুর বোডস্থ তৎপুত্র শ্রীঅজিত
দাসের গৃহে গত ১লা বৈশাখ, ১৩৮৩; ইং ১৪ই
এপ্রিল, ১৯৭৬ বুধবার শ্রীবলরামের রাদযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের
বসন্তরাস তথা শ্রীল বংশীদানানন্দ ঠাকুর ও শ্রীল শ্রুমা-
নন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব পৌর্ণমাসী বাসরে শ্রীহরি-
নাম গ্রহণ করিতে করিতে সন্ধ্যানে ৭০ বৎসর বয়সে
সকাল ৬-৩০ সাড়ে ছয় ঘটিকায় দেহ রক্ষা করেন।
তিনি দুই বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠাধ্যক্ষ পূজ-
নীয় শ্রীল আচার্যদেবের নিকট শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল আচার্যদেবের নিকট শ্রীনাম
ও মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী রেখাদাসীর
একান্ত ইচ্ছায় কৃষ্ণনগর-মঠরক্ষক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ
ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে গত ১৩ই
বৈশাখ, ১৩৮৩ সোমবার উক্ত কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়
মঠে সাত্তত-স্মৃতিবিধানানুসারে মহাপ্রসাদাঙ্গদ্বারা তাঁহার
পারলৌকিক কৃত্য মহাসমারোহে স্নসম্পন্ন হইয়াছে।
শ্রীক্ষে মুখ্যাক্ষরূপে ভগবদ্রিবেদিতার-দ্বারা বৈষ্ণবগণের
তৃপ্তিবিধানরূপ বৈষ্ণবভোজনের অবশুকর্তব্যতা নির্দ্ধারিত
থাকায় শ্রীমতী রেখা মাতা বৈষ্ণবসেবারও প্রচুর
আয়োজন করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবপ্রীতিভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপ্রমথ নাথ রায় — ইনি অন্তরীম পরমারাধ্য
কৃষ্ণপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচর-
ণাশ্রিত। আমাদের ব্রহ্মরজঃপ্রাপ্ত সতীর্থ শ্রীপাদ সখী-
চরণ দাস ভক্তিবিজয় প্রভুর ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ইহাদের নিবাসস্থল — ১৪০এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রাইট,
কলিকাতা। গত ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৮৩; ইং ১৭ই এপ্রিল,
১৯৭৬ শনিবার কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে ইনি সকাল ৬-৩০
সাড়ে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীশঙ্কগোরাঙ্গগাঙ্গবিকাগিগিধারী-
পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণমিশন হাস-
পাতালে দেহরক্ষা করেন। ইহার লোকান্তরিত দেহ
দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠদ্বারে আনীত
হইলে, তাঁহাকে শ্রীশ্রীশঙ্কগোরাঙ্গরাধানয়ননাথজীউর
প্রসাদী মালাচন্দন দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল।
কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁহার শেষ ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য
সম্পাদন করা হয়। ইনি বৈষ্ণবোচিত বহু সদৃশ-
বিমণ্ডিত ছিলেন। অল্পবয়সেই দেহ রক্ষা করেন।
মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ আচার্যদেব এই সময়ে মঠে উপস্থিত
ছিলেন না। তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।
অকস্মাৎ তাঁহার অপ্রকটবার্তা শ্রবণে তিনি খুবই মশ-
বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ মাতৃদেবী
এখনও প্রকট আছেন। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা
রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

তাঁহার — বিরহ-সমস্তপ্ত আত্মীর-স্বজনকে মনঃস্বপ্ননা
দিবার ভাবা আমাদের নাই। তবে তাঁহাদের বংশের
প্রতি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি
আছে। প্রভুপাদই তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ কোন সেবার
জন্ত তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন,
ইহা মনে করিয়াই তাঁহার। তাঁহাদের বিচ্ছেদবিফল
চিন্তকে সামান্য প্রদান করুন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

(পূর্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর)

১৩৩৭৬ শনিবার — অষ্ট আশ্বিন পরিক্রমা বাহির
হয় নাই, শ্রীমঠেই বিশ্রাম করা হয়। আমরা সকালে
স্নানান্তিক পূজাপাঠাদি সমাপনান্তে গতকল্যের

শ্রীশ্রীসিংহদেবের পরমায় প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক
পারণ সম্পাদন করি। যাত্রিসংখ্যা প্রায় দুই সহস্র।
সকলেরই এক ধ্যান এক জ্ঞান। শ্রীগৌরধামে সপার্বদ

শ্রীগৌরমন্দিরের মহাবদান্ত লীলাকথা আলোচনায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আত্মহারা। অপ্রাকৃত ধামের অপূৰ্ণ আকর্ষণ ভাগ্যবান যাত্রিবৃন্দের অনেকেই স্পষ্টতঃ অনুভব করিতেছেন। সন্ধ্যায় আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়। জোর বাতাস বহিতে থাকে, সামান্য ২১১ ফোঁটা জল হইয়া থামিয়া যায়। সন্ধ্যারতির পর সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ স্ববীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমদ্বল্লভনিলয় ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার পর পূজাপাদ আচার্যদেব ও শ্রীমদ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ কিছু বলেন। মহামন্ত্র কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

অতঃপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্ভঙ্গামী শ্রীমন্তুক্তি-বেদান্ত স্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীমাদপুরাচন্দ্রোদয় মন্দির' (ISKCON) হইতে কএকজন সেবক আসিয়া পরিপ্রশ্নমুখে পূজাপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করেন। ইংরাজী ভাষায়ই কথাবার্তা হইয়াছিল। ১৪।৪।৭৬ রবিবার—পরিক্রমার পঞ্চমদিবস—পাদ-সেবনাথ্য ভক্ত্যঙ্গযজ্ঞনস্থল কোলদ্বীপ, কুলিয়া বা সহর নবদ্বীপ, অর্চনাথ্য ভক্ত্যঙ্গযজ্ঞনস্থল গুতুবীপ—চাঁপাহাটি ও বিজ্ঞাননগর, বন্দনাথ্য ভক্ত্যঙ্গযজ্ঞনস্থল—জহুবীপ বা জারননগর এবং দাস্তাথ্য ভক্ত্যঙ্গযজ্ঞনস্থল মোদজমদ্বীপ বা মামগাছি—চারিটি দ্বীপ একদিনেই পরিক্রমা করা হয়। অতঃপ্রাতে শ্রীমদমহাপ্রভু পরিক্রমায় বাহির হন, আমরা তাঁহার অনুগমনে শ্রীপাদ যাবাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক শ্রীক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরে উপস্থিত হই। তথায় প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক ভাগীরথী তটে আসি। প্রায় দুই সহস্র যাত্রীর পার হইতে অনেক সময় লাগে। যাহা হউক আমরা ধৈর্য্য পার হইয়া সকলে একত্রিত হইয়া উদ্গুন্যাকীর্তনরত বিশাল সংকীর্তনশোভাযাত্রা সহ প্রথমে পোড়ামা তলায় উপস্থিত হই। প্রৌঢ়ামায়া শব্দের অপভ্রংশই 'পোড়ামা'। একটি ঘনচ্ছায় বিশাল বট-বিটপীমূলই শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া দেবীর অধিষ্ঠানরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। এই বটবৃক্ষের একপার্শ্বে শ্রীভবতারিণী মাতার মন্দির, অপর পার্শ্বে শ্রীভবতারণ শিবমন্দির।

আমরা শ্রীভবতারিণী মাতার মন্দিরালিন্দে শ্রীমদমহাপ্রভুর শিবির (পালকি) সংরক্ষণপূর্বক শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত্যে সশক্তিক শ্রীমদমহাপ্রভুকে প্রণতিজ্ঞাপন করিয়া তৎপদাস্তিক উপবেশন করি। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব একটি ভাষণ প্রদান করেন।

অতঃপর তন্নিক্শীলসারে শ্রীমদ গিরি মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত শ্রীযোগমায়ায় কৃপাপ্রার্থনা-মূল্য একটি গীতি (আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে ইত্যাদি) কীর্তন করেন। শ্রীমদ পুরী মহারাজ শ্রীকোলদ্বীপমহাত্মা পাঠ করেন। অতঃপর আমরা শ্রীভবতারিণীদেবী, শ্রীপ্রৌঢ়ামায়াদেবী ও শ্রীভবতারণ মহা-দেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনাপূর্বক তৎসমীপে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করতঃ শ্রীশুকগোরাঙ্গাধ্বগমনে শ্রীদেবানন্দমোড়ীমঠে যাই। তথায় শ্রীশুকগোরাঙ্গগার্কাকগিরিধারী ও শ্রীবরাহ দেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করতঃ সতীর্থ পূজ্যপাদ শ্রীল কেশব মহারাজের সমাধিমন্দির বন্দনা করিয়া সংকীর্তন শোভাযাত্রাসহ আমরা বরাবর চাঁপাহাটি গমন করি, তথায় শ্রীগৌরপার্বদপ্রবর শ্রীবিজবাণীনাম্য সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণপূর্বক শ্রীমদনে বিশ্রাম গ্রহণ করি। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পরমারাধা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই লুপ্ততীর্থের পুনরুদ্ধার ও প্রাচীন সেবা শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের নিয়মিত সেবাপরিচালনাদির স্বব্যবস্থা করার কথা কীর্তন করিলে, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ এখান হইতেই সমুদ্রগড়ের ভক্তরাজ্য শ্রীসমুদ্রসেন-প্রসঙ্গ তথা শ্রীবিজবাণীনাম্য ও শ্রীগৌরগদাধর কথা এবং ভক্ত কবি শ্রীজয়দেব ও শ্রীপদ্মা-বতীকথা শ্রীধামমহাত্মা হইতে পাঠ করেন। শ্রীমদ গিরি মহারাজ কীর্তন করেন। অতঃপর শ্রীগৌরগদাধরের কিছু প্রসাদ সন্মান করতঃ আমরা এখান হইতে বিজ্ঞাননগর যাত্রা করি। তথায় প্রথমে পরমারাধা শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীসার্বভৌমগোড়ীমঠ-মন্দির বন্দন ও প্রদক্ষিণ করতঃ আমরা শ্রীসার্বভৌম ভবনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশিবমন্দির বন্দনা করি এবং তথায় কল্লতরু প্রদক্ষিণান্তে তরুমূলে বিশ্রাম করি।

এ স্থানে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাংগায়া হইতে শ্রীঋতুবীপ ও শ্রীবিজ্ঞানগর-মাংগায়া পাঠ ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ শ্রীবিশুভৈষ্ণবমাংগায়া-সূচক মহাজ্ঞানপদাবলী কীর্তন করেন। দ্বিপ্রহর হইয়া যায়। প্রথর রোদ্ৰতাপ। শ্রীগৌরধাম, ধামবাসিতত্ত্ববৃন্দ ও ধামেশ্বর শ্রীগৌরহরির অপার কল্পণাবলে পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দ পথকষ্ট সহ করিয়া বিজ্ঞানগর হাইস্কুলের নিকটবর্তী একটি বটবৃক্ষ মূলে উপনীত হন। অত্যন্ত বারে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল গৃহেই শ্রীমন্মাংগপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিতেন। এবার তাঁহাদের উদাসীন্ম দর্শনে সপার্বদ আচার্যদেব বিশেষ ব্যথিত হন। গ্রামটিও এবার দেখা গেল শ্রীহীন। বড় বড় পুষ্করীগুলি আবর্জনাপূর্ণ, নানীয় ও পানীয় জলের বিশেষ অভাব অনুভূত হইল। আমাদের বিশ্রামস্থান বটবৃক্ষটিও শাখা-হীন হইয়া পড়ায় ছায়াও সঞ্চারিত। দূর হইতে পানীয় জল আনিয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে খুবই উদ্বিগ্ন পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক বস্ত্রবেষ্টনুমধ্যে শ্রীমন্মাংগপ্রভু ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অর্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিহিত হইলে আমাদের প্রসাদ সন্মান করিতে অপরাহ্ন ৩টা বাজিয়া যায়। ৪টায় আমরা সেখান হইতে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করি। জহুদীপ বা জামগরে উপস্থিত হইয়া একটি বটবৃক্ষতলে শ্রীমন্মাংগপ্রভু বিশ্রাম করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ তথায় জহুদীপ-মাংগায়া কীর্তন করিলে ভক্তগণ তত্রতা ধামরজঃমণ্ডকে ধারণ করিয়া মোদক্রমদীপ বা মামগাছি অভিমুখে চলিতে থাকেন। তথায় প্রথমে আমরা শ্রীশাধু মুরারি ঠাকুরের শ্রীপাটে উপনীত হই। বিশাল সিদ্ধাকুলতলস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীশাধু-মুরারিপূজিত শ্রীরাধাগোপীনাথ, শ্রীশঙ্করদেবভট্টাকু-প্রপু-জিত শ্রীরাধামদনগোপাল প্রাচীন বিগ্রহ এবং পরবর্তি-

কালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর শ্রীমূর্তিদর্শন ও বন্দন করিয়া আমরা তথা হইতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করি। পরমাংগায়া শ্রীল প্রভুপাদই এই স্থানের সেবা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়, আমাদের ভাগ্যদোষে সেবাটির তাদৃশ ওজ্জ্বল্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না। আমরা বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থান করি। শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ বৈষ্ণব-মাংগায়াসূচক পদাবলী কীর্তন করিলে শ্রীল আচার্যদেব সংক্ষেপে স্থানমাংগায়া সম্বন্ধে কিছু বলেন। অতঃপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাংগায়া পাঠ করিলে আমরা এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ মহৎপুর গ্রামে উপনীত হই। এখানে এক ভক্তের বহির্বাটীস্থ পূজামণ্ডপে আমাদের প্রত্যক্ষ শ্রীমন্মাংগপ্রভুর শিবিকাসহ বিশ্রাম করা হয়। এবার এখানে পৌছিতে অন্ধকার বেশ ঘনীভূত হইয়া পড়ে। শ্রীপুরী মহারাজকে মোমবাতির আলোকে শ্রীবৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুরাদির মাংগায়া পাঠ করিতে হয়। যাত্রিবৃন্দকে পথ চলা ও গঙ্গা পার হওয়া সম্বন্ধে খুব সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীমন্মাংগপ্রভু ভক্তিবিঘ্নবিমোক্ষন শ্রীনৃসিংহ-রূপে আমাদের সকল বিঘ্ন দূর করিয়া আমাদের সকল-কেই লইয়া নিবিঘ্নে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে উপনীত হন। পথে চল্লীলোক থাকায় অন্ধকার জন্ম বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ শ্রীমন্দিরে নিজ নিজ সিংহাসনে অবস্থিত হইলে বিপুল জয় জয় ধ্বনিসহ আরাত্রিক কীর্তন ও শ্রীতুলসীপরিক্রমণাদি বিহিত হয়। রাত্রে নিয়মিতভাবে সভার অধিবেশন হয়। পূজাপাদ শ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীল আচার্যদেবের ভ্রমণ-সূচী

পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্যদেব শ্রীধামনববীপ পরিক্রমার পর কলিকাতা হইতে ৩১/৩/১৬ তারিখে দিল্লী যাত্রা করেন। তথায় আগরওয়াল মিল্লনগল ট্রাষ্ট ভবনে [D 13A/3I Model Town, Delhi-9] অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ২৪/১/১৬ — ২৪/১/১৬ সভাপতিত্ব করেন। তথা হইতে চণ্ডীগড় যাত্রা করিয়া ১/৪—১১/৪ পর্যন্ত শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব সমাপনান্তে ১৫/৪ হইতে ১৮/৪ তাং পর্যন্ত জ্ঞানঙ্কর সংঘে এবং ২০/৪ হইতে ২৪/৪ তাং পর্যন্ত হোসিয়ারপুরের উৎসব সম্পন্ন করতঃ তথা হইতে অমৃতসর যাত্রা করেন। তথায় ২৫/৪ হইতে ২৮/৪ পর্যন্ত মহাসম্মেলনে অভিভাষণ প্রদানান্তে পুনরায় চণ্ডীগড় মঠে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ১১/৫ তাং কলিকাতায় পৌছান। পুনরায় ১৭/৫ প্রাতে বিমানযোগে আগরতলা যাত্রা করেন। তথা হইতে ২১/৫ তাং কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া ২৪/৫ তাং হায়দরাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। তত্রত্য মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনান্তে আগামী ৭/৬ তাং শ্রীপুরীধাম হইয়া ১১/৬ তাং কলিকাতা মঠে পৌছিবেন।

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্।
আনন্দানুদ্বিভর্জনং প্রতিপদং পূর্ণায়ুতান্মাদনং
সর্ববান্ধবপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮৩। { ৫ম সংখ্যা
১৭ বামন, ৪৯০ শ্রীগোরাঙ্গ; ১৫ আষাঢ়, মঙ্গলবার; ২৯ জুন, ১৯৭৬।

সজ্জন-সর্বোপকারক

[ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

জগতে জীবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্নাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। প্রথমতঃ অগ্নাভিলাষী — যাঁহারা, কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তিব্যোগ স্বীকার না করিয়া, নিজ ক্রটিমতে চালিত হইয়া যথেষ্ট আচরণ করেন এবং তাদৃশ আচরণ দ্বারা নিজ সুখাধ্বষণকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানেন।

দ্বিতীয়তঃ কর্মাবলম্বক — যাঁহারা সংকর্ম্ম অমূল্য পূর্বক নিজ সুখভোগ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া পুণ্য সংগ্রহ করেন। পিতৃশ্রদ্ধা, স্বর্গসুখভোগ, মহঃ-জন-তপঃ-সত্য-লোক লাভেচ্ছায় চেষ্টাবান্, জীবের জড়সুখ লাভের উদ্দেশ্যে ঐহিক-চেষ্টা-বিশিষ্ট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অশ্বখ-প্রতিষ্ঠা, পথনির্মাণ, জলদানাদি-ইষ্টাপূর্ত্ত, ব্রাহ্মণ-ভোজন, লোকহিতকর-ভিক্ষামন্দির প্রভৃতি কার্যাদ্বারা পুণ্য সংগ্রহপূর্বক তত্তৎ সংকর্ম্মের পরিবর্ত্তে ফল-স্বরূপে নিজ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা নিজের জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ প্রভৃতি-কার্যে তৎপর। উহাকেই তাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-লাভ-নামক ত্রিবর্গসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। কর্ম্ম-কাণ্ডের মানবগণ অনিত্য ফলভোগ-কামনায় জগতের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ নহেন। পুণ্যবান্ কর্ম্মীর ব্রত, ইষ্টযোগ ও বৈদিকানুষ্ঠান-গত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রভৃতি

অনিত্য সংকর্ম্মগুলি, অগ্নাভিলাষীর যথেষ্টাচার হইতে অপেক্ষাকৃত সং। অগ্নাভিলাষী অপেক্ষা সংকর্ম্মপর মানব অনেকের অনিত্য ও আংশিক উপকার করিতে সমর্থ, কিন্তু সর্বোপকারক নহেন। কর্ম্মী নিজেরই বার্থ উপকার করিবার সম্বন্ধে উদাসীন, আবার নিজ-জন বলিয়া যাহাদিগকে বলেন, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। ঐহিক বা আনুজিক ষণ্ডকালগত শ্রেয়োলাভের পক্ষা ব্যতীত নিত্যসুখ ও পূর্ণসুখের দৃষ্ট তাঁহাদের হৃদয়ে দৃগ্গোচর হয় না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কর্ম্মী, জগতে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ দেন এবং নিজে সেই উপদেশ-কালে অনিত্য জড়সুখ অর্জন করেন মাত্র।

তৃতীয়তঃ জ্ঞানী, — কর্ম্মকাণ্ডনিপুণের দ্বায় আংশিক ও অনিত্য সুখের ভিক্ষু নহেন। জ্ঞানীর বিচারে, ষণ্ডকালের অনিত্য সুখ কখনই পূর্ণ নহে, সুতরাং কর্ম্মীকে তিনি নিতান্ত ষড়্দৃষ্টিসম্পন্ন ভোগী বলিয়াই জানেন। জ্ঞানীর মতে অগ্নাভিলাষীর চেষ্টা ও কর্ম্মীর পুণ্যাদি উভয়ই বর্জনীয়। তিনি ভোগী নহেন, আপনাকে ভোগী বা বৈরাগী বলিতে ব্যস্ত। জ্ঞানী বলেন, ভোগ-বুদ্ধিতে অজ্ঞান বাস করে, কালদ্বারা তাহা পরিবর্তিত হয়। তাঁহার বিচার মতে বস্তুর অদ্বয়তার সহিত

নির্বিশেষভাবে বিজড়িত। নির্বিশেষ বিচারে বস্তুর বিচিত্রতা না থাকায়, দৃষ্টা দৃশ্য ও দর্শনগত নিত্য বিশেষ নাই। অহংগ্রহোপাসক মুমুক্শু জ্ঞানী বলেন, এই ভেদজগতে অজ্ঞানক্রমে দ্বৈততাব উদয় হওয়ায় এই প্রকার অশান্তি কলিত হইয়াছে। অজ্ঞান তিরো-
হিত হইলেই অখণ্ড-জ্ঞান, অখণ্ড-সত্তা ও অনবচ্ছিন্ন-
নন্দের উদয় হয়। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ; দৃষ্টা,
দৃশ্য ও দর্শন ; আনন্দাস্তিত্ব, আনন্দানুভবকারী ও
আনন্দ-নামক বিশেষত্বয় অনন্তকালের জ্ঞান বিলুপ্ত
হইয়া অদ্বয়তার নির্বিশেষত্বই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানীর
এই নির্বিশেষ কেবলদ্বৈতসিদ্ধিই বহুমাননের বিষয়।
তিনি মনে করেন, এইরূপ শুদ্ধ-পূর্ণ-নিত্য-মুক্ত ভগবৎ-
সত্তাকে জড়ের প্রকারভেদরূপে প্রচার করিয়া জগতের
মঙ্গল বিধান করিবেন। এইরূপ একটি কাল্পনিক
জড়বিচার কখনই ভগবানের অনন্ত শক্তিমত্তার
হাস করিতে সমর্থ হয় না। ভববোগের চিকিৎসার
জ্ঞান অস্ত্রাভিলাষী ও কর্মী অসমর্থ হইয়াছে দেখিয়া,
জ্ঞানাবলম্বকের মুমুক্ষাবিচারে ঈশ্বররাহিত্যের মায়া
দর্শনে, ভগবত্তত্ত্বগণ উপকৃত হন না। যথেষ্টাচারী—
নাস্তিক্য প্রচার করিতে গিয়া যে-সকল কথা বলিয়া-
ছেন, তাহাই জ্ঞানী নানাধিক সমর্থন করিয়া নিজ-
দল পুষ্টি করায় ভগবত্তত্ত্বগণ উপকৃত হইলেন না,
একথা মায়াবাদী জ্ঞানীও বুঝিতে পারেন। মুমুক্শু—
বিচারকের পরিচ্ছেদে যে-সকল উপদেশ থাকে
দিলেন, সে-সকল কথাই অজ্ঞানোক্ত জড়বিচারাদীন,
স্বতরাং তাদৃশ করণমায়াযো তাদৃশ অনুষ্ঠানের মায়া
ভক্তিবোধীর নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হান্তাপদ
মাত্র। জ্ঞানীর লক্ষ্য বস্তু কার্যে পরিণত করিতে
সমর্থ হইলে, আত্মবিনাশরূপ চরম ফল লাভই ঘটে।
নির্বিশেষত্ব কার্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার
ঐ প্রকার দলপোষণ স্বীয় অপকৃত্যের নিদর্শন মাত্র।
অপক পনসকে যদি প্রপক কাঁঠালে পরিণত করা
হয়, তাহা হইলে উহা এঁচড়ে পাকা বলিয়া উদ্দেশ্যের
ব্যাঘাত করে। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ নিত্যকাল পূর্ণ
চিদ্বিলাসরঙ্গে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপশক্তি প্রকট করিয়া

যে সর্বোপকারকতা বিস্তার করিতেছেন, তাহা ভক্তের
নিত্যপরিপন্থী-নির্বিশেষবাদীর জ্ঞানের গম্য নহে।
নিষ্ঠুর জ্ঞানী, সজ্জনের চরণে নিত্যকাল অপরাধী
বলিয়া মোক্ষের যে কাল্পনিক চিত্র জড়বিচারে অঙ্কন
করিয়াছেন, তদ্বারা ভক্ত ব্যতীত অন্তের উপকার করিতে
সমর্থ মনে করেন। ভক্তিবোধের পরিপন্থী জ্ঞানযোগ
কখনই কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না।
জড়বস্তুর অনুপাদেশতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার
অভিপ্রায়ে চিন্ময় শক্তিমান্ ভগবান্কে কেবলমাত্র
নির্বিশেষবাদরূপে পাতিত করিয়া যে অপরাধ সঞ্চিত
হয়, তদ্বারা মুমুক্শুর কোন উপকার হয় না এবং ভক্তেরও
তিনি কোন উপকার করিতে পারেন না। মায়াবাদী
মুমুক্শু তমোশুণের দ্বারা বিচার করিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ
ভগবত্তত্ত্বকে জড়নির্বিশেষত্বে স্থাপন করিলেই তিনি
কি-প্রকারে সর্বোপকারক হইবেন? জড়নির্বিশেষ
কখনই চিং-সবিশেষের তুল্য নহে। চিত্তনির্বিশেষ
মুখে বলিয়া উহাকে জড়-সবিশেষের প্রকারভেদ
জ্ঞান করিলে অজ্ঞানপুষ্ঠ হয়, তাহা কখনই মুক্তপুরুষের
চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। অহংগ্রহোপাসক নির্বিশেষ
বৈদান্তিক নিজ মৎসরতাময় চিত্তবৃত্তিকে শাস্তরস
বলিয়া প্রতিপাদন করিলেই যে, তিনি সর্বোপকারক,
সজ্জন-সংজ্ঞা লাভ করিবেন, একথা সজ্জন কখনই
বলেন না। কপটভক্ত মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া
বৈষ্ণব-পরিচর্যাকাজ্ঞী বলেন যে, তাঁহার সর্বোপকারক,
যেহেতু তাঁহার নিঃশ্রেয়স কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয়
করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানভাবে তাঁহার
শুদ্ধভক্ত-সংজ্ঞায় কখনই দৃষ্ট হইতে পারেন না। যে-
কাল-পর্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্গীর্ণ সাম্প্রদায়িক-ভাব
পুষ্ঠ হইতেছে, মায়াবাদী, কর্মী, যথেষ্টাচারী প্রভৃতি
পরহিংসাময় ভাবসমূহ হৃদয়ে অঙ্কুসলিলা কঙ্ক-
নদীর জ্ঞায় প্রবাহিত হইতেছে, সেকালপর্যন্ত পরো-
পকারের স্বরূপ-প্রতীতি তাঁহাদের হৃদয়ে অধিকার
করিতে পারে না।

শেষতঃ শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই একমাত্র সর্বোপকারক।
তিনিই সজ্জন। শুদ্ধভক্তই মায়াবাদীকে তাহার

বিচারমুক্ততা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, তিনিই কর্ম্মীকে তাঁহার ফল ভোগবাসনা হইতে উদ্ধার করিতে বলবান্, তিনিই কেবল যথেষ্টাচারীকে তাহার ক্ষুদ্র অভিলাষের কৈঙ্কর্য্য হইতে উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে ক্ষমবান্। সেই জন্তই শুদ্ধ-ভক্ত কুলশেখর বলিয়াছেন, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অথবা পার্থিব অশান্তি অপনোদনের চেষ্টা-রূপ মোক্ষ, শুদ্ধভক্তের থাকিতে পারে না, মুমুক্ষা-নাশী ছলনা কখনই শুদ্ধভক্তকে আক্রমণ করিতে পারে না। একমাত্র জীবের নিত্যবৃত্তি হরিসেবাই জীবের পরমোপকারে সমর্থ এবং হরিজনগণই সর্বোপ-কারক। তাঁহার মায়াবাদীর তায় মতবাদ প্রচার বা ভোগীর তায় ইঞ্জিয়-তর্পণমূলে বিক্রমস্বার্থে প্রমত্ত নহেন। কৃষ্ণস্বার্থ ব্যতীত মায়িক ভোগপর স্বার্থ বা জড়ত্যাগপর অনর্থ ভক্তকে কোনদিন গ্রাস করিতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত জীবের কালনিক অধবর্গ মার্গ কখনই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে

সমর্থ নহে। একমাত্র কৃষ্ণকপ্রপন্ন সজ্জনই নিজোপ-কারক এবং সমগ্র জগৎকে হরিজনজ্ঞানে সর্বোপ-কারক সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য। শুদ্ধভক্ত, সর্বদাই অগ্ন্যভিনাবী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত, আবার মিছাভক্তগণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে বলবান্। সজ্জনকুলচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন — “কর্ম্মী-জ্ঞানী-মিছাভক্ত, না হব তাতে অনুরক্ত”। সর্বোপকারকের কিরূপ বিস্তারিণী দয়া, সজ্জনগণ হৃদয়ে ধারণা করুন এবং তাদৃশ সর্বোপকারক হইয়া কৃষ্ণসেবা করুন, ইহাই শুদ্ধভক্ত-গণের একমাত্র ভিক্ষা। সজ্জন নিঃস্বংসর। অসজ্জন সমংসর। মংসরতা প্রবল হইলে উপকারবৃত্তি তিরো-হিত হইয়া অপকার বা হিংসায় পর্য্যবসিত হয়। সজ্জন নিত্য কৃষ্ণদাস, স্তবরাং মায়াবাদী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর মংসরতা তাঁহাকে কোনদিন আক্রমণ করে না। তিনি নিত্যকাল মংসর সম্প্রদায়ের উপকার করিয়া সর্বোপকারক নামের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

শ্রীভক্তিনিনোদ-বানী

(জীবে দয়া)

প্রঃ — সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার কি ?

উঃ — “সর্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সংকর্ম্ম মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান — এই সকলই দেহ-সম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। বিজ্ঞা-দানই জীবের মনঃসম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু জীবের আত্ম-সম্বন্ধিনী দয়াই সর্বোপকারি। সেই দয়া-প্রবৃত্তি হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-রেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়।”

— ‘পরহিংসা ও দয়া’, সং. তোঃ ৯৯

প্রঃ — ‘জীবে দয়া’ বলিতে কোন্ প্রকার জীবের প্রতি দয়া বুঝায় ?

উঃ — “‘জীবে দয়া’ এই কথাটি কেবল বদ্ধজীব-সম্বন্ধে — ইহা বৃত্তিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে ষাঁহার কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবগণের মধ্যে ষাঁহার বালিশ-অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতিই দয়া করিতে হয়।

— ‘জীবেদয়া’, সং. তোঃ ৪৮

প্রঃ — কর্ম্মী, জ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তগণের পরোপকার-বৃত্তির মধ্যে তারতম্য কি ?

উঃ — “কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল তত-দূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধিনী ও মনঃ-সম্বন্ধিনী দয়াকেই অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর

করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের
নিত্য-মঙ্গল সাধনের যত্ন করেন।”

— ‘পরহিংসা ও দয়া’, সং: তো: ৯৯

প্রঃ — বৈষ্ণবের পক্ষে জীবে দয়ার একমাত্র
পরিচয় কি?

উঃ — “জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী-
প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য
করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়।”

— ‘জীবেদয়া’, সং: তো: ৪৮

প্রঃ — বৈষ্ণব জীবের প্রতি কিরূপ দয়া করেন?

উঃ — “জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান
কার্য্য। যে-স্থলে স্থল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা
ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণ-
বতা নাই; যেহেতু তদ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়,
কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐসকল
কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে
পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়।”

— ‘জীবেদয়া’, সং: তো: ৪৮

প্রঃ — আদর্শ আচার ও প্রচার কিরূপ হওয়া উচিত?

উঃ — “তোমাদের সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও।
তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার
ভ্রাতৃগণ, তাহারা অসং কার্য্যের দ্বারা পতিত হইতেছে;
তোমার কর্তব্য এই যে, তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া
তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও।”

— ‘সাধুশিক্ষা’, সং: তো: ৫১০

প্রঃ — কিরূপ বিষয়িগণ বৈষ্ণব-রূপা-পাত্র?

উঃ — “নিরুপট বিষয়ি-জনের প্রতি রূপা করা উচিত।”

— ‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচার’, ভা: ম: ১৫১২৬

প্রঃ — বৈষ্ণব কিরূপ প্রচার-ফলে সুখী হন?

উঃ — “দ্বারে-দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে
যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণ-
ভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজকার্য্যে বিশেষ সুখলাভ
করেন।” — ‘জীবে দয়া’, সং: তো: ৪৮

প্রঃ — জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সম্ভার কোন ভেদ
আছে কি?

উঃ — “দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্নবৃত্তি হইতে
পারে না,—জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সম্ভার ভিন্নতা নাই।”

— কৃ: সং ৮১৮

প্রঃ — বৈষ্ণবের দয়া কিরূপ? উহা সর্বোত্তম কেন?

উঃ — “বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বন্ধাবস্থায়
পাত্রবিশেষে মৈত্রী, রূপা ও উপেক্ষারূপ ভাবসকল
নিত্য স্বধর্ম্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসা-
রিক জীব-সম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের
স্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রক্ষুটিত হইলে অগৃহ্যবাসি-জীবনিষ্ঠ;
আরও প্রক্ষুটিত হইলে স্ববর্ণনিষ্ঠ; আরও প্রক্ষুটিত
হইলে স্বদেশবাসি-স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রক্ষুটিত হইলে
স্বদেশবাসী-সর্বজননিষ্ঠ; আরও প্রক্ষুটিত হইলে সর্ব-
মানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রক্ষুটিত হইলে সর্বজীবনিষ্ঠ
আদ্র্ভাব বিশেষরূপে পরিচিত। ইংরাজী ভাষায়
যাহাকে পেট্রিয়টিজম্ (Patriotism) বলে, তাহা
স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ-ভাব-বিশেষ। যাহাকে ফিলান-
থপি (Philanthropy) বলে, তাহা সর্বমানবনিষ্ঠ-
ভাববিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সন্ধীর্ণভাবনিচয়ে আবদ্ধ
থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদগ-
রাহিত্যরূপা সর্বজীবের প্রতি পরম আদ্র্ভা স্বরূপা
দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব।” — চৈ: শি: ৩৩

“কৃষ্ণ পাইয়ে ভজনে”

[পরিরাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

জগদগুরু ব্রহ্মা শ্রীভগবান্কে শ্রব করিয়া বলিতেছেন—

“অহং গিরিত্রস্ত সুবাদয়ো যে

দক্ষাদম্নোহগ্নেবিব কেতবন্তে।

কিংবা বিদ্যামেশ পৃথগ্ভিভাতা

বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্ ॥” — ভা: ৮৬১৫

অর্থাৎ হে ভগবন্! আমি, শিব এবং অন্যান্য-

দেবগণ ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণ—আমরা সকলেই অগ্নিফুল্লিঙ্গের ছায় আপনা হইতে পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত। অতএব আমরা শ্রেয়ঃ কি-ই বা জানি। হে ঈশ, আপনিই দ্বিজ-দেবগণের মঙ্গল ও উপায় বিধান করুন। আমাদের বুদ্ধিচাতুর্য্যাদি রসাতলে ঝাউক।

“যথায়িমেষস্তমুতঞ্চ গোমু

ভুব্যন্নমম্বত্মমেনে চ বৃত্তিম।

যোগৈর্মমুখ্যা অধিযন্তি হি ভাং

গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি।” —ভাঃ ৮।৩।২২

অর্থাৎ যেরূপ মানবগণ মথনাদি উপায়াবলম্বনে কাষ্ঠে অগ্নির উদ্ভব উপলব্ধি করিতে পারে, দেখিতে ছন্দ আছে, কিন্তু দোহনাদি উপায় অবলম্বন করিয়া ত’ সেই ছন্দ পাইতে হইবে? পৃথিবীতে অন্ন আছে, কিন্তু কৃষ্যাদি উপায় অবলম্বন করিলে যেমন তাহা লব্ধ হয়, মৃত্তিকা-মধ্যে জল আছে, কিন্তু খননাদি উপায় অবলম্বন পূর্বক যেমন সেই জল প্রাপ্ত হইতে হয়, বাণিজ্যাদি পুরুষাকারদ্বারা যেমন জীবিকা অর্জন করিয়া লইতে হয়, পণ্ডিতগণ সেইরূপ গুণময় জগতে নিষ্ঠুর—গুণাতীত শ্রীভগবান্ আপনাকে ‘ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য হই’ এই ভগবদ্বক্তি অনুসারে শুদ্ধ ভক্তিয়োগ-দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সেই ভগবদ্বক্ত বুদ্ধি-দ্বারাই তাঁহার গুণ কীর্তন করেন।

সুতরাং নিরলস হইয়া সদগুরুপাদাশ্রয়ে সাধনভঞ্জে রত হইতে হইবে। বেদান্তসূত্রও ‘অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্’ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪) সূত্রদ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তু নিষ্ঠুর, প্রাকৃত আকার ও বিশেষ রহিত হওয়ায় তিনি প্রাকৃত গুণ-জাত বস্তুর ছায় দৃষ্ট ও শ্রুত হন না বটে, কিন্তু যথার্থভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইলে তিনি চাক্ষু-প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ‘পরাক্ষিখানি’ ইত্যাদি কাঠক-শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মা জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্গুণ বা বিষয়প্রবণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তজ্জন্ত জীব অন্তরাঙ্গাকে দর্শন করে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে যে মুক্তির আত্যন্তিক অভাব আছে বলিয়া মনে করিতে

হইবে, তাহা নহে। কেননা কোন কোন ধীর বিচক্ষণ বিবেকীপুরুষ অমৃতত্বলাভের কামনায় সংসদ্বলক হরিভক্তি-দ্বারা বহির্গুণ-বৃত্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্গুণ-বৃত্তি-বিশিষ্ট করিয়া তদ্বারা সেই প্রত্যগাত্মা — প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য স্বয়ংপ্রকাশমান পরমাত্মা শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকেন। মুণ্ডক শ্রুতিতেও (৩য় মুণ্ডকে ১ম খণ্ডে ৮ম শ্রুতি) উক্ত হইয়াছে—

“ন চক্ষুর্বা গৃহ্যতে নাপি বাচা

নাত্মৈর্দেবৈশ্বপসা কর্মণা বা।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসদ্ব-

শ্রুতন্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যানমানঃ।”

অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা গ্রাহ্য নহেন, প্রাকৃত বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাচ্য নহেন, অপরাপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাও তিনি জ্ঞেয় নহেন, অথবা অস্ত্রান্ত দেবতার আরাধনাদ্বারাও তিনি প্রাপ্য নহেন, কৃচ্ছ চাক্ষ্যাদি তপস্জাদ্বারা বা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারাও তিনি লভ্য হন না; কেবল আচাৰ্য্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্য বিশুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে চিত্তশুদ্ধি হইলে তৎপর সেই নিষ্কল—অখণ্ড, প্রাকৃত আকাররহিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহবিশিষ্ট ভগবান্কে একান্তভাবে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অনুগ্রহে জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

এইরূপে তাঁহার বিশ্বদ্বক্তের দৃশ্যতা শ্রুত হওয়ার তিনি যে প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত হন, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

স্মৃতিশাস্ত্র শ্রীমদভগবদগীতায়ও শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥

ভক্ত্যা বনস্তয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।

জাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তন্মেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥”

—গীঃ ১।১।৫০-৫৪

অর্থাৎ হে অর্জুন, তুমি যে বিজ্ঞানসহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা অর্থাৎ যোগাদি উপায় দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

হে অর্জুন, একমাত্র অনন্তভক্তিদ্বারাই আমি এই-রূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই।

সুতরাং সংরাধন অর্থাৎ সমাগ্ভক্তি বা অনন্তা—কেবলা—বিশুদ্ধা ভক্তিদ্বারাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্কে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করা যায়। শব্দব্রহ্ম, পরংব্রহ্ম উভয়ই তাঁহার শাস্ত্রীতত্ত্ব হইলেও বাচ্যস্বরূপ পরংব্রহ্ম নামী হইতেও বাচকস্বরূপ নামব্রহ্মের কল্পণা অত্যধিক প্রবলা। এজ্ঞ শ্রীম্মহাপ্রভু আমাদিগকে শ্রীনামব্রহ্মের আশ্রয়-লাভার্থই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন এবং নাম-ভজনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীম্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া মনোমুগ্ধ-চালিত অনর্থযুক্ত সাধককে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কল্পজ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় হইতে পারে না, যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিই একমাত্র কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। ভক্তি ব্যতীত অস্ত্রকোন উপায়াবলম্বনেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় সম্ভব হয় না এবং সেই শুদ্ধ প্রেম ব্যতীতও অস্ত্র কোন পন্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। ভজন করিতে হইবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মাধুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে শ্রীপুরী-ধামে আসিলেন। পথে নানাস্থানে নানাপ্রকার জলের দোষে ও উপবাসাদিজ্ঞাত তাঁহার গাত্রে বহির্দর্শনে কণ্ডু (পাঁচড়া) হইয়া পড়িল। গাত্রকণ্ডন করিতে রস পড়ে। পথে যাতনায় তিনি নির্বেদবশতঃ দৈন্ত্য করিয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন—“আমি নীচকুলোদ্ভূত (বস্তৃতঃ তিনি কর্ণাট-দেশীয় ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত), অত্যন্ত অসার দেহ আমার, জগন্নাথে গেলে তাঁহার দর্শন পাইব না, মহাপ্রভুকেও সর্বদা দর্শন করিতে পারিব না, শুনিয়াছি মন্দির-নিকটে তাঁহার বাসা, কিন্তু মন্দির-নিকটে যাইতে ত’ আমার শক্তি নাই, সেখানে জগন্নাথের সেবকগণ নানা সেবাকার্য্যায়রোধে সর্বদা ঘোরাকেরা করেন, কোনক্রমে তাঁহাদের স্পর্শ হইয়া গেলে আমাকে ত’ অত্যন্ত অপরাধী হইতে হইবে, সুতরাং এই দেহটাকে যদি আমি একটি কোন ভালস্থানে বিসর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার দ্রঃখশাস্তিও হইতে

পারিবে, সদগতিও লাভ করিতে পারিব। শ্রীজগন্নাথ যখন রথযাত্রায় বাহির হইবেন, তখন তাঁহার রথচক্র-তলে এই শরীরটাকে রাখিতে পারিলে শ্রীম্মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিব।” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীসনাতন পুরীধামে আসিয়া নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসায় উঠিয়াছেন। শ্রীম্মহাপ্রভুর নিয়ম—প্রতিদিন তিনি শ্রীজগন্নাথের উপলভোগ (বা ছত্রভোগ) দর্শনান্তে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ দিয়া গম্ভীরায় প্রত্যাবর্তন করেন। দৈবক্রমে সে-দিন শ্রীসনাতনের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনার্থ অগ্রসর হইলে সনাতন পিছনে সরিতে সরিতে বলিতে লাগিলেন—

“মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়ো তোমার পায়।

একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডুরসা গায়॥”

ভক্তভক্তিমান্ ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের লীলার গভীর রহস্য কে বুঝিবে? মহাপ্রভু বলপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর সর্বঅঙ্গে সনাতনের কণ্ডুক্লেদ লাগিয়া গেল। অবশ্য সনাতন না চাহিলেও মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে সনাতনের কণ্ডু তখনই ভাঙ্গ হইয়া গেল। মহাপ্রভু সনাতনকে ভক্তগণ সঙ্গে মিলাইলেন। এইরূপে মহাপ্রভু প্রত্যাহ শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীসনাতন-সহ মিলিত হইয়া ‘ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে’। একদিন সর্বজ মহাপ্রভু আচম্বিতে শ্রীসনাতনের পূর্ব দেহত্যাগ-সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন—

“সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।

কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।

কৃষ্ণপ্রাপ্তোর উপায় কোন নাহি ‘ভক্তি’ বিনে॥

দেহত্যাগাদি যত, সব — তমোমর্ষ।

তমো-রজোমর্ষে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ষ॥

‘ভক্তি’ বিনা কৃষ্ণ কভু নহে ‘প্রেমোদয়’।

প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অস্ত্র হইতে নয়॥

‘ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥’

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

(অর্থাৎ ‘হে উদ্ধব, মদীয় সাধনাত্মিকা প্রবলা
ভক্তি আমাকে যেক্ষপভাবে বশীভূত করিতে পারে,
যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদপাঠ, তপস্বী কিসা দানক্রিয়া
আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।)

“দেহত্যাগাদি তমোধর্ম — পাতককারণ।

সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥”

“কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন।

অচিরে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।

সংকুল-বিপ্র নহে ভক্তনের যোগ্য ॥

যেই ভজে — সেই বড়, অভক্ত — হীন, ছার।

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।

কুণীন, পণ্ডিত, ধনী’র বড় অভিমান ॥

ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥”

— ১৫: ৫: অন্ত্য ৪।৫৫-৬০ ; ৬৫-৭১

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিমমুখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—অনর্থ কবে কাটবে ?

উঃ—যখন আমরা অক্ষজের সেবা ছেড়ে—স্বস্থ-
বাঞ্ছা ছেড়ে অধোক্ষজের সেবার দিকে—ভগবানের
সুখবিধানের দিকে মুখ ফিরাব, তখনই সেবাসুখ
আমাদের কৃষ্ণসুখোন্মুখী আনন্দের অনর্থ বা অসুবিধা
কাটবে। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—ভক্তি জিনিষটা কি ?

উঃ—ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী নিত্য বৃত্তি—
ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক
ধর্ম। জীবস্বরূপে অস্ত্র কোন ধর্ম নাই। ইতর বৃত্তি-
সমূহ জীবস্বরূপের ধর্ম নহে, ঐ সকল বিরূপের ধর্ম।
তাহা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য।

ভক্তি শোকমোহভয়াপহা। দ্বিতীয় অভিনিবেশ
হ’তেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি হয়। কৃষ্ণ ও
কাঞ্চ ব্যতীত অস্ত্র প্রতীতিই দ্বিতীয় অভিনিবেশ।
ভক্তি জিনিষটা ভগবৎসুখানুসন্ধান। শাস্ত্র বলেন—

‘ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্বসুখে।’ (প্রভুপাদ)

প্রঃ—কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি হয় ?

উঃ—অমুক্ষণ কৃষ্ণকথাকীর্তন ছাড়া ষাঁদের অপর

কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবন্তজন-পারায়ণের
নিকট সেবা-বুদ্ধির সহিত মনোযোগ-সহকারে ভগ-
বানের কথা শ্রবণ করলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি
উদিত হয়। শাস্ত্র বলেন— ‘ভক্তিস্ত ভগবদ্-ভক্ত-
সঙ্গেন পরিজায়তে।’ ভগবান্ শ্রীগোরাঙ্গদেবও বলিয়া-
ছেন—‘সাদুসঙ্গ-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।

কামাদি হুঃসঙ্গ ছাড়ি’ শুদ্ধভক্তি পায় ॥’ (প্রভুপাদ)

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম জগতের কি উপকার করছে ?

উঃ—বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা জগতের যে উপকার হ’চ্ছে,
রাজনীতি সংগ্রহ সংগ্রহ যুগ-যুগান্তরেও তা’র কোটি
অংশের এক অংশও ক’রে উঠতে পারবে না। আমরা
রাষ্ট্র-নীতিবাদের দ্বারা অত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক
হ’তে বলছি না। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম করজনে লোকেই বা জানে ?

উঃ—Post Graduate করজনেই বা হচ্ছে ? নিউ-
টন করজনেই বা হ’চ্ছে। অনেক মিঃ জে, সি, বোস
যখন হ’ছেন না, তখন বিজ্ঞানের আলোচনা ছেড়ে

দেওয়া ভাল—এই বিচারই কি সমীচীন? (প্রভুপাদ)

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্মে কা'রো ব্যক্তিগত কল্যাণ হ'তে পারে, জগতের তা'তে কি উপকার হয়?

উঃ—তা' নয়; সেরূপ বিচার অর্চন যিনি করেন, তাঁ'র পক্ষের কথা। যা'রা কীর্তন করেন, তাঁ'দের পক্ষের কথা নয়। অর্চনকারী নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধন করেন। আর কীর্তনকারী সমগ্র জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—পশু-পক্ষী-দেব-দানব এমন-কি বৃক্ষ-লতা-প্রস্তরাদির পক্ষে যেটা সব চেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম কি সকলের পক্ষেই গ্রহণীয়?

উঃ—বৈষ্ণবধর্মই নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম—বৈষ্ণবধর্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম। খৃষ্টান থেকে কাজ নাই—মুসলমান থেকে কাজ নাই—হিন্দু থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও। পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই, দেবতা-দৈত্য-দানব থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও অর্থাৎ স্বরূপের নিত্যধর্ম গ্রহণ কর—আত্মধর্ম গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই ক'রেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে কীর্তন করতে করতে সব বৈষ্ণব করে যাচ্ছিলেন—ঝারিখণ্ডপথে তৃণ-শুল্ক-লতা, পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর সকলে তাঁ'র রূপায় বৈষ্ণব হ'য়ে গিয়েছিল। শৈব, শাক্ত, পাষণ্ডী-হিন্দু, পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্শু, বুভুক্শু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মুখ, ক্রম, স্তম্ভ—সব বৈষ্ণব হ'য়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণকীর্তন। আর যা'রা বৈষ্ণব হচ্ছিলেন, তাঁ'রাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্তনকারী গুরুর কার্য্য ক'রে সকলকে বৈষ্ণব কচ্ছিলেন।

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের স্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই—হ'বে না। অতীত উপকারের প্রস্তাব বা ছলনা উপকারের নামে মহা-অপকার। আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্যি সত্যি পরম-উপকার। তা' হ' দশ দিনের উপকার নয়—তাৎকালিক উপকার নয়। যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব করে, যে উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হয়,—যেমন আমাদের

দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য—আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে উপকৃত হ'লে ঘোড়াগুলির অসুবিধা অবশ্যস্বীকার্য, আমার তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব—এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ লোকবঞ্চনা করেন নাই। তাঁ'রা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান ক'রেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্বকালে, সর্বাবস্থায় পরম-উপকার। মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে, সকল পাত্রে, সকল কালে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে; এ উপকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপকার। তাঁ'রা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকের স্রায় নশ্বর উপকারের কথা বলেন নাই। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—বিষ্ণুসেবা করলে কি কাজকর্ম সব ছেড়ে দিতে হ'বে?

উঃ—বৈষ্ণব হ'য়ে সব করবো। বৈষ্ণবতা ছেড়ে—বিষ্ণুসেবা বাদ দিয়ে, কর্মপন্থা গ্রহণ করবো না বৈষ্ণব-গণ সমস্ত কার্য্য হরিসেবার অন্তর্ভুক্ত করেন।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ—যা'রা হরির সেবা করেন, তাঁ'রা কি জীবের সেবা করেন না?

উঃ—শ্রীহরি অথও বস্তু, শ্রীহরির সেবকগণই জীবের নিঃস্বার্থ বন্ধু বা স্বার্থ সাহায্যকারী। যা'রা জীবের বাহু চেহারা মূখ হ'য়ে, হরির বাহু অঙ্গের সেবাকেই হরিসেবা বা জীবসেবা মনে করছে, তা'রা বিবর্তবাদী তাঁ'দের জীবসেবা হয় না—হরির বাহু অঙ্গ মায়া'র সেবা হয়। এইভাবে অনন্তকাল মায়া'র সেবা করলেও নিজের বা পরের মঙ্গল হ'তে পারে না। নারায়ণে দরিদ্রবুদ্ধি হ'লে; নারায়ণের সেবা হ'লো না—নারায়ণদাস জীবের সেবাও হ'লো না—মায়া'র সেবা হ'য়ে গেল। বিবর্তের সেবা—মরীচিকার সেবা—ছায়া'র সেবা কখনও বস্তুর সেবা নহে। তত্ত্ব-বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ; জীব সেই কৃষ্ণেরই সেবক। হরির নিত্য সেবক আমরা, হরির সেবা করবো—

হরিভক্তের সেবা করবো—যাঁ'রা হরিভক্তকে বৃক্তে পারছেন না তাঁ'দের সেবা করবো, যাঁ'তে তাঁ'রা হরিভক্তকে বৃক্তে পারেন,—তাঁ'দিগকে শারীরিক ও মানসিক সাহায্য করবো; আর হরিভক্তের বিদ্বেরী যাঁ'রা, তাঁ'দেরও সেবা করবো উপেক্ষা দ্বারা। ঈশ্বরের সেবকই আমাদের Best friend (সর্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু), তাঁ'দের সঙ্গে মিত্রতা করবো। আমাদের যে-সকল বন্ধু বিষ্ণুসেবার মাহাত্ম্য বৃক্তে না পেরে অল্প ধর্ম গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছে বিষ্ণুসেবার কথা বলবো, যদি তাঁ'রা বিদ্বেরী না হন। আর যাঁ'রা বিদ্বেরী, নাস্তিক প্রভৃতি, তা'দের সঙ্গে Non-co-operation (অসহযোগ) করবো। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—লোককে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা করাই কি জীব দয়া নয়?

উঃ—যদি কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন—হরিভজন করেন, তবে তাঁ'কে অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করবো। অন্নাবগুস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে পরিষে হরিভজন করাতে হ'বে—তাঁ'র কিছু উপকার ক'রে দিতে হ'বে; নতুবা ছব-কলা দিয়ে সাপ পুখে কাজ কি? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে লুক ক'রে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করাই প্রকৃত জীব দয়া। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই—কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়াই, জীব সংসারে নানাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণোন্মুখতা জাগলেই জীব সমস্ত দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেয়ে সুখী হ'তে পারবে। শ্রীচৈতন্যদেব এই দয়াই করেছেন। অতীত যাবতীয় তথাকথিত দয়ার—অপূর্ণ দয়ার একটা comparative study (তুলনামূলক বিচার) করলে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া হ'চ্ছে পরিপূর্ণ দয়া বা চিরস্থায়ী দান, আর যত দয়া সব limited—সব বন্ধনাময়ী। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—যে গুরুবৈষ্ণবের কথা শুনে না, তাহাকে কি শিষ্য বলা যায়?

উঃ—অবনতমস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। যে সাধুগুরুর কথা শ্রবণ করে

না, সে ত' দাস্তিক। তাহার মঙ্গল হওয়া অসম্ভব।

জীব নিষ্কপট হইলে যে কোন আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন। সাধুগুরুর আনুগত্য, হরিভজন বা হরিসেবা বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী বা গৃহব্রত। হরিভজনপরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠ সদৃশ।

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। গুরুসেবা করিতে হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। মঠের সেবা করিতে হইবে। মঠে থাকিয়া গুরুবৈষ্ণবের নিকট সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে। কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না। নিজ সুখার্থ মঠে থাকিতে হইবে না। ভগবৎসুখার্থই মঠে বাস করিতে হইবে। পরের নিন্দায় নিজের লাভ নাই। সাধুগুরুর আনুগত্য ত্যাগ করিলে এবং ভগবৎপ্রসঙ্গ বিমুখ হইলে পতন অনিবার্য। শ্রীগুরুমহিমাই আমাদের একমাত্র শ্রোতব্য। যিনি কীর্তন করেন, তিনি গুরুপাদপদ্ম। গুরুর শ্রীমুখকীর্তিত বিষয় শ্রবণই শিষ্যের আচার ও বিচার। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—সাধুসঙ্গ হ্রলভ কেন?

উঃ—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন না বলিয়া সাধুসঙ্গ হ্রলভ।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবের দয়া ও মাহাত্ম্য কবে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম একান্তভাবে ভগবৎসেবক। তাঁ'র প্রত্যেক ক্রিয়া ভগবানের সেবার সর্বোত্তম আদর্শ—এই দর্শন যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে, ততক্ষণ আমার চক্ষু ঠুলিচাপা আছে। তাঁ'র দয়া না পেলে, দিব্যজ্ঞান লাভ করতে না পারলে, আমরা গুরুপাদপদ্মের মহিমা বৃক্তে পারি না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা করছেন। শ্রীগুরুদেবের এই সেবাময় শ্রীমূর্তি দর্শন না করা পর্যন্ত আমরা গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হই না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্তের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অণু কোন কার্য নাই, ইহা

লক্ষ্য না করলে স্তূৰ্ভভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হয় না।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ—গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?

উঃ—শিষ্য আমরা আশ্রয়জাতীয় সেবক, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ বা আশ্রয়বিগ্রহ। আমরা ভগবৎসেবক, আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবক-ভগবান্; আমরা আশ্রিত, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়। জীব আমরা কিন্তু আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ নহি। আমরা শক্তি, কিন্তু শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি। আমরা বিভিন্নাংশ শক্তি, আর শ্রীগুরুদেব স্বাংশ-শক্তি। আমরা নিত্য ভগবৎসেবক, আমরা ভগবান্ নহি; কিন্তু শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হয়েও ভগবৎপ্রের্ত্ত এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রের্ত্ত। শ্রীগুরুদেব আমাদের ত্রায় জীব নহেন, তিনি দৈশ্বরবস্ত।

আমরা আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহগণের আত্মগত্যে সেবা করব, ইহাই আমাদের সত্তা। কিন্তু তা' না ক'রে গুরুর আত্মগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি আমরা আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ সাজবার চুৰ্কি পোষণ করি, তা' হ'লে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা হ'য়ে যা'বে। আমরা ভেদাংশ, তা' না হ'লে হরিবিমুখতা শিখবো কেন? হরিবিমুখ জনগণকে আত্মীয়জ্ঞানই বা করবো কেন? নন্দনন্দনের প্রের্ত্ত গুরুপাদপদ্মে অনাত্মীয় জ্ঞান উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের এরূপ নানা চুৰ্কি উপস্থিত হ'য়েছে। চুৰ্ত্তাগ্য বশতঃ আমরা গুরুকৃষ্ণের সেবায় উদাসীন হ'য়ে প'ড়েছি। আমাদের সেবোন্মুখতার জন্ত যা'রা সাহায্য করেন, তাঁ'রাই আমাদের মিত্র; আর যা'রা আমাদের কৃষ্ণ-বিমুখতার সাহায্য করে, তা'রা আমাদের ভীষণ শত্রু—এই কথাটা আমরা বুঝতে পারছি না ব'লেই হরিবিমুখ আত্মীয়নামধারী স্বজনাত্ম শত্রুগণের জন্তই আমাদের জীবন নষ্ট ক'রে ফেলু'ছি। শ্রীনন্দনন্দনের প্রের্ত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাবিস্তৃতিই ইহার কারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র নিদান, এই নিখুঁত সত্য কথাটা আমাদের সতত মনে রাখা উচিত। তবেই মঙ্গল হ'বে।

আমরা গুরুর সেবক, গুরুদেব আমাদের সেবা। গুরুসেবা ব্যতীত মঙ্গললাভের অত্ৰ কোন উপায় নাই। এজন্ত আমরা বর্ত্তমান সময়ে, প্রত্যেক বর্ষের প্রারম্ভে গুরুসেবা আরম্ভ ক'রে সমগ্র বৎসর গুরুপাদপদ্ম-সেবা করবো, পরজন্মেও গুরুপাদপদ্ম-সেবা করবো। গুরুসেবার ফলে যখন মুক্ত হ'ব, তখনও আমরা গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্রুত-পাত্র হ'য়ে, তাঁ'র সঙ্গে, তাঁ'র নির্দেশে নিত্যকাল শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা করবো।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিতা, তাঁ'র সেবক নিতা, তাঁ'র সেবা নিতা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই শিষ্যের জীবন, ভূষণ ও সর্ব্বস্ব। গুরুসেবাই শিষ্যের প্রাণ ও জীবাত্ম। এজন্ত শিষ্য গুরুসেবা ছেড়ে, গুরুকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তাই ষড়্গোষ্ঠামীর অত্ৰতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু ব'লেছেন—আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ও কৃপা না পেলে ব্রজে বাস ও কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে আমার কি প্রয়োজন? কৃষ্ণ-প্রিয়তমের দর্শনসৌভাগ্য যদি না হয়, তবে জীবন ধারণ ক'রে কি লাভ? আমার অত্ৰ এমন কি কার্য্য প'ড়ে গিয়েছে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ছেড়ে আমি সেই সেই কার্য্যে ধাবিত হচ্ছি?

একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তেই সব লাভ হ'বে, তাঁ'র সঙ্গ-রাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্তও না হয়। অত্ৰ কোন প্রাকৃত প্রলোভনে লুপ্ত হ'য়ে লবমাত্রও যেন গুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই—অত্ৰ বাজে লোকের পরামর্শ শুনে যেন গুরুপাদপদ্ম-সেবা থেকে বঞ্চিত না হই, ইহাই প্রার্থনা। (প্রভুপাদ)

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

(পূর্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর)

১৫।৩।৭৬ সোমবার — পরিক্রমার ৬ষ্ঠ দিবস—শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ পরিক্রমা । আমাদের বিজ্ঞানগরে দুইরাত্রি থাকা হইতে বলিয়া মহৎপুর হইতে নিদয়ার ঘাট পার হইয়া কৃষ্ণদ্বীপ গোড়ীয় মঠে আসা হইত । এবার কৃষ্ণদ্বীপ পৃথগ্-ভাবে পরিক্রমা করা হইল । আমরা সকল প্রায় ৭। ঘটি-কায় কৈশোত্থানস্থ মূল মঠ হইতে বাহির হইয়া বেলা প্রায় ৯। টায় শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ গোড়ীয়মঠে পৌছাই, তথায় বার-চতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ-গান্ধ-র্ষিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ বন্দনা করিয়া সুবিস্তৃত আত্ম-বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হই। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের স্তম্ভুর কীৰ্ত্তন যাত্রিগণের পথশ্রম দূর করিয়া দেয় । শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ-মাংস্যা পাঠ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর প্রমোত্তর ও ফলশ্রুতি প্রভৃতি পাঠ দ্বারা শ্রীনবদ্বীপধামমাংস্যা-গ্রন্থ পাঠ সম্পূর্ণ করেন । ভরদ্বাজটীলা বা ভারুইডাঙ্গার মাংস্যাও এখান হইতে পাঠ করিয়া দেওয়া হয় । সমগ্র শ্রীধাম-মাংস্যা শ্রবণকীৰ্ত্তন-মুখে সমগ্র নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিলে শ্রীধামের রূপা লাভ হয় । ‘তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর’ । শ্রীধামরূপায় শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, ভক্তরূপায়ই শ্রীভগবানে ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে । ভগবৎরূপা ভক্তরূপাঙ্গগামিনী । পরিক্রমা এক অপূৰ্ণ ভক্ত্যঙ্গ । ইহা দ্বারা যুগপৎ সাধুসঙ্গ, নামকীৰ্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস বা ধামবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন-রূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় । যাঁহাতে আমরা সকল কর্তব্যের মধ্যে মুখ্য কর্তব্য-বিচারে প্রত্যঙ্গ মহাবদান্ত শ্রীগৌরহরির এই মহাবদান্ত ধাম পরিক্রমায় যোগদান করিয়া ‘তুয়া ধাম মাংহে তুয়া নাম গাওয়ত’ জীবন ধ্য করিতে পারি—সার্থক করিতে পারি, তজ্জন্ত সকলেরই শ্রীধাম, ধামবাসী বৈষ্ণব ও ধামেশ্বর শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন কর্তব্য । পরিক্রমা সমাপ্তি দিবসে আজ পরিক্রমার যাত্রিবন্দ

সকলেই ছল ছল নেত্রে পুনঃ পুনঃ ধামরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে করিতে ধামরূপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । শ্রীধাম পরিক্রমার সুযোগ প্রদানকারী পরম-করণ পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণে সকলেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে করিতে মুহূর্মুহুঃ তাঁহার জয়গানে আকাশ বাতাস পরিপূরিত করিতে লাগিলেন । আর কীৰ্ত্তনে বাদনে যে-সকল বৈষ্ণব অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলকেই সৰ্ব্বক্ষণ আনন্দে আত্মহারা করিয়া রাখিয়াছেন, পাঠবক্তৃতা দ্বারা যে-সকল বৈষ্ণব তাঁহাদিগকে হরিকথা শ্রবণসুযোগদানে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন, প্রসাদ-পরিবেশনাদি বিবিধ সেবাকার্য্য দ্বারা যাঁহারা তাঁহাদিগকে নানাভাবে আপ্যায়িত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের প্রতিই তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । আমরা কৃষ্ণদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ১১। টার মধ্যেই কৈশোত্থানস্থ মূলমঠে প্রত্যাবর্তন করি ।

অতঃ কলিকাতার ধনাঢ্য বদান্তবর ভক্ত শ্রীপরেশ চন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীমঠে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন । অগণিত ভক্ত নরনারী চতুর্বিধ রস-সম্বিত বিচিত্র প্রসাদ সন্মান করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন ।

সন্ধ্যারাত্রিক কীৰ্ত্তনের পর সভার অধিবেশন হয় । অতঃ শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর অধিবাস-কীৰ্ত্তনোৎসব—শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজিউর দোলযাত্রার অধিবাসোৎসব—বহু্যৎসব বা চাঁচর । পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং এবং তন্নির্দেশক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ ভাষণ দান করেন । শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজও শেষে কিছু বলেন । শ্রীগুরু-পাদপদ্ম, বৈষ্ণবগণ, শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবান্ধামরূপা-প্রার্থনাই বক্তৃতার স্বারস্ব । শুদ্ধনির্মল হৃদয়েই শ্রীভগবদাবির্ভাব

উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীপাদ স্ববীকেশ মহা-
রাজ মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার পর রিভ্‌ড়া যাত্রা করেন।
তথায় তাঁহার মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্পাদন করিবেন।

১৬।৩।৭৬ মঙ্গলবার — অদ্য শ্রীশ্রীকান্তনী পূর্ণিমা —
শ্রীশ্রীগৌরাবিভাবপৌর্ণমাসী—শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী- সভা
ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশন-
দিবস। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের অনুগমনে আমরা
শ্রোতৃকর্ম্ম সমাপনান্তে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানাদি সম্পাদন
করি। শ্রীক্ষেত্রপাল শিবকে পূজা ও প্রণাম করিয়া
মঠে আসি। শ্রীল আচার্য্যদেব তিলকাঙ্কিত সমাপনান্তে
শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-রাধামদনমোহন-
জিউর অভিষেক ও পূজা স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া অত-
কার প্রথালুয়ারী শ্রীবিগ্রহচরণে আবীরও প্রদান করেন।
সেই প্রসাদী আবীর আমরা সকলেই মন্তকে ধারণ
করি, পূজ্যপাদ মহারাজকেও দিই। প্রভাতে মঙ্গল-
রাত্রিক, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও প্রভাতী গীতি কীর্ত্তনান্তে
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রবর্তিত বিধানালুয়ারী
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। সন্ন্যাসী ও
ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ কর্ত্তক মর্মান্বসারে পর্যায়ক্রমে সন্ধ্যা
পর্যন্ত পাঠ চলে। [শ্রীচরিতামৃত পারায়ণ করিয়া-
ছিলেন যথাক্রমে — শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ
কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ,
শ্রীমদ্ ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ
দণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ,
শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয়
ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ অপ্রমের ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ।]
শ্রীল আচার্য্যদেব বহু দীক্ষা ও হরিনামপ্রার্থী ব্যক্তিগণকে
শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। অপরাহ্নে
নাটমন্দিরে উপরি উক্ত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা
ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশন
আরম্ভ হয়। মাল্য-চন্দনাদি প্রদান ও উদ্বেধন সঙ্গীত
সমাপ্ত হইলে সভার কার্য্যান্তে সভাপতি শ্রীল
আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দকে তাঁহাদের বিবিধ
গৌরপ্রিয়কার্য্যার্থুষ্ঠান জন্ত প্রসাদীমাল্যচন্দনসহ শ্রীগৌরা-
শীর্ষদ-স্বরূপ ভক্তিসূচক উপাধি প্রদান করেন।

ইহাদের মধ্যে যাহারা বিশেষ কার্য্যবশতঃ সভাস্থলে
উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নাম ও উপাধির
উল্লেখমাত্র করা হয়। নাম ও উপাধিসমূহ যথা :—

- ১। শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা মঠ
— কীর্ত্তন-কুশল
- ২। ডাক্তার শ্রীসর্বোত্তরদাসাধিকারী, ঈশো-
তান, শ্রীমায়াপুর মঠ — ভিষগব্রত
- ৩। শ্রীসচিদানন্দ ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগড় মঠ
— রাগভূষণ
- ৪। শ্রীশ্রেয়স্বর ব্রহ্মচারী, কলিকাতা মঠ
— সেবাব্রত
- ৫। শ্রীশ্যামসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী, ঐ —
ভক্তিশ্রুত
- ৬। শ্রীনন্দহুলাল দে, সলিসিটর, কলিকাতা
— নয়কোবিদ
- ৭। শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, এড্-
ভোকেট, কলিকাতা — শ্রায়বিশারদ
- ৮। শ্রীসুনীল কুমার দাস, গোষ্ঠাট —
ভক্তিবূষণ
- ৯। শ্রীসুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা —
ভক্তিসুহৃদ
- ১০। শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারী, ঐ —
সেবাকুশল
- ১১। শ্রীমধুমঙ্গল দাস, (শ্রীমতিলাল রায়,
তেজপুর) — কারুকুশল
- ১২। শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী, (শ্রীরবীন্দ্র-
নাথ মোদক, তেজপুর) — সেবাবূষণ
- ১৩। শ্রীবিপুল চন্দ্র পাল, তেজপুর —
সজ্জনসুহৃদ

অতঃপর নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দের মহাপ্রয়াণে তাঁহা-
দের বিভিন্ন গুণাবলী স্মরণে বিশেষ বিরহবেদনা
প্রকাশ করা হয় —

- ১। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমানন্দ বিহারত প্রভু
- ২। শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু
- ৩। শ্রীমৎ চৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, ভক্তিব্রত

- ৪। শ্রীজ্ঞানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
 ৫। শ্রীতিলকরাজ অরোরা, দিল্লী
 ৬। শ্রীশাঙ্গীধর দাসাধিকারী, মেদিনীপুর
 ৭। শ্রীদামোদর পাঠক, সরভোগ
 ৮। শ্রীসরস্বতী ভট্টাচার্য্য (বড়মা), বৃন্দাবন
 ৯। শ্রীনীরদবরণ নন্দী (শ্রীনারায়ণদাস)
 কৈশোতান, শ্রীমায়াপুর মঠ

- ১০। শ্রীযোগমায়া বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর
 ১১। শ্রীউপেন হালদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী
 (শ্রীমতী রাধারানী), গোহাটী
 ১২। শ্রীভূরামলজী, হায়দরাবাদ
 ১৩। শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহ-
 ধর্ম্মিণী (শ্রীমতী বিভাবতীদেবী), কলিকাতা
 ১৪। শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারীর জননী, মেচেন্দ্র

অনন্তর নিম্নলিখিত ভক্ত সজ্জন ও মহিলাবৃন্দের
 শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-প্রীত্যুদ্দেশ্যে অল্পটীত বিবিধ মনোজ্ঞ সেবা-
 চেষ্টা উল্লেখ পূর্ব্বক সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য-
 বাণীপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অসংখ্য
 ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন —

শ্রীপরেশ চন্দ্র রায় — কলিকাতা; শ্রীজিৎপালজী,
 শ্রীসত্যপালজী — জালন্ধর; শ্রীযশোবন্ত রায় ওরা —
 ধানবাদ; শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরীয়া — কলিকাতা; শ্রীপ্রহ্লাদ
 রায়, শ্রীবিলাস রায়, শ্রীসুন্দর মল, শ্রীগোলাপ রায়, শেঠ
 মাতাদিন, শ্রীশ্রামসুন্দর কনোরিয়া, শ্রীকৃষ্ণ রেডি — হায়-
 দরাবাদ; শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল, শেঠ শ্রীহীরামলজী
 — দিল্লী; শ্রীপুরুষোত্তম গোয়েল — কলিকাতা; ডাক্তার
 শ্রীসুনীল আচার্য্য, ডাক্তার শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী
 — তেজপুর; শ্রীকণিভূষণ চক্রবর্তী, ষাড্‌ভোকেট
 — শিলিগুড়ি; শ্রীনারায়ণ মিশ্র, ষাড্‌ভোকেট, শ্রীনারা-
 য়ণ সেন, ষাড্‌ভোকেট — পুরী; পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ
 মিশ্র — কটক; শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র, খাত্তমলী, ওড়িষ্যা;
 শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, অধ্যাপক শ্রীসুখীর কৃষ্ণ
 বোষ, শ্রীরাধাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীচপল চট্টো-
 পাধ্যায়, পাঞ্জাবী ভক্ত মেজর সিং প্রভৃতি — বোম-
 পুর; শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর — লুধিয়ানা; লাল

শ্রীব্রজভূষণ লালজী, শ্রীমতী মিত্ররানী — জগদ্বী;
 শ্রীগোপাল চন্দ্র দে — অংগরতলা; ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী
 শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য; পশ্চিমবঙ্গের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ
 ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় —
 কলিকাতা; শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা — তেজপুর।

এদিকে শ্রীগোরাবির্ভাবকাল সমাগত দেখিয়া শ্রীল
 আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার কার্য্য বিশেষ
 ক্ষিপ্ততার সহিত সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত
 বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া
 দেন। ইহারও সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব। ইহার
 অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীজী (যিনি পূজ্য-
 পাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ত্রিদণ্ডসম্মান্যসেবক
 আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীমন্তকৃষ্ণদামোদর মহারাজনামে প্রসিদ্ধ
 হইয়াছেন, তিনি) বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণ পাঠ
 করেন। সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব বিদ্যাপীঠের ক্রমো-
 ন্নতি শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন — “প্রকৃত
 ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতে হইলে সচ্ছাত্তাহ্মশীলনের
 একান্ত আবশ্যকতা ও তজ্জন্য আত্মযজ্ঞিকভাবে সংস্কৃত-
 ভাবা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে
 অনুভূত হয়। কিন্তু বিদ্যার্থীগণের — “পড়ে কেনে
 লোক? — কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে
 বিদ্যায় কি করে?” (১৫: ভাঃ আ ১২।৪৯) তথা
 “সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। ‘কৃষ্ণপাদপদ্মে’
 যদি চিত্ত-বিত্ত রয় ॥” (১৫: ভাঃ আ ১৩।১৭৮), ‘পরী
 (বিদ্যা) যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে’, (মুগ্ধক), ‘স্যা বিদ্যা
 তন্মতির্ধর্যা’, (ভাগবত), “বিদ্যাবধূজীবনং — শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্”
 (শিক্ষাষ্টক) ইত্যাদি সারগর্ভ শাস্ত্রবাক্যের প্রতি
 বিশেষ ধ্যান রাখিতে হইবে।” অতঃপর শ্রীল আচার্য্য-
 দেবের পৌরোহিত্যে সাক্ষ্য ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হয়।
 শ্রীল আচার্য্যদেব “নিরন্তর নিরপরাধ নামাহ্মশীলনরত
 — নামরূপাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধমণ্ড বস্তুদেব-শব্দিত শুদ্ধ পুংহুদয়ে
 সঙ্কীর্ত্তননামং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমায়াপুর শশধর
 গৌরহরির আবির্ভাব উপলব্ধি তথা প্রেমান্বন-রঞ্জিত
 ভক্তিনেত্র দ্বারাই সেই ব্রজপ্রেমদাতা বদান্ত-শিরোমণি
 পুরটসুন্দরজ্যতিকদম্বসন্দীপিত শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-

সৌভাগ্য প্রাপ্তি” প্রভৃতি দিব্যজ্ঞানগর্ভবাক্য সংক্ষেপে কীর্তন করিয়া শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজকে কিছু বলিতে বলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমদ্ব্যাক্রান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীমদ্ ভক্তি ললিত গিরি মহারাজ কীর্তন করেন। সাক্ষ্য সভার অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালেই শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের মহাভিষেক, পূজা, ভোগবাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। যথা সময়ে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ভোগারতি কীর্তন করেন। আরাত্রিকের পর শ্রীতুলসী-আরতি-কীর্তনমুখে বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমার পরও নাটমন্দিরে অনেকক্ষণ যাবৎ উদ্‌গুনৃত্য-কীর্তন চলিতে থাকে। পূজাপাদ আচার্যদেব জয়গান করেন। মঠ অজস্র লোকে লোকারণ্য। ইহা এক নয়ন-তৃপ্তিকর-মনোমুগ্ধকর অপূর্ব দৃশ্য। শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর আকর্ষণে যে কত লোক শ্রীধামে আসা যাওয়া করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। অদ্য গৌরভক্তগণ প্রায় সকলেই উপবাসী, সন্ধ্যায় ভোগারতিকীর্তনাদির পর তাঁহারা কিছু প্রসাদী ফলমূলাদি অল্পকাল স্বীকার করেন। কেহ কেহ বা দিব্যরাত্রি নিরন্তর উপবাসীই থাকেন। রাত্রে কৃষ্ণনগরের একটি য়ামেচার (Amateur) পাট ধর্মমূলক যাত্রা অভিনয় করেন। অভিনয় ভালই হইয়াছে।

১৭/৩/৭৬ বুধবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। গত রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত্রিই রন্ধনকার্য্য চলে। অল্পও চলিতেছে। প্রভাতীকীর্তন ও পাঠাদির পর আজ সকাল সকাল পূজা ও ভোগারাত্রিক অন্তে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সহস্র সহস্র যাত্রী দলে দলে প্রসাদ পাইতে থাকেন। শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-জয়গানে শ্রীমঠের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতেছে। ‘চণ্ডালে ব্রাহ্মণে

করে কোলাকুলি করে বা ছিল এ রঙ্গ’। আজ আর প্রসাদ সম্মানে জাতি-কুল বিচার নাই। একদল উঠিতে উঠিতে আর একদল বসিয়া যাইতেছেন। ভাল করিয়া স্থান উপস্থারেরও অপেক্ষা নাই। অপরাহ্ন পর্য্যন্ত এইরূপ দীর্ঘতাং ভুজ্যতাং চলে। অতঃপর নাটমন্দিরে কীর্তন বক্তৃতাদির আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্যদেব ও তন্নির্দেশক্রমে তদীয় বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ বক্তৃতা দেন।

অল্প পরিক্রমার যাত্রীগণের অনেকেই প্রসাদ পাইবার পর বিদায় গ্রহণ করেন। অপর অধিকাংশ পরদিবস ১৮/৩/৭৬ তারিখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ত্যাগী মঠাশ্রিত সেবকগণ আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে বিভিন্ন মঠে গিয়া স্ব স্ব সেবা সংরত হন। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবানুরক্ত মঠবাসী এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ — সকলেই শ্রীধাম হইতে বিদায় গ্রহণ সময়ে ছল ছল নেত্র না হইয়া পারেন নাই। বিশেষতঃ পূজাপাদ আচার্যদেবের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মুগ্ধ। অধিকাংশ ভক্তই অশ্রুসিক্ত নেত্রে আবার বৎসরান্তে শ্রীধামে পরমাত্মীয়-জ্ঞানে বৈষ্ণব-চরণ-দর্শন সৌভাগ্য প্রার্থনা শ্রীধাম ও ধামেশ্বর গৌরহরির চরণে জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবকালে যে সমস্ত গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জন এবং মঠবাসী ভক্তগণ প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধিবাক্য-দ্বারা অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশেষভাবে বিভিন্ন-মুখিনী সেবাচেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীল আচার্যদেব তাঁহাদের সকলের ছোটবড় সকল-সেবাকার্য্যকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত বহুমানন করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে না পারায় কেহ যেন তজ্জন্ত হৃৎপ্রকাশ না করেন। সর্বাস্তব্যামী বিশ্বতচ্ছন্দু শ্রীভগবান্ আমাদের সকলেরই অন্তর বাহিরের সকল চিন্তা, সকল কার্য্যই সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাযোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু নিকাম ভক্ত নামের জন্ত লালায়িত হন না।

১৯৭৪ সালে গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

কলিকাতা **শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে** নিম্নলিখিত বিভাগিগণ **মধ্য ও আন্ত** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

মধ্য—দ্বিতীয় বিভাগ

- ১। শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী — হরিনামামৃত-ব্যাকরণ,
- ২। কুমারী রীতা রায়—পাণিনি-ব্যাকরণ

আন্ত—দ্বিতীয় বিভাগ

- ১। শ্রীভাগবত ব্রহ্মচারী— হরিনামামৃত-ব্যাকরণ
- ২। কুমারী পদ্মশ্রী রায় — হরিনামামৃত-ব্যাকরণ
- ৩। কুমারী রীতা কুণ্ডু— সারস্বত-ব্যাকরণ
- ৪। কুমারী উমা বিশ্বাস— সারস্বত-ব্যাকরণ
- ৫। শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী— সারস্বত-ব্যাকরণ

৬। শ্রীমতী শান্তি মুখার্জি—বৈষ্ণবদর্শন

৭। শ্রীউদয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৌরোহিত্য

৮। শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—পৌরোহিত্য

শ্রীধাম-মায়াপুর দেশোত্তানস্থ **শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের** নিম্নলিখিত বিভাগিগণ **মধ্য ও আন্ত** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

মধ্য—প্রথম বিভাগ

- ১। শ্রীভাস্কর বিশ্বাস — পুরাণ

আন্ত—দ্বিতীয় বিভাগ

- ১। শ্রীসুন্দরলাল ব্রহ্মচারী—কাব্য
- ২। শ্রীসমরেন্দ্র নাথ প্রাণাণিক—কাব্য
- ৩। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য—কাব্য

শিলিগুড়িতে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্য্য

শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীৰ্তন-সেবা-সমিতির সভ্যগণের দ্বারা বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও ১০৮শ্রী শ্রীমভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ আট মূর্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ বিগত ১০ মাঘ (১৩৮২), ইং ২৪ জানুয়ারী শনিবার প্রাতে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে-স্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে ষাডভোকেট শ্রীকণীভূষণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মণ্ডল প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্বাদিত হন। উপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ও শ্রীমবীনমদনদাস ব্রহ্মচারী কিছুদিন পূর্ব হইতেই শিলিগুড়িতে অবস্থান করতঃ প্রচারাাদি করিতেছিলেন। পরবর্তিকালে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হন— সর্বশ্রী ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী

ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ভক্তিবল্লভ ভীর্থ মহারাজ, মদনগোপাল ব্রহ্মচারী, পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও বলভদ্র ব্রহ্মচারী। পূজ্যপাদ শ্রীমদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, দিনহাটা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তি-শরণ সাধু মহারাজ ও শিলিগুড়ির শ্রীনরোত্তম গোড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিলায় সজ্জন মহা-রাজও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। শ্রীকণীভূষণ চক্র-বর্তী মহাশয়ের বাসগৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। ফণীবাবু ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরম সন্তোষ লাভ করেন।

২৫শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ ফণীবাবুর গৃহের সম্মুখস্থ অঙ্গনের সভামণ্ডপে প্রাতঃকালীন সভা এবং ২৪শে হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ গান্ধীময়দানে বিশাল সভামণ্ডপে অপ-

রাষ্ট্রকালীন সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ গান্ধীময়দানে অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন— সর্বশ্রী কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ও ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। এতদ্ব্যতীত ২৫শে ও ২৬শে জামুয়ারী শিলিগুড়ি কলেজে দুইটি সাক্ষা ধর্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাগবতধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসিতাংশুভূষণ দাস ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীতরণীকান্ত ভট্টাচার্য্য। প্রথম দিনের মুখ্য অতিথি-

রূপে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী। শিলিগুড়ির বিভিন্ন মহল্লায় প্রত্যহ প্রভাতে নগরকীর্তন করা হয়। ৩০শে জামুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় বাবুপাড়া সভামণ্ডপ হইতে নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ গান্ধীময়দানে আসিয়া শেষ হয়। শিলিগুড়িতে ইতঃপূর্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের এইরূপ বিপুল প্রচেষ্টা কখনও হয় নাই। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় আমুকুল্যের জন্ত শ্রীকণীভূষণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মণ্ডল প্রভৃতি শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন-সেবা-সমিতির সভাবৃন্দ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

দিল্লী :— দিল্লীর আগরওয়াল মিত্র মণ্ডল ট্রাষ্ট ভবনের সভাপতি, সেক্রেটারী ও সভ্যবৃন্দের সাদর আহ্বানে এবং দিল্লী ও নিউদিল্লীস্থিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের প্রার্থনায় নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ঙ্গ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিরয়িত মাধব গোষ্ঠানী বিষ্ণুপাদ বিগত ১৮ই চৈত্র, ১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় সপার্ষদে দিল্লী জংশন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপারেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। অগ্রিম ব্যবস্থাদির জন্ত শ্রীবৃন্দাবন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীললিতকৃষ্ণ দাস বনচারী পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মেটর-কার ও রিজার্ভ বাসাদিতে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্শদবৃন্দ ও ভক্তগণসহ মডেল টাউনে পৌঁছিলে ভক্তগণ সংকীর্তন-শোভাযাত্রাসহ রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সম্মেলন স্থান—আগরওয়াল মিত্র মণ্ডল ট্রাষ্ট ভবনে আসিয়া

উপনীত হন। মুক্ত বায়ু পরিবেষিত রমণীর পরিবেশ-যুক্ত নবনির্মিত বাসভবনের দ্বিতলে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। স্থানীয় ভক্তগণ ব্যতীত উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে শতাধিক ভক্ত উৎসবে যোগদানের জন্ত আসেন। ২রা এপ্রিল হইতে ৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম-সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, দেবদ্বারের শ্রীপ্রেমদাসজী ও মুজফফরনগরের শ্রীঅখোধ্যাপ্রসাদজী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজয়প্রকাশ গোয়েল শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতঃ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে মুখ্য অতিথির ভাষণে বর্তমানযুগে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার অত্যাৱশ্য-কতার কথা বলেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্তন করেন শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী কীর্তনামোদ। এতদ্ব্যতীত দিল্লী ও দেবদ্বারের ভক্তবৃন্দও পরমোৎসাহের সহিত হিন্দী ভজন-কীর্তন ও শ্রীনামসংকীর্তন করিয়া সকলের

আনন্দবর্দ্ধন করেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে মহিলা ভক্ত-গণের সংকীৰ্ত্তন হয়। ৪ঠা এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় মিত্র মণ্ডল ট্রাষ্ট ভবন হইতে বিরাট নগর-সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মডেল টাউনের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। সহরবাসিগণের মধ্যে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মথোৎসবে নরনারী নির্বিশেষে বহু শত ভক্তকে বিচিত্র মধ্যপ্রসাদের দ্বারা আত্মপাতিত করা হয়।

এই সম্মেলনের মুখ্য উত্তোজ্ঞারূপে কাণ্ড্য করিয়াছেন শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল। সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন আগরওয়াল মিত্র মণ্ডল ট্রাষ্ট ভবনের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীবদ্রী-প্রসাদ জৈন। প্রচারকার্য্যে আত্মকৃত্য করিয়াছেন উক্ত ভবনের সভাপতি শ্রীহংসরাজ কাপুর, শ্রীহরি-প্রকাশ শর্মা, মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীহরসহায়মলজী, শ্রীতুলসীদাসজী ও শ্রীরামনাথজী প্রভৃতি। অতিথি-গণের যথোপযুক্ত সংকারের জন্ত দিল্লীর মহিলাভক্ত-গণের সেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েলের প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে এবং স্বধামগত শ্রীতিলকরাজ আরোরার সহধর্ম্মিণীর প্রার্থনায় তাঁহার শঙ্করপুরস্থ গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্শ্বদেবদেব উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকথায়ত পরিবেশন করেন।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড় :— চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৪শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল বুধবার হইতে ২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী সাক্ষা ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে হরিয়ানা রাজ্য-সরকারের রাজস্বমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীচিরঞ্জীলালজী, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রী এম. আর. শর্মা, শ্রীশম্ভুলাল পুরী বার-ম্যাট্রাই-ল ও পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীমোহনলালজী। প্রধান অতিথিরূপে বৃত্ত হন যথাক্রমে পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীজগজিৎ সিংজী, চণ্ডীগড়

সরকারী শিক্ষক-শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীরঘু-নাথ সফায়া, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচার-পতি মাননীয় শ্রীহরবংশলালজী, পাঞ্জাবের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী এবং খ্যাতনামা ম্যাড-ভোকেট শ্রীরামলাল আগরওয়াল। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী মূললিত ভক্তন-কীৰ্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

৭ই এপ্রিল সাধারণ মহোৎসবে সহস্র সহস্র নর-নারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। ১০ই এপ্রিল শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দ-রাধা-মাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বহির্গত হইয়া বিরাট শোভাযাত্রা ও বাতুভাণ্ডাদি সহযোগে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভূচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্তামণি দাস, শ্রীভাগবত-প্রপন্ন দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত-গণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাক্ষাফলমণ্ডিত হয়।

রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী চতুর্থ দিবসের অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—

“দেশের আজকের সমস্তা হ’চ্ছে চরিত্র গঠন। ছাত্র, শিল্পপতি, রাজনৈতিক-নেতা সকলেই নিজ নিজ চরিত্র হ’তে ভ্রষ্ট হ’তে চলেছে। গভীর চিন্তা ক’রলে দেখা যাবে এই সার্বজনীন চরিত্র-ভ্রষ্টতার মূল কারণ নাস্তিকতা। গতানুগতিকভাবে আমরা দেখছি বহুলোক ত’ মন্দিরে, চার্চে, মসজিদে যাচ্ছে, তবে সফল দেখা যাচ্ছে না কেন? বুঝতে হ’বে তা’দের

বিশ্বাসের মধ্যে আন্তরিকতা নাই। আমরা মুখে বড় বড় কথা বলি, কিন্তু কিছুই আচরণ করি না। স্বামীজীগণের জায় আদর্শচরিত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা জনতার মধ্যে ধর্ম ও নীতির মূল্যবোধ প্রসারিত হ'তে পারে। আমরা যা ক'রছি দেখি তা' দেখছেন, এই সামান্য জ্ঞানও যদি আমাদের মধ্যে সরলভাবে জাগে, আমরা নিয়ন্ত্রিত হ'বই। পবিত্র সৃষ্টিস্রষ্টা সমাজ যদি আমরা পেতে ইচ্ছা করি তা'হ'লে দেখব- বিশ্বাসরূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর জোর দিতেই হ'বে।”

জালন্ধর (পাঞ্জাব) — জালন্ধর নিবাসী শ্রীচৈতন্য শ্রোতৃবৃন্দ প্রেরিত ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সংকীর্তন সভার উদ্বোধনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে স্থানীয় ভক্তিসম্পাদকে বাবা লাল মন্দিরের সম্মুখে চব্বরে সূর্যহাস সভামণ্ডপে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমত্তক্দিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পৌরোহিত্যে সপ্তদশ বার্ষিক ধর্মসম্মেলন গত ২রা বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ৫ই বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী ও চণ্ডীগড় হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্ৰিতে ধর্মসম্মেলন হয়। শ্রীল আচার্যদেব রাত্ৰির সম্মেলনে প্রত্যহ অভিভাবণ প্রকাশ করেন। প্রাত্যহিকালীন সম্মেলনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপদ্ম ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ (বাহার পূর্বাশ্রম ছিল রাজ্যক প্রদেশে) ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—সম্বন্ধ তত্ত্ব

বিষয়ে শ্রীমহাপ্রভুর বিচারবৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত আলোচনা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, বাবা লাল মন্দিরের শ্রীমহন্ত মহারাজজী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন-সভার সভাপতি (মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত) শ্রীকৃষ্ণ-রামজী সর্বরওয়াল এবং উক্ত সভার সম্পাদক (মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত) শ্রীরামভজন পাণ্ডে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্তন-সভার অন্ততম সভা (মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত) শ্রীশ্রীজী অরুণ্ড পরিশ্রম সহযোগে সমস্ত সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা করেন। অপরাহ্ন ও রাত্ৰির সম্মেলনে বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। সভার কীর্তন করেন শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীদেব প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধব সিংজী ভামওয়ালে, শ্রীবালাকৃষ্ণ বশিষ্ঠ এবং লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, অমৃতসর, চণ্ডীগড় ও জালন্ধর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বহু সংকীর্তন-মণ্ডলী। ১৭ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্তন-শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। অগণিত নরনারী সংকীর্তন-শোভা-যাত্রায় যোগদান করায় নগরবাসিগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় সম্মেলন ও শোভাযাত্রার সংবাদ বিশেষ শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্তন-সভার সভ্যগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐতসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমত্তক্দিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকমে হায়দরাবাদ-স্থিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ মে শুক্রবার হইতে ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন মঙ্গলবার পর্যন্ত পাঁচদিবসব্যাপী ধর্মালুষ্ঠান

সুসম্পন্ন হইয়াছে। খজাপুর হইতে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমত্তক্দিদয়িত সন্ত মহারাজ একজন ব্রহ্মচারী সেবকসহ (শ্রীবিখনাথ ব্রহ্মচারী) উক্ত ধর্মালুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমঠের সংকীর্তন-ভবনে সন্ধ্যা ধর্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে

বৃত্ত হন যথাক্রমে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর আর. কে. পাণ্ডে, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক শ্রী বি. এ. সাহানে, হায়দরাবাদ সমাচার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমুনীন্দ্রজী, অন্ধপ্রদেশ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী ভি. মাধব রাও, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর বি. আর শাস্ত্রী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে অন্ধ-প্রদেশের রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রী টি. আনুজাইয়া, সেকেন্দ্রাবাদ এম্. পি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য ভার্গদকর (মধ্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য), বঙ্গ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর বিদ্যাচল ত্রিপাঠী, অন্ধপ্রদেশ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী জি. ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী এবং হায়দরাবাদ সহরের পুলিশ কমিশনার শ্রী কে. এন্. শ্রীনিবাসন্। চতুর্থ অধিবেশনের বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন Divine Life Society র (দিব্য-জীবন সঙ্ঘের) সভাপতি স্বামী শ্রীচিদানন্দজী মহা-রাজ। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুম্ভদ সন্ত মহারাজ প্রত্যহ অভি-ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীপাদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পা-দক শ্রীপাদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও বিশাখাপত্তনমের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রী জি. ভি. এম্. শর্মা (Sree G. V. S. Sarma). সভার আদি ও অন্তে কীর্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। তৃতীয় দিবসের অধিবেশনের প্রারম্ভে বেদমন্ত্র পাঠ করেন বিশাখাপত্তনমের প্রতি-বাদী ভরস্কর ভাস্করাচার্য্য। ৩০ শে মে রবিবার শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদ-রাধা-বিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহ-

গণ স্বৰ্গ্য রথারোহণে নগর-সংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া হায়দরাবাদ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। ৩১ শে মে সোমবার শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট-তিথিতে মথোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দন মহারাজ, শ্রীশ্রামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুভর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাদী এবং শ্রীবলভদ্র দাসাধিকারী ও শ্রীশ্রামহনন্দরলাল কনোড়িয়া প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্ত ও সঙ্গ-গণের হাদী প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

স্থানীয় হিন্দী, ইংরাজী, উর্দু ও তেলেগু ভাষার সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় উৎসবের সংবাদ প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে অন্ধপ্রদেশের জনপ্রিয় দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা — The Deccan Chronicle এ ওরা জুন তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

হায়দরাবাদস্থ Divine Life Societyর সেক্রেটারী র্যাড্‌ভোকেট শ্রীবেণুগোপাল রেড্ডির আমন্ত্রণে অন্ধ-প্রদেশস্থ দিব্যজীবন সঙ্ঘের ঊনবিংশতিতম বার্ষিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গত ২৯ শে জুন পূর্বাঙ্কে শ্রীল আচার্য্যদেব যোগদান করিয়াছিলেন। সেকেন্দ্রাবাদ পদ্মরাওনগরে একটি বিরাট সভামণ্ডপে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অন্ধপ্রদেশের গভর্নর মাননীয় শ্রীমোহনলাল সুখা-রিয়া উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। দিব্যজীবন সঙ্ঘের সভাপতি স্বামী শ্রীচিদানন্দজী মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গোড়ীর মঠাধ্যক্ষ মহারাজ তথায় অভিভাষণ প্রদান করেন।

চয়ন — 'The Deccan chronicle' (Hyderabad), Thursday, June 3, 1976 Chaitanya Gaudiya Math annual function held

His Divine Grace Sreemat B. D. Madhav Goswami Maharaj, President-Acharya All India Sree Chaitanya Gaudiya Math Organi-

sation in his address at the religious confer-
ence held on May 31 said—Faith in God
is innate in the nature of every being. No

amount of human efforts is competent to comprehend God who is transcendental. The right approach to God-realisation is through submission and cultivation of Divine Love. 'Persons of ideal characters can help people in imbibing faith in God and understanding moral and spiritual values of life'.

Swami Chidanandajee Maharaj, President, Divine Life Society in his address as distinguished speaker said—'Association of bonafide sadhus is the first and foremost pre-requisite for God-realisation.

'God dwells in the hearts of every individual. It is impure mind which acts as a screen obstructing feeling of the Divinity.

Constant company of the sadhus and hearing of the glories of God from the lips of the sadhus cleanses impure mind and makes it fit for God-realisation'.

Justice V. Madhava Rao presided while Mr. G. Venkataram Sastry retired Justice was the chief guest.

Mr. T. Anjiah Minister of Labour, Mr. B. R. Sastri Head of the Dept. of Sanskrit, Osmania University, Mr. K. N. Sreenivasan Commissioner of Police Hyderabad City participated.

A Sankirtan procession with the presiding Deities of the Math on chariot started from the Math and passed through the principal thoroughfares of the City on May 30.

মেদিনীপুর জেলায় শ্রীল আচার্যদেব

শ্রীলবদীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পর পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেব পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও সপরিচয় ২১ মার্চ রবিবার মেদিনীপুর জেলাভূগত আনন্দপুর ও কেশপুরের মঠাশ্রিত ভক্ত ও স্থানীয় গৃহস্থ সজ্জনগণের সাদর আহ্বানে তৎতৎ স্থানে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্যদেবের অলুগমন করেন—পূজ্যপাদ শ্রীমত্তত্ত্বিকবিকাশ হরীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপেরশাম্ভব ব্রহ্মচারী। ২১, ২২ ও ২৩ মার্চ আনন্দপুরে এবং ২৪ ও ২৫ মার্চ কেশপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ৫টি বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্যদেব সভায় প্রত্যাহই সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার সমুদয় ভাবগণের সাররূপে আমরা ইহাই জানিয়াছি যে, একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাই জীবগণের বিভিন্ন সোপানাবলীর মধ্যে নিত্য সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নে সমর্থ; সুদূর পাশ্চাত্য-ভূমি ইউরোপ, আমেরিকা ইহাতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় প্রাচ্য-ভূমি আজ মহাপ্রভুর শিক্ষাকে স্ব স্ব আত্মকল্যাণ-বিচারে সমাদর করিতেছেন এবং মহাপ্রভুর শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াই সমুদয় মানবজাতি সকলপ্রকার ভেদা-

ভেদ ভুলিয়া আজ পরস্পর ভ্রাতৃত্বাব পোষণ করিতেছেন,—এই সকল দেখিয়া শ্রীল আচার্যদেব বিশেষ উল্লাসবোধ করিতেছেন। তিনি বলেন, মনুষ্য-গণের পরস্পরের মধ্যে যাবতীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল উৎপাটিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে মৌলিক সন্তাব সংস্থাপিত হইতে পারে যদি তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্মের কিঞ্চিদাভাসও লাভ করিতে পারেন। প্রেমধর্মের বিস্তারকালে পরম আনন্দকন্ড সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-মহাপ্রেমরসপ্রদ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-রূপা-লাভে জীব কৃত কৃতার্থ হয়।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হরীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, রামগড়রাজ শ্রীরঞ্জিত কিশোর শাস্ত্রী ও শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিবসে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

আনন্দপুর ও কেশপুর ইহাতে ২৬ মার্চ শুক্রবার শ্রীল আচার্যদেব সপরিচয় মেদিনীপুর শ্রীজ্ঞানানন্দ গোড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। সন্ধ্যারাজিকান্তে শ্রীমঠেই সভার আয়োজন হয়; শ্রীল আচার্যদেব ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিকার যাবাবর গোবিন্দী মহারাজ সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ২৭ শে মার্চ শনিবার সপার্বদ শ্রীল আচার্যদেব কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচস্ত্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ববাস্তুপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮৩। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা
২০ শ্রীধর, ৪৯০ শ্রীগোরাঙ্গ; ১৫ শ্রাবণ, শনিবার; ৩১ জুলাই, ১৯৭৬।

সজ্জন-শাস্ত

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিক্তান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শুদ্ধবৈষ্ণব বা সজ্জনই একমাত্র শাস্ত। অসজ্জন হইতে কেহই ইচ্ছা করেন না। সত্য, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া অসংস্ভাবকে নিজ স্বভাব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া মায়াবদ্ধ অহঙ্কারী জীব অশান্তনামে আখ্যাত হন। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি বা মহত্ত্ব। মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব। অসজ্জন বৈষ্ণবাপরাধক্রমে অপ্রাকৃত দর্শন-বিমুখ হইয়া প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শমোদে ছটফট করিতে থাকায় তাঁহার অহঙ্কারের ক্রিয়াই পরিফুট হয়। তিনি সেই বিবে এরূপ জর্জরিত হইয়া অশান্ত হন যে, শ্রীশুদ্ধভক্ত-সজ্জনকেও অহঙ্কার-যুক্তভাবপূর্ণ আরোপপূর্বক তাঁহাকেও নিজ সদৃশ জ্ঞান করেন। প্রাকৃত অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি তিনি কোনদিন সজ্জন শাস্তের আদর্শ দেখিবার চক্ষু পান, তাহা হইলে ব্রূিতে পারিবেন যে, সজ্জনই কেবল শাস্ত, আর সর্দ্ধীর্ণ জড়বুদ্ধি বৈষ্ণবপরিচয়াকাজ্ঞী প্রাকৃত সহজিয়াই কেবল অশান্ত। শ্রীমদ্ব্যপ্রভু বলিয়াছেন যে—

“কেশাগ্র-শতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি।

তার সম হৃদয় জীবের ‘স্বরূপ’ বিচারি॥

তার মধ্যে ‘হাবর’, ‘জঙ্গম’ — দুই ভেদ।

জঙ্গমে তির্ধ্যাক্-জল-স্থলচর-বিভেদ॥

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।

তার মধ্যে শ্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে।

বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে।

ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত ‘কর্ম্মনিষ্ঠ’।

কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক ‘জ্ঞানী’ শ্রেষ্ঠ॥

কোটি-জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন মুক্ত।

কোটি-মুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

কৃষ্ণভক্ত — নিষ্কাম, অতএব ‘শান্ত’।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী — সকলই ‘অশান্ত’॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)

যাহারা জড়বিচার অবলম্বনপূর্বক সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-তত্ত্ব জানিয়াছি মনে করে এবং হরিসেবাপ্রবৃত্তি হইতে স্বীয় স্বভাবক্রমে দূরে অবস্থান করে, তাহাদের অনন্ত কোটি জীবনেও অপরাধ ছাড়ে না। তাহারা চিরদিনই অপরাধী বা অশান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিবার বাসনায় পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা কেহ মুখে বেদ মানে, কেহ বা নিজ যোষিৎ-সঙ্গময় পাপময় জীবনে বেদালোচনা নিষিদ্ধ জানিয়াও নীচ শূদ্রাভিমান প্রচারক নামে

প্রতিষ্ঠাভিক্ষু হয়। কৃষ্ণেচ্ছায় আপামর সকলেই তাহা-
দিগকে উপেক্ষা করে; স্তূতরাং উপেক্ষিত হইয়া তাহারা
বৈষ্ণবাপরাধে অশান্ত হইয়া উত্তরোত্তর সংসারে নিমজ্জিত
হয়। বেদের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বুঝিতে না
পারিয়া নিজ নিজ অসৎ অশান্ত-বৃত্তিসমূহকে তত্ত্বান্নামে
প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে।
বেদ মুখে মানিয়া হরিভজনবিমুখ বদ্ধ অহঙ্কারী জীব
বেদনিষিদ্ধ পাপ-সকল করিতে থাকে এবং তীব্র প্রতি-
বাদচ্ছলে সজ্জন সমাজকে নিন্দা করে। কোটা কোটা
তাদৃশ জীবনে অশান্তি পাইয়া ক্রমশঃ পাপক্ষয়ে জন্ম-
জন্মান্তরে পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া কৰ্ম্মপদবীতে উন্নত
হয়। পরে তাদৃশ বিষময় কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বা মিছা-
ভক্তকাণ্ড অতিক্রম করিয়া সজ্জনের অমল পাদপদ্মে শান্তি
লাভ করে। যেকাল পর্য্যন্ত না ক্লেশবিমুখ অশান্ত-বৃত্তির
বিষময় ফল উপলব্ধি হয়, যেকাল পর্য্যন্ত না শ্রীসজ্জনের
অমল পাদপদ্মের মাহাত্ম্য স্মৃতিক্রমে লভা না হয়, তৎ-
কালাবধি অহঙ্কারী জীব, বৈষ্ণবকে নিজের হার অশান্ত
অহঙ্কারী কপটী জীববিশেষ বলিয়া চিৎকার করে। শুদ্ধ
বৈষ্ণবের ধৰ্ম্ম এই সকল অনভিজ্ঞ অর্কাটীন অশান্ত জীবকে
কেবল উপেক্ষা করা। শ্রীমন্তাগবতে ত্রিদণ্ডী ভাগবত মহো-
দয় যে-ভাবে অশান্ত অহঙ্কারী জীবগণের দ্বারা নিপীড়িত
হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেইস্থান
প্রত্যেক বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর অনুক্ষণ আলোচ্য বিষয়।
বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী বা ত্যক্তদণ্ড পরমহংসগণ এই অশান্ত
জীবকে তাহাদের অশান্তি হইতে উদ্ধৃত্ত করিবেন না,
পরন্তু উপেক্ষা করিবেন মাত্র, ইহাই ত্যক্তদণ্ড বা ত্রিদণ্ডীর
ধৰ্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত এই ত্রিদণ্ডীর ধৰ্ম্মকেই “গৃহি-গৌরঙ্গ-
সেবী” বদ্ধজীবের সর্বোত্তম বিচার বলিয়া নিরূপণ
করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই এই ত্রিদণ্ডি-ধৰ্ম্মের ব্যাখ্যাতা
এবং শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং সন্ন্যাস করিয়া তাহাই ত্রিদণ্ডি-
বৈষ্ণবের জন্ত স্বয়ং আশ্বাদন করিয়া দেখাইয়াছেন।
ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের অশান্তিময়
ধৰ্ম্ম অপগত হইবে। বদ্ধজীব কৃত্রিম সাংঘিকবিকার
অথবা বাবা ঠাকুরের সম্ভান প্রভৃতি অসৎ পরিচয়
ছাড়িয়া সজ্জন হইতে পারিবেন।

“তুর্জনগণ বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীকে তিরস্কার, অপমান,
উপহাস, হিংসা, তাড়না, আবদ্ধ ও নানাপ্রকারে বঞ্চনা
করেন। কোনসময় ত্রিদণ্ডীকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার গাত্রে
থুথু ফেলেন, প্রত্যাঘ করিয়া দেন এবং তাঁহার ভগবদ্ভজনে
নানাপ্রকার ব্যাঘাত করেন। ত্রিদণ্ডী, তুর্জনের কথায়
আপনার ভজনিষ্ঠা ত্যাগ না করিয়া স্বয়ং সমস্ত সহ্য
করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, যাহারা তুর্জনের
বাক্যে ক্ষুব্ধ না হন, এরূপ সাধু জগতে বিরল।
অসজ্জনের নিষ্ঠুর বাক্যবাণ অক্লান্ত, কেবল হরিভক্তি
থাকিলে তিনি সহ্য করিতে সমর্থ। অবন্তীদেশে এক
ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নানাপ্রকারে ধন সঞ্চয় করিয়া সমাজে
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার রূপণ স্বভাব ও লোভ-
বশতঃ গ্রামবাসীগণ, দেবগণ এবং অসংখ্য অনেকেই
তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। এই প্রতিকূল আচরণের
ফলে তিনি সকল-প্রাকৃতবিষয় হইতে অপসারিত
হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্যে উপনীত হইলেন। বৈরাগ্য
উদয় হইবামাত্র তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রতি
ভগবানের নিকট কল্পনার উদয় হইয়াছে। তিনি
আপনাকে নিত্য কৃষ্ণদাস জানিয়া ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু
প্রভৃতি তুর্বাশ্রম-সংস্কার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, যেহেতু
কৃত্রিমভাবে তাদৃশ সংস্কার একব্যক্তি অপরকে দিতে
অসমর্থ এবং কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে ছল-
বৈরাগ্য গ্রহণ করিতেও অসমর্থ। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে
আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্যের আদর শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি
কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু তাদৃশ আদর্শের
অনুসরণে গুরুর নিকট হইতে কৃত্রিম বৈরাগ্য গ্রহণ-
পন্থাই যে সমীচীন, এরূপ সজ্জনগণ বলেন না।
বিবিৎস্যা বা বৈধ সন্ন্যাসে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্য
স্বীকৃত আছে। আবস্তিক-ভিক্ষু মহাশয় লৌকিক নিজ-
ভোগ্য-সকল পরিত্যাগ করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের সকল-
আশা-ভরসা ছাড়িয়া যখন হরিভজনেদ্রোশে স্বীয়
ত্রিদণ্ড গ্রহণের সন্ন্যাসের প্রদর্শনে বাহিয় হইলেন, তখন
গৃহমেধী অশান্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাকে বৃদ্ধ, বৃক ও
বালক হইয়া তাঁহার ত্রিদণ্ডে টান লাগাইলেন, তাঁহার
কমণ্ডলু, কন্যা, যজ্ঞস্থত্র, মালিকা কাড়িয়া লইতে গেলেন,

তাঁহার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে অসজ্জনগণ খুংকার ও প্রশংসা করিয়া দিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্ত মন্তকে পদাঘাত করিলেন, কেহ বলিতে লাগিলেন, এই ত্রিদণ্ডী চোর, বিষয় রক্ষা করিতে না পারিয়া, ভোগে অসমর্থ হইয়া ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন; লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্ত নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিতেছেন, এই ত্রিদণ্ডীকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাধ, ইহাকে সকলে মিলিয়া বধ কর, ইহার সম্মাসের দ্রব্য-গুলি অপহরণ কর, ইনি ধর্ম্মধ্বজী এবং শঠ, মৌন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বকের আয় কপটাচারী প্রভৃতি নানা দুর্ভাষা বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর ভাগ্যে চিরদিনই ঘটিতে থাকিল। ত্রিদণ্ডিভিক্ষু আপনাকে এই অকৃত্তক বাধ্যবাণে অথবা অসতের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট মনে না করিয়া সাম্বিকী ধৃতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই, যে-সকল অনভিজ্ঞ অর্কাচীন বিষয়মতে প্রমত্ত হইয়াছে এবং ভগবানকে মায়িক অবতার মনে করে, তাঁহারা কিছু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী নহে, তাঁহাদের ধর্ম্ম-বৃত্তি ও আচরণ পরিবর্তিত করাইয়া আমি কোন পার্থিব শাস্তি চাই না, যেদিন তাঁহারা বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে, সেইদিন তাঁহাদের ঐ প্রকার অসদ্বৃত্তি আপনা হইতে নিবৃত্ত হইবে। আমি কেন তাঁদের প্রচণ্ড রক্তস্রবের প্রতিবন্ধক হই? জীব মাঝেই যখন স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, তখন তাঁহাদের প্রচণ্ড বিরূপ নৃত্য একদিন না একদিন থামিয়া যাইবে। আমি বর্ত্তমান-কালে আমার ভজননিষ্ঠা ছাড়িয়া দুর্বৃত্তদিগকে প্রত্যুত্তর-

হুত্রে অথবা তাঁহাদের জিজ্ঞাসাত্মক কোতূহল-পরিতৃপ্তির ইন্দন-স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন? তাঁহারা অশ্রদ্ধবান, কোন কথা তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রমত্ততায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি ত্রিদণ্ডী ভাগবতদাস, সূত্ররাং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগকে কোন-প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বিশুদ্ধ মহাজনের পথের অনুসরণ করিয়া এই দুর্বৃত্তগণের চতুর্ধ্বংসরূপ অস্ত্রাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানপথদ্বয়ে বিচরণ করিব না। সজ্জন শাস্তগণ যে কৃষ্ণক-শরণতা আশ্রয় করিয়া, সমগ্র জাগতিক দুর্বৃত্তি ছাড়িয়া হরিভজন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমি দুর্জয়গণের হিংসা-বাহির ইন্দন-স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের অশান্তির বৃদ্ধি করাইব না।”

শ্রীগৌরসুন্দর এই গাথা গান করিয়াই নিজাশ্রিত বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিগণকে শ্রীহরিভজনের যে পথ দেখাইয়াছেন, তদনুসরণেই প্রাচীন বৈষ্ণবকতিগুলিতে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। “গৃহী গোরাঙ্গের” সেবক গৃহমেধী যাজ্ঞিকের এই সকল কথা ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে কোনদিন প্রবেশ করিবে না। তাঁহারা সন্ধীর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া বৈধ ও অবৈধ প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া জড়ভোগকেই ‘প্রেম’ বলিয়া জাহির করিবে। কিন্তু শাস্ত সজ্জনগণ এরূপ যুগিত বৈধাবৈধ দুইপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়াবাদকে অন্তরের সহিত বর্জন করিয়া শ্রীব্রজবাসী গোষামিবর্ণের নির্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণভজনমার্গে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা সহজিয়াদিগের যুগিত জড়ভোগময় হিংসোথ তীব্র প্রতিবাদকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(নামে রুচি)

প্রঃ — ভক্তি-স্বকৃতির অভাবে নামে রুচি হয় কি?

উঃ — “যে ব্যক্তির ভক্তি-স্বকৃতি না থাকে, তাঁহার কখনই ভক্তি-তবে শ্রদ্ধা হয় না। নামই ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব স্বকৃতির অভাবে নামে রুচি জন্মে না।”

—‘নামে অর্থবাদ’, হং চিঃ

প্রঃ — হরিনামে রুচি হইলে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের কোন আবশ্যকতা থাকে কি?

উঃ — “যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কারদ্বারা চিদহুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্ম্মাকারে আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদহুশীলন।

সন্ধ্যা-বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্যের উপায়
মাত্র—ইহা কখন সম্পূর্ণ-তত্ত্ব হয় না।”

— জৈঃ ধঃ ওয় অঃ

প্রঃ — কিরূপে ও কখন নামে রুচির উদয় হয় ?

উঃ — “প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া

সে নাম কীৰ্ত্তন করি।

সিতপল যেন, নাশি’ রোগ-মূল,

ক্রমে স্বাস্থ্য হয় হরি ॥

তুর্দৈব’ আমার, সে নামে আদর,
না হইল দয়াময়।

দশ অপরাধ, আমার তুর্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয় ॥

অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে রূপায় তব।

অপরাধ যাযে, নামে রুচি হবে,
আশ্বাদিব নামাসব ॥”

অবতারী—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্ — স্বয়ংরূপ সর্বকারণ-
কারণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব, তাঁহার স্বরূপশক্তিসমম্বিত — শ্রীশ্রীরাধা-
ভাবকান্তিসুবলিত সেই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-
স্বরূপই তজপ কলিযুগে কলিযুগপাংনাবতারী স্বয়ং-ভগবান্
শ্রীগৌরসুন্দর। ভক্তরাজ প্রহ্লাদের শ্রীনুসিংহ গুণিতে
তাঁহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পূর্ব হইতেই প্রকাশিত হইয়া
আছে। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন —

“ইথং নৃতির্থাগৃবিদেবকথাবতীরৈ-

লৌকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ! পাসি যুগান্নুযুক্তং

ছন্নঃ কলৌ যদভবজ্জিযুগোহথ স ত্বম্ ॥”

— ভাঃ ৭।৯।৩৮

অর্থাৎ হে ভগবন্! এইভাবে আপনি নর (কৃষ্ণ, রান),
তির্থাঙ্ক (বরাহ), ঋষি (পরশুরাম), দেবতা (বামন) ও
মৎস্য রূপ (কুর্ম), প্রভৃতি অবতার কর্তৃক ত্রিভুবন পালন
করেন এবং জগদ্দ্রোহীদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন।
হে মহাপুরুষ! আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া
থাকেন; আর কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনি
‘ত্রিযুগ’-নামে অভিহিত।

এই ‘ত্রিযুগ’ শব্দটি লইয়া একদিন অদ্বিতীয়
নৈমায়িক পণ্ডিত শ্রীরাঘদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যেরও
পর্য্যন্ত মণ্ডা ঘুরিয়া যাইবার অভিনয় হইয়াছিল।

বিদ্যানগর (জেঃ নদীয়া) নিবাসী শ্রীমহেশ্বর বিশারদের
হই প্রুত — শ্রীমুখদন বাচস্পতি ও শ্রীরাঘদেব সার্বভৌম।
শ্রীমহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাধর চক্রবর্তী ছিলেন
শ্রীবিশারদের সহাধ্যায়ী, শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্রীবিশা-
রদের জামাতা। সুতরাং শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের
ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য। প্রথমে শ্রীসার্বভৌম
শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়া
তাঁহাকে ‘মহাভাগবত’ বলিয়া স্বীকার করিলেও
শ্রীগোপীনাথের ‘ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা’ — এই
কথাটি তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য হইল না। তিনি বলিলেন—

“মহাভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাক্ষি।

এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥

অতএব ‘ত্রিযুগ’ করি’ কহি বিষ্ণু-নাম।

কলিযুগে অবতার নাই, — শাস্ত্রজ্ঞান ॥”

— (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৯৪-৯৫)

শ্রীআচার্য্য ইহা শুনিয়া একটু দুঃখিতচিত্তে কহি-
লেন — ‘সার্বভৌম, তুমি নিজেকে ‘শাস্ত্রজ্ঞ’ বলিয়া
অভিমান করিতেছ, কিন্তু পঞ্চমবেদস্বরূপ ‘মহাভারত’
এবং সেই ‘ভারতার্থবিনির্গয়’ ভাগবত — এই দুই গ্রন্থই
প্রধান শাস্ত্র, অথচ সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে তোমার
মনোযোগ নাই। তাঁহারা উভয়েই কলিতে স্বয়ংরূপ অব-
তারীর আবির্ভাব আছে, ইহা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তবে কলিতে শ্রীভগবানের লীলাবতার নাথাকায়ই তাঁহাকে ‘ত্রিযুগ’ বলা হইয়াছে। প্রতিযুগেই কৃষ্ণের যুগাবতার হয়, ইহা তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয় ধারণা করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন —

“আসন্ বর্ণাঙ্কয়ো হস্ত গৃহতোহনুযুগং তনুঃ।

শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকৃষ্ণং সাক্ষোপাদ্বাদ্রপার্ষদম্।

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি স্নমেধসঃ ॥”

— (ভাঃ ১০।৮।১৩; ১১।৫।৩১, ৩২ শ্লোক)

মহাভারত-দানবধর্ম্মে (১৪৯ অঃ) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নামেও (৯২ ও ৭৫ সংখ্যা) লিপিত আছে —

“স্ববর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাঙ্গচন্দনাদঙ্গী।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শাস্তো নিষ্ঠা-শাস্তি-পরায়ণঃ ॥”

[অর্থাৎ শ্রীগঙ্গমুনি নন্দমহারাজকে বলিতেছেন —

হে নন্দ, তোমার এই পুত্র প্রতিযুগেই স্বীয় শ্রীমূর্তি প্রকট করিয়া থাকেন। পূর্বে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত — এই তিন বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল, সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হইয়াছেন।

(নবম যোগেন্দ্র করভাজন ঋষি বিদেহরাজ নিমির ‘ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ কালে কোন্ বর্ণ ও কাদৃশ আকৃতিবিশিষ্টরূপে কোন্ নামে কোন্ বিধি অনুসারে মানবগণকর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন’ — এই প্রশ্নোত্তরে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগাবতার ও যুগধর্ম্মাদি বর্ণন করিয়া বলিতেছেন —) ‘হে রাজন্, দ্বাপরযুগে মানবগণ এই প্রকারে জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।’ (কলিযুগে তন্ত্রমার্গের অর্থাৎ সাহিত্য পঞ্চরাত্র-বিহিত মার্গেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে।) ‘যাঁহার মুখে সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্শদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে স্তুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রায় যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞন করিয়া থাকেন।’

‘স্ববর্ণবর্ণ, গলিত-হেমবৎ অঙ্গ, সর্বদাঙ্গসুন্দর গঠন,

চন্দন-মালা-শোভিত, — এই চারিটি গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরহস্তালোচনরূপ শমশুণ্যবিশিষ্ট, হরি-কীৰ্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠতারূপ কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্তনিবৃত্তিকারিণী শাস্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।’]

শ্রীল শ্রীজীবগোপস্বামিপাদ ‘কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকৃষ্ণং’ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় ও সর্বসম্বাদিনীতে লিখিয়াছেন—

“ত্রিবা কান্ত্যা যোহকৃষ্ণো গৌরস্তং স্নমেধসো যজন্তি।” গৌরত্বকান্ত ‘আসন্ বর্ণাঙ্কয়ো হস্ত গৃহতোহনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ’ ইত্যত্র পারি-শেষ্যপ্রমাণ-লব্ধম্। ‘ইদানীম্’ এতদবতারাস্পদত্বেনাভি-ধ্যাতে দ্বাপরে ‘কৃষ্ণতাং গতঃ’ ইত্যুক্তেঃ, শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতং পীতস্তাতীতত্বং প্রাচীনাবতার-পেক্ষয়া। অথ শ্রীকৃষ্ণস্ত পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ-যুগাবতারত্বং, — তস্মিন্ সর্বেষুপাবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্ত্বং প্রয়োজনং তস্মিন্নৈকস্মিন্নেব সিদ্ধাতীত্যপেক্ষয়া তদেবং যদ্বাপরে কৃষ্ণোহবতারতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোহপ্যবতারতিতি স্বায়ত্তলব্ধৈঃ শ্রীকৃষ্ণাবি-ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যয়াতি, তদব্য-ভিচারঃ। তদেতদাবিভাবত্বং তস্ত স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা ব্যনক্তি। ‘কৃষ্ণবর্ণং’ — কৃষ্ণতোতো বর্ণোচ যজ্ঞ; যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবন্যসি কৃষ্ণত্বাভিযাজকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমঙ্গীত্যর্থঃ; তৃতীয়ে শ্রীমহাক্ষবাক্যে ‘সমা-হুতা’ ইত্যাদি পণ্ডে ‘শ্রিয়ঃ সর্ববর্ণেন’ ইত্যত্র টীকায়াং — ‘শ্রিয়ো কল্পিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্ত সঃ, শ্রিয়ঃ সর্ববর্ণো কল্পীতাপি দৃশ্যতে’; যবা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাসস্বরূপোন্মাদসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরম-কারুণিকতয়া চ সর্বোন্মাদোহপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যন্তম্, অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্রিবা স্বশোভাবিশেষে-নৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদর্শনেনৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্মরতীত্যর্থঃ; কিংবা সর্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ‘ত্রিবা’ প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং, তাদৃশ-শ্রামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপাত্তেব প্রকা-শাং তদৈবাবিভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্যা ভগবত্বমেব স্পষ্টয়তি — ‘সাক্ষোপাদ্বাদ্রপার্ষদম্’ — অঙ্গান্তেব পরম-মনোহরত্বাহুপাদ্বাদ্রি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাবত্বাং তাত্ত্বে-

বাস্তবানি, সর্বদৈবৈকান্তবাসিতাত্ত্বৈব পার্শ্বদাঃ। বহু-
ভিন্নহাস্যভাবৈবসকৃদেব তথা দৃষ্টোহসাবিতি গোড়বরেন্দ্র-
বদ্বোংকলাদিদেবীযানং মহাপ্রসিক্কে, যদ্বা, অত্যন্ত-
প্রেমাপ্পদস্বাত্তুল্যা এব পার্শ্বদাঃ শ্রীমদদৈবতাচার্য্যমাসু
ভাবচরণপ্রভৃত্যন্তঃ সহ বর্তমানমিতি চার্খান্তরেণ ব্যক্তম্।
তদেবন্তুং কৈর্যজ্ঞন্তি? যজ্ঞঃ পূজাসম্ভারৈঃ, 'ন যত্র
যজ্ঞেশমধা মহোৎসবাঃ' ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ
তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি, 'সঙ্কীৰ্তনং' বহুভিমিলিত্বা
তদগানস্বং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ, তথা সঙ্কীৰ্তন-
প্রাধান্ত্য তদাশ্রিতেষেব দর্শনাং, স এবাত্মাভিধেয় ইতি
স্পষ্টম্। অতএব সংস্রামি তদবতারসূচকানি নামানি কথি-
তানি — 'স্ববর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গচন্দনাদ্বদী। সন্ন্যাস-
কৃচ্ছমঃ শান্তঃ' ইত্যেতানি। দর্শিতক্লেতং পরমবিদজি-
রোমণিনা শ্রীসার্কভৌমভট্টাচার্য্যেণ — 'কালারং ভক্তি-
যোগং নিজং যঃ প্রাক্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনাম। আবির্ভূত-
স্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীলতাং চিত্তভূদঃ॥'
ইতি 'সর্বসংবাদিহাস্যম্'।

উহার অর্থ এইরূপঃ — 'দ্বিবা' অর্থাৎ কান্তিতে যিনি
'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ, বুধগণ তাঁহার উপাসনা
করেন। 'প্রতিযুগে তনু (বিগ্রহ) ধারণপূর্বক অবতীর্ণ
স্বয়ং শ্রীহরিস্বরূপ তোমার এই পুত্রের পূর্বে শুক্ল,
রক্ত এবং পীত — এই তিনটি বর্ণ ছিল; ইদানীং
তিনি কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।' — শ্রীমদ্-
ভাগবতে (১০।৮।১৩) শ্রীন্দ মহারাজের প্রতি কথিত
গর্গমুনির এই বাক্যে পূর্বোক্ত শুক্ল, রক্ত ও গ্রামবর্ণ
ব্যতীত অবশিষ্ট 'পীতবর্ণ' প্রমাণ হইতে ইহার গৌর-
বর্ণের কথা পাওয়া যায়। 'ইদানীং' অর্থাৎ বর্তমান
অবতার-কালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ)
প্রাপ্ত হইয়াছেন' এই উক্তি নিবন্ধন এবং সত্য ও
ব্রোতায়ুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের
পূর্ব পূর্ব (কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণপূর্বক সেই সেই)
অবতারকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই (কলিযুগাবতারে
গৃহীত) পীতবর্ণের অতীতকালত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।
শ্রীভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণস্বরূপে পরে কীৰ্তিত
হইবেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত

বলিয়া, একমাত্র তাঁহাতেই যে সেই সমস্ত অবতারের
প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, — ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই
তাঁহার যুগাবতারত্ব ঘটিল। অতএব যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ
অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী অর্থাৎ
সেই চতুর্থ যুগান্তর্বর্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরও
যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, — এরূপ ভাৎপর্ধ্য
বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর যে
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত
হইতেছে; যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রম
ঘটে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-
বিশেষ, এবিষয় গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে নিম্ন-
লিখিত বিশেষণ-দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন, যথা — 'কৃষ্ণ-
বর্ণ — 'কৃ' এবং 'ষ্ণ' — এই দুইটি বর্ণ (অক্ষর)
আছে যাহাতে, অর্থাৎ যাহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' নামের
মধ্যে কৃষ্ণ (স্বয়ং ভগবতা)-সূচক 'কৃ' এবং 'ষ্ণ'
এই দুইটি বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিদ্যমান; যেমন
(ভাঃ ৩।৩।৩) শ্রীউদ্ধব-কথিত 'সমাহুতাঃ' ইত্যাদি
পদস্থিত 'শ্রিয়ঃ সর্বগেন', এই অংশের শ্রীল শ্রীধর-
স্বামিকৃত টীকায় 'শ্রী'র বা 'কৃষ্ণগী'র 'সর্ব' বা 'সমান'-
বর্ণন্য (অর্থাৎ 'কৃষ্ণী' এই বর্ণন্য) হইয়াছে বাচক
যাহার, সেই ব্যক্তিই 'শ্রিয়ঃ সর্বগঃ' (অর্থাৎ 'কৃষ্ণী'),
— ইত্যাদি (বহুস্থলে সমাসাশ্রয়ে এরূপ) অর্থ
করিতেও দেখা যায়;

অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ' পদে যিনি কৃষ্ণনাম 'বর্ণন' করেন,
অর্থাৎ তাদৃশ স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস স্রবণ-জনিত
উল্লাস-বশতঃ স্বয়ং ঐ নাম গান করেন এবং পরম-
করণ্যবশতঃ সমস্ত লোককেই ঐ নাম যিনি উপদেশ
করেন, তিনি;

অথবা যিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌর হইয়াও
'দ্বিবা' (দ্বি শব্দের ওয়া) বা স্বশোভা-বিশেষদ্বারাই সমস্ত
লোককে 'কৃষ্ণনাম উপদেশ প্রদান করেন', অর্থাৎ যাহার
দর্শনেই সমস্ত লোকের কৃষ্ণ-স্মৃতি হইয়া থাকে, তিনি;

অথবা সর্বলোকদ্রষ্টা কৃষ্ণ 'গৌর' রূপে অবতীর্ণ
হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে যিনি 'দ্বি' বা কান্তি-
বিশেষের দ্বারা 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ তাদৃশ শ্রীমদ্বন্দ্যরূপেই
বর্তমান, তিনি;

অতএব শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই প্রাকট্যাহেতু অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ার, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

‘সাক্ষোপাঙ্গাঙ্গপার্ষদং’ এই পদ-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন, — ‘সাক্ষোপাঙ্গাঙ্গপার্ষদ’ অর্থাৎ যিনি অঙ্গোপাঙ্গাঙ্গপার্ষদ সহ বর্তমান। ‘অঙ্গোপাঙ্গাঙ্গ-পার্ষদ’ পদটি কর্মধারয় সমাসাশ্রয়ে সাধিত হইয়াছে। ইহার ব্যাসবাক্য এইরূপ, — যাহা ‘অঙ্গ’, তাহাই ‘উপাঙ্গ’, তাহাই ‘অঙ্গ’, তাহাই ‘পার্ষদ’; ভগবানের অভিন্ন ‘অঙ্গ’-সমূহ—পরমমনোহর বলিয়া ‘উপাঙ্গ’ বা ভূষণরূপে, মহা-প্রভাব-যুক্ত বলিয়া ‘অঙ্গ’-রূপে এবং সর্বদাই একান্তভাবে ভগবৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া ‘পার্ষদ’-রূপে প্রকটিত; বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবম্বিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন, তাহা গোড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকল প্রভৃতি দেশবাসি লোকগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে; অথবা, উক্ত পদে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অঙ্গের তুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীমদধৈত্যাচাৰ্য্য প্রভৃতি বহু প্রভাব-শালী পার্ষদগণের সহিত বর্তমান,’ এরূপ অর্থান্তরেও তিনি ব্যক্ত হইতেছেন। এমন যে গৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন? তদন্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে ‘যজ্ঞ’ অর্থাৎ পূজাসম্ভার-দ্বারাই আরাধনা করেন; যেহেতু ‘ন যত্র যজ্ঞেশমখ্যাঃ’ ইত্যাদি (ভাঃ ৫।১৯।২৩ শ্লোকে) দেবগণের গীতবাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতে ‘সঙ্কীর্তনপ্রার্থঃ’ এই বিশেষণ-দ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন; তন্মধ্যে ‘সঙ্কীর্তন’ অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহুলোকের যে শ্রীকৃষ্ণনাম-গান, সেই সঙ্কীর্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্তমান যাহাতে, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনবহুল যজ্ঞাদিদ্বারা এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সঙ্কীর্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া সেই সঙ্কীর্তন-যজ্ঞই যে এইস্থলে অভিধেয়, ইহা স্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব মহাভারতেও দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ, শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায় তাঁহার (শ্রীগৌরের) অবতারসূচক ‘স্ববর্ণবর্ণ, হেমতল্ল, সূর্য্যাম ও চন্দ্রনবলয়যুক্ত এবং সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত ও শান্ত’ ইত্যাদি

নামসমূহ কথিত হইয়াছে। পরমপণ্ডিতশ্রীমোক্ষানন্দ শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যমহাশয়ও এবিষয়ঃ (শ্রীগৌরাবির্ভাব) এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন,—‘কালক্রমে অন্তর্হিত স্বীয় ভক্তিব্যোগ যিনি পুনর্বার প্রকটিত করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তনামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোমধুপ গাঢ়ভাবে লীন হউক।’ (শ্রীজীব-প্রভুকৃত ‘ক্রমসন্দর্ভ, ও ‘সর্বসম্বাদিনী’))

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—যথা আদি ৩য় পঃ —

“শুন ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা।

এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥

‘কৃষ্ণ’ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে।

অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ষে নিজ-মুখে ॥

কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত’ প্রমাণ।

কৃষ্ণবিহ্নু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥

কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।

আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ ॥

দেহকান্তো হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ।

অকৃষ্ণবরণে তাঁর কহে পীতবরণ ॥

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের ছাতি।

ধাঁধার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্তুতি ॥

জীবের কন্ময়-তমো নাশ করিবারে।

‘অঙ্গ’ ‘উপাঙ্গ’ নাম নানা ‘অঙ্গ’ ধরে ॥

* * *

অন্ত অবতারে সব সৈন্ত-শস্ত্র-সঙ্গে।

চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্ত অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥

অঙ্গোপাঙ্গ-অঙ্গ করে স্বকার্য্য-সাধন।

‘অঙ্গ’ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥

‘অঙ্গ’ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।

অঙ্গের অবয়ব ‘উপাঙ্গ’-ব্যাখ্যান ॥

* * *

অধৈত, নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই ‘অঙ্গ’।

অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে ‘উপাঙ্গ’ ॥

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অঙ্গ প্রভুর সহিতে।

সেই সব অঙ্গ হয় পাণ্ড দলিতে ॥

নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ দেবর ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্ত সঙ্গে লঞা।
হই সেনাপতি বলেন কীর্তন করিয়া ॥

* * *

সঙ্কীৰ্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীৰ্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য।
সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
‘সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥’

সুতরাং যে ষাপরযুগে কৃষ্ণ অবতরণ করেন, তদ-
অব্যবহিত কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীগৌরসুন্দরও অবতীর্ণ
হন, এই স্বারস্ত লব্ধ হওয়ায় শ্রীগৌরান্দ যে শ্রীকৃষ্ণেরই
অবির্ভাব-বিশেষ, ইহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ-
বতারে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য এবং শ্রীগৌরবতারে
ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর প্রকট-
লীলা বিস্তার পূর্বক অন্তর্দ্বান করিয়া মনে করিলেন
— এযাবৎ আমি জগৎকে ব্রজের প্রেমভক্তি প্রদান
করি নাই। লোকে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া আমাকে
বিধিভক্তিতে ভজনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সেই বিধিভক্তিতে
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল থাকায় ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয়
অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তা থাকে না, এজন্য ‘ঐশ্বর্য্যশিথিল-
প্রেমে নাহি মোর প্রীতি’। ‘বিধি-ভক্তো ব্রজভাব পাইতে
নাহি শক্তি’ ইত্যাদি উক্তি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমাগ্নে
ভজন করতঃ ভক্ত সান্নিধ্য (সমান ঐশ্বর্য্য), সাক্ষ্য (সমান
রূপ), সালোক্য (সমান লোক) ও সামীপ্য (সমীপে
অবস্থিতি)-রূপ চতুর্বিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ
করেন। অবশ্য ব্রহ্মের সহিত একতা-রূপ সাযুজ্য মুক্তি
বিধিমাগ্নের ভক্তও চাহেন না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে
প্রেমভক্তির অধিকারী হইলে ভক্ত সাযুজ্য ত’ দূরের
কথা, ঐ চারি প্রকার বৈকুণ্ঠের মুক্তিকেও পরিতাগ
পূর্বক ভগবানের সেবা সুখ লইয়া মত্ত থাকেন। এই
জগতে এবস্থিধ প্রেমভক্তি প্রচারই আমার অভীষ্ট।

আমি কলিযুগধর্ম্ম যে নাম-সঙ্কীৰ্তন, তাহা দাস্ত-সখ্য-
বাৎসল্য-মধুর (শৃঙ্গার) রসের সহিত জগৎকে দিয়া,
সকলকে নৃত্য করাইব। নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকার
পূর্বক আচারমুখে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইব :—

“আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।

‘আপনি আচরি’ ভক্তি শিখামু সবারে।’

‘আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান’ না যায়।

এই ত’ সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥”

— চৈঃ চঃ আদি ৩২০-২১

[শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ‘যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত’, ‘পরি-
ভ্রাণায় সাধুনাং’, ‘উৎসিদেয়ুরিমে লোকাঃ’ ও ‘যদ্যদা-
চরতি শ্রেষ্ঠঃ’ ইত্যাদি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।]

তাই কৃষ্ণ স্থির করিলেন — ‘যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীৰ্তন
প্রবর্তন ও ব্রজপ্রেম বিতরণার্থ আমি প্রপঞ্চে প্রকটবিহার
করিব’। তবে যুগধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য তাঁহার অংশাবতার-
দ্বারাও সাধিত হইতে পারে; কিন্তু তিনি অর্থাৎ
পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং না আসিলে ব্রজপ্রেম-প্রচার
অন্ত কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। তাই—

“এত ভাবি’ কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।

অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥”

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে
‘প্রথম সন্ধ্যায়’ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

“যুগায়ত্তকালে আদিতে এবং যুগান্তকালে শেষে
যুগের ষষ্ঠভাগ-পরিমিত-কাল ‘সন্ধ্যা’। যুগের প্রথম
সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ ও শেষসন্ধ্যা দ্বাদশভাগ। সুতরাং
কলিকালের প্রথম সন্ধ্যা ৩৬০০ সৌরবর্ষ। শ্রীগৌর-
সুন্দর কলিকালের ৪৫৮৬ বর্ষ গত হইলে একটি
হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমাদ্রাপুর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ
করেন। “ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যায়াঃ স্বকঃ,
শ্রীধর্ম্মসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারে ১৭শ শ্লোকঃ ॥”

— চৈঃ চঃ আ ৩.২৯ অনুভাষ্য

(ক্রমশঃ)



শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উত্তরোত্তর পরাবস্থ

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে ‘এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং’ (ভাঃ ১।৩।২৮) অর্থাৎ “ইহারা পুরুষের অংশকলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ — স্বয়ংভগবান্।” — এই শ্লোকোক্তির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন : —

“এতে পূর্বোক্তাঃ, ‘চ’ শব্দাদনুক্রান্ত প্রথমমুদ্রিষ্ট পুংসঃ পুরুষাংশকলাঃ কেচিদংশাঃ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাৎ-দংশত্বেনাংশাংশত্বেন চ দ্বিবিধাঃ, কেচিদংশাবিষ্টদ্বাদংশাঃ কেচিত্তু কলা বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্ত ভগবান্ পুরুষত্বাপ্যবতারী যো ভগবান্ স এষ এবোত্যর্থঃ।”

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্মা কাব্য, তর্ক (ক), তর্ক (খ), ভক্তি, বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উহার অনুবাদে লিখিতেছেন —

“পূর্বে যেসকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে এবং যেসকল অবতারের কথা বলা হয় নাই, তাঁহার সকলেই প্রথমোক্ত পুরুষ কারণার্ণবশায়ীর অংশ এবং কলা; অর্থাৎ কেহ কেহ অংশ, কেহ কেহ কলা — বিভূতি। অংশ দুই প্রকার — সাক্ষাৎ অংশ ও অংশের অংশ। অবতারগণমধ্যে বিংশতিতম অবতার-রূপে কথিত, যাদবগণ-মধ্যে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ — স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পুরুষের অবতারী (জগুহে পৌরুষ রূপং ইত্যাদি ১।৩।১ শ্লোকোক্ত) যিনি ভগবান্, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।”

আমরা ১৬শ বর্ষ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার গত ৪র্থ সংখ্যায় ‘অবতারী-তত্ত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত ‘এতে’ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলাম যে, “‘এতে’ বলিতে পূর্বে ভাঃ ১।৩।২৫ শ্লোক পর্য্যন্ত যে * * * ২২টি অবতার-কথা বলা হইয়াছে এবং ‘চ’ শব্দদ্বারা * * * যেসকল অবতার উক্ত হন নাই, সকলেই প্রথমোক্ত পুরুষ কারণার্ণবশায়ীর অংশ ও কলা * * * প্রথমোক্ত দ্বাবিংশতি অবতারগণ-মধ্যে যিনি বিংশতি-

তম অবতাররূপে কথিত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই কিন্তু স্বয়ংভগবান্। তিনি অংশ নহেন বা অংশী ‘পুরুষ’ও নহেন, কিন্তু পুরুষেরও অবতারী যিনি ভগবান্, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ। * * * * শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়কারী বলিয়া (১৯শ অবতার) শ্রীবলরামেরও পুরুষের অংশত্ব খণ্ডিত হইল। * * *।”

আমরা ঐ প্রবন্ধে ১৪শ অবতার শ্রীনৃসিংহ এবং ১৮শ অবতার শ্রীদাশরথি রামচন্দ্রও ‘পরাবস্থ’ অবতার বলিয়া যে পুরুষাবতারের অংশ নহেন, তাহা উল্লেখ না করায় পাঠকগণের মনে সংশয়ের অবকাশ হইতে পারে।

লঘুভাগবতানুসারে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ — জানা-ইয়াছেন —

‘পরাবস্থচ সম্পূর্ণবস্থঃ শাস্ত্রে প্রকীর্তিতঃ।’

অর্থাৎ শাস্ত্রে সম্পূর্ণবস্থকে ‘পরাবস্থ’ বলিয়া নির্দারণ করিয়াছেন।

শ্রীল রূপপাদ ‘পরাবস্থ’ সম্বন্ধে পাদ্যবাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন —

“নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষ্ণু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্।

পরাবস্থান্ত তে তন্ত দীপাভ্যুপগমদীপবৎ॥”

অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণভাবে বিद्यমান আছে। এক প্রদীপ হইতে অল্প প্রদীপ উৎপন্ন হইলেও যেমন সকল প্রদীপই সমান ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহ অভিযুক্ত হইলেও ঐ তিন তত্ত্বই ষাড়্গুণ্যে পরাবস্থাপন্ন।

টীকাঃ— তত্ত্ব কৃষ্ণে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণত্বম্, নৃসিংহেতি যথোক্তরং পরিপূর্ণবিজ্যতে। তন্ত ষাড়্গুণ্যন্ত, ইতি প্রাতীতিকমিদং বোধ্যম্।

অর্থাৎ ষাড়্গুণ্য — ষড়ৈশ্বর্য। উত্তরক্রমে অর্থাৎ ক্রমশঃ, নৃসিংহ হইতে রামচন্দ্রের ও তাঁহা হইতে কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য অধিক, এই যে পরাবস্থা, ইহা প্রাতীতিক

“পূর্বতোহপ্যেব নিঃশেষমাধুর্য্যামৃতচন্দ্রমাঃ ।

ভাতি সদগুণসঞ্জন তুঙ্গঃ শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ ॥”

অর্থাৎ ‘অশেষ মাধুর্য্য এবং সদগুণরাশির বহুলরূপে
অভিব্যক্তি হওয়ায় শ্রীনৃসিংহদেব হইতে শ্রীরাঘবেন্দ্র
রামচন্দ্রে বাড়্‌গুণ্যপূর্তির আধিক্য রহিয়াছে।’

“বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে রাম-লক্ষ্মণাভাঃ ক্রমাদমী ॥

পাণ্ডে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ ।

শেষশ্চক্রঞ্চ শজ্ঞাশ্চ ক্রমাৎ শূলক্ষ্মণাদয়ঃ ॥

মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেহশ্চ বসতিঃ স্মৃতা ।

মহাবৈকুণ্ঠলৌকে চ রাঘবেন্দ্রশ্চ কীর্ত্তিতা ॥”

অর্থাৎ বিষ্ণুধর্মোত্তরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও
শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রভুস্বয় ও অনিরুদ্ধের
অবতার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে
শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীভগবান্ নারায়ণ এবং শ্রীলক্ষ্মণ, ভরত
ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে শেষ, চক্র ও শজ্ঞা বলিয়া কীর্ত্তন
করা হইয়াছে। এই শ্রীরাঘবেন্দ্রের বসতি-স্থান মধ্য-
দেশস্থিত অযোধ্যাপুরী এবং মহাবৈকুণ্ঠ লোক।

টীকা : — “অশ্চ রাঘবেন্দ্রশ্চ, সম্রাটকশ্চ সত্যতাবর্গ-
শ্চেতি ধ্যেয়ম্ । এতেন নৃসিংহরাময়োঃ ‘এতে চাংশকলাঃ’

ইতি বাক্যাৎ প্রাপ্তমংশব্দমপোহিতম্ ॥”

অর্থাৎ এই পরাবহুপ্রকরণদ্বারা ‘নৃসিংহ ও রামের’
‘এতে চাংশ কলাঃ’ ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রাপ্ত যে
অংশত্ব, তাহা অপোহিত অর্থাৎ বারিত হইয়াছে।

অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহ ও রামের পরাবস্থা স্বীকার করিলে
তঁাহাদিগকে ‘পুরুষের’ অংশ বলা যাইবে না।

শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র যদি পুরুষাবতারের অংশ
হন, তাহা হইলে তঁাহাদের অপর পরাবস্থা থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে কথিত হইয়াছে — “তদেবং শ্রীকৃষ্ণো
ভগবান্, পুরুষস্ত সর্বান্তর্ধামিত্যাং পরমাশ্রুতি নির্দ্বারিতম্”।

অর্থাৎ “অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ‘ভগবান্’, কিন্তু
‘পুরুষ’ সর্বান্তর্ধামী বলিয়া ‘পরমাত্মা’, ইহা নির্দ্বারিত
হইল।” শ্রীঙ্গীতার ‘অথবা বহুতেনতেন’ ইত্যাদি বাক্যে
পরমাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের ‘একাংশ’ বলা হইয়াছে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ পুরুষেরও অংশীভাব্য ভগবান্। শ্রীরাম-
নৃসিংহ সেই শ্রীভগবানেরই স্বাংশ বা নিজাংশরূপে
অভিব্যক্ত পরাবহু তত্ত্ব, তঁাহারা পুরুষাবতারের অংশ-কলা
নহেন। [কোন কোন মহাপুরুষ আবার শ্রীরাম-নৃসিংহা-
দিকে পুরুষাবতারেরই অংশ বা কলা বলিয়া থাকেন।]



সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরবকথা

[মহোপদেশক শ্রীমদ্বালমিলয় ব্রহ্মচারী বি-এন্‌ সি, বিহারব্র, ভক্তিশার্ঙ্গী]

[৩]

প্রেমই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ। তজ্জ্ঞানই মহাজন-
গণের পদরচনার মধ্যে ‘প্রেমের ঠাকুর গৌরা’,
‘প্রেমের মুরতি গৌরা’ ইত্যাদি পদবিজ্ঞাস দেধা
যায়। বিষয় আশ্রয় ভেদে প্রেমের আশ্রয় দ্বিবিধ।
স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব, মহাভাব
পর্যন্ত প্রেমের গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।
মহাভাব-স্বরূপিণীই আরাধিকা, রাধিকা বা রাধা
(রাধ্‌ ধাতু সেবনে)। “রাধয়ত্যাঁরাধয়তীতি রাধা
ইতি নাম ব্যক্তিব্যভূব। মুনিঃ (গর্গঃ) প্রযত্নেন তদীয়
নামাপ্যধাং পরং কিন্তু তদাস্তচন্দ্রাং স্বয়ং নিরৈতি স্ম।”

(শ্রীবিদ্যনাথ)। “তুয়িরা গোবিন্দচিত্ত রাধানাঃম পরিচিতা”
(শ্রীভক্তিবিনোদ)। অতএব আশ্রয় বিচারের চরমতা
শ্রীরাধাতেই প্রকাশিত। “অনরাধাধিতো নুনং ভগবান্
হরিরীশ্বরঃ। যমোবিহার গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥”
[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ঐ ভাগাবতী কর্তৃক আরাধিত
হইয়াছেন, যেহেতু আমাদের পক্ষে পরিত্যাগ পূর্বক তিনি
তুষ্ট হইয়া তঁাহাকে নির্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন।]
তজ্জ্ঞান সর্বাধিকা আরাধিকা আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি
শ্রীরাধিকাতেই মাত্র আরাধ্য বিচারের চরম বিষয়বিগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণ-প্রকাশ। ইনিই ‘স্বরূপ’ শব্দে অভি

হিত। “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” (ভাঃ ৩।১।২৮) এই শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠায় রাধাভজন-সুখশালী হইলেই তাঁহার গৌরুরূপ হয়। “রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব শ্রীরাধিকা” (ঋক্পরিশিষ্ট)। ইহাই তত্ত্বের শেষ সীমা। “ন চৈতন্যং কৃষ্ণজগতি পরতত্ত্বং পরমহি” [(শ্রীরাধিকামাধবমিলিততত্ত্ব) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (স্তবরাং শ্রীকৃষ্ণও, তাঁহা) অপেক্ষা পরতত্ত্বের আর অধিক কোন পরিচয় হয় না বা নাই।] তাই শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা।

শ্রীগুরুতত্ত্বের যোগে পঞ্চতত্ত্বাত্মক মাধুর্য্যপ্রধান ঔদাধ্য-লীল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঔদাধ্যাধিক্যে ঔদাধ্যপ্রধান মাধুর্য্যালীল ঘটতত্ত্ববিলাসকারী শ্রীগৌরহরিরূপে নিজকে প্রকাশ করায় তাঁহারই সন্ধিনীশক্তিমত্ত্ব শ্রীমন্ নিত্যানন্দের সন্ধিনী বা চিংসভাবিস্তারিণীশক্তিবিন্যাসাধিক্যে আপামরে প্রেমদান-লীলা অধিকতর সমীচীন হইয়াছে। এমনকি ‘যে গৌরান্দের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়’। “কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার। নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥”

পুরী হইতে প্রভু পদব্রজে বৃন্দাবনে যাইতেছেন। ঋষিধণ্ডের গভীর বনপথ। কোন কোন স্থান এতই গভীর যে দিবাভাগেও সূর্যালোক তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। প্রভুর বনপথের সঙ্গী শ্রীলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও. অপর একটি ব্রাহ্মণ। পথে বহু শাকাদি বন্ধন করতঃ তাঁহারা প্রভু-সেবার সমাধান করিতেছেন। প্রভু বৃন্দাবনের ভাবে বিভোর হইয়া কখনও আতিভরে কেবল অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র উচ্চৈশ্বরে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে, কখনও বা অবিরত “রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! রক্ষ নাম। কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণকেশব! কৃষ্ণকেশব! পাহি নাম” উচ্চৈশ্বরে করিতে করিতে, কখনও বা ভুজুগ উত্তোলনে নৃত্য করিতে করিতে বনপথের যাবতীয় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, যাবতীয় অরণ্য-সম্পাদকে চঞ্চল ও পুলকিত করিয়া হৃগম বনপথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন।

কত ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু আঁকাবাঁকা বনপথে পথিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রভুকে দর্শন করিয়া কেহ কিরিয়া যাইতেছে না, হিংস্রভাবেরও কোন লক্ষণ নাই। প্রভুকে দেখিয়া তাহাদের কোন ভয়ও হইতেছে না। বরাভয় প্রদাতা দয়াময় শ্রীগৌরহরি তাহাদের প্রতি শুভদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বলিতেছেন “কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ”। সঙ্গে সঙ্গে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ দোহারও হইতেছে। প্রভুর নৃত্যের তালে হিংস্র জন্তু গুলিও নৃত্য করিতেছে, ও তাদান্য়ভাবে প্রাপ্ত হইয়া তাহারাও হর্লভ প্রেমের অধিকারী হইতেছে। কোথায় গেল তাহাদের হিংস্র স্বভাব? হিংস্রস্বভাব পশুগণের মধ্যেও কি তবে আত্মধর্মের জাগরণ হইতে পারে? তাহাদের কি তবে জন্মান্তরের কোন অপেক্ষা নাই? হর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ না করিয়াও কি তবে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হওয়া যায়? সকলই সম্ভব হয় যদি ভগবান্ ইচ্ছা করেন অথবা যদি মহাভাগবত প্রেমিক ভক্ত ইচ্ছা করেন। যাহারা যেই দেহে কর্মকলে অপেক্ষা করিতেছেন — তাহা দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, রক্ষ, লতাদি পর্য্যন্ত যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা প্রেমধর্ম সম্বন্ধে আসিবার অবকাশ পাইলেই ভগবান্ ও ভক্তের রূপায় সেই দেহেতেই প্রেমসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, বৈদিক দীক্ষারও কোন অপেক্ষা শ্রীনাম মন্ত্রে নাই। “দীক্ষা-পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ অন্তঃকলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকরিয়া করার কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পঃ) “আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং স্তমসামুচ্চাটনং চাংহসামাচণ্ডালম-মূললোকস্বলভো বশশ্চ মুক্তিপ্রিয়ঃ। নো দীক্ষাং ন চ সং-ক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনোগীকৃতে মন্ত্রোচ্ছং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥” (নামকোমুদী) [বহু সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণস্বরূপ, পাণনাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের মূলভ, মুক্তি-রূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী — এবভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনা স্পর্শমাত্রেই ফল দান করেন, দীক্ষাদি সংকার্যা বা পুরশ্চরণ, এসকলকে কিঙ্কিমাও অপেক্ষা করেন না।]

তজ্জন্মই ব্যাঘ্রাদি প্রাণীতে চেতনের কিঞ্চিৎ বিকাশ থাকায় সেখানে তো প্রেম লাভের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে, এমন কি বৃক্ষ, লতা, পাখাড় পর্বতাদি যাহা-দিগকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত চেনন বা জড় বলিয়াই ধারণা করা হয়, তাহারাও শ্রীকৃষ্ণনামে কৰ্ম্মফলদায়া ঔপাধিক অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চেতনের পূর্ণতম বিকাশে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইতে পারে।

প্রাণিমাতেই কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধরূপে অবস্থান করিতেছেন। সময় সুযোগে যে কোন যোনিতে তাহা প্রকাশিত হইতে পারেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশে জীবের যাবতীয় পার্থিব মোহ, জড়ীয় অভিমান — সকল প্রতিকূল ভাবই চলিয়া যায়, জীবন ধন্য হয়, নিত্য সুখ লাভ হয়।

প্রভু ভঙ্গী করিয়া নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “(হরিদাস!) পৃথিবীতে বহুজীব স্থাবর জন্ম। ইহা সবার কিপ্রকারে হইবে মোচন?” “হরিদাস কহে, — প্রভু সেকুপা তোমার। স্থাবর জন্ম আগে করিয়াছ নিস্তার। তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সংকীৰ্ত্তন। স্থাবর জন্মের সেই হয়তো শ্রবণ। শুনিয়া জন্মের হয় সংসার ক্ষয়। স্থাবরে শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয়। প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীৰ্ত্তন। তোমার কুপার এই অকথ্য কথন। সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীৰ্ত্তন। শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জন্ম।” (চৈঃ চঃ অন্ত্য তয় পঃ) এইরূপে স্থাবর জন্মকে প্রেমদান করিতে করিতে মহাপুৰুষাশ্বরূপ কৰ্ণাময় শ্রীগৌরহরি ঝাঝিখণ্ডের পথবাহিয়া চলিতেছেন। সাধারণ জ্ঞানে ঐশ্বর্য্য ভগবন্তের সার বলিয়া গোধ হইলেও শ্রীভগবদ্ব্যধুর্ধারূষ্ট প্রেমিকভক্তগণ ভগবদ্দৈবধর্ম্মের প্রতি অনেকসময়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া অথবা ঐশ্বর্য্য দর্শনে শিথিলভাব পোষণ করতঃ “নমো নারায়ণ দেব! করহ প্রসাদ। কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাই বিষাদ।” (চৈঃ চঃ আঃ ১৭শ পঃ) বলিয়া ‘গোপবেশ বেণুকের নবকিশোর নটবর’ শ্রীকৃষ্ণাশ্বেষণে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলিয়া যান। সেই কৃষ্ণমাধুর্য্যে স্বয়ং কৃষ্ণেরও লোভের সঞ্চারণ হইলেই তাঁহার স্বাভাবিক গৌররূপ হয়।

এবম্প্রকারে প্রেমদানলীলা করিতে করিতে সমস্ত

পথ অতিক্রম করতঃ উক্ত দুইজন সঙ্গিসহ মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তীর্থদর্শন, স্পর্শন, লুপ্ততীর্থ-গুলিকে পুনঃপ্রকটন করিতে করিতে প্রেমাবেশে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভু ব্রজের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, ব্রজভূমি ছাড়িবার মন নাই, তত্ক্ষণে ব্রজে আসিয়া অপর দুইজন প্রেমিক ভক্তেরও সঙ্গ পাইয়াছেন; তন্মধ্যে একজন শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য সনোড়িয়া বিপ্র এবং অপর একজন রাজপুত্র, নাম— কৃষ্ণদাস। ইহারাও উভয়ে প্রভুপ্রেমে বিভোর। এখন হইতে এই চারি মুক্তি প্রভুর ব্রজ ভ্রমণের সঙ্গী। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাক্রান্ত হইয়া প্রভু কখনও উঠেন, কখনও পড়েন; কখন কি অবস্থা লাভ করেন, কিছুই বলা যায় না। ভট্টাচার্য্য ‘প্রভুহিতে সর্বদাই সাবধান’। এই-মত ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু একসময় অক্রুরতীর্থে আসিলেন। অক্রুরের যমুনা-জল-মধ্যে বৈকুণ্ঠ-দর্শনের কথা স্মরণ করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। দীর্ঘ সময় যাবৎ জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া কৃষ্ণদাস উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ভট্টাচার্য্য আশ্চর্য্য-বাস্তে জলে ঝাঁপ দিয়া প্রভুকে জল হইতে উঠাইলেন। অতঃপর ভট্টাচার্য্য অপর সঙ্গি-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে মকরস্নানের জন্ত লইয়া চলিলেন। পথের পরিচয় কৃষ্ণদাস রাজপুত্রের ও মাধুর-বিপ্রের ভাল জানা আছে। নির্ভয়েই সকলে চলিতেছেন। কিছুদূর আসিয়া পথশ্রান্তি নিবারণার্থে সকলে একটি বৃক্ষতলে বসিলেন। বৃক্ষপার্শ্বে বহু গাভীকে একত্র বিচরণ করিতে দেখিয়া প্রভু বড় সুখী হইলেন। এমতাবস্থায় আচম্বিতে একটি গোপ বংশীধ্বনি করায় তচ্ছবনে প্রভুর প্রেমাবেশ হইল এবং তিনি মুচ্ছিত হইলেন। হেনকালে দশ-জন অশ্বারোহী পাঠান রাজ-কুমার বিজলীধানসহতথায় আসিলেন। রাজার আদেশে পথিকগণের নিরাপত্তা বিধানই তাঁহাদের কার্য্য। তাঁহারা প্রভুকে মুচ্ছিত দেখিয়া প্রথমতঃ মনে করিলেন — তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাঁহার ধন অপহরণ করিতেছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা প্রভুর সঙ্গিগণকে

বাধিয়া ফেলিলেন। প্রভুর প্রেমাবেশ ভঙ্গ হইলে বিজলী ঋণ দলের জৈনিক স্বেচ্ছাচার্যের সহিত তাঁহার কথোপকথন ও শাস্ত্র-বিচার হইল। প্রভু কোরাণ শাস্ত্র হইতেই কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন। বিজলী ঋণ ও তাঁহার অনুগত সোয়াবগণ মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করতঃ কৃষ্ণভক্ত হইলেন। সেই স্থানে এখনও ‘পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম’ বলিয়া একটা গ্রাম দেদীপ্যমান। যেখানে অতিবড় হিংস্র জানোয়ার — সিংহ, জলহস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর প্রেমে বিভোর হয়, সেখানে মনুষ্য যখন প্রেম লাভ করিবে, ইহা আর বিচিহ্ন কি?

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময়ও প্রভু এইমত লীলা প্রকাশ করতঃ দক্ষিণ দেশ তথা দেশবাসীকে কৃষ্ণানন্দ-প্রেমদানে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। তথায় প্রভুর আরও এক অপূর্ণ লীলা-মাধুরী প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ঋণারা প্রভুকে

দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তো শ্রীনাম-প্রেমে মত্তই হইয়াছেন, পরন্তু সেই প্রেমিক ভক্তগণ যখন তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রামে বা দেশে গমন করিয়াছেন, তখন যে পথ দিয়া তাঁহারা গমন করিয়াছেন, তত্রস্থ সকল নরনারীই — এমনকি অপরাপর প্রাণী পর্য্যন্তও শ্রীনাম-প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন। এককথায়, মহাপ্রভুকে দর্শন-মাত্রেই মনুষ্যগণের হৃদয়ে জগজ্জ্বারক আচার্যের গাভীর্ষ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরপর দর্শনকারীর দর্শনকারী হুত্রে এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলেই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুক্তিদাতা গুরু হইয়াছেন। এইরূপে সমস্ত দক্ষিণদেশ-গ্রাম বৈষ্ণব হইয়াছেন।

নমো মহাবদাতায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরবিশেষে নমঃ॥



যশড়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেদের স্নানযাত্রা মহোৎসব

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩; ইং ১২ই জুন, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ আচার্য্য-দেবের রূপানির্দেশে ও শুভেচ্ছায় শ্রীশ্রীগৌরপার্বদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়া গ্রামস্থ (চাকদহের নিকটবর্তী) শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব কলিকাতা-মঠের চতুর্থতলের প্রতিষ্ঠামহোৎসবে ত্রতী থাকায় তদ্বিদেশক্রমে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরু ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ১-২০ কৃষ্ণনগর লোকালে চাকদহ যাত্রা করেন। অপরাহ্ন ৪টা আন্দাজ তাঁহারা যশড়া শ্রীপাটে উপনীত হন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরালিন্দে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজীর কীর্তন ও শ্রীপুরী মহারাজের ভাষণমুখে অধিবাসকীর্তনোৎসব সমাপ্ত হয়।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলারাত্রিক ও প্রভাতীকীর্তনাদি সমাপনান্তে গঙ্গা হইতে অভিষেকের জল আনিবার ব্যবস্থা হয়। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ মূল মঠ, কৃষ্ণনগর-শাখামঠ, পায়রাডাঙ্গা, রাণাবাট, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিলাভক্ত স্নানযাত্রা দর্শনে শুভাগমন করেন। পূর্বাহ্ন ৯-৪১ পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল। শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ খুব ক্ষিপ্ততার সহিত গর্ভমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পুজা, মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিলে ৯-৩০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চা এবং শ্রীতুলসীদেবীকে সংকীর্তন-সহ স্নানবেদীতে লইয়া যাত্রা হয়। শ্রীমৎপুরী মহারাজ অবিলম্বে অভিষেককৃত্য আরম্ভ করেন। স্নানবেদীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অবিশ্রান্ত কীর্তন চলিতে থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাক্তন সেবাহিত শ্রীমদ বিষ্ণুনাথ দেব-গোষামী তথা শ্রীমৎ শম্ভুনাথ ও শ্রীমৎ হৃত্যুজয় গোষামী, ভক্ত শ্রীবীরেন্দ্র এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তি মুহুদ

দামোদর মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকবৃন্দ নানাভাবে সহায়তা করেন। পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক অস্ত্রে স্নানবেদী কীর্তনমুখে বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করা হয়। আকাশের অবস্থা ভাল থাকায় অগণিত যাত্রিসমাগম হইয়াছে। মেলাও বেশ নিবিড়িয়ে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। শ্রীজগন্নাথ হৃদ্যাকাল পর্য্যন্ত স্নানবেদীতে বিরাজ করতঃ সহস্র সহস্র ভক্তকে তাঁহার

দর্শনসৌভাগ্য দান করিয়া সন্ধ্যায় নিজমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে দিবসত্রয় তাঁহার দর্শন বন্ধ থাকার নিয়ম আছে, রথযাত্রা হয় না। অতঃবহু নরনারী প্রসাদ সম্মান করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ দামোদর মহারাজ ও পুরী মহারাজের ভাষণ হয়। মঠসেবকগণ বিভিন্ন সেবা কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।



আগরতলায় প্রসিদ্ধ ‘শ্রীজগন্নাথবাড়ি’ শ্রীচৈতন্যগোড়ীর মঠে হস্তান্তরিত

আগরতলা রাজপ্রাসাদ সীমানার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ মন্দির, তৎসংলগ্ন জমী ও গৃহাদি (১৮.৭৬ একর) ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কর্তৃক গত ২০শে বৈশাখ, ৩রা মে, ১৯৭৬ সোমবার দলিলাদি রেজিষ্ট্রি হইয়া ১১ই আষাঢ়, ২৫শে জুন শুক্রবার শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে হস্তান্তরিত হইয়াছে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাণী অমূল্যলীল ও বিস্তারের উৎসাহ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কেন্দ্র হইবে। জনসাধারণের পারমাধিক কল্যাণসাধনরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গত প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও দাতব্য চিকিৎসাদিরও বিরাট পরিকল্পনা আছে।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সম্পাদকের নিকট হইতে ট্রান্সফোনে হস্তান্তরের সংবাদ জানিতে পারিয়া শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিত্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ও ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ছয় মূর্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভাণ্ডারী মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশামুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীননী গাঙ্গাল বনচারী] পর দিন প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রথম বিমানে আগরতলায় শুভাগমন করেন। দুর্ধ্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও শ্রীমঠের সহসম্পাদক

মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি, ভক্তিশাক্তী গোহাটি হইতে রেলপথে ২৮ শে জুন আসিয়া পৌছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ শ্রীমান



আগরতলাস্থিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির

প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীও কলিকাতা হইতে ২৯ শে জুন তথায় পৌছেন।

এবংসর শ্রীল আচার্যদেবের দেবানিয়ামকছে আগরতলায় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব গত ১৫ই আষাঢ়, ২৯ শে জুন মঙ্গলবার বিরাটভাবে স্তম্ভস্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছাক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা চিরাচরিত প্রথাহুয়ারী কেবলমাত্র সরোবর পরিক্রমা না করিয়া সহরের বিভিন্নরাস্তা পরিক্রমা করেন। আনুমানিক বিশ সহস্র নরনারী রথযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। রথাকর্ষণে ত্রিপুরাবাসী নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্যদেব সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তবে তিনি শ্রীজগন্নাথদেব ও ভক্তগণের উপর কলা, আনারস, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল সজোরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কুপ্রথাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। উহাতে দুর্গভিক্ষামূলক ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গহান ও ভক্তগণের গুরুতররূপে আহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। উক্ত কুপ্রথা পরিত্যক্ত হইলে তথাকার রথযাত্রাদি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হইবে। সুধের বিষয় শ্রীল আচার্যদেবের আবেদনে ত্রিপুরাবাসী সজ্জনগণ ২৩শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই উত্তারপের শোভাযাত্রায় উক্ত গর্হিত কার্য হইতে অনেকাংশে নিবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব ও শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে ১৬ই আষাঢ়, ৩০শে জুন বুধবার হইতে ২০শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই রবিবার পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পাঁচটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। সভায় বক্তব্য বিষয়

নির্ধারিত ছিল যথাক্রমে — ‘মঠ ও মন্দিরের উপযোগিতা’, ‘সংসার-দুঃখ ও তৎপ্রতিকার’, ‘ঈশ্বর ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপকারিতা’, ‘বিশ্বসমস্তা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান’ এবং ‘যুগধর্ম শ্রীহরিনাম-সুকীর্তন’। শ্রীল আচার্যদেবের জ্ঞানগর্ভ অভিভাবণ-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ভিক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমঠের সহসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিভিন্নদিনে ভাষণ দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী — সভার আদি ও অন্তে সুললিত পদাবলী কীর্তন ও শ্রীনামসংকীর্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীল আচার্যদেব ৫ই জুলাই হইতে ৯ই জুলাই পর্যন্ত উক্ত দুর্গাবাড়ীর সভামণ্ডপেই প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত — অষ্টাদশ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ সংস্থাপনের মুখ্য উদ্যোক্তা ধার্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দে মহোদয় তাঁহার হার্দী সেবাপ্রচেষ্টার জন্ত শ্রীল আচার্যদেবের প্রচুর আশীর্বাদ-ভাজন এবং সকলের ধন্যবাদ হইয়াছেন। আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদৈবমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে রথযাত্রা মহোৎসব

পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্যদেবের কৃপানির্দেশে কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠে পূর্বপূর্ব বৎসরের তায় এবারও গত ১৩

আষাঢ় (১৩৮৩), ইং ২৭ জুন (১৯৭৬) রবিবার হইতে ১৫ আষাঢ়, ২৯ জুন মঙ্গলবার পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব পূর্ববিধোবিত সেবাহুচী-

অনুসারে মহাসমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-দিবস এই মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশুঙ্কগোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গোপীনাথজিউ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষেই প্রত্যক্ষ এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ — শ্রীমান্ নন্দ-গোপাল দাস, শ্রীমান্ নিমাই চরণ দাস, শ্রীমান্ সুরেশ চন্দ্র দাস ও পাচক ব্রাহ্মণ 'সাবু' সহ গত ১২ই আষাঢ়, ১৩৮৩ শনিবার অপরাহ্ন ৩-৩২ এর ট্রেণে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে তত্রতা মঠে পৌঁছান এবং রাত্রে তথায় শ্রীমন্তাগবত পাঠ করেন।

১৩ই আষাঢ় শ্রীশ্রীল গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা-বাসর। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ সকালে তাঁহাদের জীবন-ভাগবত আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্তিকের পর শ্রীমঠের প্রশস্ত সংকীর্তন-ভবনে সভার অধিবেশন হয়। মঠরক্ষক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মহতী শিক্ষাসম্বলিত পরম পূত চরিতামৃত সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ ও শ্রীমদ্ গোরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন। ১৪ই আষাঢ় শ্রীশুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও ১৫ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা দিবসও এক্রপ সকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ১২শ পঃ—শুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-প্রসঙ্গ ও ঐ মধ্য ১৩শ-১৪শ পঃ—রথযাত্রা-প্রসঙ্গ) পাঠ করেন—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ এবং সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উক্ত প্রসঙ্গে ভাষণ দান করেন—উক্ত ত্রিদিগ্বি যতিদ্বয়। শ্রীশুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনদিবস পূর্নাক্ষে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ-গণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ। এই দিবস মধ্যাহ্নে প্রায় দুই সহস্র ভক্ত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ১৫ই আষাঢ় অপরাহ্ন প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণ রথা-

রোহণে নগদভরণে বহির্গত হন, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রথ নির্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অগণিত নরনারী আশালব্ধবনিতা রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সর্বশ্রী হেবা মোদক, অমিত দাস, মানা মোদক প্রভৃতি শ্রীমঠের সম্মিহিত পল্লীর যুবকসম্প্রদায় রথচক্রগতি ও দর্শকজনতা নিয়ন্ত্রণ তথা উভয়পার্শ্বে দর্শনার্থিগণকে বাতসাপ্রসাদ বিতরণাদি সেবার্থে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর কৈশোতানস্থ মূল মঠ হইতে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ বোধায়ন মহারাজ কৃপাপূর্বক এই উৎসবে যোগদান করিয়া মঠসেবকগণকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ঐ মঠ হইতে শ্রীমান্ মদনগোপাল গোস্বামী ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের পাণ্ডা শ্রীমান্ বিনোদকৃষ্ণ দীক্ষিত, শ্রীমান্ প্রহ্লাদদাস ব্রহ্মচারী (প্রদীপ), শ্রীমদীনমদন দাস ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীধর্মেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি; কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী; যশড়া শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে মঠরক্ষক শ্রীনিমাইদাস অধিকারী, কাঁচড়াপাড়া হইতে ভক্ত শ্রীগোবিন্দদাস এবং অন্তান্ত স্থান হইতেও বহু ভক্ত এই রথযাত্রা উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহারা এবং কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীমঠের সর্বশ্রী গোরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, সুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী, বলরামদাস ব্রহ্মচারী, বীরচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, রঘুপতিদাস ব্রহ্মচারী, ভববন্ধুজিদ্ দাসাধিকারী, সুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী, স্বপনকুন্ডার বিশ্বাস, অবনীকান্ত বিশ্বাস, ধোকন বিশ্বাস, মহাদেব দাস, সত্য সাহা, পঞ্চা সাহা, গোবিন্দ বিশ্বাস প্রমুখ সেবকবৃন্দ—সকলেই স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী ভগবৎপ্রসঙ্গালাপ, কীর্ত্তন, মৃদঙ্গ-বাদন, রন্ধন, প্রসাদ-পরিবেশনাদি বিভিন্ন সেবার্থে কায়মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া উৎসবটিকে সর্বশোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের সর্বতোমুখী সেবাচেষ্টায় এবং সর্বোপরি তাঁহার সুমধুর ব্যবহার-

নৈপুণ্যে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসবের যাবতীয় অঙ্গই শান্তি-মহোদয়। আমরা তাঁহাদের সকলের প্রতিই আমাদের পূর্ণভাবে স্ননিম্ন হইয়াছে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের

স্থানীয় বদান্ত সজ্জনবৃন্দ উৎসবের বিভিন্ন প্রয়ো-নিত্যকলাপ প্রার্থনা করিতেছি।
জনীয় দ্রব্য দান করিয়া এবং অর্থালুক্য বিধান-ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণেচ্ছ স্থানীয় শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীমুক্ত পূর্বক বহুপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। লরী দিয়া সুরেশ সরকার নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত ধর্মপ্রাণ সহায়তা করিয়াছেন—সজ্জনবর শ্রীমুক্ত বিজয়কৃষ্ণ পাল অধ্যাপক মহাশয়ের শ্রবণগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



কলিকাতা-শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

ওড়িয়ার মুখ্য জনপ্রিয় দৈনিক 'সমাজ'-পত্রিকায় প্রকাশিত

কটক, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ সোমবার

(বঙ্গভূবাদ)

কথা ও কার্য এক হওয়া উচিত

কলিকাতা-শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ-সভায়—

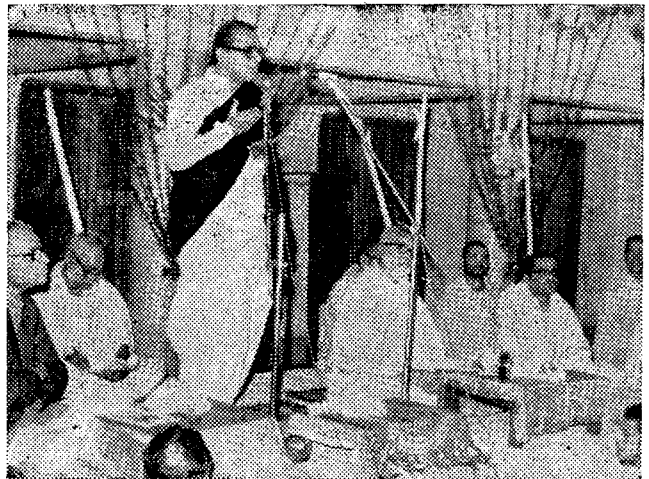
লোকসেবক মণ্ডল সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ দাসের

উদ্বোধন

মঠের পাঁচদিনব্যাপী ধর্মসভায় বহু বিশিষ্টবক্তার সমাবেশ

(স্বতন্ত্র সংবাদদাতা হইতে)

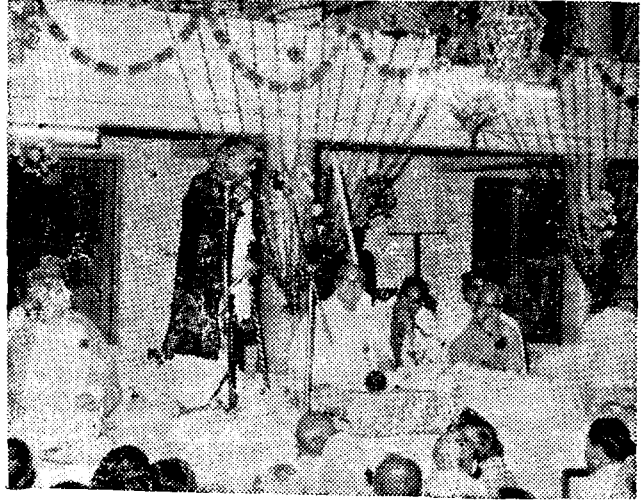
কলিকাতা—তারিখ ২৫।১—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহামান্ত্রী শ্রীমদ্ বি, ডি, মাধব গোস্বামী মহারাজের নিয়ন্ত্রণে শ্রীমঠে, মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী ধর্মসভা সূচনায় হইয়াছে। মান্তবর জাষ্টিস্ শ্রীবি, সি, বসাক; মান্তবর এন্সি মুখার্জী; মান্তবর এন্স রাই চৌধুরী; ওড়িয়ার খাত্ত ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র ও মান্তবর এন্স মুখার্জী বিভিন্নদিনে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, পূর্বীর



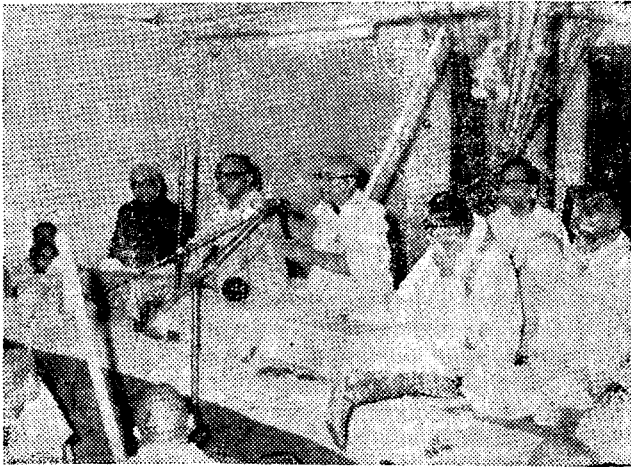
পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ ভাষণ দিতেছেন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিচারপতি শ্রীবি সি বসাক, বামপার্শ্বে শেষে শ্রীআই পি গোয়েঙ্কা

এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র, এড্‌ভোকেট শ্রীজ্ঞে, কে মুখার্জী; ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও লোক-সেবকমণ্ডলের সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ দাস এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর এ এন্‌ বসু যথাক্রমে মুখ্য অতিথিরূপে যোগ দিয়াছিলেন। সর্বশ্রী আই, পি গোয়েন্কা; এন্‌ এল্‌ ভাগানিয়া (ধানবাদের এড্‌ভোকেট) ও ওড়িষ্যার প্রাক্তন এম্‌ এল্‌ এ পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের সম্মানিত বক্তারূপে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯শে জাগুয়ারী তারিখের অধিবেশনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পাব্লিকসার্ভিস্‌ কমিশনের অধ্যক্ষ শ্রীহরিহর দাস — স্বতন্ত্র অতিথিরূপে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীমদ্‌গোস্বামী মহারাজ, সর্বশ্রী শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ, বর্দ্ধমানের পুরী মহারাজ, ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ভারতী মহারাজ,



বাম দিক্‌ হইতে—পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, শ্রীবিশ্বনাথ দাস (ভাষণরত), শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্‌ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীহরিহর দাস, শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র ও শ্রীশ্রীধর দেব গোস্বামী



বামদিক্‌ হইতে—এড্‌ভোকেট শ্রী এন্‌ এল্‌ ভাগানিয়া, বিচারপতি শ্রীসলিল রায় চৌধুরী, শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ (ভাষণরত), এড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদ্‌ শ্রীধর দেব গোস্বামী, পশ্চাতে ব্যারিষ্টার শ্রীনিতাই রায়

ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ (মঠের সাধারণ সম্পাদক), চণ্ডীগড়ের বি, ভি ভারতী মহারাজ, বৃন্দাবনের বি, পি পুরী মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। সন্ধ্যা ও মঞ্চস্থল হইতে বহুভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ দাসের অভিভাষণ

শ্রীবিশ্বনাথ দাস তাঁহার অভিভাষণে শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি হার্দী আবেদন জানাইয়া বলেন—“মহোৎসবের ব্যবস্থাপক এবং যোগদানকারীর উচিত নিজের কথাবল্যায়ী প্রথমে আচরণ করিয়া পরে শুচার-কার্য্য করা।”

তিনি আরও বলেন — ‘যাহা আমরা বলি, তাহা আমাদের করা উচিত। ধর্ম উপদেশ যথার্থরূপে বুঝাইতে হইলে প্রথমে নিজ চরিত্রে উহা রূপায়িত করাই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহা হইলেই প্রচার ফলপ্রসূ হইবে।’

ওড়িয়ার সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র বলেন — “ওড়িয়ার ও বঙ্গের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাবগত দৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দুই রাজ্যের মধ্যে এই সৌজন্য-সম্পর্ক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাগমনফলে আরও সমৃদ্ধ হইয়াছে। আমাদের সমাজ গোষ্ঠীগত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, স্বর্ণ-ভাব ও কুসংস্কারের দ্বারা যখন ধ্বংসোন্মুখ, সেই সময় শ্রীমদমহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া তাহার স্মরণে

অলৌকিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমাজ-ব্যবস্থায় অদ্ভুত বিপ্লব আনিয়াছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের বাণী আজ পৃথিবীর সর্বত্র অভিনন্দিত ও সমাদৃত।”

শ্রীমদ মাধব গোস্বামীর অভিভাষণ

মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ মাধব গোস্বামী মহারাজ অভিভাষণে বলেন, — “দীর্ঘদিনব্যাপী অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার ফলে আমরা পুর্বাতে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যের আবির্ভাবস্থানটি প্রাপ্তিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহা এক মহা আনন্দের বিষয়। জন্মস্থানের স্থিতি সংরক্ষণের জন্ত তথায় এক বিরাট মঠ-প্রতিষ্ঠান-নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।”

কলিকাতা-শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত চতুর্থতল-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৩), ১২ই জুন (১৯৭৬) শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শুভ স্নানযাত্রা-পোর্ণমাসী-তিথিবাসরে পূর্বাহ্নে পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠ-অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পশ্চিমঙ্গ পুন্নিশ-বিভাগের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অর্থায়নকৃত্যে তদীয় স্বধামগতা পরমা ভক্তিমতী সাধবা সহধর্মিণী ‘ভাগবতী-কথা’ (সমগ্র শ্রীমদভাগবতের পঞ্চাঙ্গবাদ) নামক ভক্তি-গ্রন্থের প্রণেত্রী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কাব্যভারতী মহোদয়ার পবিত্রস্থিতি-সংরক্ষণ-কল্পে দক্ষিণকলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠের দক্ষিণপার্শ্বস্থ চতুর্থতলের যে ব্লকটি নির্মিত হইয়াছে, তাহার শুভ উদ্বোধন-কাৰ্য্য পাঠ-কীর্তন-পূজা-হোম-মহাপ্রসাদবিতরণাদি বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গ-লুষ্ঠান-মুখে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পূজাপাদ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব পূর্বাহ্নে ৯ ঘটিকার মধ্যেই সঙ্কীর্ণনসহ অস্বদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্যা লইয়া চতুর্থতলের পশ্চিমদিক্স্থ প্রশস্তগৃহে প্রবেশ করেন। শ্রীমন্দির হইতে শ্রীশালগ্রামকেও কীর্তনসহকারে ঐ গৃহে লইয়া আসা হয়। অবিশ্রান্ত কীর্তন চলিতে থাকে, তন্মধ্যেই শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা যথাবিধি পূজা, ভোগরাগ, গৃহভিক্তিগাত্রে বসুধারাপ্রদান এবং বৈষ্ণব-হোমাদি কৃত্য সম্পাদন করেন। শ্রুতি, স্থিতি ও তায় — প্রস্থানত্রয় পাঠ্যায়ণেরও ব্যবস্থা হয়। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদভক্তিবিজ্ঞান গিরি মহারাজ, শ্রীমদভক্তিবজয় বামন মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীমদ বিভূপদ পাণ্ডা (কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বি-এ বি-টি) পাঠ করেন। কীর্তন করিয়াছিলেন—শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্তনবিনোদ, শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীশ্রামসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ভোগরন্ধনাদি সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়

পূর্বাহ্নেই শ্রীমঠে শুভাগমন করতঃ তদন্ত গৃহ-প্রতিষ্ঠাকৃত্য দর্শনে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করেন। হোমকাণ্ডে তিনি শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতিও প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরগোরাধগান্ধিকাগিরিধারীজীউর ভোগা-রতি সম্পন্ন হইলে সমবেত ভক্তনরনারীবৃন্দকে চতুর্বিধ

রসসমম্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও এই উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলকেই মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা

আষাঢ়ী-পূর্ণিমাই শ্রীগুরুপূর্ণিমা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে—শ্রীভগবানের শক্ত্যাবশেষ অবতার শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাাস এই তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জগদগুরু। এইজন্ত সকল সম্প্রদায়েই ইহা গুরুপূর্ণিমা-রূপে বহুমানিত হন। পরম-পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব এই দিবস (২৭শে আষাঢ়, ১৩৮৩; ইং ১১ই জুলাই, ১৯৭৬ রবিবার) পূর্বাহ্নে স্বয়ং দক্ষিণকলিকাতায় শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্বক বিহিত-বিধানে **শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক** (শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবাহুদেব, সর্গদেব, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ), **শ্রীব্যাসপঞ্চক** (শ্রীভগবান্বেদব্যাাস এবং ঋগ্বেদ-পারঙ্গত পৈলমুনি, সামবেদপারঙ্গত জৈমিনি-মুনি, যজুর্বেদ-পারঙ্গত বৈশম্পায়ন মুনি এবং অথর্ব-বেদ-পারঙ্গত স্মৃতি মুনি), **শ্রীবৈষ্ণবপঞ্চক** (শ্রীশুক-দেব এবং শ্রীমধ্ব-রামানুজ-বিষ্ণুস্বামী-নিষাদিত্যাচার্য্য), **শ্রীসনকাদি পঞ্চক** (শ্রীসনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার

এবং শ্রীবিষ্ণুসেন), **শ্রীগুরুপঞ্চক** (অশ্বৎসম্প্রদায়-কর্তা শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরমগুরু-পরাংপর গুরু-পর-মেষ্টীগুরু) এবং একান্তী শ্রীগোড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়প্রি-গণের পক্ষে **তত্ত্বপঞ্চক** (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ) ও শ্রীস্বরূপ-রূপাদি গুরুপরম্পরা পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করেন। পূজাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ বোধায়ন মহারাজ ও পূজারী শ্রীমান শ্রিনিবাস দাস ব্রহ্মচারী সহায়তা করেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ পূজা সম্পাদনান্তে তাঁহার নিজকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিলে তত্চরণাশ্রিত শিষ্য ও শিষ্যাগণ পুষ্পাজলি, পুষ্প-মালা ও বিবিধ ফলমূলমিষ্টান্নাদি উপায়নদ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করেন। পূজা-কালে অবিশ্রান্ত কীর্তন চলিতে থাকে। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগজিকের পর সমবেত সকল ভক্তকেই মহা-প্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

স্বধামে শ্রীমৎ কৃষ্ণকিষ্করদাসাধিকারী

গত ১২ই আষাঢ় (১৩৮৩), ইং ২৬শে জুন (১৯৭৬) কৃষ্ণচতুর্দশী (রা ৭।১৭) অন্তে অমাবস্ত্যার প্রথমে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত কৃষ্ণ-কাঞ্চ-সেবানিষ্ঠ শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণকিষ্কর দাসাধিকারী দক্ষিণ-কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহার পূর্বনাম ছিল শ্রীকুমুদবন্ধু দত্ত — কায়স্থ-কুলোদ্ভূত। পিতা — পরলোকগত শ্রীহরিমোহন দত্ত। তিনি তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সে বিগত ১৩ই ফাল্গুন (১৩৬২), ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৬) মাঘীপূর্ণিমা-তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন। পরে ২৬শে আষাঢ় (১৩৬৪), ইং ১১ই জুলাই (১৯৫৭) আষাঢ়ী পূর্ণিমা

তিথিতে তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা ও সংস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি খুব সরলহৃদয় বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পূর্বনিবাস ছিল—গ্রাম—চিতলাই, পোঃ—ঐ, জেলা ঢাকা। তিনি প্রথমে কলিকাতায় একস্থানে চাকুরী করিতেন। পরে ভগবদ্ভজনেই মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা, ইহা বুঝিয়া সেই চাকুরী ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কাঞ্চ-কৈষ্কর্য্যকেই নিঃশ্রেয়সজ্ঞানে জীপুত্রাদির সঙ্গ পরি-তাগপূর্বক মঠবাসী হন। শ্রীমঠের সেবাকার্য্য ব্যতীত কখনও তাঁহাকে বৃথা সময় নষ্ট করিতে দেখা যায় নাই। এজন্ত শ্রীগুরুবৈষ্ণব—সকলেরই তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাই আজ সকলেই ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহার অভাব বোধ করিতেছেন। শ্রীমঠে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-বর্ণা

“চেভোদপর্ণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্।
আনন্দানুদ্বিভক্জনং প্রাপ্তিপদং পূর্ণায়ুতান্মদনং
সর্ববাস্তুস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮৩। { ৭ম সংখ্যা
২৩ হুদীকেশ, ৪২০ শ্রীগোবিন্দ; ১৫ ভাদ্র, বুধবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

সভজন-কৃষ্ণকশরণ

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈষ্ণবের যে ২৬টি গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণকশরণ ব্যতীত অপর ২৫টি গুণ তটস্থ বলিয়া লক্ষিত। কৃষ্ণকশরণ গুণই স্বরূপ বা মূখ্য গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট। কৃষ্ণকশরণতা ষাঁহার নাই, তাঁহার অপর পঞ্চবিংশ গুণের সম্ভাবনা নাই অথবা তত্তদগুণ লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐগুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অত্যাগত গুণ কপটতা করিয়া অসাধুগণ অপরকে প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু অসজ্জন কখনই কৃষ্ণকশরণ হইতে পারে না।

সজ্জনই একমাত্র কৃষ্ণকশরণ। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূল বস্তু। তাঁহা হইতে শ্রীবলদেব প্রভু, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি ব্যুৎপত্তি, পুরুষাবতারত্ব এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলী উদয় হইয়াছেন। জীবের পুরুষাবতারত্বের জ্ঞান হইলেই তিনি প্রাপঞ্চিক জগতের সকল কথা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ বস্তুর অমলত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যদাস্তই তাঁহার ধর্ম, ইহা বুঝিতে পারেন। সর্বাশ্রয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্বাদি, সর্বকারণকারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ্য। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অস্ত্র কোন প্রকার গতি নাই। যে জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ

করিয়া মায়াবাদ, কর্মকাণ্ড ও অজ্ঞাভিলাষ মিছা ভজিতে কালক্ষেপ করেন, তিনি কৃষ্ণকশরণ হইতে পারেন না। আবার মুখে কৃষ্ণকশরণ বলিলেই যে কৃষ্ণ-বিমুখতা ছাড়িয়া যায়, এরূপ নহে। যিনি অকিঞ্চন, তিনিই কৃষ্ণকশরণ। অকিঞ্চন বলিলে মায়াবাদীকে বুঝায় না, কর্মকাণ্ডী সন্ন্যাসীকে বুঝায় না বা অজ্ঞা-ভিলাষীর ভাষায় প্রাকৃত দরিদ্রতাকেও বুঝায় না। শরণাগত বা অকিঞ্চনের লক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্যাবিশিষ্ট। কৃষ্ণকশরণ হইলেই জীব কৃষ্ণের মায়াবাবতীয় মায়াশ্রো উদাসীন হন। সেই সকল মায়াব্রা বরণ কবাতো দূরে থাক, প্রতিষ্ঠার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করেন। ষাঁহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসরণ প্রবল আছে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই (তাঁহাকে) কৃষ্ণকশরণ বলা যায়। শরণের লক্ষণ ছয়প্রকার—(১) আশ্রুকুল্যের সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকুল্যের বর্জন, (৩) কৃষ্ণব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্তা নাই — এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, (৪) কৃষ্ণকেই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, (৫) কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তৎসেবা ব্যতীত অন্তচেষ্টারাহিত্য,

(৬) জড়ের সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজে কে নিতান্ত দীনবুদ্ধি। এই ছয়প্রকার শরণের লক্ষণে লক্ষণাধিত হইয়া সজ্জন কৃষ্ণ আত্মসমর্পণ করেন।

কৃষ্ণকশরণ সজ্জনের কৃষ্ণকশরণতা ব্যতীত কৃষ্ণ-তর বস্তুর শরণ গ্রহণে প্রবৃত্তি নাই। তবে যাহারা বৈষ্ণব-পরিচয়াকাজ্জা লাভের জন্ত কপটতা করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণকশরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধ ভক্তির অত্যাশুপূর্বক তীব্র প্রতিবাদ করাকে কৃষ্ণকশরণতা জানেন, তাঁহারা মিছাভক্ত বা কপটী বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন। ভক্তের স্বভাবে পরচর্চা নাই, অনর্থক তীব্র প্রতিবাদ নাই, পরহিংসা নাই, মৎসরতা

নাই। যাহা সজ্জনে নাই, সেইগুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণবপরিচয়চ্ছলে অন্তঃস্থিত সম্পত্তিপুঞ্জ। অসাধুর ভগ-বান্ ও ভক্তের বিবেচ্য করাই স্বভাবজাত ধর্ম, উহা কৃষ্ণকশরণতা নহে, কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র। কপটী মিছা-ভক্ত যখনই কৃষ্ণকশরণ হন, তৎকালে হরিগুরুবৈষ্ণব-দ্রোহিতার অপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত বৃত্তিসমূহের হস্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীবের কৃষ্ণকশরণতা সুতুল্লভ হইলেও সাধুসঙ্গক্রমে সজ্জনের এই মূল গুণ বা স্বরূপ-লক্ষণে দৃষ্টি পড়ে। তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন।



শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(বৈষ্ণবসেবা)

প্রঃ — রূপাপ্রার্থী কি বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার করিবেন না?

উঃ — “যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের রূপা, যাহে সর্ব-সিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে।”

— প্রার্থনা (লালসাময়ী) — ৭, কঃ কঃ

প্রঃ — অসাধুকে সাধুক্রমে সেবা করিলে কি সাধু-সেবা-ফল লভা হয়?

উঃ — “এমত মনে করিবেন না — ‘আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবা-ফল পাইব’।”

— ‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং: তোঃ ৫৫

প্রঃ — জীবসেবা ও বৈষ্ণবসেবা কি এক?

উঃ — “জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে ‘জীবসেবা’ হইতে পারে। উৎসাহে মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট ‘নামপরায়ণ-বৈষ্ণব-সেবা’ বলা যায় না।”

— ‘বৈষ্ণবসেবা’, সং: তোঃ ৬১

প্রঃ — উদরপরায়ণ ও ধন-শিখাদিলোভী বৈষ্ণব-

চিহ্নধারিণীগকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণবসেবা হয়?

উঃ — “তীর্থস্থানে বর্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। তথায় একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব (?) নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুণি (?) অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদি-দ্বারা সজ্জী-ভূত হইলেন। ‘অচ্ছ ভরপেট লুচি-মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণাও মিলিবে,’ — এই ধনাশায় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ-গ্রন্থে — “ধনশিখা-দিভির্বারৈষ্য ভক্তিরূপপত্ন্যতে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এই সকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল, তবে অনুরূপা-দিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।”

— ‘বৈষ্ণবসেবা’ সং: তোঃ ৬১

প্রঃ — বহির্শূখ-প্রভু-সন্তানকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণবসেবা হয়? বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

উঃ — “তীর্থস্থানে আজকাল প্রথা এই যে, যখন

যাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটি প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া-
ঘারা অন্ন-ব্যঞ্জন-পিঠাপান্য প্রস্তুত করাইয়া ‘বৈষ্ণব’
বলিয়া কতকগুলি লোককে আমন্ত্রণ করতঃ ভোজন
করাইয়া থাকেন। একরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণবসেবা
বলিতে পারি না। * * * বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম-
সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যই
বৈষ্ণবের তারতম্য।”

— ‘বৈষ্ণবসেবা’, সং. তোঃ ৬:১

প্রঃ — কিরূপ বিচার ও সতর্কতার সহিত বৈষ্ণব
সেবা করা কর্তব্য?

উঃ — “বৈষ্ণবসেবাকে নিত্যধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য করি-
বেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে
সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তি-বিরুদ্ধ
কার্য্য করিবেন না।”

— ‘বৈষ্ণবসেবা’, সং. তোঃ ৬:১

প্রঃ — বৈষ্ণব (?) ভোজনে দক্ষিণা-প্রদান কার্য্যটি
কি কর্ম্মকাণ্ড নয়?

উঃ — “বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা
দেওয়া নিতান্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের
দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথাটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের
দক্ষিণা-প্রথা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ
করা নিতান্ত আবশ্যক।”

— ‘বৈষ্ণবসেবা’, সং. তোঃ ৬:১

প্রঃ — কিরূপ বৈষ্ণবকে তৃপ্ত করা কর্তব্য?

উঃ — “হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধ নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে
সর্ব্বপ্রকারে তর্পণ করুন। কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-
দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণবসেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধম করিবেন
না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে (?)
ভোজন করান’ প্রভুর মত নহে।”

— ‘বৈষ্ণবসেবা’, সং. তোঃ ৬:১

প্রঃ — শুদ্ধবৈষ্ণব ও সাধারণ অতিথিকে কিরূপ-
ভাবে ভোজন করান’ উচিত?

উঃ — “ক্ষুধিত আতুর বিত্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক
ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা
সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই;
যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে
প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে
প্রীতিসহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ
করিবে।” — ‘সঙ্গত্যাগ’, সং. তোঃ ১১:১১

প্রঃ — সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া ও অভ্যাগত-
বৈষ্ণবসেবা কি এক?

উঃ — “অনিমন্ত্রিত বৈরাগী বৈষ্ণবের নাম —
‘অভ্যাগত’। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব হই একটি গৃহে
আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত; ইহাতেই
গৃহস্থের বৈষ্ণবসেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্রে
করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান হয় না; তাহাতে
অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবারাত্রই নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবের
অভ্যাগতত্ব ধর্ম্ম থাকে না; তাহাতে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা
দেওয়া হয় বটে, বৈষ্ণবসেবা হয় না।”

— ‘বৈষ্ণবসেবা’, সং. তোঃ ৬:১

প্রঃ — অতিথিসেবা ও বৈষ্ণবসেবায় পার্থক্য কি?
বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোনটি করা কর্তব্য?

উঃ — “অতিথিসেবায় ও বৈষ্ণবসেবায় এই ভেদ যে,
অতিথিসেবাটি — গৃহস্থধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবসেবাটি —
বৈষ্ণবধর্ম্ম। যিনি বৈষ্ণব হইয়াও গৃহস্থ, তিনি অবশ্যই
অতিথি সেবা করিবেন; কেন না, তিনি গৃহস্থ
বলিয়া অতিথিসেবা করিবেন এবং ‘বৈষ্ণব’
বলিয়া বৈষ্ণবসেবা করিবেন।”

— ‘বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য’, সং. তোঃ ৮:২

প্রঃ — যথার্থ বৈষ্ণবসেবা কিরূপে হয়?

উঃ — “আজকাল ‘মহোৎসব’ বলিয়া একটি প্রথা
চলিতেছে; তাহাকেই অনেকে বৈষ্ণবসেবা বলিয়া
মনে করেন। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব-
সেবা হয় না। শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি অন্নসংখ্যকও হন,

তথাপি তাঁহাদের সেবাতেই বৈষ্ণবসেবা হইতে পারে।”
— ‘বৈষ্ণবসেবা’ও প্রচলিত মহোৎসব-প্রথা’, সঃ তোঃ ৪।৫
প্রঃ — বৈষ্ণবের আগমনে ও গমনে কিরূপ ভক্ত্যঙ্গ
পালনীয় ?

উঃ — “বৈষ্ণব আসিতেছেন, শুনিলে কিছু দূর
গিয়া অভ্যর্থনা করিবে; আর বৈষ্ণব যখন চলিয়া
যান, তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে।”
— ‘শ্রীরামানুজ-স্বামী’র উপদেশ’ — ১৯, সঃ তোঃ ৭।৩

শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণই — সর্বমূলতত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থের দ্বিতীয়রাত্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে
লিখিত আছে — “শ্রীকৃষ্ণ যেমন জগৎপিতা, শ্রীরাধাও
তেমন জগন্মাতা। তাঁহারা দুই-ই একতত্ত্ব, দুগ্ধ ও তাহার
ধবলবর্ণে যেমন কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ তাঁহাদের
মধ্যে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলনিবাসিনী
শ্রীরাধা তাঁহার বামাংশসম্ভবা। সেই শ্রীরাধাই আবার
বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণবক্ষঃস্থিতা মহালক্ষ্মী, তিনিই বিবুধ-
জননী শ্রীসরস্বতীরাূপা, তিনিই ক্ষীরোদসিন্ধুকণ্ঠা শ্রীলক্ষ্মী-
দেবীরূপে শ্রীবিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা, তিনিই আবার ব্রহ্মলোকে
শ্রীসাবিত্রীদেবীরূপে শ্রীব্রহ্মার বক্ষঃস্থলবাসিনী। পুরাকালে
শ্রীহরির দয়া মূর্তিমতী দেবী ভগবতীরূপে দেবগণের
তেজে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যকুল নিধনপূর্বক দেবরাজ
ইন্দ্রকে নিকটক রাজ্য প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণাদেশে সেই
সনাতন ভগবতী বিষ্ণুমায়ার কালক্রমে দক্ষকণ্ঠা সতী
রূপে আবির্ভূতা হন, আবার পতিনিন্দা শ্রবণে সতী-
দেহ ত্যাগপূর্বক হিমাद्रিহ্রিতা পার্বতী রূপে তিনিই
সর্বশক্তিস্বরূপিণী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবী। তিনিই অর্থাৎ
শ্রীরাধা পরমাত্মা কৃষ্ণের পরমাবুদ্ধিস্বরূপিণী সম্পত্তিরূপা,
স্বর্গে ইন্দ্রগৃহে তিনিই স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী, মর্ত্যে রাজগৃহে
রাজলক্ষ্মী, গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মী, সর্বত্র পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে
তিনি গ্রামদেবতা, জলে সত্যস্বরূপা, ভূমিতে গন্ধরূপা,
আকাশে শব্দরূপা, চন্দ্রে শোভারূপা, সূর্য্যে এবং প্রধান
প্রধান নৃপতিতে প্রভা ও প্রভাবরূপা, অগ্নিতে দাহিকা
শক্তি এবং জীবগণের সর্বশক্তিস্বরূপিণী তিনি। সৃষ্টি-
কালেও সেই দেবীই মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী — মহাবিষ্ণুব
জননী-স্বরূপিণী, সেই মহাবিষ্ণুই মহান ও বিরাট —

তাঁহার লোমকূপে বিশ্বসকল আছে বলিয়াই তিনি
‘বাসু’ বলিয়া প্রকীর্তিত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারও দেব, এজ্ঞা
তিনি ‘বাসুদেব’ বলিয়া খ্যাত হন।”

সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণই লীলাভেদে অনন্তরূপে আত্ম-
প্রকাশ করিতেছেন। শক্তিমানের সহিত শক্তির কোন
ভেদ নাই। কেবল শক্তি — শক্তিমানের ইচ্ছাধীন,
ইহাই বৈশিষ্ট্য। অংশী শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বেশ্বরের স্বর্গমূল
শক্তিমতত্ত্ব স্বয়ংরূপ স্বয়ং ভগবান্, অংশিনী শ্রীরাধাও তেমন
সর্বশক্তির মূলধার — স্বরূপশক্তি — স্বয়ংরূপা — স্বয়ং-
ভগবতী। শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি। ব্রজে
স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় কায়ব্যাহ — মূল সঙ্কর্ষণ —
স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব। ব্রজের সেই শ্রীকৃষ্ণবলরামই দ্বার-
কায় ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ এই
আদি চতুর্ধ্যরূপে আবির্ভূত। মহাবৈকুণ্ঠে ইহারই
প্রকাশ দ্বিতীয় চতুর্ধ্য। এই দ্বিতীয় চতুর্ধ্যে
শ্রীবলরামের যে মহাসঙ্কর্ষণ রূপ আছেন, তিনিই একাংশে
কারণবারিধিতে কারণাক্রিশায়ী প্রথম পুরুষাবতার,
ইনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ; ইনি আবার
প্রতিব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেকাংশ নিজস্বদজলে পরিপূর্ণ করতঃ
তথায় স্বেতদ্বীপ প্রকট করিয়া তাহাতে শেষ-শয্যা
শয়ন করেন, লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদসম্বাহনরতা।
ইনিই গর্ভোদশায়ী — দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইহারই
নাভিপদ্মে পদ্মযোনি ব্রহ্মার জন্ম হয়। ইনিই আবার
ক্ষীরসমুদ্রশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার — ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত প্রত্যেক
জীবের অন্তর্ধানী পরমাত্মা। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয়
পুরুষাবতার প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমষ্টি জীবের অন্তর্ধানী

পরমায়া এবং কারণোদকশায়ী প্রথম পুরুষাবতার অনন্তকোটিক্রোণ্ডের সমষ্টি জীবান্তর্ধামী পরমায়া।

এক কৃষ্ণই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে চতুর্ভুজরূপে — ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি অনন্তরূপে প্রকটিত। এক অদ্বিতীয় বাচ্যস্বরূপ ব্রহ্মের বাচকস্বরূপ একাক্ষর প্রণবের শ্রীগোপাল-রামাদি অনেকাক্ষর বাচ্যস্বরূপ প্রতীত হইলেও ঐসকল ভেদপ্রতিম প্রতীতি এক অদ্বয়জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত জানিতে হইবে। “বদন্তি তত্ত্ববিদন্তস্বং যজ্ঞ-জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥” — এই ভাগবতীয় বিচার অল্পধাবনীয়। শ্রীগোপালভাপনী শ্রুতি বলিতেছেন — একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ং অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর মায়্যা অর্থাৎ তৎ স্বরূপভূতা নিত্যশক্তিদ্বারা চতুর্ভুজ হইয়াছেন। প্রণবের অকার অক্ষর হইতে রোহিণীনন্দন রাম, উকার অক্ষর হইতে প্রহ্লাদ এবং মকার অক্ষর হইতে অনিরুদ্ধ প্রাহ্লভূত হইয়াছেন। অকার জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতৃ-সমষ্টিরূপ, উকার স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ-সমষ্টিরূপ এবং মকার সুষুপ্তাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ-সমষ্টিরূপ। কিন্তু কৃষ্ণ উক্ত জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তরূপ অবস্থাত্রয়বজ্জিত তুরীয় বস্তু, তিনি অল্পচাৰ্য্য অর্দ্ধমাত্রাত্মক নাদস্বরূপ সম্পূর্ণ-প্রণববাচ্য পূর্ণব্রহ্ম, সেই সদানন্দাত্মক কৃষ্ণেই সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে।

শক্তিমানের সহিত শক্তির অভেদত্ব-হেতু শ্রীকৃষ্ণিণী কৃষ্ণ-স্বরূপ। জগৎকর্ত্রী — সর্বসম্পাদয়িত্রী মূল প্রকৃতি — স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণান্তর্ভাব-হেতু কৃষ্ণের চায় ইনিও প্রণববাচ্য। অর্থাৎ প্রণববাচ্য বা প্রকাশ্য। কৃষ্ণিণীর উপলক্ষণে শ্রীরাধাও উপলক্ষিতা হইতেছেন। স্বন্দ ও মৎস্তপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে —

“কৃষ্ণিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।
ঋক্পরিশিষ্টেও উক্ত হইয়াছে —

“রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজন্তে জনেষু ইত্যাদি।”

এইজন্মই নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে — বিশ্বস্রষ্টি-কালে সেই মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী (শ্রীরাধিকাই) অনন্ত-কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ মহা বিরহী পুরুষ কারণ-কিশায়ী মহাবিশ্ব-প্রসবিনী হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতি-

খণ্ডে (২য়-৩য় অঃ) সেই মহাবিশ্বের উদ্ভব এই ভাবে কথিত হইয়াছে, যথা —

“শ্রীকৃষ্ণ সর্বস্রষ্টির আদিতে সিস্কক্ষু হইয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করতঃ বামার্দ্ধে রমণীরূপ এবং দক্ষিণ অর্দ্ধে পুরুষরূপ ধারণ করিলেন — অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা শ্রীরাসমণ্ডলে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত রাসক্রীড়া করিলেন (‘রাসক্রীড়াং চকার হ যাবদ্ বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ’)। কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতা কৃষ্ণপ্রাণাধিক-প্রিয়তমা রাধা কৃষ্ণ হইতে শতমত্সরকাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণপূর্বক একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। ডিম্ব দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া দেবী সেই ডিম্বটি জলে ফেলিয়া দিতে কৃষ্ণ তাঁহাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তুমি যেমন অপত্য বর্জন করিলে, তজ্জন্তু অত্যাধি তুমি আর অপত্য লাভ করিতে পারিবে না। নিরপত্য হইলেও তুমি নিত্য-যৌবনা থাকিবে। তোমার অংশে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারাও নিরপত্য হইবে, কিন্তু চিরকাল তাহারা সুস্থিরযৌবনা থাকিবে। অনন্তর দেবীর জিহবাগ্রে শুক্রবর্ণা পীতবস্ত্রপরিধানা বীণাপুস্তকধারিণী সর্বশাস্ত্রাধিদেবতা সরস্বতীদেবীর আবির্ভাব হইল। অতঃপর দেবী বিধা বিভক্ত হইলে বামার্দ্ধে কমলা দেবী আবির্ভূতা হইলেন। দক্ষিণার্দ্ধে রাধারূপেই বিद्यমান থাকিলেন। তদর্শনে কৃষ্ণও দ্বিধারূপ হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধে দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপে প্রকট থাকিলেন, বামার্দ্ধে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণেচ্ছায় সরস্বতী এবং রাধারাগীর ইচ্ছায় লক্ষ্মী নারায়ণের অনুগামিনী হইলেন। নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শ্রীরাধাংশে জন্মহেতু লক্ষ্মী-সরস্বতী নিরপত্য রহিয়া গেলেন। অতঃপর নারায়ণাঙ্গ হইতে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসম তেজস্বী বহু চতুর্ভুজ পার্শ্বদ জন্ম গ্রহণ করিলেন। কমলা দেবীর অঙ্গ হইতেও কোটি কোটি দাসী আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহারা সকলেই লক্ষ্মীর সহচরী। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপ এবং শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপিকা জন্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণাভিশাপে তাঁহারা সকলেই

নিরপত্যা। অনন্তর কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সনাতনী বিষ্ণুমায়া নারায়ণী ঈশানী দুর্গাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহারই মায়ায় এই তিন সংসার মুগ্ধ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের (গর্ভোদশায়ীর) নাভিপদ্মে চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং তাঁহার বামে এক অপূর্ণরূপবতী নারীর (সাবিত্রীর) আবির্ভাব হইল। স্বামী-স্ত্রী কৃষ্ণের অনেক স্তব করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ দ্বিধারূপ হইলে তাঁহার বামার্দ্ধাঙ্গে মহাদেব ও দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গে নিজেই — গোপিকাপতিরূপে বিরাজিত হইলেন। মহাদেব পঞ্চবদনে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রহ্মার বয়ঃকাল পর্য্যন্ত সেই ডিম্ব জলে অবস্থানপূর্বক যথাকালে দ্বিধা বিভক্ত হইলে সেই ডিম্ব-মধ্য হইতে কোটিমুখ্যসমকান্তি এক অপূর্ণ শিশু প্রকাশিত হইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইনিই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডনাথ কারণাকির্শায়ী মহাবিষ্ণু। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব বিद्यমান। সুতরাং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের অধীশ্বর ইনি। গোলোক বৈকুণ্ঠ — এই দুই মাত্র নিত্যস্থান, ঐসকল ব্রহ্মাণ্ড জল-বিশ্বের ত্রায় অনিত্য। মহাবিষ্ণু অতঃপর জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তারত হন। কৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়া তৎসম জ্ঞানী ও ক্ষুধাতৃষ্ণ-রোগশোকজরান্বিত প্রভৃতি রহিত হইবার বর দান করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণকর্ণে মহাশঙ্খ ‘ওঁ কৃষ্ণায়

স্বাঃ’ এই বড়ক্ষর মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং জননী শ্রীরাধিকা-সতীর নিরন্তর ধ্যান করিবার উপদেশ দিলেন। এই মহাবিষ্ণুরই ঈক্ষণে প্রকৃতি ক্রিয়াবতী হইয়া চরাচর জগৎ প্রসব করেন। ইনিই গর্ভোদশায়ী-রূপে নাভিপদ্মে ব্রহ্মাকে ধারণ করেন। ইহারই ললাট হইতে একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব ইত্যাদি।”

অতএব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের বচনের সহিত ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ-বাক্যের অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে দশম পুরাণ বলিয়াছেন :— “দশমং ব্রহ্মবৈবর্তম্।”

উক্ত শ্রীনারদীয়ে লিখিত আছে —

“আদৌ সমুচ্চরেদ্ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
বিপরীতং যদি পাঠেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেৎক্ৰবম্॥
শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণে মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী॥”

— নাঃ পঃ ২৭। ৬ষ্ঠ অঃ। ৬-৭ শ্লোঃ

অর্থাৎ আদৌ ‘রাধা’-শব্দ উচ্চারণ পূর্বক পশ্চাৎ মাধব (মা — লক্ষ্মী, ধব — পতি — লক্ষ্মীপতি) ‘কৃষ্ণ’ শব্দ উচ্চারণ করিবে। যদি কেহ ইহার বিপরীত পাঠ করে, তবে সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাতক প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ — জগতের পিতা, শ্রীরাধিকা — জগন্মাতা। পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে অধিক বন্দ্যা, পূজ্যা ও গুরুতমা।



অবতারী---স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর

(পূর্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবতে ‘কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণং’, ‘আগন্ বর্ণা-স্ত্রয়ো’, ‘ছন্নঃ কলৌ’ ইত্যাদি বাক্যে; মহাভারতে ‘সন্তবামি যুগে যুগে’ (গীতাঃ) ও ‘সন্ন্যাসকুৎ শমঃ শাস্তঃ’ (মহাভারতে ও বিষ্ণুসংহতনামে) ইত্যাদি বাক্যে; বেদে ‘মহান্ প্রভুবৈ পুরুষঃ’, ‘যদা পশুঃ পশুতে রুহ্ম-বর্ণং’ ইত্যাদি বাক্যে; আগমানুগত বহুতন্ত্রে ‘মায়াপুরে ভবিস্যামি শচীস্থতঃ’ ইত্যাদি বাক্যে এবং উপপুরাণেও

‘অহমেব কচিদব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥’ (অর্থাৎ ‘হে ব্রহ্মন্, কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।’) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের অবতারের সাফাৎ প্রমাণ রহিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবেও তাঁহার অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক প্রভাব দৃষ্ট ও অনুভূত হইয়া থাকে।

তথাপি উলুক যেমন কোটরাভ্যন্তরে থাকিয়া সূর্য্যের
কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্বই স্বীকার
করিতে প্রস্তুত নহে, তদ্রূপ অভক্তসমূহ হৃৎগাভ্যবশতঃ
দিবাক্ষেপচকের আয় অধোক্ষজভগবদবস্তুদর্শনে বঞ্চিত
হইয়া থাকে। অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রীভগবান্ তাহাদের
অক্ষজ্ঞানগোচরীভূত না হওয়ায় তাহারা তাঁহার
অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহে না। তাই শ্রীল
কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন —

“ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।

চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট-প্রমাণ ॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।

কৃপা করি’ ব্যাসপ্রতি কহিয়াছেন কথন ॥

‘অহমেব কচিদ ব্রহ্ম’ ইত্যাদি ॥

প্রত্যক্ষে দেবহ নানা প্রকট প্রভাব।

অলৌকিক কৰ্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।

উল্কে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥

আপনি লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।

তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥”

কিন্তু রহস্য এই যে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে লুকাইতে
যতই না কেন চেষ্টা করুন, তাঁহার ভক্তের সেবোন্মুখ
ইন্দ্রিয়ের নিকট তাঁহার নামরূপগুণলীলা — কিছুই
অপ্রকাশিত থাকে না, স্বপ্রকাশবস্তু স্বতঃই স্ফুট
হইয়া পড়ে। গোদাবরীতটে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে
বলিতেছেন —

“পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ।

এবে তোমা দেখি মুক্তি শ্রাম-গোপরূপ ॥

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।

তাঁর গৌরবাস্তো তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥

তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশীবদন।

নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥

এইমত তোমা দেখি’ হয় চমৎকার।

অকপটে কহ প্রভু, কারণ ইহার ॥”

মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে মহাভাগবতাদি বলিয়া
অঙ্গাগোপন করিবার চেষ্টা করিয়া কহিতে লাগিলেন —

“(প্রভু কহে —) কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেম হয়।

প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।

তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণফুরণ ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।

সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্মৃতি ॥

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।

যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে ফুরয় ॥”

শ্রীমদ্রম্যপ্রভুর এই আত্মগোপনচেষ্টা শুনিয়া রায়
স্পষ্টভাবেই মহাপ্রভুর অবতারোদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিয়া
কহিতে লাগিলেন —

“(রায় কহে, —) প্রভু তুমি ছাড় ভারি-ভুরি।

মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥

রাধিকার ভাবকাস্তি করি’ অঙ্গীকার।

নিজরস আশ্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥

নিজ গুঢ় কার্য্য তোমার — প্রেম-আশ্বাদন।

আনুভঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।

এবে কপট কর, তোমার কোন্ বাবহার ॥”

তখন ভক্তবৎসল ভক্তবাঞ্ছাকরকর শ্রীভগবান্ গৌর-
সুন্দর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া
ভক্তসমক্ষে স্বীয় শ্রাম ও গৌররূপ প্রদর্শন করিলেন —

“তবে হাসি’ তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।

‘রসরাজ’, ‘মহাভাব’ — দুই একরূপ ॥”

অর্থাৎ “রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব রূপা
শ্রীমতী রাধিকা — দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব সেই
স্বরূপ দেখাইলেন — অর্থাৎ ‘রাধাভাবত্যাতিসুবলিত
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ’ দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্ব দুই
এবং দুই তত্ত্বই এক, এরূপ একটি অপূর্ব্ব স্বরূপ
দেখাইলেন। যাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব
অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারা ই শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর
রূপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পারেন।”

(অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামানন্দ প্রেমানন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।
মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-স্পর্শে সংজ্ঞা লাভ করতঃ তাঁহার

সন্ন্যাসবেশদর্শনে বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু প্রিয়ভক্ত রায়কে আলিঙ্গন করিয়া নিজ কৃষ্ণরূপ ও রাধাভাব-জুতিময়ত্বের উদ্দেশ্যাদি সমস্ত গূঢ় কারণই অকপটে জ্ঞাপন পূর্বক কহিলেন —

“মোর তত্ত্বনীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইলু’ তোমারে ॥
গৌরঅঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রমুখ বিনা তিঁহো না স্পর্শে দত্তজন ॥
তঁার ভাবে ভাবিত করি’ আত্মন।
তবে নিজ মাধুর্য্য করি আশ্বাদন ॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান’ লর্যমর্ম্ম ॥”

— চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ

শ্রীরাধামুখাচার্য্যচরণের পরমগুরুদেব আলবন্দার যামুনাচার্য্য তাঁহার স্তোত্ররত্নে (১৫ ও ১৮ শ্লোক) লিখিতেছেন —

“হ্যাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সঞ্জন সাঙ্গিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাস্তুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রটিম্ভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যনং
পশুন্তি কেচিদনিশং বৃন্দনম্ভাবাঃ ॥”

অর্থাৎ “হে ভগবন, তোমার অবতারতত্ত্ব পর-মার্থবিদ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাঙ্গিকশাস্ত্রদ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাঙ্গিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামসগুণবিশিষ্ট অস্তুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

“হে ভগবন, দেশ, কাল, চিন্তা (দ্রব্য বা পাত্র) — এই তিনটি সীমাধারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ় স্বভাব সম ও অতিশয়-শূন্য (অর্থাৎ অসমোদ্ধ) হওয়ার উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে

আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্তভক্তগণ সর্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।”

— চৈঃ চঃ আ ৩৮৬, ৮৮ অঃ প্রঃ ভাঃ

এই জন্মই শ্রীগোপীনাথচাৰ্য্য শ্রীসার্কভোম-ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন —

“ঈশ্বরের রূপালেশ হয় ত’ যাঁহারে।
সেই ত’ ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥”

(ব্রহ্মসুবেও কথিত আছে —)

“তথাপি তে দেব পদাশুভদয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্ব ভগবনমহিমো
ন চাত্ত একোহপি চিরং বিচিহ্ন ॥”

“যতপি জগদগুরু তুমি — শাস্ত্র-জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥
ঈশ্বরের রূপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে।

পাণ্ডিত্যে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান কভু নহে ॥”

শ্রীগোপীনাথচাৰ্য্যের এই প্রকার তীব্র মন্তব্য শ্রবণে সার্কভোম কহিয়া উঠিলেন — আচার্য্য, একটু সাবধানে কথা বল, তোমাতে যে ঈশ্বরের রূপা হইয়াছে, ইহারই বা প্রমাণ কি? তজ্জবনে আচার্য্য কহিলেন —

(আচার্য্য কহে —) ‘বস্তুবিষয়ে হয়ে বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় রূপাতে — প্রমাণ ॥

ইহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥
তবু ত’ ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়া, — এই বলি ব্যবহার ॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্গুণজন।’

অর্থাৎ পরমতত্ত্ববস্তুবিষয়ে যে বস্তুতত্ত্বজ্ঞানোদয়, তাহাই ঈশ্বর-রূপার জাজ্জল্য প্রমাণ। তুমি তাঁহার মহাপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বর-লক্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়াছ, কিন্তু ঈশ্বরের বহির্লক্ষ্য মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলে না। বহির্গুণগণ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পার না।

প্রেমসৰ্বস্বভাবা গোবিন্দেশ্বরীযোগমায়ার আবিষ্কার-
শক্তি অধিগম্যত্রী ত্রিগুণময়ী মহামায়া তাঁহার আব-
রণাঙ্গিকা ও বিক্ষেপাঙ্গিকা বৃত্তিদ্বারা জীবের জ্ঞান
বা বুদ্ধি অজ্ঞানদ্বারা আবৃত ও কৃষ্ণাধেষণাঙ্গিকা
চিত্তবৃত্তিকে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন।
শ্রীভগবানে শরণাপত্তিব্যাপ্তী এই দুৰত্যয়া মায়ার হস্ত
হইতে নিষ্কৃতি লাভের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।
শ্রীভগবান্‌ই বলিয়াছেন — ‘মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়া-
মেতাং তরন্তি তে।’ আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
মহাশয় গাহিতেছেন — ‘মায়া-র করিয়া জয় ছাড়ান’
না যায়। সাধুগুরু রূপা বিনা না দেখি উপায়॥’
ইহাও পরম সত্য, যেহেতু ভগবৎরূপা ভক্তরূপাত্ম-
গামিনী। ভক্তমাধ্যমেই শ্রীভগবানের রূপা জীবগণে
সঞ্চরিত হয়। শ্রীবাগ্‌দেব সার্কভোম শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-
জন, তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণদ্বারা আমাদিগকেই সাব-
ধান করা হইয়াছে। অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তিও ‘ত্রিগুণ’
প্রভৃতি শব্দার্থ-অবধারণে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কলি-
কালে লীলাবতার না থাকিলেও যুগাবতার যে নিষিদ্ধ
হয় নাই, প্রতিযুগেই যে কৃষ্ণের যুগাবতার হয়, ইহা
তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে বোধগম্য হয় না। ‘ছন্ন’ বলিতে কি
অর্থ করিতে হইবে কলিতে যুগাবতার নাই? তাহা
হইলে ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ এই ভগবদ্বাক্যে যে
ব্যভিচার দোষ আসিয়া পড়ে? স্মরণ্য
কলিতে প্রচ্ছন্ন বলিয়াই ‘ত্রিগুণ’ শব্দ। কিন্তু শ্রীভগ-
বান্‌ তাঁহার ভক্তের নিকট আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে
বা আত্মগোপন করিতে পারেন না। অকৃত্রিম শুদ্ধ-
ভক্তের প্রকৃত ‘বাস্তববস্তু’ বিষয়েই বস্তুজ্ঞান হইয়া
থাকে। পরন্তু অধুনাতন কোন কোন অভক্ত অনুচান-
মানী অবস্থকে বস্তু বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যাইয়া
মন্ত্বে Apotheosis or Deification — দেবত্বারোপ
রূপ দোষজুট হইয়া পড়িতেছেন। ঐ দোষের সঙ্গে
সঙ্গে আবার Anthropomorphism বা ঈশ্বরে
মানবত্বারোপ রূপ দোষেরও আবাহন হইয়া পড়িতেছে।
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকটিত হইবার পূর্বে
শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকথিত “আরো দুই জন্ম এই

সংকীর্ণনারস্তে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥”
— এই বাক্যের সুযোগ লইয়া অনেকে অনেককে
অবতার সাক্ষাৎকার জন্ত ব্যস্ত হইতেছেন, কিন্তু ঐ
দুই অবতার — ‘অর্চাবতার’ ও ‘নামাবতার’ ব্যতীত
অন্ত কিছুই নহে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
লিখিতেছেন —

‘কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার’

— (চৈঃ চঃ আদি ১৭১২২)

অর্চাবিগ্রহও নাম ও স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তদ-
বিষয়েও লিখিতেছেন —

“নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ — তিন এক রূপ।

তিনে ভেদ নাই, — তিন চিদানন্দ-রূপ॥”

— চৈঃ চঃ মধ্য ১৭১৩১

“যে ষাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তদব্যবহিত
পরবর্তী সেই চতুর্ধুগান্তর্বর্তী কলিতেই শ্রীগৌরসুন্দরও
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণেরই
আবির্ভাব-বিশেষ, ‘তদব্যভিচার্যং’ অর্থাৎ আর কখনও
ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই — শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-
পাদের পূর্বোক্ত এই ক্রমসন্দর্ভসিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া
যখন তখন যাহাকে তাহাকে অবতার সাক্ষাৎকারে
যাওয়া মহত্মজ্ঞানজনিত মহদপরাধ ব্যতীত আর
কিছুই নহে।

শ্রীকৃষ্ণলীলাও যেমন নিত্য, তদভিন্ন শ্রীগৌর-
লীলাও তদ্রূপ নিত্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্য
২০শ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলার নিত্য হৃদ্যের
জ্যোতিষ্চক্রে ভ্রমণের দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া লিখিয়াছেন—

“নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়।

* * *

জ্যোতিষ্চক্রে হৃদ্য যেন ফিরে রাতিদিনে।

* * হৃদ্যোদয় হইতে * * পুনঃ হৃদ্যোদয়॥

ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদমঘন্তরে।

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥

সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকটপ্রকাশ।

তাহা যৈছে ব্রজপুবে করিয়া বিলাস॥

অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।

সবলীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥

জন্ম, বালা, পৌগণ্ড, কৈশোর-প্রকাশ।

পুতনাবধাদি করি' মোঘলান্ত বিলাস ॥

কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।

তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম পুরাণ ॥

সূর্য্য যেমন তাঁহার নিজ কক্ষে (Orbit এ)

নিজ ইচ্ছামত ভ্রমণ করেন, আমাদের ইচ্ছামত তাঁহাকে
অন্তপথে অন্তসময়ে ভ্রমণ করাইতে পারি না, শ্রীভগ-
বান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রও তদ্রূপ সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বরাট
লীলাপুরুষোত্তম। কেবল প্রেমিক ভক্তের প্রেমে বশীভূত
হইয়া তাঁহাদের প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রের সমক্ষেই
শ্রীভগবান্ তদীয় নিত্যলীলাবিলাস প্রকট করিয়া
থাকেন। কঠ শ্রুতিও বলিতেছেন —

“নায়মায়া প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তশ্চৈব আত্মা বিরূণুতে তনুং স্বাম্ ॥”

অর্থাৎ “এই পরমাত্মবস্তুর বহু তর্ক, মেধা বা
পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগ-
বানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার রূপা যাঞা
করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং-
প্রকাশ তনু প্রকটিত করেন।”

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন —

“যেষাং স এষ ভগবান্ দয়স্বেনদনন্তঃ

সর্বাঙ্গান্নাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যালীকম্।

তে হুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং

নৈবাং মমাহমিতিবীঃ শৃঙ্গালভক্ষ্যে ॥”

— ভাঃ ২।৭।৪২

অর্থাৎ “সেই অনন্ত ভগবান্‌ই (তদ্ব্যতীত অন্ত-
দেহতা নহে) বাহ্যদের প্রতি রূপা করেন, তাঁহারা
যদি কায়-মনোবাক্যে নিকপট (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষবাহ্যাহিত) হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ
করেন, তাহা হইলে সেই হুস্তরা দৈবী মায়ায় পারে
গমন করিতে পারেন এবং মায়ায় বৈভবও জানিতে
পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তগণের কুকুর-শৃঙ্গাল-
ভক্ষ্যাদেহে আমি ও আমার বুদ্ধি নাই।”

শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর রূপাপাত্র শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের
প্রভাতে দন্তধাবন মুখপ্রক্ষালনাদি ব্যতীতই মহাপ্রভুপ্রদত্ত
মহাপ্রসাদ-সম্মান-বিচারে শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভু তৎপ্রতি অতীব
প্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন —

“আজি তুমি নিকপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।

কৃষ্ণ আজি নিকপটে তোমা হইলা সদয় ॥

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদিবন্ধন।

আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ায় বন্ধন ॥

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।

বেদধর্ম্ম লজ্জি' কৈলে প্রসাদ সেবন ॥

— চৈঃ চঃ মধ্য ৩২৩২-৩৪

সুতরাং নিকপটে কৃষ্ণাশ্রয় ব্যতীত কখনই কৃষ্ণ-
মায়ায় হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, কৃষ্ণ ও
গৌরতত্ত্ব এবং তাঁহাদের অবতার ও লীলাবিলাস-
তত্ত্বাদিরও স্বরূপোপলব্ধি হইতে পারে না। রূপা
হি কেবলম্।



সম্বন্ধজ্ঞান ও গোঁরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমন্নৃসিংহনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্ সি, বিত্তারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী]

(৪)

প্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীরঙ্গনাথ-
ধাম। চাতুর্মাশকাল। কাবেরীর তীর। প্রভু কাবেরীতে
স্থান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে গেলেন; প্রেমাবেশে

তথায় বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও স্তুতিপ্রবর্তি করিলেন।
মহাভাগ্যবান্ শ্রীবেঙ্কট ভট্ট তৎকালে তথায়ই উপস্থিত
ছিলেন। তিনি ‘শ্রী’ সম্প্রদায়ের আচার্য্য-স্বরূপ এক-

জন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেই তাঁহার নিবাস। প্রভুর প্রেমাবেশ দর্শনে তিনি মুগ্ধ, চমৎকৃত। পরম সমাদরে তিনি প্রভুকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন, শ্রীপদযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং স্ববংশে সেই প্রক্ষালিতবারি ভক্ষণ করিলেন ও মস্তকে ধারণ করিলেন। প্রভুর মাধ্যাহ্নিক ভিক্ষা তথায়ই নির্বাহ হইল। ভট্টের প্রার্থনা, প্রভু চাতুর্মাশ্যকাল তাঁহার আলয়েই অবস্থান করেন। প্রভু স্বীকার করিলেন। “তাঁর ঘরে রহিল। প্রভু কৃষ্ণকথা রসে। ভট্ট সঙ্গে গৌরাইল সুখে চারি মাসে॥” (চৈঃ চঃ ম ৯৮৬) প্রতিদিন প্রভুর কাবেরীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও প্রেমাবেশে নর্ত্তন-কীর্ত্তন। দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু দর্শনে আসিলেন। প্রভু দর্শনে সকলের মুখেই শ্রীকৃষ্ণনাম, সকলেরই গদ-গদ ভাব, সকলের অঙ্গেই পুলক ও নেত্রে অশ্রুধার। আনন্দের অবধি নাই! যেন সুদীর্ঘ অবকাশে এক পরমাত্মার সহিত সকলের মিলন হইয়াছে!

প্রভু বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভট্টের সঙ্গে প্রত্যহ কৃষ্ণকথা বলেন। উভয়েরই মধ্যে প্রগাঢ় সখ্যভাব। ‘শ্রী’সম্প্রদায়ের উপাশ্রু শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ। ভট্টের উপাসনা-নিষ্ঠা দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট। ভট্টের মনের ভাব ‘আমার সম্প্রদায়ের উপাসনাই চরম উপাসনা। অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণই তত্ত্বের শেষ সীমা। প্রভু, ভট্টের মনের ভাব বুঝিলেন, মৃদু হাস্য করিলেন, কিছু বলিলেন না। দিবসান্তরে এক দিবস উভয়ে বসিয়া আলাপ করিতেছেন; প্রভু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, * * * “ভট্ট! তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা শিরোমণি॥ আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গোচারক। সাধ্বী হইয়া কেন চাহে তাঁহার সঙ্গম। এই লাগি’ সুখ-ভোগ ছাড়ি’ চিরকাল। ব্রত নিয়ম করি’ তপ করিল অপার॥” (চৈঃ চঃ ম ৯১১১-১১৩) “কস্তানুভাবোহস্ত ন দেব বিদ্যাহে তবাজি-রেণুস্পর্শাধিকারঃ। যদ্বাঙ্করা শ্রীললনাচরতপো বিধায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥” (ভাঃ ১০১৬১০৬) [নাগপত্নীগণের স্তবোক্তিঃ—হে দেব, যাঁহার চরণে

লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল সমস্তকাম পরিত্যাগ পূর্বক ধৃতব্রতা হইয়া তপস্বী করিয়াছিলেন, সেই চরণেই এই কালিয়সর্প যে কি স্নকৃতি দ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না।] প্রভুর আকস্মিক জিজ্ঞাসায় ভট্ট কিছুটা হত-বুদ্ধি হইলেও উত্তরে বলিলেন,—‘স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ ভগবত্ত্বয়ে না থাকায় কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ বলিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ইহাতে পতিব্রতা ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, সুতরাং কৃষ্ণসঙ্গলালসায় লক্ষ্মীর কৌতুক হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু বিলা-সোত্তম শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসও লভ্য হয়। ইহাতে দোষের কি থাকিতে পারে? তথাপি প্রভুর জিজ্ঞা-সায় কৌতুহলাক্রান্ত ভট্টের মন। তখন অতি বড় রঙ্গী, অতিবড় রস-রহস্যজ্ঞ প্রভু হাস্যসহকারে বলি-লেন,—“দোষ নাহি ইহা আমি জানি। রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥” (চৈঃ চঃ ম ৯১২০) “নায়াং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতে প্রসাদঃ স্বর্ঘোবিতাং নলিনগন্ধকচাং কুতোহতাং। রাসোৎসবেহস্ত ভুজদগুহীত-কণ্ঠলক্ষ্মীশিবাং য উদগাদব্রজসুন্দরীণাম॥” (ভাঃ ১০১৭১৬০) [শ্রীলক্ষ্মীবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদগুদ্বারা গৃহীত-কণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমহু নিতান্ত অল্পগত শক্তিগণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেক্ষণ হয় নাই, তখন অতী সখ্যক্ষে কি বলিব?। “লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ। তপ করি’ কৈছে কৃষ্ণ পাইল ঐতিগণ॥” (চৈঃ চঃ ম ৯১২২) “নিভৃৎসুসুন্দরোহক্ষদূতবোণযুজো হৃদিয়মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্রবণাৎ। স্ত্রিয় উরগেস্ত্রভোগভুজদগুবিষজ-ধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদুশোহজি-সরোজসুধাঃ॥” (ভাঃ ১০১৭১২৩) [মুনি-গণ প্রাণায়ামদ্বারা নিশ্বাস জয়পূর্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দূররূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবানের শক্তসকলও তাঁহার অমুখ্যান-বলে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রজসুগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্পগরীরতুল্য ভুজদগুের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্র বিষকর্তৃক

হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পাদপদ্মসুখা লাভ করিয়া ছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার পাদপদ্মসুখা পান করিয়াছি।] “শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ?” (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১২৪) ভট্ট নিক্তর। রহস্য ভেদ করা কঠিন। প্রভু উত্তর দিলেন। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-ভেদে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সকলই অনন্ত এবং বৈকুণ্ঠও সকলের পৃথক্ পৃথক্। তন্মধ্যে মাধুর্য্যই তাঁহার স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ অথবা কারণরূপ। তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় রূপগুলি তাঁহার কারণরূপেরই পুষ্টিকারী কার্য্যস্থলীয়রূপ। যেমন অন্তঃপুরচারী রাজা ও দরবারের রাজা (king in the harem and king in the court)। অন্তঃপুরচারী রাজার কোন লোকাপেক্ষা নাই, কিন্তু দরবারের রাজার লোকাপেক্ষা আছে। লোকাপেক্ষায়ুক্ত রূপটী রাজার স্বাভাবিকরূপ বা স্বরূপ নহে। উহা বস্তুতঃপক্ষে রাজার কার্য্যস্থলীয় রূপ। উহাতে পিতামাতাদি ভেদে বিবিধ মাধুর্য্যপর সম্বন্ধগুলি অপ্রকাশিত থাকায় মাধুর্য্যের অভাবযুক্ত। তথায় মুখ্যরূপে প্রভু-দাস-সম্বন্ধেরই প্রাধান্য থাকায় ঐশ্বর্য্যই মাত্র তথাকার প্রকাশিতরূপ। পক্ষান্তরে, অন্তঃপুরচারী রূপেও, উক্ত রাজা পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতায় আসীন থাকিলেও অর্থাৎ সর্ববিধ দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইলেও অন্তঃপুরে অবস্থানকালে দাস্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যাদি ভেদে বিবিধ মাধুর্য্যপর সম্বন্ধগুলির যোগে তথায় বিশ্রুতভাবে পূর্ণতম প্রকাশ থাকায় রাজার সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যভাস্তরে সঙ্কুচিতই থাকে। স্থানবিশেষে, যেমন গোবর্দ্ধনধারণাদিলীলাবিশেষে, ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়িলেও মাধুর্য্যপর সেবকগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। এহেন মাধুর্য্যময় রূপই কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ, যাহা ব্রজেন্দ্রনন্দনেই মাত্র পরিচূষ্ট হয়। এমনকি দ্বারকাধীশ কৃষ্ণও (যদিও দ্বারকা মথুরা গোকুল তিনটীই কৃষ্ণলোক) এই মাধুর্য্য-ভাবে সর্বদা ক্ষুরণ নাই, যদি বা কখনও ক্ষুরণ হয়, তবে “আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনা আপনে চাহে করিতে আলিঙ্গন॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪৮) অর্থাৎ ব্রজভাবের ক্ষুণ্ণিতে দ্বারকাধীশের ঐশ্বর্য্য-ভাবও শিথিল হইয়া যায়। এমনকি সাময়িকরূপে তিনি যে দ্বারকাধীশ, তাহাও বিস্মৃত হইয়া যান। দ্বারকায় নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিকৃতিতে স্বসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বলিতেছেন - “অপরিকলিতপূরঃ কশ্যচমৎকারকারী ক্ষুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুক্রচেতাঃ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেষ॥” (ললিত মাধব) [অর্থাৎ “কৃষ্ণ কহিলেন, — অহো! এই প্রগাঢ় মাধুর্য্য-মৎকারকারী অবিচারিতপূর চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুরচিতে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ছায় ইচ্ছা করিতেছি।”] এইজন্ত দ্বারকায় তাঁহার কখনও কখনও গোপভাবাবেশ আসিয়া যায়। পরব্যোমপতি বা বৈকুণ্ঠপতিরূপে দ্বিতীয় চতুর্বাহ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই ত্রীনারায়ণরূপে বিরাজিত এবং দ্বিতীয় চতুর্বাহ হইতেই পুরুষাবতারত্রয়ের অধর্যক্রমে প্রকাশ, যীশ্বদের অংশ-কলায় মৎস্ত, কূর্ম্ম, বরাহ, বামনাদি ভগবানের অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হইয়া দৈত্য-নিপীড়িত লোককে যুগে যুগে রক্ষা করেন। তজ্জন্তই শ্রীমদ্ভাগবতের “এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রাণিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥” শ্লোক সমুদয়-শাস্ত্রার্থ-তাৎপর্য্য-বিনির্ণায়করূপে ভ্রবতারার ছায় সনাতন গগনে নিত্যকাল শোভা পাইতেছেন। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ইহাই এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্ট সাধিত হইয়াছে। যদি নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ তাঁহার অংশ হইতেন, তবে স্মৃতবাক্য বিপরীত হইত অর্থাৎ ‘স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ’ এইরূপ হইত। তাহাতে ‘স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই নারায়ণ’ না হইয়া ‘স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণই কৃষ্ণ’ এইরূপ অর্থ হইত। কিন্তু আর্ষ (অর্থাৎ ঋষি সম্বন্ধীয়) — বিজ্ঞ-বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিশ্লিষ্টা—এই চারিটি দোষ না থাকায় ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং’ এইরূপ মহাবাক্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাই ‘অখিলরসামৃতমুষ্টিঃ’ ও ‘রসো বৈ সঃ’ বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই লক্ষ্যীভূত হন। শাস্ত্র, দাস্ত,

সখা, বাৎসল্য, মধুরাদি ভেদে মুখ্য রস-পঞ্চক পূর্ণ-
রূপে শ্রীকৃষ্ণে দেদীপ্যমান থাকিলেও তাঁহার শ্রীনারায়ণ-
স্বরূপে মাত্র শান্ত, দাশ্ত ও সখ্যার্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই
রসেরই সমাহার দেখা যায়। (বৈকুণ্ঠের সখা গৌরব-
ভাবমিশ্র বলিয়াই তাহাকে পূর্ণসখা না বলিয়া অর্দ্ধ
বলা হয়।) তথায় উন্নত—উজ্জল মধুররতির কোন
কার্যই নাই। এমনকি দাশ্ত ও সখা যাহা আছে,
তাহাও গৌরবভাবময়। বিশ্রুত ভাবময় দাশ্ত ও সখ্যের
স্থান ব্রজ, বৈকুণ্ঠ নহে। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সমূহ
সম্বন্ধগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত তো বটেই, অধিকন্তু
তাহা বিশ্রুত-যুক্ত (অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস ও মমতায় ভরা)
ও রাগময়ী। বিষয়বিগ্রহের রুচিসম্পাদিকা আশ্রয়-
বিগ্রহগণও তজপ বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্নরূপে প্রকাশিত।
স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপাশক্তি শ্রীরাধিকা
সর্বলক্ষ্মীময়ী ও সর্বকান্তা শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণের
দ্বারকাবীশ ও শ্রীনারায়ণাদি বিলাসময় রূপগুলি যেমন
যেমন প্রকাশিত, তজপ শ্রীরাধার অংশাংশে পূরের
মহিবীণ ও বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণেরও প্রকাশ জানিতে
হইবে। যদিও আশ্রয়বিগ্রহগণ সকলেই স্বরূপশক্তি,
তাহাতে তৎসত্তা আত্মান্তিক ভেদবুদ্ধি করা যায় না এবং
মনঃকল্পিত ভেদ দর্শন করিলেও মহা অপরাধ হয়, তথাপি
ভাবের ঐশ্বর্যময়তা ও মাধুর্যময়তা যে এক নহে, ইহা
অনস্বীকার্য। তাই তটস্থ বিচারে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা,
মথুরা, গোবুল, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ডাদিভেদে রসের
ক্রমোন্নত পথ্যারে ব্রজরসের উৎকর্ষ অবশ্যই স্বীকার্য।
বলা বাহুল্য যে, ব্রজরসের উৎকর্ষস্থাপনের জগুই এই
জাতীয় রস-বিলাস-বৈচিত্র্য বৈকুণ্ঠের বিবিধ প্রকোষ্ঠে
— বিবিধ বিষয়-আশ্রয় বিগ্রহের প্রকাশে সংস্খিত
হইতেছে, এমনকি জগতের ঘোর অন্ধকারময় পটভূমিকা
যাহা অরস, কুরস ও বিরসে পরিপূর্ণ, তাহারও সৃষ্টি
মাত্র ব্যতিরেকভাবে ব্রজরসপুষ্টির জগুই। “সৃষ্টাদিক
কার্য তাঁর লীলার সহায়।” (চৈঃ চঃ)। আরও
সিদ্ধান্ত এই যে, ঐশ্বর্যবিলাসী দ্বারকাবীশরূপে শ্রীকৃষ্ণ
স্বয়ংই ব্রজমাধুরী আশ্বাদনে যেমন বঞ্চিত থাকেন,
তজপ ঐশ্বর্যবিলাস-সহচরীরূপে পূরের ও বৈকুণ্ঠের

স্বরূপশক্তিগণও রাশাদি বিবিধ মাধুর্যপূর্ণ রসবিলাস
আশ্বাদন হইতে সরাসরি বঞ্চিতই থাকেন ॥ শ্রীরাধিকা
সর্বলক্ষ্মীময়ী বলিয়া সিদ্ধান্ততঃ তাঁহার দ্বারেই লক্ষ্মীগণ
কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করিয়া থাকেন। “গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করেন
কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ। ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥”
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯, ১৫৫)। কিন্তু আবার ‘গোপীদ্বারে’
অর্থে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য-
বিলাসিনী রূপেই সরাসরি রাসে প্রবেশ করেন।
কেন না ঐশ্বর্যধিক্যে প্রেমশৈথিল্যে রাসে প্রবেশাধিকার
নাই। কাজেই কেবলমাত্র স্বরূপশক্তিতে ঋণ বিচারের
আশঙ্কা নিরাকরণার্থ, ‘যার যেই রস সেই সর্বোত্তম’
অনুমোদনার্থ ও ব্যোমটভট্টের সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠা সংরক্ষ-
ণার্থে উক্ত “গোপীদ্বারে * * * ” পয়ারটির অবতারণা
বুঝিতে হইবে। গোপী-আনুগত্যে ঋতিগণ রাসে
প্রবেশ করিতে পারিলেও বিবিধরূপ ও গোপী-কৈঙ্কর্য-
বিহীন লক্ষ্মীগণ পারেন নাই, ইহাই সত্য কথন।
“ব্রজ লোকের কোন ভাব লক্ষ্য যেই ভজে। ভাব-
যোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥” (চৈঃ চঃ ম চা ২২২)
“নায়ে সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাভূতঃ।
জানিনাঞ্চাভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহা ॥” (ভাঃ ১০।৯।২১)
[যশোদা-পুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহী-
দিগের পক্ষে যেরূপ স্থলভ, আভূত জ্ঞানীদিগের
পক্ষে সেরূপ নন।] শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত
অত্যভূত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত লাভ করিয়া
ভট্টের পূর্ব অভিমান অর্থাৎ ‘নারায়ণই যে স্বয়ং
ভগবান্’ এইরূপ জ্ঞান বিদূরিত হইল। এই প্রসঙ্গে
যুগপৎ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভক্তনোৎকর্ষ ও উপাস্ত-
নিষ্ঠাও সংস্থাপিত হইল। এই ব্যোমট ভট্টেরই
অন্যতম ভ্রাতা শ্রীরাধাভূজ সম্প্রদায়গাধ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোত্তম,
শ্রীনবদীপ শতকম্ আদি শ্রীগৌর-গুণজ্ঞাপক গ্রন্থাবলীর
প্রণেতা এবং শ্রীভট্টের পুত্রই ষড়্গোষ্ঠামীর অন্যতম
শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুবর, যিনি শ্রীধাম-
বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের সেবা প্রকাশক।
প্রভু ভট্টের গৃহে চাতুর্মাশকাল অবস্থানের পর

ভট্টগোষ্ঠীর হৃদয়ে অত্যন্ত বিরহভাব জাগ্রত করাইয়া আরও দক্ষিণে প্রস্থান করিলেন। ঋষভ পর্বত ও শ্রীশৈল আদি দর্শনান্তে প্রভু কামকেজীপুরীতে আসিলেন ও কৃতমালায় স্নান করিলেন। দক্ষিণ মাজরায় এক বিরক্ত রামভক্ত ব্রাহ্মণের আস্থানে প্রভু তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিলেন। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হইল। রন্ধনের কোন আয়োজন নাই। ব্রাহ্মণের শ্রীরামের প্রতি আবেশ লক্ষ্য করিয়া প্রভু যদিও সূখী হইলেন, তথাপি লোকাচারে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, আমি না তোমার বাড়ীতে অতিথি! এগনও পাক-কাঁধ্য করিতেছ না, অতিথি-সৎকার হইবে কিরূপে? ব্রাহ্মণ ভাবাবেশে বলিলেন, — “প্রভু! মোর অরণ্যে বসতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে লম্প্রতি ॥ বহুশাক-ফলমূল আনিবে লক্ষণ। তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন ॥” (চৈঃ চঃ ম ৯।১৮৩-৪) এইরূপ ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ রন্ধনও করিলেন। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর, প্রভুর ভিক্ষা নির্বাহ হইল। ব্রাহ্মণ কিছু উপবাসী থাকিলেন। শুভ উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণটী বলিলেন, “মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন। অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী। রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে, — ইহা কানে শুনি! এ শরীর ধরিবারে কছু না যুয়ায়। এই ছুখে জলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৮৮-৯০)

শ্রীমদমহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া সংসিদ্ধান্ত বর্ণন করিলেন। যথা—

“প্রভু কহে, এভাবনা না করিহ আর।

পণ্ডিত হঞা মনে না কর বিচার ॥

ঈশ্বর-প্রেমসী সীতা—চিদানন্দমূর্তি।

প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥

স্পর্শিবার কাঁধ্য আছুক, না পায় দর্শন।

সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্বান কৈল।

রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল ॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।

বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।

পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥”

—চৈঃ চঃ ম ৯।১৯১-১৯৬

মহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্ত-বাক্য শ্রবণে বিপ্র আশ্বস্ত হইয়া ভোজনাদি করিলেন, তখন তাঁহার জীবনের আশা হইল। মহাপ্রভু অতঃপর দুর্ভিক্ষনে বা দর্ভ-শয়নে শ্রীরামচন্দ্র ও মহেন্দ্রশৈল শ্রীপরশুরাম দর্শন করিয়া সেতুবন্ধে আসিলেন। তথায় ধনুছোটী তীর্থে স্নান করিয়া শ্রীরামেশ্বর দর্শন করিলেন। এখানে বিপ্রসভায় কৃষ্ণপুরাণ-শ্রবণকালে মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় দৈবক্রমে পতিব্রতা-প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সংক্ষিপ্তসার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

“পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।

জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী ॥

রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।

রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥

‘মায়াসীতা’ রাবণ নিল, শুনিলা আখ্যানে।

শুনি’ মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥

সীতা লঞা রাখিলেন পার্বতীর স্থানে।

‘মায়া সীতা’ দিয়া অগ্নি বঞ্চিল রাবণে ॥

রঘুনাথ আসি’ যবে রাবণে মারিল।

অগ্নি পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥

তবে মায়াসীতা অগ্ন্যে কৈল অন্তর্দ্বান।

সত্যসীতা ‘আনি’ দিল রাম-বিজ্ঞান ॥”

—চৈঃ চঃ ম ৯।২০২-২০৭

এইসকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং পাঠক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সেই কৃষ্ণপুরাণ পুঁথির পুরাতন পত্রখানি চাহিয়া লইলেন। একখানি নূতন পত্র লেখাইয়া তথায় সন্নিবেশিত করাইলেন। ঐ পুরাতন পত্রখানি লইয়া মহাপ্রভু পুনরায় দক্ষিণ মাজরায় আসিলেন এবং সেই রামভক্ত বিপ্রকে তাহা দেখাইলেন। বিপ্রের

আর আদলের সীমা রহিল না। বিপ্রবর মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্রজ্ঞানে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন।

প্রথমতঃ জগন্মাতা রামবক্ষোবিলাসিনী শ্রীসীতাদেবীকে দৃষ্টে রাবণ স্পর্শ করিল, তজ্জনিত ক্রোধের বা ক্রোধের প্রয়োজন আছে, আবার শ্রীসীতাদেবী প্রপঞ্চাভীত বৈকুণ্ঠবস্ত্র, ভগবানের স্বরূপশক্তি, তাঁহাকে কখনও প্রাপঞ্চিক জন স্পর্শ করা তো দূরের কথা, দর্শনও করিতে পারে না, এই বোধেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। উভয়টাই এক-তাৎপর্য্যাপর। উভয়টাই হইতেই ইষ্টবস্তুর সাধকের শুদ্ধ ও প্রগাঢ় প্রেমাবেশ লাভ হয়, ইহাকেই ইষ্টে স্বারসিকী মতি বলে। সাধকের সংসার-বন্ধন তখনই চিরতরে ছুটি হয়। কাজেই সিদ্ধান্ততঃ মুঢ়মতি রাবণ ‘সীতাহরণ করিলাম’ বলিয়া যে অভিমান করিয়াছে, তাহা মায়ামৃগ স্বীকারের ত্রায় সর্ব্বৈব মিথ্যা ও প্রাপঞ্চিক ধারণা মাত্র। তাহার অবশেষে প্রাপঞ্চিক জন মোহিত হন, শ্রেয়ঃসাধক কোতুলাক্রান্ত হইয়া সত্যাত্মসন্ধানের প্রযত্ন করেন এবং মুক্তপুরুষগণ অনন্ত রহস্যযুক্ত শ্রীভগবন্তীলারস প্রেম-

ভরে আত্মদান করেন। ধল-প্রকৃতি রাবণ যে মায়া-সীতা হরণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কুর্শ্মপূরণ ও বৃহন্নারদীয়পূরণ হইতেও এইরূপ পাওয়া যায়।

“সীতায়ারাবিতো বহ্নিছায়া-সীতামজীজনৎ।

তাং জহাং দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপূরং গতঃ ॥

পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিঃ ছায়াসীতা বিবেশ সা।

বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপূরস্তাদনীনয়ৎ ॥”

[সীতা কর্তৃক প্রাপ্তি হইয়া অগ্নি ‘ছায়াসীতা’ প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল; মূল সীতা ‘বহ্নিপূরে’ রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূল সীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলেন।]

ভক্তবৎসল দয়াময় শ্রীগৌরহরি এই সকল সিদ্ধান্ত-কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের মনোবাখ্য চিরতরে বিদূরণ করতঃ ব্রাহ্মণকে নির্ম্মল প্রেম প্রদানান্তর বিভিন্ন তীর্থ দর্শন ও স্পর্শন করিতে করিতে শ্রীপুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

**অক্ষজবিচারে বৈষ্ণবের বিবম-ব্যবহার
দর্শনে নিন্দা অমার্জ্জনীয় অপরাধ :-**

অধিকারি-বৈষ্ণবের না বৃন্নি ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা’র নাহিক নিন্তার ॥
অধমজনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণ রূপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে’ ॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার ॥
অজ্ঞ হই’ লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাধনানে শুনিবেক মহান্ত-বচন ॥
তবে কৃষ্ণ তা’রে দেন হেন-দিব্যমতি।
সর্ব্বত্র নিন্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৭-৩৯২)

**শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু বৈষ্ণব অপরাধী ব্যতীত
সকলকেই উদ্ধার করিবেন :-**

কাহারে না করে নিন্দা, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে।
অজ্ঞ চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥
সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক ছরাচার ॥
শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ — তথাপিহ শীঘ্র মরে ॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই’।
সে জনের অধঃপাত — সর্ব্বশাস্ত্রে কই ॥
সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥
পদ্মপূর্ণাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয়, ইহা করিলে পালন ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৮৭-৩৯২)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের উদ্যোগে শ্রীপুরুষোত্তমধামে কার্তিকব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্ভানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ ও ভারতবাপী তৎশাখা-মঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিদিয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকরে এই বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমধামে আগামী ১৭ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর সোমবার শ্রীএকাদশী তিথি হইতে ১৬ কার্তিক, ২ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউথানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত কার্তিকব্রত, উর্জ্জব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। যাহারা চারিমাসকাল চাতুর্মাশ্র যাজনে অদমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে দামোদরব্রত বা উর্জ্জব্রত অনুকল্পবিধি অনুযায়ী অবশ্য পালনীয়। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে তীর্থে কার্তিকব্রত পালনের প্রচুর মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। কার্তিক ব্রতান্তে ২০ কার্তিক, ৬ নভেম্বর শনিবার শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমধামেই অবস্থান করা হইবে।

৭ই কার্তিক, ২৪ অক্টোবর রবিবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকুট এবং ১৬ কার্তিক, ২ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউথানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমন্তুক্তিদিয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব ও পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা সম্পন্ন হইবে।

তজ্জন্য ভগবন্তুক্তিপিপাসু সজ্জনগণকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্মাদি হইতে অন্ততঃ কিস্কিদিয়িক একমাসের জন্ত সময় লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আশ্রুগতো সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, শ্রীধামবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবনরূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্তাঙ্গ অনুশীলনমুখে তীর্থমুকুটমণি শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীদামোদর-ব্রত পালনের এই সৌভাগ্য বরণ করেন।

কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইতে ইচ্ছুক যাত্রিগণ আগামী ১৬ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর রবিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস ১৭ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর সোমবার পূর্ব্বাহ্নে পুরী পৌঁছিবেন। উক্ত দিবস হইতেই শ্রীপুরুষোত্তমধামে ব্রত আরম্ভ হইয়া ১৬ কার্তিক, ২ নভেম্বর মঙ্গলবার সমাপ্ত হইবে। নিয়মসেবাকালে নগর-সংকীর্তন-মুখে শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা, তদ্রূপ বিভিন্ন মন্দির ও শ্রীমন্ন্যমহাপ্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন এবং নিয়মসেবাকালীন ভক্তাঙ্গসমূহ পালন করা হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্রীভুবনেশ্বর ও সাক্ষীগোপালাদি দর্শনেরও ব্যবস্থা করা হইবে। ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা থাকিবে। আগামী ২১ কার্তিক, ৭ নভেম্বর রবিবার পুরী হইতে প্রত্যাবর্তনের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নির্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাদীনে শ্রীপুরুষোত্তমধামে মাসাধিকবাণী ব্রত পালনের ও অবস্থানের জন্য রেলভাড়া ও বাসভাড়া ব্যতিরিক্ত দুইবেলা ভগবৎপ্রসাদ সেবন ও প্রাথমিক চিকিৎসাদির ব্যয় বাবদ প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ২৫০.০০ আড়াই শত টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাহারা সাধুগণের সহিত কলিকাতা হইতে শ্রীপুরীধামে যাইবেন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাঁহাদিগকে রেলভাড়া বাসভাড়াদি বাবদ প্রত্যেকে ৬০ + ১০ = ৭০ টাকা পৃথক্ দিতে হইবে। রেলওয়ে পাশ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেলভাড়া বাদ যাইবে। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতেই নিজেদের নাম ঠিকানাসহ খরচের নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অথবা যাত্রার একমাস পূর্বে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ জানান' হইতেছে। প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি লইবেন। ছোট থাল, বাটী, গ্লাস, ঘটি, টর্চ আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬; ফোন ৪৬-৫৯০০—ঠিকানায় সাক্ষাদভাবে কিংবা পত্রের দ্বারা সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য। সন ১৩৮৩, ১৪ ভাদ্র; ইং ১৯৭৬, ৩১ আগষ্ট।

নিবেদক—

শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মঠের শুভানুষ্ঠায়গণকে বিশেষ আনন্দের সহিত এতদ্বারা জানান' যাইতেছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমধামে বিশ্ববাণী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠাদির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানটি পাকাগৃহাদি-সহ গত ২৮ আষাঢ়, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ইং ১৩ জুলাই, ১৯৭৩ শুক্রবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নামে দলিলাদি যথারীতি রেজেষ্ট্রী হইয়া সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি সংরক্ষণার্থে তথায় সুউচ্চ শ্রীমন্দির ও বিরাট প্রতিষ্ঠান-সংস্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে।

দৈবানুরোধে ব্রতকালীন অনুষ্ঠানসূচি পরিবর্তনযোগ্য। কোনও আকস্মিক ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীর মঠের উদ্যোগে দক্ষিণ ভারত তীর্থ পরিক্রমা

সাধুসঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শন ও পরিক্রমার
বিপুল আয়োজন

অখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গোড়ীর মঠের অধ্যক্ষ এবং আচার্য্য পরিত্রাজক ত্রিদণ্ডিযশি ও ১০৮-শ্রী
শ্রীমন্তলিঙ্গদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের রূপানির্দেশে আগামী শ্রীউজ্জ্বত, শ্রীদামোদরব্রত বা নিয়ম-
সেবাকালে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনকারী তথা শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিস্তারকারী ভক্তগণসঙ্গে শ্রীগোরাধমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত
দক্ষিণভারতের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন, পরিক্রমা ও তাঁহাদের মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ-কীৰ্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইবে।

“গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে।”

একমাত্র অনন্তভক্তিধারাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের লাভ্য হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই উদ্ধবকে
বলিয়াছেন—‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়ায়া প্রিয়ঃ সত্যম্।’—(শ্রীমদ্ভাগবত)। ঐতিহাসিক বলেন—‘ভক্তিরেবৈনং
নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।’ ভক্তিই শ্রীভগবানের নিকট লইয়া
যান, ভক্তিই ভগবান্কে দেখান, পরমপুরুষ ভক্তিবশ, সূত্রবাং ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবের পরম মুগ্ধা
পুরুষার্থ শিরোমণি শ্রীভগবৎপ্রেম লাভের জন্য শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র সাধন বলিয়া শাস্ত্রাদিতে নির্ণীত হইয়াছে।
ভক্তি-সাধনের আনুষ্ঠানিক ফলরূপে ত্রিতাপ উন্মূলিত হয়। তত্ত্বশাস্ত্রে ভক্তিসাধনের অঙ্গ সহস্রপ্রকার বর্ণিত
আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধা ভক্তির কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। কলিযুগপারমাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
সমস্ত সাধনাদ্বয়ের মধ্যে পাঁচটি মুখ্য সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,—সাধুসঙ্গ, নামকীৰ্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ,
মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবন। মথুরাবাস অর্থে শ্রীভগবৎ তীর্থাদিতে বা লীলাভূমিতে বাস—অন্ততম
মুখ্যসাধন। হরিক্ষেত্রে গমনাগমন সাধনাদ্বয়ভেদে শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দিষ্ট আছে। শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্তির
অঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দেহ গেহ কলত্র পুত্র বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন বা ভ্রমণ করিলে যেমন
তত্তদ্বিষয়ে আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভাক্তকে কেন্দ্র করিয়া তত্তদ্ব্যপেক্ষে যত্ন
করিলে বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমশঃ শুদ্ধপ্রেম লাভের অধিকারী
হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা
যেন অন্ততঃ নিয়মসেবাকালে বা শ্রীদামোদরব্রতকালে গৃহকর্মাদি হইতে অবসর লইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের
অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধসাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীৰ্ত্তন,
স্মরণাদি নববিধাভক্তির অনুশীলন করতঃ নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতি বিধানের এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ
করেন।

সুভযাত্রা:—আগামী ২০ আশ্বিন, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ; ৭ অক্টোবর, ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন
হইতে রাত্রি ৮টা ১৫ মিঃ এ পূর্বী এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করা হইবে। পূর্বীতে দর্শনীয় স্থানসমূহ এবং

সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে ও কার্তিক, ২০ অক্টোবর বুধবার রিজার্ভ টুরিষ্ট কোচে পুরী হইতে দক্ষিণ ভারতের অগ্রান্ত স্থান দর্শনের জন্ত যাত্রার দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। ২৪ কার্তিক, ১০ নভেম্বর বুধবার হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্তনের আশা করা যায়। মাসাধিকব্যাপী পরিক্রমাকালে ছুই বেল। শ্রীভগবৎ প্রসাদ সেবন (আহার), দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রাসাত, রেলভাড়া, বাসভাড়া এবং প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্ত প্রত্যেক যাত্রীর ব্যয় বাবদ ৯০০ নয়শত টাকা ধার্য হইয়াছে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :— (১) **পুরী**— শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীমম্বহাপ্রভুর পাদধৌতি স্থান, শ্রীমম্বহাপ্রভুর পদচিহ্ন-মন্দির, শ্রীবলদেব, শ্রীমুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ, ষড়্ভুজ গৌরঙ্গ, শ্রীভূষণী কাক, শ্রীবিমলাদেবীর মন্দির, শ্রীসরস্বতী মন্দির, শ্রীলক্ষ্মীমন্দির, আনন্দবাজার, শ্রীজগন্নাথের স্নানবেদী, শ্রীসার্কভৌম ভট্টাচার্যের গৃহ, খেতগঙ্গা, কাশীমিশ্রের ভবন বা গম্ভীরী, শ্রীরাধাকান্তজী, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী, সিদ্ধ বকুল, সমুদ্র, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি, স্বর্গদ্বার, ভক্তিকুঠী, চটক পর্বত, শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, টোটাগোপীনাথ, শ্রীযমেশ্বর শিব, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব পাঠ, কপালমোচন, মার্কণ্ডেশ্বরের ও লোকনাথ শিব, শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদের কূপ, শ্রীজগন্নাথ বসন্ত উদ্ভান, নরেন্দ্র সরোবর, আঠারনালা— শ্রীমম্বহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির, শ্রীশুণ্ডিচা মন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীইন্দ্রদ্রুম সরোবর, শ্রীনীলকণ্ঠ শিব, শ্রীচক্রতীর্থ এবং পুরীর অগ্রান্ত দর্শনীয় স্থান, সাক্ষীগোপাল, শ্রীভুবনেশ্বর আদি দর্শন। (২) **ওয়ারানটিয়ার**— সিংহাচলম্, পর্বতোপরি শ্রীজয়দৃষ্টিংহ মন্দির, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠমন্দির। (৩) **কভুর**— শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ মিলনস্থান, গোম্পদতীর্থ, গোদাবরী স্নান, (৪) **বিজয়ওয়াডা** মঙ্গলগিরি, পর্বতোপরি শ্রীপানানৃসিংহ মন্দির, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির, (৫) **মাদ্রাজ**— পার্শ্বসারথি মন্দির, শ্রীগোড়ীয় মঠ আদি, (৬) **চিন্নলপেট**—পক্ষীতীর্থ, (৭) **চিদাম্বরম**— শ্রীনটরাজ আদি, ময়ূরম্, (৮) **কুন্তল কোণম্**— শ্রীশার্দপানি, কুন্তেশ্বর আদি, (৯) **ভাজোর**, (১০) **ত্রিচিনাপল্লী**— শ্রীরঙ্গনাথজী, কাবেরী স্নান, (১১) **রামেশ্বরম্**, (১২) **মাদুরা**— শ্রীমীনাক্ষী দেবী, (১৩) **শ্রীত্রিবাল্লম্**— শ্রীঅনন্তপদ্মনাভ, শ্রীকঙ্কাকুমারী, (১৪) **কাঞ্চীপুরম্**— শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী, শ্রীশিবকাঞ্চী, (১৫) **তিরুপতি ইষ্ট**— শ্রীব্যোমকেশ্বর, কালহস্তী আদি, (১৬) **রেনগুণ্টা**।

রিজার্ভ টুরিষ্ট কোচে (বগীতে) নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন থাকিবে। এইজন্ত পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রীগণকে এখন হইতে নির্দ্ধারিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ অগ্রিম জমা দিয়া নাম রেজিস্ট্রী করতঃ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে রসিদ লইতে অগ্ররোধ করা যাইতেছে। যাত্রার এক সপ্তাহ পূর্বে সমস্ত টাকা জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক যাত্রী নিজের শয়নোপযোগী বিছানা লইবেন। কিছু শীতবস্ত্র ও গরমের উপযোগী বস্তাদিও সঙ্গে রাখিবেন। নিজের জন্ত ছোট থালা, বাসী, ঘটা, গ্লাস, ছোট বালতি ও টর্চাদি রাখিলে ভাল হয়। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী সম্পাদক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৫৯০০ ঠিকানায় পত্রদ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য। সন ১৩৮৩, ১৪ ভাদ্র; ইং ১৯৭৬, ৩১ আগষ্ট।

নিবেদক —

শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

দৈবাভ্রুরোধে অহুষ্ঠানস্থলী পরিবর্তনযোগ্য। কোন আকস্মিক ঘটনার জন্ত মঠকর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

WHILE PURCHASING

YOUR CLOTHS

INSIST ON

A
S
A
R
W
A

F
A
B
R
I
C
S

THE ASARWA MILLS LIMITED

9, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA-700001

PHONE :— 22-3417/18/19

GRAM :— MILLASARWA

TELEX :— CA-2808

MILLS AT :— A S A R W A,
AHMEDABAD-380016

DISTRIBUTORS :—

M/s. NATHMAL KEDIA & SONS—CALCUTTA.

M/s. KALURAM MAHAVIRPRASAD—DELHI.

M/s. SHARMA & COMPANY—BOMBAY.

শ্রীচৈতন্য-বর্ণা

“চেতোদর্পণমার্জনং শুব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিভরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাসুখিবর্দ্ধনং শ্রুতিপদং পূর্ণায়তাস্বাদনং
সর্বাস্বাপ্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮৩।

২৪ পদ্যনাভ, ৪৯০ শ্রীগোরাধ; ১৫ আশ্বিন, শনিবার; ২ অক্টোবর, ১৯৭৬।

{ ৮ম সংখ্যা

সত্তজন-অকাম

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যে কালে জীব নিজের স্বরূপ বুদ্ধিতে অসমর্থ থাকেন, তখনই তিনি অভাবের বশবর্তী হইয়া নানা-প্রকার কামনা করেন। ধর্ম্যাধর্ম্য শূন্য হইয়া যে কামনা তাহার নাম যথেষ্টাচার, পুণ্যময় কামনাকে সংকর্ম্ম এবং কামনাত্যাগকে মোক্ষকাম বলে। কামনা-যুক্ত জীব ত্রিবর্গের জন্ত অনুসন্ধান করেন এবং কামনা-যুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের যত্ন করেন। ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্থ বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ যুগ্য কামের দাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্তমান থাকায় তাঁহারা সজ্জন বা অকাম হইতে পারেন না। সজ্জনই একমাত্র অকাম। সজ্জন এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণ ও আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকেশ্বর। চতুর্দশ ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, লোভে লুপ্ত হইয়া সজ্জন কামনাবিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণই সজ্জনের একমাত্র কাম্য বস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণকামে তাঁহার সকল

কামনা পর্যাবসিত। নিজেদ্বিগুণ-প্রীতিকাম সজ্জনের আদৌ থাকিতে পারে না। সজ্জনের সকল ইন্দ্রিয় সর্বদা কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত; সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তু কামনার তাঁহার অবকাশ নাই।

“ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশাস্ত।

কৃষ্ণভক্ত নিকাম অতএব শাস্ত ॥”

মিছাভক্ত বৈষ্ণবপরিচর্যাকাজ্ঞা করিলেও তিনি কামদাস। মিছাভক্ত কর্ম্মজ্ঞানাবৃত হইয়া যথেষ্টাচারের উদ্দেশে কামনা-হীন হইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া-ভক্ত, বাস্তাবী, ভেকধারী ও অবৈষ্ণব-মিছাভক্ত সকলেই কামনাময়। সজ্জনেরও কামনা থাকে বলিয়া মিছাভক্ত বিশ্বাস করে কিন্তু মিছাভক্ত ও বৈষ্ণব একজাতীয় নহে। দেবপিতৃকামী, জড়সেবারতদয়ার্দ্রহৃদয়, বৈষ্ণব-বিদেহী, পুণ্যসঞ্চরী, শৌক্যজাত্যভিমানী মিছাভক্ত অকাম নহেন। ভক্তসহ অভক্তের সাম্যপ্রয়াসী অসং-কামী নিকাম ভক্তের স্বরূপ বুদ্ধিতে পারে না।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বানী

(ইষ্টগোষ্ঠী)

প্রঃ — ইষ্টগোষ্ঠী-সভা কাহাকে বলে ?

উঃ — “শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। ‘ইষ্ট’-শব্দে — অভিলষিত বিষয় এবং ‘গোষ্ঠী’-শব্দে — সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তিপরায়ণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়।”

— ‘শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১২

প্রঃ — ভাগবতগণের ইষ্টগোষ্ঠী কয় প্রকার ?

উঃ — “ইষ্টগোষ্ঠী দুইপ্রকার — আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা (ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ) শ্রীভাগবতাদির পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনামকীর্তনে রত। প্রচার-সময়ে ভগবন্ত, জীব, রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারি-ভেদে প্রদান করেন।”

— ‘শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১২

প্রঃ — কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কাহাকে বলে ?

উঃ — “দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী বলে।”

— ‘শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ — সাধারণের সহিত আলাপ ও ইষ্টগোষ্ঠীতে

পার্থক্য কি ?

উঃ — “সাধারণের সঙ্গে রসলাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না।”

— ‘শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ — শুদ্ধভক্ত-সম্মেলন অতি দুর্লভ কেন ?

উঃ — “শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে দুইচারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না।”

— ‘শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ — শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন স্তর কি কি ?

উঃ — “যে-স্থলে সর্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণব-দিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন, সে-স্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জন-ভজন।”

— ‘শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১১



হরিরেব গুরুঃ গুরুরেব হরিঃ

[পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্টিময়্যুখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ — শ্রীগুরুদেব কি সাক্ষাৎ ভগবান্ ?

উঃ — নিশ্চয়ই। গুরু অনীশ্বর বা জীব নহেন। তিনি জীবের প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর। গুরু লঘু নহেন, লঘুও গুরু নহে। নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান্‌ই গুরুরূপে বিশেষ প্রকটিত হন।

শাস্ত্র বলেন—

“গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা করেন ভক্তগণে॥

কৃষ্ণ যদি রূপা করেন, কোন ভাগ্যবানে।

গুরু-অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥

শিক্ষা-গুরুকে ভ’জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥” (চৈঃ চঃ)

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ বলেন—

“নারায়ণশ্চ ভগবান্ গুরুঃ প্রত্যক্ ঈশ্বরঃ।

সর্বতীর্থপ্রদৈব সর্বদেবপ্রিয়ো গুরুঃ।

সর্বদেবস্বরূপশ্চ গুরুরূপী হরিঃ স্বয়ম্॥”

গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। গুরু সমস্ত তীর্থেরও আশ্রয়-স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত তীর্থ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে বিরাজিত। গুরু দেবতাগণেরও আশ্রয়। গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীহরিরই সকলের একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১৫।২৬) বলেন —

“যশ্চ সাক্ষাৎভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।

মর্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তত্ত্ব সর্বং কুঞ্জরশোচযৎ ॥”

ভগবজ্জ্ঞান-প্রদাতা সাক্ষাৎভগবান্ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে তাহার নামকীৰ্ত্তন, মন্ত্রজপ, হরিকথা-শ্রবণ, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি সবই হস্তিষ্মানের ছায় বার্থ হয়।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন— “কিঞ্চ সত্যং ভূয়স্তামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিষে সর্বমেব বাথং ভবতি। সাক্ষাৎভগবতি—ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কাৰ্য্য। যদ্বা উপাশ্রে ভগবতোব সাক্ষাৎ বিद्यমানো মর্ত্যাসন্ধীঃ মর্ত্য ইতি দুৰ্ভূদ্ধিস্তত্ত্ব শ্রুতং ভগবদ্ভাষাদিকং শ্রবণমননাদিকঞ্চ ব্যর্থমিতার্থঃ।”

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। আমার নিত্য উপাশ্রয় ভগবান্ গুরুরূপে কৃপাপূর্বক আমার সম্মুখে বিद्यমান। এই প্রত্যক্ষ ভগবান্—সাক্ষাৎ বিद्यমান ভগবান্ গুরুকে ভগবদংশ-বুদ্ধি করাও উচিত নয়। আর সেই ঈশ্বর-বস্তু গুরুতে যদি মনুষ্যবুদ্ধিরূপ দুৰ্ভূদ্ধি আসে, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা কোথায়?

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন — “সাক্ষাৎ ভগবান্কে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও তদ্রূপ বিচার করবে, কোন অংশে কম মনে করবে না। সাধু-সকল—পণ্ডিত-সকল — বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সকলের কর্তব্য হচ্ছে—ভগবানের ছায় গুরুকে জানা—পূজা করা — সেবা করা। যদি তা’ না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ’তে ভ্রষ্ট হ’য়ে যাবেন।

মহান্ত-গুরুদেবকে ভগবান্ হ’তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জানলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ’বে না। তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝতে পারবেন, ঈশ্বর গুরু ও ভগবানে অভিন্ন-বুদ্ধি আছে।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্ত

গুরুরূপে অবতীর্ণ হ’য়েছেন। কপাল ভাল হ’লেই লোক শাস্ত্রের এই নিখুঁত সত্যকথাটা বুঝতে পারে। নতুবা সন্দ্বিগ্নচিত্ত হ’য়ে সংসার সমুদ্রেই ডুবে মরে।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ সুদামা বিপক্ষে বলিয়াছেন—

“জ্ঞানদাতা গুরুরূপে—আমি ভগবান্।’

উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি’।

গুরু উপদেশে লোক যায় ভব তরি’ ॥

গুরুকে সাক্ষাৎ হেন ঈশ্বর করি’ মানে।

সেই সে আমার প্রিয়, সর্বতত্ত্ব জানে ॥

গুরুরূপে জ্ঞানদাতা প্রভু ভগবান্।

চিন্তে না করিহ গুরু মানুষ্য-গেয়ান ॥

গুরুতে যাবৎ যার থাকে নরবুদ্ধি।

তাৎ ন হয় তার কোন কর্ম্মসিদ্ধি ॥

যেই গুরু সেই হরি দেখিব সমান।

গুরুভক্তি করিয়া ভজিব মতিমান ॥”

(শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী)

শিষ্য-মাত্রেয়ই শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানা কর্তব্য। নতুবা ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা নাই। শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্বুদ্ধি ও প্রিয়-বুদ্ধিই সমস্ত মঙ্গলের মূল। যিনি গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়া প্রীতির সহিত তাঁহার সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য বা বৈষ্ণব, তিনিই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ।

শাস্ত্র বলেন—

“বৈষ্ণবং জ্ঞানবস্তারং যো বিদ্যাদ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।

পূজয়েদ্ বাঙ্ মনঃ কাঠৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥”

(নারদ-পঞ্চরাত্র)

গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ সত্য কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের ছায় বিষয়-জাতীয় ভগবান্, বিষয়-জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, বিষয়-বিগ্রহ, ভোক্তা-ভগবান্ বা Predominating Absolute নহেন। গুরু হ’লেন আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্, আশ্রয়-জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, পরিকর-বৈশিষ্ট্যরূপী-ভগবান্ বা আশ্রয়-বিগ্রহ অর্থাৎ সেবকভগবান্, আরাধক-ভগবান্ বা Predominated Absolute.

মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন — ‘শ্রীগুরুদেব

ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-প্রিয়তম। আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অধিক প্রয়োজনীয়তা। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণব-গণের মধ্যে প্রেষ্ঠ।

আমাদের নিত্য সেবা শ্রীগুরুদেব যুগপৎ ভগবদ্-বিগ্রহ ও ভক্তিবিগ্রহ। গুরু কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ইহাই গুরুর সহিত কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। এইজন্ত গুরুতে ভগবদ্-বুদ্ধি, ঈশ্বর-বুদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-বুদ্ধি না হইলে হরিভজন অসম্ভব।

শাস্ত্র বলেন—

‘যতপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥’

(চৈঃ চঃ)

শ্রীগুরুদেব ভগবান্ শ্রীগৌরান্দেবের প্রিয়জন ও অন্তরঙ্গ সেবক হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্‌ই গুরু—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

গুরু মূল-আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়-বিগ্রহ নহেন পরন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ। মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার নিজজন। তিনি যুগপৎ গৌরপার্শ্ব ও কৃষ্ণপার্শ্ব — নিত্যসিদ্ধ মহাজন।

গুরু কৃষ্ণের তায় রাসবিহারী বা গোপীনাথ নহেন। শ্রীগুরুদেব মধুরসে ব্রজের মঞ্জরী গোপী বা নিত্য-সিদ্ধ ব্রজবাসী। কৃষ্ণ শক্তিমান্ কিন্তু গুরু কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, অন্তরঙ্গশক্তি, স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি।

শাস্ত্র বলেন—

‘গুরু পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।

হই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরিমাণ ॥’

ভগবান্‌কে লইয়াই যেমন গুরুর গুরুত্ব বা ভক্তের ভক্তত্ব, গুরু বা ভক্তকে লইয়াই তজ্জপ ভগবানের ভগবত্তা। রাজ্যহীন রাজা, আলৌহীন হৃদ্য এবং পূর্ণিমাহীন পূর্ণচন্দ্র যেরূপ অসম্ভব, পরিকর বা ভক্তকে বাদ দিয়াও তজ্জপ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা ভগবানের ভগবত্তা অস্বীকৃত। হৃদ্যহীন আলো এবং আলৌহীন হৃদ্য যেমন হইতে পারে না, ভগবান্‌হীন ভক্ত এবং ভক্তহীন ভগবান্‌ও তজ্জপ অসম্ভব। এইজন্ত গুরু ও কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন—ভগবান্‌ই গুরু এবং গুরুই ভগবান্‌। তাই

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্শ্বদ জগদগুরু শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু স্বরূত গ্রন্থে জানাইয়াছেন— ‘হরিরেব গুরুঃ গুরুরেব হরিঃ।’

স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী-ভগবান্ এবং শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি ঈশ্বরগণ যেমন তাঁহার অংশ, মধুরসাঁচাৰ্য্য-শিরোমণি স্বয়ংরূপা পরমেশ্বরী শ্রীবৃষভানুন্দিনীও তজ্জপ গোড়ীয়-বৈষ্ণব আমাদের মূলগুরু এবং অত্যাগত গোড়ীয়-গুরুবর্গ সকলেই তাঁহার অংশ, নিজজন বা অভিন্নবিগ্রহ।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন— ‘শ্রীগুরুদেব স্বয়ংরূপ ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশবিগ্রহ। ভগবান্ যখন উপদেশকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্য-মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন তখন তিনি আচার্য্য-নামে অভিহিত হন। সুতরাং কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্ত আশ্রয় জাতীয় ভগবদ্-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। নতুবা মঙ্গল সূদূরপরাহত। গুরু ভগবান্ বলিয়াই গুরুকে ‘ভগবৎ-পাদ’, ‘বিষ্ণুপাদ’ বলা হয়।

কৃষ্ণতত্ত্বভেদা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব লঘু শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ বা ‘হরি-স্বরূপ’ বলিয়া ও ‘বিষ্ণুপাদ’, ‘প্রভুপাদ’ বলিয়া অভিহিত হন।’

প্রঃ— ভগবান্ কৃষ্ণই কি নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্ত গুরুরূপে অবতীর্ণ?

উঃ— নিশ্চয়ই। জগদগুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন— ‘সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁর গা চুলকুচ্ছেন; ভগবানের হাত তাঁর দেহই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা করছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্ত গুরুরূপে অবতীর্ণ হ’য়েছেন। আমাদের শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ’তে অভিন্ন—ভগবানের সতি একদেহ—সেবা-ভগবান্ আর সেবক-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্ আর আশ্রয়-ভগবান্। মুকুন্দ — সেবা-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার শ্রীগুরুদেবের তুল্য ভগবানের প্রিয় আর কেহই নাই। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

চণকের (ছোলার) বিদলের ছায় বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা; এতদ্বয়ের বিলাসবৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণপ্রীতি—কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ব্রহ্মবস্ত, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্ত। আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু; আর যিনি অমূল্য বৃহত্তর সেবা করেন, সেই সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়-জাতীয় ভগবদ্-বিচার করতে হ'বে, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে।”

জগদগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

‘সাক্ষাৎকরিছেন সমস্তশাস্ত্রকল-

স্তথা ভাব্যত এবং সত্ত্বিঃ।

কিন্তু প্রভো ধঃ শ্রিয় এবং তত্ত্ব

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥’

সমস্ত শাস্ত্র বাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, ভক্তগণও বাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই চিন্তা করেন, কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, আমি সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪।৩৫২) বলেন—

‘গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥’

শ্রীসনাতন টীকা — সংপূজয়েৎ গুরুমেব।

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই শিব, গুরুই পরং ব্রহ্ম; সুতরাং গুরুদেবকে সমাগরূপে পূজা করিবে।

বামন-কল্পে ব্রহ্মণো বাক্যম্ (হঃ ভঃ বিঃ ৪।৩৫৩ শ্লোক) —

‘যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।

গুরুর্গুণ ভবেত্তুষ্টিত্ব তুষ্টি হরিঃ স্বয়ম্॥’

মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু এবং গুরু সাক্ষাৎ হরিই। গুরু বাহার প্রতি প্রসন্ন হন, স্বয়ং হরি তাহার প্রতিই প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪।৩৫৪) শ্রীবিষ্ণুবহ্নে —

‘তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুম্।

অভেদেনার্চয়েদ্ যন্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ॥’

যিনি যত্নে গুরুকে হরি সহ অভেদ জানিয়া পূজা করেন, তিনি মুক্তি ও ভক্তি সবই লাভ করেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪।৩৬০) শ্লোকে বলেন—

‘হরৌ রুপে গুরুস্তাতা গুরৌ রুপে ন কশ্চন।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥’

হরি রুপ হইলে গুরু রক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু গুরু রুপ হইলে কি ভগবান্, কি বৈষ্ণব, কি দেবতা কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব প্রাণপণে গুরুকে প্রসন্ন করিবার জন্ত যত্ন করিবে।

শ্রীসনাতন টীকা — সর্বপ্রযত্নেন—আত্মনঃ সর্ব-যত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ।

হঃ ভঃ বিঃ (৪।৩৬২) শ্লোকে আদিতাপুরাণে —

‘অবিভো বা সবিভো বা গুরুরেব জনার্দনঃ।

মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥’

‘শ্রীগুরুদেব বাহুদৃষ্টিতে জাগতিক বিদ্বান্ হউন বা না হউন, গুরুকে সাক্ষাৎ হরি ও একমাত্র গতি বলিয়াই জানিবে।’

শ্রীসনাতন টীকা—মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন কথঞ্চিদপি গুরু ন ত্যজ্য ইতি লিখিতং; কিন্তু মোহাদবৈষম্যো গুরুঃ কৃতশ্চেৎ তর্হি সঃ পরিত্যজ্য এবং সাধুজনস্তাদৃশং জনং রূপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েৎ।

‘মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থ’ শ্লোক দ্বারা জানা যাইতেছে যে—গুরু আদৌ পরিত্যজ্য নহেন। কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ কেহ অশেষ গুরু, বিবয়ী গুরু, কৃত্রিম গুরু বা তথাকথিত অযোগ্য গুরুর নিকট মন্ত্রাদি গ্রহণ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর নিকট অবশ্যই মন্ত্রাদি গ্রহণ করিবেন। নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য।

ভাঃ ১০।৮।১৩০-৩৪ **শ্রীধরস্বামী টীকা**—‘জ্ঞানপ্রদাদ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি। অতএব তদুজ্জনাধিকো ধর্মশ্চ নাস্তি।’

ভগবজ্জ্ঞান-প্রদাতা গুরু অপেক্ষা অধিক সেবা আর কেহ নাই। অতএব গুরুসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্মও আর কিছু নাই।

প্রঃ— যম কাহাকে দণ্ড দান করেন ?

উঃ— যাঁহাদের গুরুপাদে ভগবৎপাদপদে শ্রদ্ধা ও আপনজ্ঞান নাই, যাঁহারা গুরুপাদপদে শরণাগত হয় না, যাঁহারা গুরুনিষ্ঠ নহে বা গুরুসেবা করে না, সেই গুরুবিমুখ সংশয়াত্মা অভক্ত ব্যক্তিগণকে যমরাজ বিশেষভাবে দণ্ড দান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা গুরুনিষ্ঠ ও গুরুসেবা-প্রাণ, গুরুতে যাঁহাদের আপনজ্ঞান ও প্রীতি আছে, গুরুপাদপদে প্রণত বা শরণাগত সেই গুরুদেবতাত্মা ভক্তগণকে যমরাজ আদর ও নমস্কার করিয়া থাকেন। যথা—

শ্রীনৃসিংহপুরাণে ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যমরাজশ্রু উক্তিঃ—

“অহমমরগণাচ্চিতেন ধাত্বে।

যম ইতি লোকহিতাহিতে মিস্তৃতঃ।

হরি-গুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্তান্

হরিচরণ প্রণতান্মমস্করোমি ॥”

শ্রীসনাতন টীকা—যমরাজ নিয়মস্বতীতি যমো নিয়ন্তেতি লোকানাং হিতে নিমিত্তে পুণ্যফল-স্বর্গাদি দানার্থম্, অহিতে চ নিমিত্তে পাপফল-নরকাদি দানার্থম্ নিযুক্তোহপি সন, হরিরেব গুরুস্তদ্বিমুখান্ অভক্তানাং প্রশাস্মি প্রকর্ষণে দণ্ডং করোমি। (শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১০।২২৩)

হরিচরণ প্রণতান্ অর্থে গুরুনিষ্ঠ-ভক্তান্। কারণ হরিচরণ অর্থে ভগবচ্চরণ, ভগবৎ-পাদ, বিষ্ণুপাদ, প্রভুপাদ অর্থাৎ গুরু।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।১৭।২২) আমরা পাই—

‘আচাৰ্য্যং মাং বিজানীয়াব্রবমন্তেত কহিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাস্থয়েত সৰ্বদেবময়ো গুরুঃ ॥’

কর্ম্মী ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্ম-নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ অধ্যাপক আচার্য্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবে, মনুষ্যবুদ্ধিতে কখনও তাঁহার দোষ দর্শন করিবে না। কারণ গুরু সর্বদেবময়।

শ্রীসনাতন টীকা—ন অস্থয়েত—মা দোষদৃষ্টিং কুর্ধ্যাৎ।

‘আচাৰ্য্যং মাং বিজানীয়াৎ’ শ্লোক-প্রসঙ্গে জগদগুরু

শ্রীশ্রীজীবগোষ্ঠারী প্রভু স্বকৃত শ্রীভক্তিসম্ভর্ষ গ্রন্থে (২১১-২১২) আমরাদিককে জানাইয়াছেন—“কর্ম্মভিরপি স্বগুরৌ ভগবদৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্য৷।”

ততঃ স্মৃতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরৌ ইতি আহ—

‘যশ্চ সাক্ষাভক্তগবতি জ্ঞানদীপপ্রদেগুরৌ।

মর্ত্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তশ্চ সৰ্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥’

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

কর্ম্মগণেরই যখন কর্ম্মী গুরুর প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি করা কৰ্ত্তব্য, তখন যিনি কৃপাপূর্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধ-কার দূর করেন এবং কোটীচন্দ্র সূরীতল নিত্যসুখ-ময় শ্রীভগবৎ-পাদপদে জীবকে পৌছাইয়া দেন, সেই প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুকে যে ভগবদ্বুদ্ধি করিতেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। উপরি-উক্ত ভাঃ ৭।১৫।২৬ শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১৫।২৭) আরও বলেন—

“এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।

যোগেশ্বরৈবিসৃগ্যাজিযুলোকো যং মন্ততে নরম্ ॥”

শ্রীবিংশনাথ টীকা—নহু গুরোঃ পিতৃপুত্রাদয়ঃ প্রতিবেশিনঃ চ তং নরমেব মন্ততে? কথমেকমেবাং শিষ্যতং পরমেশ্বরং মন্ত্যামত আহ, এষ ইতি। ভগবান্ যদ্বন্দনো রঘুনন্দনো বা বৈ নিশ্চিতমেব প্রধানপুরুষেশ্বরীশ্বরঃ। যং লোকঃ তদবতার-কালোৎ-পন্নো জনঃ নরং মন্ততে তেন কিং স নরো ভবতি? অপি তু পরমেশ্বর এবোত্যেবং গুরুরপীতি ভাবঃ।

যদি কেহ মনে করে, গুরুদেবের পিতা-পুত্রাদি আত্মীয় ও প্রতিবেশিগণ আমার গুরুকে যখন মনুষ্যবুদ্ধি করে, তখন শিষ্য আমি একাকী কি করিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বর মনে করিব? তত্ত্বস্তর এই যে—জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তাৎকালিক কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মনুষ্য মনে করিত বলিয়া তিনি কি পরমেশ্বর নহেন? সেইরূপ শ্রীগুরুদেবও সাক্ষাৎ ভগবান্।

প্রঃ— শ্রীগুরুদেব কি কৃষ্ণের অবতার ?

উঃ— কৃষ্ণশ্রুত মহানবতারান্তে তব গুরুঃ। গুরু শ্রীকৃষ্ণের মহান্, অবতার। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রঃ— ভগবান্, শ্রীগৌরানন্দদেব কি গুরুকে সংক্ষেপে ঈশ্বর বলিয়াছেন ?

উঃ— জগদগুরু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী হইয়া শূদ্রকুলোদ্ভূত গোবিন্দকে কিরূপে সেবকরূপে গ্রহণ করিলেন ? — দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার শ্রীমার্ক-ভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে এই প্রশ্ন করিলে ভগবান্, শ্রীগৌরানন্দদেব বলিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৩৭-১৪০) —

“প্রভু কহে, —ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।

ঈশ্বরের রূপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥

ঈশ্বরের রূপা জাতি-কুলাদি নাহি মানে।

বিভুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-রূপার।

স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥

মর্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।

পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে ॥”

প্রঃ— শ্রীগুরুদেব কি মানুষ ?

উঃ— কখনই না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন— শ্রীগুরুদেব ক্ষণবিশ্বংসী রক্ত-মাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভগবত বলছেন—‘শ্রীগুরুদেব ভগবান্‌ই। তিনি অবতার।’

‘শ্রীগুরুদেব রূপাপূরক স্বৈচ্ছায় এ জগতে আগমন করেন পরজগৎ হ’তে। প্রকট-অপ্রকট উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। তিনি সর্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান ক’রে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ ক’রছেন।’

‘শ্রীগুরুদেব অতিমর্ত্য মহাপুরুষ। তাঁকে মানুষ মনে করলে নরক হ’বে—নামাপরাধ হ’বে। তিনি আত্মবিৎ — কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়জন। আমাদের দ্বায় পতিতকে উদ্ধার করবার জন্ত তিনি অবতীর্ণ হ’য়েছেন। তিনি কন্দী, জ্ঞানী বা যোগী নন, তিনি লীলাময়ের লীলার পার্শ্বদ বা সঙ্গী—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্বক্তা।’

‘দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য, দেবতা

শব্দে— অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হ’তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।’

‘শ্রীগুরুদেব অভেদ-বিচারে উপাশ্র-পরাকর্ষা; তিনি ভগবান্, হ’য়েও ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী। গুরু ও কৃষ্ণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেবা-ভগবান্ বা স্বয়ং-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দশ্রেষ্ঠ, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি—অভিন্ন শ্রীবার্ধভানবী-প্রকাশ।’

‘কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-মান্। শ্রীকৃষ্ণ—পুরুষ বা ভোক্তা, আর আমাদের শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণের প্রকৃতি বা কান্তা।’

‘শ্রীগুরুদেব ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পরম-প্রিয়তম সেবক হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্‌ই গুরু।’

প্রঃ—বন্ধু কে ?

উঃ—শ্রীভগবান্, বলিয়াছেন—গুরুদেব বন্ধুঃ, ন ভ্রাতাদিঃ স চ অহমেব। (ভাঃ ১১।১৯৪৩ টীকা)

শ্রীভগবান্, বলিয়াছেন পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি কেহই জীবের প্রকৃত বন্ধু নহে। কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র নিঃস্বার্থ বন্ধু এবং আমিই সেই গুরু।

শাস্ত্র বলেন—

‘সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতা-মাতা।

শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥’

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদদ্বন্দ্ব কি মহাতীর্থ-স্বরূপ ?

উঃ—নিশ্চয়ই। গুরুর চরণোদক কোটীতীর্থ-ফলপ্রদ। ‘গুরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্থকোটী-ফলপ্রদম্।’ হরি-পাদোদক ও গুরুচরণামৃত উভয়ই নিখিল তীর্থস্বরূপ। (হরিভক্তিবিলাস)

প্রঃ—ভক্তগণ গুরুকে কিভাবে চিন্তা করেন ?

উঃ— ভগবদ্বক্তৃৎ গুরুং লোকান্তঃস্বরূপং যেনৈব ধ্যায়ন্তি। ভগবদ্বক্তৃৎপ্রবর্তকঃ সাধুঃ ভগবৎস্বরূপান্তি-মোহপি তৎস্বরূপভূতঃ। (ভাঃ ১১।১১২৮ টীকা)

শাস্ত্র বলেন —

শিষ্য মন্ত্রদাতা গুরু, মন্ত্রদেবতা কৃষ্ণ ও মন্ত্র—এই
তিনটী অভেদ জানিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।১৩১ টীকা—

গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রশ্চ তেবাং ঐক্যাং চিন্তয়ন্
মন্ত্র উচ্চারয়েৎ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৭।৩৬) আরও বলেন—

মন্ত্ৰাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিনী।

তেবাং ভেদো ন কর্তব্যো যদিচ্ছেদিস্টমাত্মনঃ ॥

মন্ত্র সাংক্ষাৎ ভগবান্ এবং সেই ভগবান্‌ই গুরু।

যিনি নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি গুরু, মন্ত্র
ও ভগবানে ভেদ-বুদ্ধি করিবেন না।



শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদভিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

‘মাধবতিথি ভক্তিজননী’। এজন্ত শ্রীমাধবপ্রিয়তমা
শ্রীরাধার আবির্ভাবতিথি সর্বমাধবতিথির মুকুটমণিস্বরূপ।।
শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—দেববি নারদ পিতৃদেব
শ্রীব্রহ্মার নিকট শ্রীরাধাষ্টমীর মহিমা শ্রবণ
করিতে চাহিলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, একমাত্র শ্রীহরি
ব্যতীত তাঁহার প্রিয়তমার প্রকটতিথি মাংসাত্ম্য বর্ণন
করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। একাদশী শ্রীহরির
প্রিয়তমার বটে, কিন্তু সহস্র একাদশীত্রয় পালনে
মাতৃদেব যে ফল প্রাপ্ত হয়, শ্রীরাধাষ্টমী ত্রতপালনে
তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ভক্ত্যনুভবী স্মৃতি লভা
হইয়া থাকে, —

“একাদশ্যাঃ সহস্রেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।

রাধা জন্মাষ্টমী পুণ্যং তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্ ॥”

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব স্থান গোবিন্দ মহাবনে
নানা উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়া শ্রীনন্দ মহারাজ যেমন
তথা হইতে নন্দীশ্বর পর্বতোপরি বাস্তব্য স্থাপন
করিয়াছিলেন, শ্রীনন্দের পরমসুখ্য শ্রীষ্যভানু মহারাজও
তদ্রূপ রাভেল বা রাওয়েলে নানা উপপাত আশঙ্কা
করিয়া নন্দীশ্বর পর্বতের দক্ষিণদিকস্থ বরসাত্ত বা
বর্ষণা পর্বতোপরি বাস্তব্য স্থাপন করেন। রাভেলেই
শ্রীষ্যভানু মহারাজ ও তন্মহিষী কীৰ্ত্তিদা বা কৃত্তিকা-
মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা ফ্লাদিনীশক্তিমতী
শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরবৎসর ভাদ্রমাসের

শুক্লাষ্টমী তিথিতে অমুরাধা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে প্রকট-
লীলা আবিষ্কার করেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির
‘শক্তিশক্তিমতোরভেদ’ দ্বায়ে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সহিতই
তাঁহার নিত্য আবির্ভাব, তথাপি লীলাবশতঃ প্রাকট্যে
বাহ্যতঃ এক বৎসরের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

“তত আরভা নন্দস্ত ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্।

হরেনিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূম্প ॥”

—ভাঃ ১০।৫।১৮

এই ভাগবতীয় শ্লোকে বক্তা শ্রীশুকদেব শ্রোতা
শ্রীমহারাজ পরীক্ষিতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—
“হে রাজন্, নন্দব্রজ শ্রীহরির বাসস্থান বলিয়া নিজ-
গুণের দ্বারাই (নিত্য) সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধিমান্, আবার
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল হইতে সেইস্থান লক্ষ্মীর বিহার-
স্থল (রমায়াঃ আক্রীড়ং বিহারস্থানং) হইয়াছিল।”

লক্ষ্মীর বিহারস্থল হইয়াছিল এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ
আবির্ভাবের পর সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী রাধিকার আবি-
র্ভাব সূচিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোপালচম্পু
গ্রন্থে (পূর্ষ ১৫।১২-২০) লিখিয়াছেন—

“সত্যং বহুসুতরঙ্গাকরতাং স প্রাপ গোপদুগন্ধিঃ।

কিন্তুমৃতচুতি-রাধা, লক্ষ্মীজননাদগাং পুত্রিম্ ॥

স। খলু শ্রীকৃষ্ণজন্মবর্ধনসুতরবর্ষে সর্বসুখসম্ভবে রাধা-
নাম্নিনক্ষত্রে জাত্যেতি রাধাতিথীযতে।”

অর্থাৎ “সত্যই সেই শ্রীবৃষভানুগোপরূপ ক্ষীরসমুদ্র
বহুপুত্ররূপ রত্নের আঁকরতা প্রাপ্ত হইলেও অমৃতপ্রভা-
শালিনী শ্রীরাধা-রূপা লক্ষ্মীর আবির্ভাব-হেতুই তাহা
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সেই কল্পা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বর্ধের পর বর্ধে
সর্বসুখসংযুক্ত অল্পরাধা-নক্ষত্রে জন্মলীলা আবিষ্কার
করায় তিনি ‘রাধা’ নামে অভিহিতা হন।”

একদা জলাধিপতি শ্রীবরুণদেবও তাঁহার ভবনে
শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য রত্ন পাইয়া অত্যন্ত উল্লাসের সহিত
বলিয়াছিলেন—

“অত্ মে নিভৃতো দেহোহষ্টৈবার্থোহধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥”

—ভাঃ ১০।২৮।৫

অর্থাৎ “হে প্রভো, ভগবন্, অত্ আনার দেহ-
ধারণ সার্থক হইল। অত্ই আমি পরমধ্বন লাভ
করিলাম। সমস্ত রত্নাকরের অধীশ্বর হইয়াও ইতি-
পূর্বে এরূপ ধন (আর কখনও) লাভ করি নাই।
আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবকগণ মোক্ষ লাভ করিয়া-
ছেন (অধ্বনঃনংসারস্ত পারমবাপুঃ), অতএব আমিও সেবক
বলিয়া তাদৃশী গতি আকাঙ্ক্ষা করি।”

পদ্মপূর্বাব শ্রীবৃষভানু মহারাজের যজ্ঞস্থলে শ্রীরাধার
আবির্ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে :—

“ইতি ঋতাপি সা রাধাপ্যাগতা পৃথিবীং ততঃ।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিকে তিথৌ॥

বৃষভানোবর্জজভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা।

যজ্ঞার্থং শোধিতায়াঞ্চ দৃষ্টা সা দিব্যরূপিণী॥

রাজানন্দমনা ভূত্বা তাং প্রাপ্য নিজমন্দিরম।

দত্তবান্ মহিষীং নীত্বা সা চ তাং পর্ধ্যাপালয়ৎ॥”

—শ্রীপদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ৭।৪০-৪২

অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমীতিথিতে (মধ্যাহ্ন-
কালে) শ্রীরাধিকা শ্রীবৃষভানু রাজার যজ্ঞস্থলে আবির্ভূতা
হইলেন। যজ্ঞার্থ শোধিত ক্ষেত্রে সেই দিব্যরূপিণী
শ্রীরাধা পরিদৃষ্টা হইলেন। শ্রীবৃষভানুরাজ তাঁহাকে
পাইয়া আনন্দিত মনে নিজমন্দিরে লইয়া গেলেন এবং
স্বীয় মহিষীর (কীৰ্ত্তিদা দেবীর) নিকট অর্পণ করিলেন।

রাজমহিষী তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অত্ৰও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বৃষভানু মহারাজ
প্রভৃষে যমুনাস্নানকালে তৎসমীপাগত একটি ভাসমান
প্রফুল্লিত পদ্মোপরি শায়িতা এই অনিন্দ্যসুন্দরী কল্পা-
রত্নটিকে প্রাপ্ত হন। তিনি তখনই পরমানন্দে তাঁহাকে
বক্ষে ধারণ করতঃ গৃহে লইয়া আসেন এবং স্বীয় মহিষী
কীৰ্ত্তিদা-হস্তে সমর্পণ করেন। কৃত্তিকা বা কীৰ্ত্তিদা দেবীও
তাঁহাকে পরমোন্মাদে বক্ষে ধারণ করিয়া অপরিমীম
অপত্য স্নেহের সহিত পালন করিতে থাকেন। কিন্তু
বালিকাটির চক্ষু মুদ্রিত দেখিয়া রাজা রাণী উভয়েই
অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীভগবচ্চরণে উহার দৃষ্টিশক্তি
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীনন্দরাজ-
মহিষী যশোদাদেবী গোকুল হইতে কৃষ্ণকে কোলে করিয়া
রাভেল রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। বৃষভানুরাজ-
দম্পতি পরমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।
শ্রীযশোদা কৃষ্ণকে কোলে লইয়া শ্রীকীৰ্ত্তিদা দেবীর
ক্ৰোড়ে শায়িতা তাঁহার নবাবিভূতা কণ্ঠারত্নকে নির্ণিমেষ
নয়নে দেখিতেছেন। এমন সময়ে এক অভূতপূর্ব ঘটনা
সংঘটিত হইল। যশোদানন্দন কৃষ্ণ সেই শিশুকণ্ঠার
সম্মুখে আসিবারাত্র সেই কণ্ঠার নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত
হইল, কণ্ঠাটি সর্বপ্রথমে তৎপ্রিয়তম কৃষ্ণমুখচন্দ্রে নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণও প্রাণ ভরিয়া প্রাণপ্রিয়তমার
মুখচন্দ্র দর্শন করিতে করিতে আশ্রয় হইলেন। নয়নে
নয়নে মিলন। বৃষভানুরাজদম্পতির আনন্দের আর
সীমা রহিল না। মহামহোৎসবের আয়োজন হইল।

(শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের মন্দির মধ্যে পরমপূজনীয়
শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীরাধার উক্ত শতদল-
পদ্মোপরি আবির্ভাবের ভাবটিই প্রদর্শিত হইয়া থাকে।)
শ্রীললিতমাধব গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোষ্ঠামিপাদও সেইরূপ
ঈদ্রিত প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীবৃণাখাদি গোষ্ঠামিবর্গ কত-না-
কতভাবে —পরমশ্রীতিভরে শ্রীরাধারাগীর মহাশ্রয় বর্ণনা
করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার
শ্রীরাধারসম্বন্ধানিধি গ্রন্থে শ্রীরাধার মহিমামৃত কি অপূর্ব
চমৎকারিতার সহিত আশ্বাদন করিয়াছেন! শ্রীশ্রীল

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'অনিয়মাস্তকাদি' বর্ণনাকালে এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 'অনুভাণ্ডে' শ্রীকৃপের উজ্জল-নীলমণির দশদশা এবং শ্রীভ্রমরগীতা ও শ্রীমহিবী গীতার পত্নাত্মবাদ মধ্যে তথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনারসবিস্তৃতি'র মঙ্গলাচরণে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের গোড়ীয় ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে এবং শ্রীকৃপের উপদেশা-মূর্তের 'অনুভূতি'র মধ্যে যেভাবে শ্রীরাধাদাস্ত্রের নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের বিষয়। আমাদের গুরুপাদপদ পরমারাধ্য প্রভুপাদ যেদিন স্বীয় গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী গৌর-কিশোর প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেইদিন তাঁহাকে যে গানটি কীর্তন করিতে করিতে শ্রীস্বানন্দমুখদ-কুঞ্জের দিকে অবধূতবেশে আসিতে দেখিয়াছিলেন, সেই গানটিকে তিনি তাঁহার স্বীয় অতিপ্রিয় ভজন-সম্পত্তিরূপে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, স্মরণ্য তাঁহার ভূত্যাগভূত্যা আমাদিগেরও সেই গুঢ় সম্পদের সন্ধান রাধা একান্ত প্রয়োজন। বড়গোস্বামী ব্রজের সর্বত্র 'হা রাধে হা রাধে' বলিয়া অত্যন্ত আকুল ভাবে কাদিয়া বেড়াইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। করুণাময়ী শ্রীরাধারাগীর নিষ্কপট রূপালাভের জন্ত নিষ্কপট ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র ভজনসম্পদ। শ্রীগুরুপাদপদের অষ্টৈতুকী রূপা ব্যতীত সে সম্পৎ লাভের আর অন্য উপায় নাই। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সেই ভজন গীতিটি এইরূপ :-

“কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।

রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে ॥

দেখা দিলে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।

তোমার কান্দাল তোমার ডাকে রাধে রাধে ॥

রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধে রাধে।

রাধে কান্দমনোমোহিনী রাধে রাধে ॥

রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।

রাধে বুঝভানুন্দিনী রাধে রাধে ॥

(গোসাক্ষী) নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে রাধে রাধে।

একবার ডাকে কেশীঘাটে, আবার ডাকে

বংশীবটে রাধে রাধে।

(গোসাক্ষী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে

কুঞ্জবনে রাধে রাধে ॥

” একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার ডাকে

শ্রামকুণ্ডে রাধে রাধে।

” একবার ডাকে কুসুমবনে, আবার ডাকে

গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে ॥

” একবার ডাকে তালবনে, আবার ডাকে

তমালবনে রাধে রাধে।

” মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায়

গড়গড়ি যায় রাধে রাধে ॥

” মুখে রাধা রাধা বলে, ভেসে নয়নের জলে

রাধে রাধে।

” বৃন্দাবনে কুলি কুলি কেঁদে বেড়ায়

রাধা বলি রাধে রাধে ॥

” ছাপান্ন দণ্ড রাত্রদিনে জানে না

রাধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে।

তারপর চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপনে রাধা-গোবিন্দ

দেখে রাধে রাধে ॥”

এই মহামূল্য ভজন-সম্পদ লাভের লালসায় যেদিন প্রাণমন সত্য সত্য নিষ্কপটে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, সেই দিনই জানিব শ্রীগুরুপাদপদ আমাকে অমায়্য আত্মদাস করিতেছেন। আহা এমন ভাগ্য কবে হইবে! জীবনের গণা দিন যে ফুরাইয়া আসিল!

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশতনাম বর্ণন করিতে গিয়া ভগ্নিতায় লিখিতেছেন — এক সময়ে শ্রীরাধারাগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানিনী হইয়া কৃষ্ণের শত অনুগণ সবেও তাঁহার প্রতি প্রসন্না না হওয়ায় কৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে চলিয়া গেলে রাধারাগী কিয়ৎক্ষণ পরে মান পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণগুবৃন্দাক্রান্তচিত্তে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার্ত হৃদয়ে মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন — ‘হায়, আমি কত কৃষ্ণবাক্য বলিয়া সেই সদ্গুণসাগর কৃষ্ণকে নিরাস করিয়াছি, এক্ষণে আর কি তিনি আমার নিকট আসিবেন?’ তাঁহাকে এইরূপ অনুতাপ-তপ্তা বুঝিয়া বিত্যাগী গুণসমৃদ্ধা তুঙ্গবিভা নামী কোন সখী তাঁহাকে সঙ্ঘোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন — হে

সুন্দরী রাধে, তুমি কৃষ্ণে মান পরিত্যাগ কর এবং আমার ঐকান্তিক বাক্য শ্রবণ কর, ‘আমি কত কটুবাক্য বলিয়া কৃষ্ণকে নিরাস করিয়াছি, তিনি আর আমার নিকট আসিবেন না’ এইরূপ চিন্তা করিও না। পূর্বে কন্দর্প-সুন্দরী নাম্নী কোন সখী তোমার সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলে ভগবতী শ্রীপোর্নমাসী তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়স্বরূপ তোমার অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিতে উপদেশ করেন। এক্ষণে শ্রীপোর্নমাসীর ইঙ্গিতাভিজ্ঞা বনদেবী বৃন্দা সেই সকল নাম সিন্দূর দ্বারা লিখিয়া তাহা তোমার জীবিতনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। তোমার বিরহার্ন্ত কৃষ্ণ সেই অষ্টোত্তরশতনাম জপ করতঃ চিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিতেছেন। উহা আকর্ষক মহাশক্তি-মন্ত্রস্বরূপ বলিয়া সিন্দূর দ্বারা লিখিত হইবার কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ ভণিতাদ্বারা শ্রীল গোস্বামিপাদ অতি অপূর্ণ ভাবগন্তীর ‘শ্রীপ্রেমেন্দুসুধাসত্র’ নামক শ্রীবৃন্দা-বনেশ্বরীর অষ্টোত্তরশত নাম বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার অজ্ঞাত স্তবও পরমোপাদেয়। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীও তাঁহার স্তবাবলী গ্রন্থে ঐরূপ অষ্টোত্তর-শতনাম ও স্তবস্তোত্রাদি বর্ণন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীরাধার প্রেমবস্ত্র কৃষ্ণের শ্রীরাধানাম সততই জপ্য। এজন্য উহা অতি গুঢ় মন্ত্রস্বরূপ। শ্রীরাধার একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণরূপা স্মদূরপরাহতা।

পরমারাধা শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—“কৃষ্ণ অধোক্ষজ শক্তিমান্ আর রাধিকা অধোক্ষজা শক্তি-মতী। ‘অনয়া মীয়তে’ ইতি মায়া,—ইহাই তর্কপন্থা আর ‘অনয়ারাধিতঃ’ ইতি রাধা—ইহাই শ্রোতপন্থার পরাকাষ্ঠা। সর্বদা সর্বোচ্চিয়ে যাহা কৃষ্ণের রাধন বা তোষণ করে, তাহাই শ্রোতপন্থার পূর্ণাবস্থা।”

তর্কপন্থায় কেবল দাস্তিকতা প্রদর্শন ব্যতীত ভজনের ‘ভ’র রাজ্যও পৌছান যায় না। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, তাঁহার মনঃশিক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া আমাদেরকে গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজবাসিন্জন-স্থানে, বৈষ্ণব সৃজনে, ভূদেবতাস্বরূপ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-গণে, নিজ ইষ্টমন্ত্রে, মহামন্ত্র শ্রীনামে এবং পরমা-

শ্রয়স্বরূপ ব্রজনবধুবদন্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দপদারবিন্দে সর্বদা দস্ত পরিত্যাগ পূর্বক অতিশীঘ্র অপূর্ণা রতি বিধানার্থ সবিনয়ে উপদেশ করিতেছেন। জন্ম, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য ও রূপাদি জনিত অহঙ্কার থাকিতে কখনই কাহারও কিস্কিন্দ্যাত্তও ভজন সাধন হয় না। আবার ভজন বা বৈরাগ্যান্দির দস্তও সাংঘাতিকভাবে ভজন-স্তরায় হইয়া থাকে। শ্রীমন্নহাপ্রভুর ‘তৃণাদপি সুনী-চেন’ শ্লোক সর্বদা স্মৃতিপটে জাগরুক রাখিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরাধারাগীর রূপা প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীরাধাদয়িতের রূপাপ্রার্থী হইতে হইবে। “বিনা রাধাপ্রসাদেন হরিভক্তিঃ সুল্লভা।” “রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।”

ক্রমদীপিকা গ্রন্থে চত্বের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

“মম নামশতেনৈব রাধানাম সত্ত্বম্।

যঃ স্মরেত্তু সদা রাধাং ন জানে তস্ত কিং ফলম্॥”

অর্থাৎ আমার শতনাম অপেক্ষা রাধা নাম পর-মোত্তম। যিনি সর্বদা রাধানাম স্মরণ করেন, তিনি যে কি ফল লাভ করেন, তাহা আমারও অজ্ঞেয়।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রিয়া-বিরহে কাতর হইয়া সতত ‘রাধা’ নাম জপ করেন, ‘রাধাও’ তজ্রূপ প্রিয়বিরহ-কাতরা হইয়া সতত কৃষ্ণনাম জপ করিয়া থাকেন। সুতরাং যুগল রাধাকৃষ্ণনামই জীবের প্রধান জপ্য নাম।

শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

“সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গনি?

রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধার, সেই বড় ধনী॥

গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম?

রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম॥

ধোয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?

রাধাকৃষ্ণপদাশুজ ধ্যান—প্রধান॥

সর্বতাজি’ জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস?

শ্রীবৃন্দাবনভূমি কাঁহা নিত্যালীলা বাস॥

শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন॥

উপাস্ত্রের মধ্যে কোন্ উপাস্ত্র প্রধান?

শ্রেষ্ঠ উপাস্ত্র—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥”

সম্মতজ্ঞান ও গৌরবকথা

[মহোপদেশক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার, ভক্তিগোষ্ঠী]

(৫)

সুদীর্ঘ অবকাশের পর তুষিত ভক্ত-চাতকগণ শ্রীশ্রীগৌরপদনখমুখচন্দ্রসুধাপান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। আনন্দাতিশয়ো অশ্রু, কল্প, পুলকাদি সাস্থিকভাবকদম্ব ভক্ত অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিল। দক্ষিণ হইতে প্রভুর প্রত্যাগমনের সমাচার দিকে দিকে চলিয়া গেল। এদিকে শ্রীরথযাত্রার সময়ও নিকটবর্তী হইল। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, পানি-হাটী, কুমারহট্ট, কুলীনগ্রামাদি বঙ্গের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু গৃহস্থ বৈষ্ণব প্রভুসেবনোপযোগী বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া প্রভুর দর্শনে তথা শ্রীরথারূঢ়জগন্নাথ-দর্শনে পুরীধামে আসিলেন। সকলের জন্তই যথা-যোগ্য বাসস্থান প্রদত্ত হইল। সকলেরই প্রভুকেন্দ্রিক জীবন। মহাসমারোহে শ্রীরথযাত্রাও হইয়া গেল। বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত লক্ষ লক্ষ যাত্রী শ্রীরথযাত্রা দর্শনে শ্রীধামে আসিয়াছিলেন। আবার যাত্রান্তে স্বস্থ স্থানে চলিয়াও গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দরও নিজ ভক্ত-গোষ্ঠী লইয়া রথ্যাগ্রে মহাসংকীর্তন ও মহানর্তনলীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরায়ুগত গোড়ীয় ভক্তগণ গুণ্ডিচাবাড়ীকে সুন্দরাচল এবং শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-সংলগ্ন ক্ষেত্রটিকে নীলাচল বলেন। তাঁহারা সুন্দরা-চলকে অভিন্নবৃন্দাবন এবং নীলাচলকে অভিন্নধারকা-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর শ্রীরথযাত্রার সময় সুন্দরাচলে ঐগুণ্ডিচামন্দিরে সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব সপারিকরে তদীয় শ্রীনীলাচল মন্দিরে পুনর্যাত্রা করেন। গমনাগমন সময়ে মহাসমারোহ ও মহাসংঘট্ট হয়। শ্রীরথযাত্রান্তে অনেকটা স্বাভাবিক পরিবেশ হইল। বঙ্গদেশ হইতে আগত প্রভু-ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই আরও চারি-মাস নীলাচলে থাকিলেন। তাঁহারা তথায় চাতুর্মাস্ত ও কার্তিক ব্রত (নিয়মসেবা) পালন করিলেন। প্রত্যহ তাঁহারা নিয়মিতভাবে প্রভু-পাদপদ্ম দর্শন

করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, ইষ্টগোষ্ঠী করেন, প্রভুর শ্রীমুখে অনেক উপদেশ শ্রবণ করেন। প্রেমে সকলেরই গরগর মন। দেখিতে দেখিতে চাতুর্মাস্তও শেষ হইল। এখন বিচ্ছেদের পালা। পরস্পর বিচ্ছেদের ভয়ে প্রভুও নির্ঝাক্, ভক্তগণও নির্ঝাক্। উভয়েরই চোখে জল। ক্ষণমধ্যে উভয়ের স্মৃতিপথেই শ্রীভাগবতী-বাণী ভাসিয়া উঠিল,—“ নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ণণাম্। ওষেন ব্যুহমানানাং প্লবানাং শ্রোতসো যথা। ” [নদীর তরঙ্গ-সমূহে পরিচালিত তৃণ কাষ্ঠাদির যেরূপ একত্র মিলন হুল্লভ, সেইরূপ বিচিত্র অদৃষ্টসম্পন্ন বান্ধবগণেরও প্রিয়জন্যের সহিত একত্র অবস্থান সম্ভবপর হয় না।] কুমারহট্ট-নিবাসী শিবানন্দ সেন ও কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণকে উপলক্ষ করিয়া প্রভুর সাঙ্ঘনাবাণী—“ প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা। গুণ্ডিচায় আসিবে সবার পালন করিয়া ॥ কুলীন গ্রামীবে কহে সম্মান করিয়া। প্রত্যহ আসিবে যাত্রায় পটুডোরী লঞা ॥ গুণ্ডিচা-পান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥ ‘ নন্দনন্দন কৃষ্ণ-মোর প্রাণনাথ’। এই বাক্যে বিকaihছু তাঁর বংশের হাত ॥ তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুকুর। সেই মোর প্রিয় অগ্রজন রহ দূর ॥ ” তবে গুণ্ডিচা-খানের বংশজ রাম-নন্দ আর সত্যরাজ প্রভুচরণে কিছু নিবেদন করিলেন, প্রভু, “ গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে। শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে ॥ ” প্রভু উত্তর করিলেন—“ (প্রভু কহে —) কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ॥ ” সত্যরাজ বলে, — “ বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ? কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে ॥ ” “ প্রভু কহে—যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, সেই পূজা শ্রেষ্ঠ সবাঁকার ॥ ** অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই ত’ বৈষ্ণব করিহ তাঁহার সম্মান ॥ ”

‘ধীর মুখে এক কৃষ্ণনাম’ (চৈঃ চঃ ম ১৫।১১) — এই বাক্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

“গৃহস্থ লোকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার জন্ত এক কৃষ্ণ-নামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবাকার্য্য-সিদ্ধি হয়, ‘মন্ত্র-দীক্ষিত বৈষ্ণব’কে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই; ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত অনেকে তত্ত্ব-জ্ঞানশূন্যতাবশতঃ মায়াবাদাদি দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে-সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্বকনিষ্ঠ হইলেও ‘শুদ্ধবৈষ্ণব’, গৃহস্থবৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।” (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীমন্ন্যায়প্রভু কুলীলগ্রামীর নিকট নামাশ্রিত বৈষ্ণবেরই অবস্থাত্তর বিচার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকেই যিনি সর্বেশ্বরে-শ্বর ও সর্বকারণ-কারণ বুঝিয়াছেন এবং নিরপরাধে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণই যাহার একমাত্র সঙ্কলিত বিষয়; কিন্তু কৃষ্ণনাম উচ্চারণে সাময়িকরূপে নৈরন্তর্য্যের অভাব হইতেছে, এমতাবস্থায় সাধককেও স্বচ্ছন্দে কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বা সাধু বলা যায়।

নিষ্কপট সাধুসঙ্গ ও শ্রবণকীর্তন প্রভাবে কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মধ্যম ভাগবত-পর্য্যায়ে প্রবিষ্ট হইলে তিনি নিরবিরুদ্ধে নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারিবেন। “কৃষ্ণনাম নিরন্তর ধাঁহার বদনে” (চৈঃ চঃ ম ১৬।৭২)। এতাদৃশ উচ্চারণের মধ্যে কোন বর্ধ্যব্যবধান বা তত্ত্ব-ব্যবধান নাই, অধিকন্তু নৈরন্তর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফলে শ্রীনামে সাধকের ক্রমশঃ প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা লাভ হয়। এই তন্ময়তার মধ্যেই শ্রীভগবদ্ভূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদির দর্শন লাভ হয়। ইহাই উত্তম ভাগবতের পর্য্যায়। “ধাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।” (চৈঃ চঃ ম ১৬।৭৪) এমতাবস্থায় পাহাড়-প্রমাণ বাধাবিপত্তির মধ্যেও নামা-নুরাগী জনের শ্রীনামে অনুরাগ বাড়িবে বৈ কমিবে

না। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও প্রহ্লাদ মহারাজ আদি উত্তম ভাগবতগণের জীবনাদর্শ অনু-শীলনে ইহাই পরিলক্ষিত হয়। শত নির্ধাতনের মধ্যেও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি—“খণ্ড খণ্ড হই” যদি যায় দেহ প্রাণ। তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥” এতাদৃশ অবস্থাত্তরকে কেবলমাত্র মহৎ রূপাক্রান্ত বলিয়াই জানিতে হইবে। “নৈবাং মতিস্তাবজরুক্ষণাজিৎ স্পৃশ্যত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোহভিবেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন ব্লীত যাবৎ॥” (ভাঃ) [যাবৎ নিক্ষিঞ্চন ভগবন্তের পদধূলিধারা অভিবিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।]

উপরি উক্ত ভাগবতগ্রন্থ লাভই জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম এবং ইহাই একমাত্র স্বেচ্ছের আকর। “স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্কে। অহৈতুক্য-প্রতিহতা যয়ান্মা স্প্রদীদতি॥” (ভাঃ) [যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাভীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সূক্ষ্মরূপে প্রসন্নতা লাভ করে। প্রসন্নতঃ বলা যায় যে, জীব স্বরূপতঃ চেতনধর্ম্মী বলিয়া জড়ধর্ম্মে বা মায়াতে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে গেলে পাওয়া যায় না। মায়াচারিত বিধে ব্যাটী ও সমষ্টি জীবের কোন স্বার্থই হরিব্যতিরিক্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেও নাই। শ্রীহরিরই জৈব স্বার্থের একমাত্র গতি। তদ্যতিরিক্ত যদি কেহ বুঝাইতেও চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাকে অবশ্যই মুঢ়মতি, ও ছষ্ট আশয় বিশিষ্ট বলিয়াই জানিতে হইবে, সমাদর করিতে হইবে না। এই কথাই একদিন বালক হইলেও শুদ্ধ হরিভক্ত পুত্র প্রহ্লাদ ত্রিভুবনবিজয়ী বীর অম্বরকুলসম্রাট হিরণ্য-কশিপুকে নির্ভীকচিত্তে উদাত্তকণ্ঠেই বলিয়াছিলেন,—“ন তে বিজ্ঞঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং ছুরাশয়া যে বহিরর্থ-মানিনঃ। অন্ধা যথাক্ষৈরুপনীয়ামানান্তেপীশতস্ত্র্যামুর-দাগ্নি বদ্ধাঃ॥” (ভাঃ) [যাহারা শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই

সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণু-তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্ধ কর্তৃক চালিত হইয়া গর্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কল্মসগণ ভগবানের বেদ-রূপ দীর্ঘ রজুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্মে নিযুক্ত হন।] শ্রীহরিতে নিজ স্বার্থ ও অস্তিত্ব (existence) অন্বেষণ না করিয়া ঐহ্যারা প্রাকৃত সৃষ্টিতে জড়দেহ-সম্পর্কিত পুত্র বিত্ত কলত্রাদিতে তাহা অন্বেষণ করিতে যান, তাঁহারা স্বার্থ-শেষণে বঞ্চিত হো হনই, উপরন্তু পুরুষোত্তমও ভাগীদার হইয়া থাকেন। এইমত জাগতিক সুখদুঃখে বঞ্চিত হইতে হইতে তদনুভবকারী মনের আত্যন্তিক বিলয় সাধনে ঐহ্যারা জড় নির্বাকবাদী হইয়া পড়েন, তাঁহারা অনাত্মপ্রতীতি সম্পন্ন বোদ্ধ হন। নিত্যসুখ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। এমন কি চিৎ-প্রতীতি-সম্পন্ন জ্ঞানিগণও মায়াবাদাবলম্বনে চিহ্নজ সাম্য করিতে গিয়া ক্রমশঃ অশ্মসার (প্রস্তর) সদৃশ হইয়া পড়েন। ঐহ্যারা বৈদিক হইলেও নির্বিশেষবাদী — প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও আত্মঘাতী। আবার যোগিগণের পরমাআনুভূতিতেও ঈশ্বর-সামুজ্যের লক্ষণ থাকায় তাহা অধিকতর ধিকারযোগ্য। একমাত্র ঈশ্বরানুভূতি প্রাপ্ত মহৎই পূর্ণ চিৎসত্য চিদ্রামে বসবাস-সৌভাগ্যালাভে সংকৃত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরারাদন-ময়ী চেষ্টা হইতেই মাত্র ইহা লভ্য হয়।

শ্রীহরি অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ চিহ্ন। স্বাভাবিকরূপেই তাঁহাতে জড়ীয় কল্লনার কোন সংস্থান নাই। ‘সর্বং ধ্বিন্দং ব্রহ্ম’ শব্দে ব্রহ্মবস্তুর ব্যাপ্তিই অনুভবের বিষয় হয়। অর্থাৎ ‘যাহা বৈ বস্তু নাহি আর।’ ‘উপধাধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক সীমা।’ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৮) কিন্তু কি এক অচিন্ত্য ব্যাপার! ব্রহ্মবস্তু ব্যতিরিক্তও একটি প্রতীতি যাহা ব্রহ্মেতে নাই অথচ যাহাকে অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই, সদাই বর্তমান দেখা যায়। শাস্ত্র এই প্রতীতিটিকে ব্রহ্মবস্তুরই মায়া বলিয়া জ্ঞান করিবার উপদেশ করিয়াছেন। “ঋতে-হর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিত্যাহ-

অন্যো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥” (ভাঃ ২।১৩৩) এই মায়ার দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি আভাসস্থানীয়া জীবমায়া ও অপরটি তমঃস্থানীয়া গুণমায়া। তমঃস্থানীয়া মায়া শব্দে চেতন ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিপরীত জড়া প্রকৃতিকে বুঝায় এবং আভাসস্থানীয়া মায়া শব্দে জড় ও চেতনের মধ্যবর্তী তটস্থাত্মা জীব শক্তিকে বুঝায়, যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় শ্রীহরির তটস্থবিক্রম বলিয়াও কথিত হয়। উক্ত ব্রহ্মবস্তু অপ্রকাশিতভাবে এই সমস্ত জগতে ও জীব পরিগ্ৰ্যাপ্ত ও সমুদয় পদার্থ তাঁহাতেই অবস্থিত। কিন্তু তিনি (ব্রহ্মবস্তু) সেই সমুদয়ে অবস্থিত নহেন অথবা তাঁহারাও তাঁহাতে অবস্থিত নহেন। এই-রূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তৎস্বরূপ ঐশ্বরিকভাব দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান্ ভূতগণের ধারক ও পালক হইয়াও তাহাতে আবদ্ধ নহেন। “ময়া ততমিদং সর্বং...তেষ্ববস্থিতঃ” গীতোক্ত শ্লোকে বুঝা যায় যে, চরাচর সকলকে লইয়া যেমন তাঁহার (ব্রহ্মবস্তুর) পূর্ণ স্বরূপের অবস্থিতি, তৎসমুদয়কে বাদ দিয়াও তাঁহার তদ্রূপই পূর্ণ স্বরূপের অবস্থিতি। তিনি স্বরাষ্ট পুরুষোত্তম বলিয়া তদুদ্ভূত লোক সমূহের তিনি পূজক নহেন, পরন্তু একমাত্র ভোক্তা, নিয়ামক ও প্রভু। তজ্জন্ত সকল চরাচর স্বরূপতঃ শ্রীহরির স্তাবক বলিয়া সমগ্র বিশ্বের হরিভজনই বাধ্যতামূলক। “যে ভজে ধেন! ভজে সব তাঁর দাস। যে না ভজে সেই পাপে তার হয় সর্বনাশ॥” তাই শ্রীহরিভজনব্যতিরিক্ত হাজার স্বতন্ত্র চেষ্টার দ্বারাও ব্যাপ্তি অথবা সমষ্টির কোন স্বার্থই রক্ষা করা যাইবে না, উপরন্তু সর্বৈব ব্যর্থ প্রয়াসই হইবে মাত্র। এবজুত ব্যর্থ প্রয়াস হইতে উদ্ভূত জড়বাদ বা সংশয়বাদ, জড় নির্বাকবাদ বা বোদ্ধবাদ, চিন্মাত্রবাদ বা মায়াবাদ ইত্যাদি — যাহা প্রতিনিয়ত জীবকে উত্তমশ্রেণ্য লাভ হইতে সর্বদা বঞ্চিত করিতেছে বা করিবে, বিশেষতঃ কলিযুগে স্বভাবতঃই কণ্ঠযুক্ত বলিয়া এইযুগে শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে যোগ, যোগ, তপঃ ধর্ম্মাদির মধ্যে কোন উত্তম মঙ্গল নিহিত নাই। তজ্জন্ত কেবল

শ্রীহরিনাম সংকীৰ্তনকে আশ্রয় করিলেই মাত্র জীব
যাবতীয় অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম শ্রেয়ঃ
লাভ করিতে পারেন। “কলেন্দোবানিধে রাজমস্তি
শ্বেকো মংগুঃ। কীৰ্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তসঙ্গঃ পরং
ব্রজেন্।” “কৃতে যদ্যামৃতো বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যজ্ঞতো
মধৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যাং কলৌ তদ্বিকীৰ্তনং।” (ভাঃ)
“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ
নাশ্ত্যেব নাশ্ত্যেব নাশ্ত্যেব গতিরন্তথা॥ (বৃন্দারদীয়-

বচন) ইত্যাদি বহু শাস্ত্রবচন শ্রীনামমাহাত্ম্য সম্পর্কে
আলোচ্য। তজ্জন্ত মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও
বলিয়াছেন, — ‘নামসঙ্কীৰ্তন কলৌ পরম উপায়’
‘আমাপ্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাঁকার। কৃষ্ণ বিহু অস্ত
কিছু না বলিহ, না বলাবে আর।’ ‘যারে দেখ
তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ...’ ইত্যাদি। কাজেই কৃষ্ণ-
নামের সম্যক্ উচ্চারণ হইতেই জীবের সর্বার্থ সিদ্ধি
হইবে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।



শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-
দেবের শুভেচ্ছায় ও রূপানির্দেশে শ্রীধাম মায়াপুর
ঈশোত্তমানস্থ মূল মঠে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ
তৎশাখা মঠসমূহে গত ২১ শ্রাবণ (১৩৮৩), ইং ৬
আগষ্ট (১৯৭৬) শুক্রবার হইতে ২৫ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট
মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের
বুলনযাত্রা এবং ১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট বৃধবার শ্রীকৃষ্ণের
জন্মাষ্টমী ও তৎপরদিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসব শ্রীকৃষ্ণকথামৃত-
বিতরণমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ স্বয়ং শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ
শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া তত্রত্য বুলনোৎসব সম্পাদন
করাইয়া থাকেন। এবারও তিনি গত ৩রা আগষ্ট
কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন,
তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন — শ্রীপাদ প্যারীমোহন
ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, যশ্ভা শ্রীজগন্নাথ
মন্দিরের সেবক শ্রীনিমাইপদ দাসাধিকারী এবং আরও
কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত। পূজাপাদ মহারাজের সাক্ষাৎ
উপস্থিতিতে বৃন্দাবন মঠের বুলনযাত্রা উৎসব কৃষ্ণ-
কীৰ্তনানন্দময় হওয়ায় ভক্তহৃদয়ের অতীব উল্লাসজনক
হইয়াছে। ভক্তপ্রবর শ্রীরাধাক্ষিণ চামরীয়া মহোদয়
বহু অর্থব্যয়ে বৈজ্ঞাতিক যন্ত্রসাহায্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

বুলন ও তৎসহ অগ্গত বৃন্দাবনীয়া লীলা জীবন্তভাবে
প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।
মঠবাসিভক্তবৃন্দ ঐ সকল লীলায় শিক্ষণীয় বিষয় ও
উহাতে প্রবেশাধিকার লাভের ক্রমপস্থা সদৃশরূপদ্বিষ্ট
প্রকারে কীৰ্তন দ্বারা জনকল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।
এবার শ্রীশ্রীবুলন লীলার সহিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের
কালিয়দমন লীলা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল।
ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে মঠাশ্রিত বহু ভক্ত এই
উৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ মঠে শুভাগমন
করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শকের সমাবেশ
হইয়াছে। আসাম হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী
কতিপয় আসামদেশস্থ ভক্তসহ যোগদান করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠেও এবার
শ্রীল আচার্য্যদেবের রূপায় শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ জিউর
নয়নমনোভিরাম শৃঙ্গার ও হিন্দোলসেবা দর্শনার্থ
প্রত্যহ অগণিত দর্শক-সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের
পশ্চিম ও উত্তরদিক্হু অলিন্দে শ্রীভগবানের জন্ম ও
বাল্য পৌগণ্ডলীলার কতিপয় দৃশ্যও প্রদর্শিত
হইয়াছিল। শ্রীমঠের জন্মাষ্টমী উৎসবকাল পর্য্যন্ত
ঐ সংশিক্ষা প্রদর্শনী দর্শনার্থ উন্মুক্ত রাখা হয়।
প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে

ধর্মসভার অধিবেশনও নিয়মিতভাবে হইয়াছে।

আসাম প্রদেশের গোহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে মঠরক্ষক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি মহোদয়ের অক্লান্ত সেবাশ্রমে পূর্ব পূর্ব বর্ষের গ্রায় এবারও শ্রীশ্রীরাধা-নয়নানন্দ জিউর কুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব একটি সুদৃশ্য ও সংশ্লিষ্ট সম্বলিত প্রদর্শনী উদ্বোধন-মুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দ্বাদশটি দৃশ্য পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইয়াছিল :—

১। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, ২। শ্রীভগবদ্ বিমুখ জীবের হ্রগতি ও মুক্তি, ৩। দ্বাদশ বর্ষীয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সন্ন্যাসিহস্তে ভিক্ষাদান, ৪। শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মিলন, ৫। শ্রীকৃষ্ণাচলে মহাপ্রভুর শ্রীবাসুদেব নামক কুষ্ঠবিপ্রের উদ্ধার-লীলা, ৬। কাবেরীতটে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে শ্রীমদ্ব্যগ্রভু ও গীতাপাঠী ব্রাহ্মণ, ৭। গোদাস বা ইন্দ্রিয় দাসের হ্রগতি, ৮। গোস্বামী কে? ৯। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা, ১০। শ্রীরামচন্দ্রের হরধনু ভঞ্জন ও শ্রীসীতা-দেবীর পাণিগ্রহণ লীলা, ১১। শ্রীলক্ষ্মণের শক্তিশেলে মুর্ছাভিনয় ও শ্রীহনুমানজীর সেবাচেষ্টা, ১২। শ্রীহরির কূর্মরূপ ধারণ ও সমুদ্রমস্থান লীলা।

দর্শক জনসাধারণকে ঐ সকল দৃশ্যের পরিচয় ও শিক্ষাসার সংবেদনার্থ মঠরক্ষক ব্রহ্মচারীজী ‘সংশ্লিষ্ট-প্রদর্শনী সহায়ক’ নামক একখানি পুস্তিকাও (guide book) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সত্যানুসন্ধিসু দর্শকগণ খুবই উপকৃত হইয়াছেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শকের সমাবেশ হইয়াছে।

৩২ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট মঙ্গলবার সপ্তমী ঘ ২।১।৩০ পর্য্যন্ত থাকায় সপ্তমীবিদ্যা বলিয়া শুদ্ধবস্ত্রবিধান মতে ১লা ভাদ্র বুধবারই জন্মাষ্টমীর উপবাসাদি বিহিত হইয়াছে। এই বুধবার আবার শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মদিন। শ্রীভগবানের আরাধনগীতি শ্রীনামসঙ্কীর্তন-সহযোগে সুসম্পন্ন করাইবার জন্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীজন্মাষ্টমীর পূর্ব-

দিবস মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর-সঙ্কীর্তনশোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। শোভা-যাত্রা পরিচালন করিয়াছিলেন স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব। দক্ষিণ কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজপথ নামগানে মুবরিত করিয়া শোভাযাত্রা সন্ধ্যায় নির্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকাদি সম্পাদিত হইবার পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের রূপানির্দেশে প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কিছুক্ষণ বলেন, অতঃপর আচার্য্যদেব স্বয়ং সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। শ্রীভগবজ্জন্ম উপলক্ষি করিতে হইলে কিভাবে হৃদয়কে শুদ্ধ নির্মল করিতে হয়, তাহাই অতঃপর অধিবাসবাসরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। ১৮ আগষ্ট হইতে ২২ আগষ্ট পর্য্যন্ত দিবস-পঞ্চকব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর সভার অধিবেশন হইয়াছে। ১৮ আগষ্ট শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে অহো-রাত্র উপবাস, সমস্তদিবসব্যাপী শ্রীমস্তাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ এবং সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে সভার অধিবেশন হয়। রাত্রি ১১টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। মধ্যরাত্রে স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন।

পঞ্চদিবসীয় সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে (১) ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, (২) ভক্তি ও ভক্তের সর্বোত্তমতা, (৩) জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ, (৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অতুলনীয় মহিমা ও (৫) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য। সভাপতি-রূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে—(১) কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি—শ্রীতরুণ কুমার বসু, (২) ঐ বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, (৩) ঐ বিচারপতি—শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) ঐ বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং (৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহোদয়, ইনি বিশেষ জরুরী কার্য্য বশতঃ উপস্থিত

হইতে না পারায় পূজ্যপাদ আচার্যদেবের ইচ্ছামুত্বারা শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজই ঐ সভায় সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। প্রধান অতিথিরূপে বৃত্ত হইয়াছিলেন যথাক্রমে — (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, (২) শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস খাঁ, (৪) শ্রীনারায়ণ মিশ্র — য্যাড্‌ভোকেট, পুরী — ইনি বিশেষ কার্যবশতঃ আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই, (৫) বঙ্গীয় সংস্কৃতশিক্ষাপরিষদের সম্পাদক—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট বক্তৃকরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন — সভার তৃতীয় অধিবেশনে — শ্রীদ্বৈশ্বরীপ্রসাদ গোস্বামী এবং চতুর্থ অধিবেশনে — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু ইনিও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আসিতে পারেন নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমঠাধ্যক্ষ আচার্যদেব প্রত্যহই গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দান করিয়াছেন — ধন্যপুর শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ আচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমার সন্ত মহারাজ, উদালা শ্রীগর্ভভানবীদয়িত গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য — ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যলোক পরমহংস মহারাজ, দম্ভমহু শ্রীচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ আচার্য — ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকআচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকআচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগোড়ীয় সজ্ঞাপ্রমের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত পর্যটক মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীবিভূপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্যব্যাকরণপূরণতীর্থ প্রভৃতি।

নন্দোৎসবের দিবস শ্রীমঠ লোকে লোকারণ্য হয়।

মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর সমবেত অন্যান্য তিন সহস্র ভক্ত নরনারীকে বিবিধবৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর মূল শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে উক্ত উৎসবত্রয়ের বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমুলনকুঞ্জ রচনায় শ্রীমান্ মদন গোপাল গোস্বামী ও শ্রীমান্ সুশীল ব্রহ্মচারী বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে। তাহাদের সেবাচেষ্টায় কুঞ্জটি সর্বদা স্বন্দর হইয়াছে।

মূলন একাদশী দিন বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট এর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পঞ্চজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, (টিউপল্ বি-এস্-সি, বি-টি, এস্-সি, সি, টি, ইন্ কেমিষ্ট্রি) মূলন কুঞ্জের দ্বারোদ্বাটন করিয়াছেন। তৎপর শত শত দর্শনার্থী দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীজন্মান্তরীয়াসরে প্রাতঃ হইতে শ্রীধাম কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বৈকালে ডাঃ শ্রীসর্বোদয় দাস, এইচ, এম, বি, ভিষকরত্ন শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ আরম্ভ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং রাত্রি ১২টায় শ্রীভাগবত হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের-আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদী ফল-মুলাদি দ্বারা পারায়ণ করান হয়।

শ্রীশ্রীনন্দ উৎসবের দিন শ্রীধাম মায়াপুর দৈশো-দ্যানপন্নী, বল্লালদীঘি, নবদ্বীপ, শান্তিপুত্র ও কৃষ্ণনগর হইতে আগত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর দিনও মধ্যাহ্নে যথাবিধি অভিষেক পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদিত হইলে উৎসবে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের আন্তরিক সেবাচেষ্টায়ই এইসকল উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিগণও বিশেষ যত্নের সহিত সেবা-

কার্য সম্পাদন করিয়া উৎসবত্বরকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

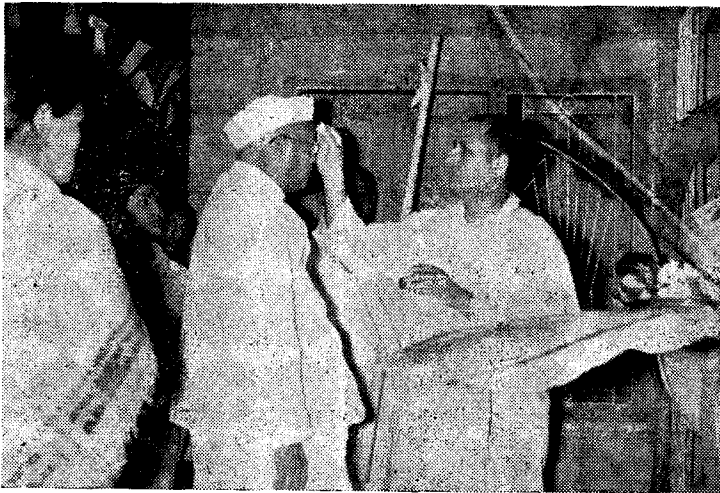
ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বোধায়ন মহারাজের তত্ত্বাবধান ও সেবাৎসাহ প্রদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল আচার্য্যাদেবের শুভেচ্ছায় ও রূপানির্দেশে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পাঞ্জাব প্রদেশস্থ চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্যগোড়ায় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবকালে তথায় শ্রীবৃন্দাবনস্থ মঠের জায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাধ্যো পরিচালিত একটি সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনী উন্মোচন পূর্বক পাঞ্জাব দেশবাসী সজ্জনসাধারণের প্রচুর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে রাত্রি প্রায় ১টা পর্যন্ত উক্ত প্রদর্শনী দর্শন ও উহার দৃশ্যসমূহের শিক্ষণীয় বিষয় শ্রবণ করিয়া শতমুখে উহার প্রশংসা গান করিয়াছেন। ১৭ই আগষ্ট হইতে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত এই প্রদর্শনী দর্শনার্থ উন্মুক্ত ছিল। ১৭ই

আগষ্ট তারিখে পাঞ্জাবের মহামাত্র গভর্নর বাহাদুর শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক স্বয়ং এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন পূর্বক সপরিবারে উহার দৃশ্যসমূহ দর্শন ও শিক্ষণীয় বিষয় শ্রবণ করতঃ প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীল স্বামিজী মহারাজ প্রসাদী মালাচন্দন-দ্বারা ধর্মপ্রাণ গভর্নর বাহাদুরকে সম্বর্জিত করেন। ১৮ আগষ্ট চণ্ডীগড়ের চীফ কমিশনার শ্রীযুক্ত টি, এন্ চতুর্বেদী মহাশয় সঙ্গীক শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ ও উক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। দিবসপঞ্চকব্যাপী এই অস্থানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ সজ্জন এবং বিদ্বী মহিলার সমাগম হইয়াছে।

শ্রীনন্দোৎসবদিবস উক্ত চণ্ডীগড় শ্রীমঠে সহস্রাধিক ভক্তনরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত কর হয়।

শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ উৎসবের বিভিন্ন সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।



শ্রীমদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পাঞ্জাবের গভর্নর বাহাদুর শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী মহোদয়কে প্রসাদী মালাচন্দন প্রদান করিতেছেন



কলিকাতা মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যাদেবের শুভেচ্ছায় তাঁহার নিখিল ভারতব্যাপী সকল মঠেই শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব বিশেষ যত্নের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে স্বয়ং আচার্য্যাদেবের শুভ উপস্থিতিতে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও সাক্ষাদভাবে তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত আন্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভজনচতুর ভক্তবৃন্দ এই উৎসবের মাধুর্য্যবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যাদেব পূর্ব্বাহ্ন হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবৃন্দামুরাজনন্দিনীর স্তবস্ততি পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে তাঁহার অসমোদ্ধ মহিমা কীর্তন করেন। তাঁহারই ইঙ্গিত অনুসারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতাবলী গ্রন্থ হইতে শ্রীরাধাষ্টক, শ্রীরাধার মাহাত্ম্যসূচক অন্যান্য পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তিত হয়। শ্রীমঠ-মন্দির আজ শ্রীরাধানাম-গানে সর্ব্বক্ষণ মুখরিত। অগণিত জনশ্রোতাঃ। তাঁহার (শ্রীল আচার্য্যাদেবের) ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীমদনগোপাল

দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীনিবাস দাস ব্রহ্মচারীর সহায়তায় মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধাধারীর মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। শ্রীরাধাধারীর প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি শুভা-বির্ভাবলীলার অপূর্ব্ব শৃঙ্গার প্রদর্শিত হয়। শ্রীবিগ্রহ-গণের শৃঙ্গারও অপূর্ব্ব দর্শন। মহা জয় জয় ধ্বনির মধ্যে অগণিত দর্শক নরনারী শ্রীরাধাবির্ভাব-লীলাদর্শনে কৃত কৃতার্থ হন। সকলকেই শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠ-ভবন আজ লোকে লোকারণ্য।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসারস্বতশ্রবণসদনে মহতী সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যাদেবের নির্দেশানুসারে প্রথমে শ্রীমদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীরাধার আবির্ভাবলীলা, তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলেন, অতঃপর শ্রীল আচার্য্যাদেব শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণামূলক বিস্তৃত ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্বে ও পরে কীর্তন হয়।



শ্রীগৌরলীলায়ই শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্ণতমত্ব

একই পরমতমত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তৃলীলায় — রস-রাজ স্বরূপ ও দাতৃলীলায় মহাভাব স্বরূপ — এই দ্বিবিধ স্বরূপ প্রকাশিত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন মাধুর্য্যের ভোক্তা, তখন তিনি সম্ভোগ রসময় — রসরাজ অপ্রাকৃত নবীনমদন, আর যখন তিনি মাধুর্য্যের দাতা তখন তিনি শ্রীরাধামাধবমিলিততত্ত্ব পরমকরণ ঐন্দ্র্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌররূপ — অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। মাধুর্য্য-রসের বর্ণ — শ্রাম আর মহাভাবের বর্ণ নানাবর্ণের সমাবেশ স্বরূপ — শবল বা গৌর। তাই ছান্দোগ্য শ্রুতি (ছা ৮।১৩।১) বলিয়াছেন —

“শ্রামাচ্ছবলং প্রপত্তে শবলাচ্ছ্রামং প্রপত্তে।”

অর্থাৎ শ্রাম হইতে শবলস্বরূপ গৌরে ও শবল বা গৌর হইতে শ্রামে প্রপন্ন হই। মাধুর্য্যবিগ্রহ হইতে ঐন্দ্র্য্যবিগ্রহের কারুণ্য ও ঐন্দ্র্য্যবিগ্রহ হইতে মাধুর্য্য-বিগ্রহের প্রেমের সন্ধান লাভ করা যায়। আবার ‘শবল’ বলিতে স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি, সূত্ররূপ শ্রামের আনুগত্যে হ্লাদিনীতে প্রপত্তি আবার হ্লাদিনীর আনুগত্যেই শ্রামে প্রপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে।

“হ্লাদিনীর সার ‘প্রেম’, প্রেমসার ‘ভাব’।

ভাবের পরমকার্তা নাম ‘মহাভাব’॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।

সর্বগুণধনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত ধীর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।

কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥”

— চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ

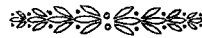
রায় রামানন্দ তৎসম্মুখস্থিত মহাপ্রভুকে অন্তঃকৃষ্ণ—
রসরাজ শ্রাম গোপরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে
কাঞ্চনপঞ্চালিকা বা পুতলিকাস্বরূপিণী মহাভাবস্বরূপা
শ্রীমতীরাধারাণীর গৌরকান্তি দ্বারা ঐ শ্রামকান্তিকে আবৃত
অর্থাৎ বহির্গৌররূপে — ‘রসরাজ মহাভাব — দুই এক-
রূপে’ দর্শন করিলেন।

নিজেই প্রেমের ভোক্তা, আবার নিজেই
সেই প্রেমের দাতা হইয়া মহাবদান্তলীলা প্রকট
করিতেছেন — ‘আপনি আচরি’ ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়’।

নিজেই নিজের ভজন করিয়া জগদগুরুরূপে কৃষ্ণভজন
—কিরূপে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণপ্রেমকে পাইতে হয়, তাহা
শিক্ষা দিতেছেন, ইহাই তাঁহার মহাবদান্ত লীলা।

শ্রুতি বলেন — “রাধয়া মাধবো দেবঃ।”

অর্থাৎ শ্রীরাধাদ্বারা মাধব শ্রীকৃষ্ণ দেব অর্থাৎ দীপ্তিমান।
পূর্ণশক্তি শ্রীরাধার নিকটই কৃষ্ণের সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকটিত।
শ্রীরাধামাধবমিলিততত্ত্ব শ্রীগৌরলীলায়ই শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য-
প্রধান মাধুর্য্যস্বরূপটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত। এই শ্রীগৌর-
লীলাই শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্টস্বরূপ হওয়ায় গৌর-
লীলাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণলীলার স্বয়ং ভগবত্তার পূর্ণতম
অভিব্যক্তি—অখিলরসায়নমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের রসচমৎকারিতা
পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না। মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য অপেক্ষা
ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যস্বরূপেই ভগবত্তার পরিপূর্ণতা এবং
নবনবায়মান রসচমৎকারিতা সম্প্রকাশিত।



শ্রীশ্রীবিজয়াদেশ্যনীর সাদর সন্তোষন

আমরা ‘শ্রীচৈতন্যবাণী’পত্রিকার সহৃদয় ও সহৃদয়া
গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকা বন্ধুবর্গকে আমাদের
শ্রীশ্রীচৈতন্যবিজয়াদেশ্যনীর হৃদয়-প্রীতি-সন্তোষন এবং
শুভ অভিনন্দন, অভিবন্দন ও অভিবাদন জ্ঞাপন করি-
তেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকর্তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
গোস্বামিপ্রভু তদীয় গ্রন্থরত্নের শ্রোতৃবৃন্দের বন্দনা ও
কৃপাপ্রার্থনাসূত্রে গ্রন্থশেষে সর্বদন্তে বলিয়া গিয়াছেন —
“সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
ধা-সবার চরণকৃপা — শুভের কারণ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত য়েই জন শুনে।

তাঁর চরণ ধুঞা করে’ মুক্তি পানে ॥

শ্রোতার পদরেণু করে’ মন্তক-ভূষণ।

তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥”

— চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২০।১৫০-১৫২

আমরাও তৎপদাঙ্কানুসরণে আমাদের ‘শ্রীচৈতন্য-
বাণী’ সমাদরকারিতত্ত্ব বন্ধকে সেইরূপ বন্দনা করতঃ
তাঁহাদের হাদী কৃপা-ভিখারী হইতেছি। তাঁহারা
সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।



শ্রীচৈতন্য-বর্ণা

‘চেতনোদর্পণমার্জনাং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচস্মিকাবিতরণং বিত্তাবধুজীবনম্।
আনন্দানুদ্বিভকনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতানন্দনং
সর্বান্নস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥’

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, কার্তিক, ১৩৮৩। { ৯ম সংখ্যা
২৪ দামোদর, ৪৯০ শ্রীগোরাঙ্ক : ১৫ কার্তিক, সোমবার ; ১ নভেম্বর, ১৯৭৬।

সজ্জন-নিরীহ

[ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীমত্তাগবতে সজ্জনের জীবনে নৈকর্মের আবিস্কার
কল্পিত হইয়াছে। নৈকর্ম বলিলে কর্ম চেষ্টা রাহি-
ত্যকে বুঝায়। ফললাভের চেষ্টাই কর্ম চেষ্টা। ভগবদ্-
ধর্ম্যে কর্ম চেষ্টা নাই, সুতরাং সজ্জন নিরীহ।

ফলভোগ-বাসনাই কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জীবের
হৃদয় শরীরে ও স্থূলদেহে ফলভোগ করিবার অবসর
হয়। যে-কালে জীব বদ্ধাভিমাণে ফলকামী হইয়া
জীবন যাপন করেন সেই সময় তাহার কর্মমার্গই
একমাত্র অবলম্বনীয়। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় স্থূল ও
হৃদয় শরীরের দ্বারা অচিৎ বস্তু ভোগ করেন। চিৎ-
স্তরই অচিৎ ভোগকেই কর্মকাণ্ডীয় স্থূল ভোগ বলে।
হৃদয় শরীরের দ্বারা অচিৎ হৃদয়ভোগ ভোগও কর্ম-
বাসনা। সজ্জন বদ্ধাবস্থায় স্বীয় স্থূল ও হৃদয় শরীরের
দ্বারা কর্মফল স্বয়ং ভোগ করিবার পরিবর্তে স্বীয়
আত্মানুশীলনপর অপ্রাকৃত মন দ্বারা কর্মফল ভোগ
বাসনা হইতে মুক্ত থাকেন। তখন বদ্ধাবস্থায় সজ্জনকে
অপ্রাকৃত বা জীবমুক্ত অভিমাণে সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ঈহা-শব্দের অর্থ চেষ্টা। ঋণকালের অন্তর্ভুক্ত স্থূল ও
অচিৎপর মন যে অহুষ্ঠানের আবাহন করেন তাহাই
ভুক্তিমার্গ। আবার তৎপরতার চেষ্টায় কোন বিশে-

ষয় না থাকিলে ঈহা মুক্তিমাৰ্গ। ভুক্তি ও মুক্তি এই
কলঘরের উদ্দেশ্য যাহা কিছু অহুষ্ঠিত হয়, সকল গুলিই
বদ্ধাভিমাণে চেষ্টা অথবা অনাশ্রয়চেষ্টা। ষাংরা ভুক্তি
ও মুক্তিকে শেষ ফল জ্ঞান করেন না, তাঁহারাই
হরিপরায়ণ বা সজ্জন। ভগবান হরি নিত্য ও অপ্রা-
কৃত বস্তু, তাঁহার লীলা নিত্য ও সেবক নিত্য।
কর্মকাণ্ডীয় চেষ্টায় ফলভোগ কামনা থাকায় হরির
উদ্দেশ্যহুত্রেও ঐ চেষ্টা নির্মূল্য নহে। যে কালে কেবল-
মাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের চিন্ময়-প্রবৃত্তি উদয়
হয় তাহা হৃদয় ও স্থূল দেহে প্রকাশমান হইয়া কর্মী
বা জ্ঞানিগণের ক্রিয়ার সহিত সমভাবে দৃষ্ট হয় কিন্তু
হৃদয়ভাবে তাদৃশ কাঁচা বিচার করিলে বুড়ুক্ষু ও মুমুক্শুর
চেষ্টার সহিত সজ্জনের চেষ্টায় সর্বতোভাবে বৈষম্য
দৃষ্ট হয়। বুড়ুক্ষু ও মুমুক্শুর চেষ্টা চিরদিনই সজ্জনের
হরিসেবা চেষ্টার সহিত পার্থক্য আছে।

সজ্জন নিরীহ, একরূপে প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মিতে
হইবে যে, সজ্জনের কৃষ্ণতর কোন চেষ্টা নাই। কৃষ্ণ-
চেষ্টায় সজ্জন জড়ে উদাসীন। তাঁহার অধিল
চেষ্টাতেই সপরিষ্কার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লক্ষ্যের বিষয়। সেই
জন্ত সজ্জনের কৃষ্ণার্থে অধিল চেষ্টা একটা প্রধান

সেবার অঙ্গ। কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে কৃষ্ণের জন্ত নিষ্কণ্ট চেষ্টা হইলেই তাঁহাকে জীবন্ত বা অপ্রাকৃত সজ্জন বলা যায়। সজ্জন নিরীহ, এই কথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণ-চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় নাই, প্রাকৃত রাজ্যের চেষ্টায় তাঁহার অধিকার নাই এই কথায়ই বলা হইল। অঘরভাবে অচিন্ত্যের অনুশীলনই কর্ম চেষ্টা এবং ব্যতিরেকভাবে অচিৎ বস্তুর প্রতি উদাসীন হইলে উহাই জ্ঞান চেষ্টা বা বৈরাগ্য। বিরক্ত পুরুষ যে-স্থলে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া ভোগফল নিরসনে ব্যস্ত, সেই সময়ে তিনি মুমুকু বা হরিসেবা-ধর্ম-রহিত, স্বার্থপর, অতন্ত্রিসমনরত, ভক্তিবিমুখ-চেষ্টা-যুক্ত। সজ্জনের এই সকল চেষ্টা কোনদিন নাই ও তাদৃশ চেষ্টা তাঁহার বাহ্যনীয় নহে। হরিবিমুখ মুক্ত ও হরিসেবক উভয়েই কর্ম-চেষ্টারহিত। হরিবিমুখের আলস্য ও নির্বিশেষভাবে তাঁহাকে ভগবানের চরণে অপরাধী করাইয়াছে, সেই জন্ত তিনি জড়ালস্যকেই

পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া হরিসম্বন্ধি-বস্ত্র মাত্রকেও প্রাপঞ্চিকবোধে হেয়জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্তিবিমুখ চেষ্টা মুমুকুর আছে বলিয়া তিনি জড়ে চেষ্টাবিশিষ্ট অচিন্ত্যতে উদাসীন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানীর অতিরিক্ত জ্ঞানচেষ্টা বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান তাঁহার জ্ঞানকে পরম উপাদেয় ভগবজ্জ্ঞান হইতে হরিবিমুখ-শক্তি মায়া কল্ক কর্তৃক বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে। এইরূপ মায়িক চেষ্টা সজ্জনের নাই বলিয়া তিনি নিরীহ। মুমুকু কর্ম-চেষ্টাবলম্বনে অচিদ্ব রাজ্যের সহায়তায় মুক্ত হইতে সচেষ্ট; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ কোন মায়িক চেষ্টার আবাহন করেন না।

অগ্নাভিলাষী, যথেষ্টাচারী, কর্মফলভোগী এবং কর্ম-ফলভোগী জ্ঞানী সকলই স্থূল ও হৃদয় দেহের চেষ্টায় বিব্রত কিন্তু সজ্জন তাদৃশ বৃত্তি মায়ার উদ্দেশে পরিচালনা না করায় তিনি নিরীহ। আবার আত্মচেষ্টায় নিত্য হরিসেবাপর অন্তর্ধান দেখা গেলেও তিনি জড়ে উদাসীন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(প্রচার)

প্রঃ — আচারপ্রিয়, প্রচারপ্রিয় ও আচার-প্রচার-প্রিয় ভক্ত কাঁহার?

উঃ — “বিভক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয় এবং গোষ্ঠ্য-নন্দিগণ সর্বদা প্রচারপ্রিয়; তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়-প্রিয়ভাবেই আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎস্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবান্ন-কীর্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্য।” — চৈঃ শিঃ ৩৩

প্রঃ — মহাপ্রভুর ধর্ম কি প্রার্থ্যা নহে?

উঃ — “মহাপ্রভু সকলকেই বৈষ্ণবধর্মের প্রচার-ভার দিয়াছেন।” — জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ — প্রচারে কিরূপ নীতি অবলম্বনীয়?

উঃ — “অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নান-উপদেশ দিবে। যে-স্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সে-স্থলে এমত

বাক্য বলিবে না — বাহাতে প্রচার-কার্যের ব্যাঘাত হয়।” — জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ — শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিপুলভাবে শ্রীমদ্ব্য-প্রভুর আজ্ঞা-প্রচারের জন্ত কি প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন?

উঃ — “নগরে-নগরে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন ও শ্রীগৌরান্দের শিক্ষা প্রচার করুন। * * আপনারা হস্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লইয়া দ্বারে-দ্বারে শ্রীমদ্ব্যপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরি-দাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্বদেশে শ্রীগৌরান্দের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল-প্রচারে সৎপাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায়,

আপনারা অবিলম্বে একটি বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচরিত্র লোকদিগকে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন।”

— ‘শ্রীমদগোবিন্দ-সমাজ’, সং: তো: ১১।৩

প্র: — “পূর্বতন বৈষ্ণববর্গ ও গোস্বামিপাদগণ কি ভাবে বৈষ্ণবধর্ম-সংরক্ষণ ও প্রচারণ করিয়াছিলেন? বর্তমান যুগেও কোন শক্তিতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইতেছে?”

উ: — পূর্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদেরা কেহ কেহ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, কেহ কেহ নানা পদ-পদাবলী, কেহ কেহ বা ধর্ম প্রচার ও হরিসংকীর্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অন্তঃপন্য বৈষ্ণবতা দ্বারা বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কাল-প্রভাবে নানা উপধর্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় মহাপ্রভু আচার নিজ-শিক্ষা ও প্রেমবিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুনা অনেকের মন-আকর্ষণ এবং কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।”

— ‘বৈষ্ণবসভা তথা বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার’, সং: তো: ২।১

প্র: — শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ-ধর্ম-সংরক্ষণের জন্ত কলঙ্ক-রোপকারীদিগের প্রতি কি কর্তব্য?

উ: — “শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে ঐ ধর্মপুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার জন্ত যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ সকল কীট ধর্মপুষ্পের কেবল যে মৌগন্ধই হরণ করিতেছে, এমত নয়; উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশ: কাটিয়া কাটিয়া নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্য-দেব, প্রভু-নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পতন করিবার জন্ত যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়ও বা উষ্ম-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিফল হইয়াছে, কোথায়ও বা অযথা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া অযথা ভূতরু হইয়া উঠিয়াছে।”

— ‘সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য’, সং: তো: ২।৪

প্র: — বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্ত কি করা কর্তব্য?

উ: — “বৈষ্ণবধর্মকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দোষাত্ম্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।” — ‘ভেকধারণ’, সং: তো: ২।৭

প্র: — ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দ্বষ্ট-মত নিরসনের জন্ত কিরূপ সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন?

উ: — “যদি আপনার দেশে ঐ সকল দ্বষ্ট-মত থাকে, তাহা হইলে আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত ও তক্ষক লোকের সখিত যদি মনোবাদও হয়, তাহা হইলে তাহাও শ্রীমহাপ্রভুর খাতিরের স্বীকার করিবেন।”

— ‘সহজিয়ামতের হেয়ত্ব’, সং: তো: ৪।৬

প্র: — শুদ্ধভক্তি প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তিবিরোধি-গণের চরিত্র-বিলেপণ আবশ্যক কি?

উ: — “ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়। সেই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয় লাভ হয় না।” — ‘সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য’, সং: তো: ২।৪

প্র: — পৃথিবীর সকল ভাষায় শ্রীচৈতন্যের লীলা লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় কেন?

উ: — “শ্রীচৈতন্য-লীলা সকল ভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয়। অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সর্বদেশ-ব্যাপী হইয়া একমাত্র উপাস্ত-তত্ত্ব হইতেছেন।”

— ‘সমালোচনা’, সং: তো: ৪।৩

প্র: — শ্রীচৈতন্য-কথা বিস্তার ও তদীয় পদাঙ্কপূত তীর্থোদ্ধারের জন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কিরূপ আতি ছিল?

উ: — “শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ-ঘাটে (যেখানে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইখানে) ভক্তগণ একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন; এই কাঁধটি যদি হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীমহাপ্রভুকে ভালরূপ প্রচার করা হয়। আবার শুনিলাম যে, শ্রীগয়াক্ষেত্রে যেন্থলে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষতীর্থের উপকারে একটি সেবা প্রকাশ করিবার জন্ত

অত্ৰহু কোন প্রভু-সন্তান বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

* * এখন কালীধামে চন্দ্রশেখর-ভবন (যেখানে মহা-প্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন) কোথায় আছে, তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন।”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা’, সঙ্গিনী সং: তো: ৮।১

প্র: — প্রচারকগণ কোন্ যত্নে মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার করিবেন?

উ: — “প্রেমহত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য করিতেন; তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্তই আজকাল অত্যাশ্রয় ধর্মে বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না।” — চৈ: শি: ১।২

প্র: — স্বয়ং শ্রীমদ্রূপ-প্রভু ও পার্শ্বদর্শক কে কিরূপ-ভাবে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন?

উ: — “কলিযুগপাবনাবতার অপার-রূপা-পারাবার শ্রীমদগোক্রমচন্দ্র সম্মান করিয়া জগতে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমদ্রূপ-প্রভু ও শ্রীমদ্রূপ-অধৈত প্রভুকে শ্রীনাম ও ভগবন্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্ত শ্রীমদ্রূপ-সনাতনাদি গোষ্ঠামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোষ্ঠামী শ্রীমদ্রূপ-প্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই নামরসার্থা গোষ্ঠামীপ্রবর যে নাম-মহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা অত আপনাদের নিকট আমি গান করিতেছি; রূপা-পূর্বক শ্রবণ করতঃ শ্রীহরিনামের মহিমা অমুভব করুন।”

— ‘নাম-মহিমা’, বৈ: সি: মা: ৫৫ গুটী

প্র: — নামহট্টের পত্তনকারী কে এবং তাঁহার আজ্ঞা-টহলটি কি?

উ: — “নদীয়া-গোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন।

পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হে!

প্রভুর রূপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥

অপরাধশূন্য হৈয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি’ অনাচার।

জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম — সর্বধর্ম-সার॥”

— ‘নাম-প্রচার’ (আজ্ঞা-টহল), বৈ: সি: মা: ৬ষ্ঠ গুটী

প্র: — নামহট্টের মূল-মহাজন, কর্মচারী ও টহল-দার পদবীর কার্য কি কি? শুদ্ধ টহল কিরূপে হয়?

উ: — “শ্রীমদ্রূপ-প্রভু কলি-জীবের প্রতি রূপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোক্রমহু নামহট্টের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক-মহাশয়গণই এই কার্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস-ঠাকুর সর্বপ্রাণে নিজে-নিজে ঐ কার্য করিয়া উক্ত পদের মাংসাদি দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদি আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নয়।

টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন—হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি তোমার নিকট কোন পাণ্ডি বস্ত্র বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, তুমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণ ভজন কর ও কৃষ্ণ শিক্ষা কর। * * * হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ভাগ-পূর্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিত্যন্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চন, বন্দন, দাত্ত, সখা ও আত্মনিবেদন-দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমাগে বা রাগমাগে ভজন কর।

* * * হে শ্রদ্ধাবান্ জন! দশ অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান,

দ্রবীণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিংকণ-
কৃষ্ণ — চিংহুয়া, জড়জগৎ — জীবের কারাগার।
জড়াতীত-কৃষ্ণলীলাই আমাদের প্রাপ্য ধন। * * *

হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণ-বহিস্মুখ হইয়া
মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা
তোমার যোগ্য নয়। * * * চৌধা, মিথ্যা-ভাষণ,
কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীব-হিংসা, কুটীনাটী
প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য —
সমস্তই অনাচার। সে-সমস্ত ছাড়িয়া সত্বপাথের দ্বারা
কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্বজীবে
দয়া-পূরক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর।
কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপাদি তোমার সিদ্ধ-স্বরূপগত নয়ন-
গোচর হইবেন। অন্নদিনের মধ্যেই তোমার চিং-
স্বরূপ উদ্ভিত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রে তুমি ভাসিতে
থাকিবে।”

—‘নাম-প্রচার (আজ্ঞা-টহল), বৈঃ সিঃ মাঃ, ৬ষ্ঠ গুটী

প্রঃ — শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও
শ্রীমন্তজিবিনোদ ঠাকুর নামহট্ট প্রচারে কিরূপ উত্তম
ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন?

উঃ — “আমরা বিগত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে
উক্ত গ্রামে (আমলাঘোড়ায়) উপস্থিত ছিলাম। পূর্ব
রাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার
সময় গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্তনে
বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ-
দাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্তী করিয়া সকলে
প্রপন্নাত্মমে পৌছিলেন। তথায় কীর্তন-সময়ে বাবাজী

মহাশয়ের যে-সকল ভাব উদ্ভিত হইতে লাগিল, তাহা
বর্ণনা করা যায় না। শতবর্ষের উর্দ্ধ বয়সেও যে
প্রেমানন্দে সিংহের ছায় তাঁহার নৃত্যে এবং মধ্যে
মধ্যে “নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে
নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে। দয়াল
নিতাই আমার জগা’র মার খেয়ে প্রেম দেয় রে।”
— ইত্যাদি ধূয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার অজস্র
ক্রন্দন ও ভূমি-লুণ্ঠন-সময়ে তথায় একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের
উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্ত্র দেখা যায় না। বাবাজী
মহাশয়ের ভাব দর্শন করিয়া এবং কীর্তনানন্দে নিমগ্ন
হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রু-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে
গদগদ হইয়া বহুকণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেককণ
পরে কীর্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নামহট্ট-বিষয়ক
একটি বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ
প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাত্মমের কার্য্য সেইদিন হইতে
আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণিপতি
মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে তদ্বিবেসেই
প্রপন্নাত্মম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্বদেখে
স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্ত-
সমাজে তৎকালে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত
জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাত্মম-প্রতিষ্ঠার
সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্বতো-
ভাবে স্মৃষ্ট। যে-যে গ্রামে প্রপন্নাত্মম স্থাপিত হয়,
তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপেই করা কর্তব্য।”

— ‘আমলাঘোড়া প্রপন্নাত্মম-প্রতিষ্ঠা’, সংঃ তোঃ ৪।২

৪ঃ৪ঃ

উপাস্ত্র, উপাসক ও উপাসনা-বিচার

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিবস্বামী শ্রীমন্তজিবিনোদ পুরী মহারাজ]

উপাস্ত্র বিচার স্বয়ং ‘যিনি গোবিন্দ, তিনিই
কালী, মূলতঃ এক। ধর্ম্মও একটাই। গোরকে
ভজন ক’রলে যেখানে পৌছানো যাবে, সেখানেই
পৌছানো যাবে কালীকে ভজলেও।’ এই প্রকার
কথা পাঁচমিশালী পঞ্চোপাসকী লোকের মুখে প্রায় সর্বত্রই

শুনা যায়। ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তগণ এক কৃষ্ণকেই
সর্বোপায়ে — সারাৎসার বলিয়া জানেন। সর্বদর্শী,
সর্বসাক্ষী, প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎগাতীত পুরুষো-
ত্তম বিগুরুস্ব শ্রীহরির (ভাঃ ১০।৮।৫) আরাধনার
সহিত গুণময়ী দেবীর আরাধনা এক কি করিয়া

বলা যাইতে পারে? বিভিন্ন কামনা বাসনা দ্বারা
অপহৃত-বিবেক (গীঃ ৭।২০) হইয়া মানুষ তাহাদের
প্রার্থনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট (অন্তব্য — গীঃ ৭।২৩)
ফল শীঘ্র শীঘ্র লাভার্থ তত্তৎকাম্য ফলদাতা বিভিন্ন
দেবদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহা যে
'অবিধিপূর্বক' ভজন (গীঃ ৯।২৩) হইয়া যায়, তাহা
তাহারা বুঝিতে পারে না। ভগবদ্ভজন ও দেবদেবীর
ভজন এক হইলে গীতার 'যান্তি দেবত্রতা দেবান্ ...
..... যান্তি মদ্ব্যজিনোহপি মাম্' (গীঃ ৭।২৩ ও
৯।১৫) এইরূপ ফলভারতম্য প্রদত্ত হইত না।
শীঘ্র শীঘ্র কর্ম সাফল্য লাভের জন্য কামনাকারি-
ব্যক্তিগণ কর্মমার্গে দেবতাদিগের যজনে প্রবৃত্ত হইয়া
স্বর্গাদিময়ী কর্মজা সিদ্ধিলাভ করেন (গীঃ ৪।১২)।
গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্রাদিতে
শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুতত্ত্বকেই মুখ্যভাবে উপাস্ততত্ত্বরূপে বিচার
করা হইয়াছে। শ্রীকাম বা শ্রীপুরুষের পরস্পর
প্রীতিকামী ব্যক্তি শ্রীদুর্গা বা উমাদেবীর, ব্রহ্মতেজস্কাম
বেদপতি ব্রহ্মার, ইন্দ্রিয়পটুতাকামী ইন্দ্রের, পুত্রাদিকামী
দক্ষাদি প্রজাপতির, তেজস্কাম অগ্নির, ধনার্থী বসু-
গণের, বলবীর্ঘ্য প্রার্থী রুদ্রগণের, ভক্ষ্যভোজ্যাকামী
অদিতির, স্বর্গকামী দ্বাদশ আদিত্যের, রাজ্যাকামী
বিশ্বদেবগণের, কুবিবাণিজ্যাদির স্বাবীনতাকামী সাধ্য-
গণের, আয়স্কাম অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, পুষ্টিকামী ইলা বা
পৃথিবীর, প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বপদ হইতে অবিচ্যুতিকামী
লোকমাতরোরোদসী অর্থাৎ লোকাধিষ্ঠানভূত স্বর্গ ও
পৃথিবীর, রূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাভিলাষী গন্ধর্বগণের,
শ্রীকাম পুরুষ উর্কশী অঙ্গরার, আবিপত্যাকামী অর্থাৎ
সকলের উপর কর্তৃত্বকামী পরমেশ্বর ব্রহ্মার, যশস্কাম
যজ্ঞসংজ্ঞক ইন্দ্রের, কোষকাম বা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী
প্রচেতাঃ বা বরুণের, বিদ্যাভিলাষী শিবের, ধর্মার্থী
ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক বিষ্ণুর বা পুণ্যশ্লোক ধামিক
জনাতির, সন্তানাদির বিস্তারকাম ব্যক্তি পিতৃগণের,
ব্রহ্মাকাম বা বাধানিবৃত্তিকাম ব্যক্তি পুণ্যজন বা যক্ষ-
গণের, বলার্থী ব্যক্তি মরুদগণের, রাজত্বলিপ্সু ব্যক্তি
মহন্তরাবিপ দেবগণের, শত্রুর মৃত্যুকামী নিশ্চতি বা

বীক্ষসের, কাম কাম বা কামভোগেচ্ছ ব্যক্তি সৌম-
দেবের অর্চনা করিয়া থাকেন; কিন্তু 'অকামঃ পুরুষঃ
পরম' অর্থাৎ কামনাক্ষর কামী ব্যক্তি পরম পুরুষ —
পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করেন।

— ভাঃ ২।৩।২-৩

'অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারবীঃ।

তীত্রেণ ভক্তিব্যোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্॥'

— ঐ ভাঃ ২।৩।১০

অকাম — একান্তভক্ত — ভজনীয় পরমপুরুষস্বরূপ-
মাত্রই বাহার স্বরূপ, সর্বকাম — উক্তাত্মক সর্বকাম-
যুক্ত বা মোক্ষকাম — মুমুক্শু ব্যক্তি উদার বুদ্ধি বা সুবুদ্ধি
হইলে তীত্ৰ ভক্তিব্যোগ দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানের যজ্ঞ
করিবেন। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন —

“উদারবীঃ সুবুদ্ধিঃ, কামরাহিত্যে কামসাহিত্যে
বা ভক্তের্ভগবদ্বিষয়ত্বমেব সুবুদ্ধিচিহ্নম্, তদভাবে এব
মন্দবুদ্ধিচিহ্নমিত্যর্থঃ। তীত্রেণ জ্ঞানকর্ম্মামিশ্রণ
মেবাতিমিশ্র এব সৌরকিরণে যথা তীত্রেঃ স্থাৎ
তথৈত্যর্থঃ।”

[অর্থাৎ উদারবী — সুবুদ্ধি। কামরাহিত হউক
বা কামসহিত হউক, ভক্তির ভগবদ্বিষয়ত্বই সুবুদ্ধির
চিহ্ন, তাহার অভাবকে মন্দবুদ্ধির চিহ্ন জানিতে
হইবে। তীত্রেণ অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি অবিমিশ্র ভক্তিব্যোগে।
মেবাদি অমিশ্র সূর্য্যাকিরণ যেমন তীত্রে হয়, সেইরূপ
শুদ্ধভক্তিব্যোগ দ্বারা।]

“পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, সত্বের সহিত
রজোগুণমিশ্রণে—সূর্য্যোপাসনা, সত্বের সহিত তমো-
গুণমিশ্রণে—গণেশোপাসনা, রজোগুণের সহিত তমো-
গুণের মিশ্রণে—শক্তির উপাসনা ও তমোগুণে—নিবো-
পাসনা এবং কেবল রজোগুণে সর্বশ্রেণীর উপাসনা-
ময় মানবের রুচি আছে। বিভিন্ন রুচির উপযোগিতা-
ক্রমে উপাস্ত ও উপাসকের সম্মিলিতা। সত্বরজোমিশ্র
স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সূর্য্যোপাসনায় লৌকিক ধর্ম্মকে প্রাপ্য
জ্ঞান করেন। সত্বতমঃস্বভাবে গণেশের উপাসনায়
অর্থপ্রাপ্ত্যাশা, রজস্তমঃ স্বভাবে কামপরিতৃপ্তিরজন্য শক্ত্যু-
পাসনা এবং তমঃস্বভাবে মোক্ষাকাঙ্ক্ষাবশে শিবোপাসনায়

কৃতি হইয়া থাকে। বিষ্ণুর উপাসনায় কোন কামনা নাই। ভোগপর উদ্দেশ্যে কামনার জন্ম হয়। কামদেব বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইলে তাঁহার অভিলাষ-পূরণরূপ সেবাই জীবের নিত্যধর্ম। নিত্যধর্মের বিশ্বাস হইতেই বিষ্ণুরূপ পরিবর্তন করিয়া নিজকাম পরিতৃপ্তির জন্য সমশীল দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্তি ঘটে। ভূত-পূজকগণ জীবিতোত্তরকালে ভূতলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃ-পূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, বহুদেবযাজিগণ তত্ত্বদেবলোক লাভ করেন। তাৎকালিক বাসনাবশে জীবের ঐ প্রকৃতির নশ্বরগতি লাভ হয়।” (শ্রীল প্রভুপাদ)

‘রজস্বমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলাঃ ভজন্তি বৈ।

পিতৃভূতপ্রাজ্ঞেশাদীন্ শ্রীরৈষধ্যাংপ্রজ্ঞস্ববঃ॥’

—ভাঃ ১১২২৭

অর্থাৎ রজস্বমঃস্বভাবযুক্ত স্মৃত্যায় পিতৃভূত প্রজাপতি প্রভৃতি স্ব স্ব ইষ্টদেবতাগণের সমস্বভাববিশিষ্ট জনগণ লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রকামী হইয়াই ঐ সকল ফলদাতা পিতৃ প্রভৃতি দেবতাস্বরগণের যজ্ঞ করেন।

শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি — তাঁহার চিল্লীলা পুষ্টিকারিণী; তাংহাই যোগমায়া নামে খ্যাত—ইনি উন্মুখতোষণী বা লীলাপুষ্টিনিমিত্ত উন্মুখ মোহনকারিণী, এই যোগমায়া চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপিণী বিমুখমোহনকারিণী বহিরঙ্গা ‘মায়াশক্তি’। ইনি ত্রিগুণময়ী। অন্তরঙ্গা যোগমায়াই প্রধান, বহিরঙ্গা মায়া তাঁহার—অংশবিশেষ। ‘পঞ্চদশীতে’ এই মায়ায় আবার বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ও মলিনসত্ত্বপ্রধান। এই দুই অবস্থায় মায়া ও অবিজ্ঞা এই দুই নাম দেখা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার ভাঃ ১০১২৫ শ্লোকের টীকায় নারদপঞ্চরাত্রে ঐতিবিজ্ঞা-সংবাদ হইতে এই যোগমায়া ও মহামায়ার বিচার উদ্ধার করিয়া দেখাই-তেছেন — “জ্ঞানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদা-ত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিশ্বস্বরূপিণী। যন্তা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমানন্দঃ। মুহূর্ত্তাদেব দেবন্ত প্রাপ্তির্ভবতি নান্তথা। একেয়ং প্রেমসর্বস্বভাবা গোকুলে-শ্বরী। অনয়া স্তলভোজ্যে-আদিদেবোহখিলেশ্বরঃ॥ অন্তা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং

জগৎ সর্ব সর্বের দেহাভিমানিনঃ॥”

অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটিই পরাশক্তি, তাংহা একা, অনংশা প্রভৃতি নামে নানাশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। তাংহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিশ্বস্বরূপিণী পরা শক্তির বিজ্ঞানমাত্রেই পরাংপর পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্বস্বভাবা গোকুলাধিপতীযোগমায়া। ইহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সঙ্কল্পে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহারই আবরণী শক্তি প্রজ্ঞাশক্তি-কারিণী মহামায়া। তাঁহার দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানী ব্যক্তি মুগ্ধ হইতেছে।

‘যোগমায়া’ সম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীতে লিখিত আছে — “যোগো ভগবচ্ছক্তিবিশেষঃ স এব ব্রহ্মাদীনামুপমোহ-নামায়া, তাং জগৎকারণশক্তিতোহপি পরাবস্থামেকানং-শাখ্যাম্।” (ভাঃ ১০২১৬)

অর্থাৎ যোগ — ভগবচ্ছক্তিবিশেষ, ব্রহ্মাদিরও মোহন-হেতু মায়া, সেই জগৎকারণশক্তি হইতেও পরাবস্থা, একা, অনংশা নামী।

শ্রীভগবান্ এই যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার রাবাদি যাবতীয় লীলা পুষ্ট করিতেছেন।

চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য এবং শ্রীগৌরানুগত গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে শিব বা শক্তির আরাধনা করেন না, শ্রীশিব বা শক্তিকে পরম বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী শক্তি বিচারে শ্রীবিষ্ণুনির্মাল্য-দ্বারাই তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। দার্শনিক বিচারে ‘শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ’ বিচার থাকিলেও শক্তি তত্ত্ব সর্বথাই শক্তিমত্ত্বের ইচ্ছাধীন। চিচ্ছক্তি যোগমায়া বা অচিচ্ছক্তি ত্রিগুণময়ী মহামায়া উভয়েই কৃষ্ণচ্ছা পরতন্ত্রা হইয়া অন্ন বা ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য করিয়া থাকেন। তবে শ্রীযোগমায়া শ্রীকৃষ্ণচ্ছায় উন্মুখমোহনকার্য্য করেন, মায়া স্বেচ্ছায় কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকে দণ্ড দান রূপ বিমুখবিমোহনকার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের উপরই এই বহি-রঙ্গা মায়ায় অধিকার, এজন্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন — ‘কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥’ (চৈঃ চঃ মঃ)

‘কৃষ্ণনিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি’ গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় ঝাঙিল।’ (চৈঃ চঃ ম ২২।২৪) কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবান্ধা করে। নিকটস্থ মায়া ভাবে জাপটিয়া ধরে।’ ‘কৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়। কৃষ্ণোন্মুখী মুক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়।’ (চৈঃ চঃ ম ২৪।১৩১), মায়ায় এই বহির্মুখ জীব-সম্মোহনকৰ্ম্মটি ভগবানের তাদৃশ রুচিকর নহে; এজন্য মায়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে বিলজ্জমানা হন —

“বিলজ্জমানয়া যন্ত স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।”

— (ভাঃ ২।৫।১৩)

অর্থাৎ “কপটী শ্রী যেমন পাছে স্বামী আমার কপট ধরিয়া ফেলেন, এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখীনা হইতে লজ্জা বোধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণদাসী জড়মায়াও জীব মোহন কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া উক্ত অপকার্য্যকারিণী জীব ত্রায় ভগবানের সাক্ষাদ্ দৃষ্টি-গোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করে। জীবসকল ঐ ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়ায় দ্বারা মোহিত হইলে বিপর্য্যয়-বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবোধ করিয়া ‘আমি আমার’ এইরূপ স্লামা করিয়া থাকে।” [বিকথন্তে (‘স্লামা’ — শ্রীস্বামিপাদ। অথবা বুধা জগন্তি।)]

অস্বাদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঐ শ্লোকের ‘বিবৃতি’তে লিখিয়াছেন —

“মহাবদান্ত ভগবান্ সকল জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজ প্রসাদ প্রদান করেন। যাহারা সেবাতৎপর নহে; তাহাদিগকে মায়া বিপথগামী করাইয়া হরিসেবায় বাধা প্রদান করেন। ভগবান্ মায়ায় এই কার্য্য অহুমোদন না করিলেও মায়াদেবী দাস্তৃত্বে ভগবৎসেবায় উদাসীন জনগণকে নানাপ্রকার দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগেরই কৃষ্ণোৎকর্ষার উপযোগিতা গোণভাবে প্রদান করেন। মায়া যে জীবমোহনকার্য্যে প্রবৃত্তা, তাহা ভগবানের অহুমোদিত নহে বলিয়া তিনি বিলজ্জমানা হইয়া তাদৃশ কার্য্যে রত থাকেন। মায়ায় এতাদৃশ কার্য্যও ভগবৎসেবা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে

মায়ায় এই কার্য্য লজ্জাকর হইলেও ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা তিনি যে ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার যোগ্যতা আছে। তিনি ভগবান্কে প্রতারিত বা মোহিত করেন না। ভগবৎবিমুখ অবিচ্ছিন্ন জনগণকেই ভগবদিতর বিষয়ে অল্পরাগ প্রদান করিয়া বাহজগতে ‘আমি আমার’ ধারণা করাইয়া থাকেন। উহা জীবের স্বরূপগত বিচার নহে। ভগবৎসেবা পরিহার করিয়া মায়ায় ক্রীড়াপুত্তলি হওয়া জীবের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও মূঢ়তার পরিচয় মাত্র।”

গীতা ৭।১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ এই অলৌকিকী গুণময়ী দুরতিক্রমা মায়াকে তাঁহারই মায়া—‘মম মায়া’ বলিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহার ভগবৎস্বরূপে নিষ্কপট প্রপত্তি ব্যতীত এই মায়ায় হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আর কোন উপায়ই নাই।

“কৃষ্ণ সূর্য্যাসম মায়া ঘোর অন্ধকার।

যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ায় অধিকার।”

— চৈঃ চঃ

কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি অম্বর প্রকৃতি ব্যক্তিগণ কৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও পরমেশ্বর বলিয়া বুদ্ধিতে পারেন নাই। ‘মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্বত্বজ্ঞান’। অতএব কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের উপরই এই বহিরঙ্গা মায়ায় যত কিছু বিক্রম প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। আগার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধনকার্য্য শ্রীভগবান্ এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিদ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকেন —

‘সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যন্ত ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।

ইচ্ছাহরূপমপি যন্ত চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষ তমং ভজামি।”

— ব্রহ্মসংহিতা ৪৪ শ্লোক

অর্থাৎ “স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিহ্নকতির ছায়াস্বরূপা প্রাপক্ষিক জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপুঞ্জিতা দুর্গা। তিনি যাহার ইচ্ছাহরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।”

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীৰ দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইতেছে—

ঋতৈৰ্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চান্মনি।

তদ্বিছাদান্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

“স্বরূপতত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। (যেমন ‘আমি’ না থাকিলে আমার ছায়ার কোন অস্তিত্ব থাকে না, অথচ ছায়াটি কিছু ‘আমি’ নহি, তদ্রূপ।) স্বরূপতত্ত্ব স্বরাস্থানীয় জ্যোতির্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাসস্থানীয়া জীবমায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণমায়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়ও বলিতেছেন—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিম্ভজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতেবশাং ॥

—গীঃ ৯।৮

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—
হে অর্জুন, আমি আমার ত্রিগুণাত্মিকা জড় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া (অর্থাৎ নিজ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ‘অবষ্টভ্য’ আশ্রয় করিয়া) এই সকল ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। সৃষ্টাদি জড় ব্যাপারে আমি স্বরূপতঃ উদাসীন। অতএব আমার ইচ্ছাবশে প্রকৃতি হইতেই এই সকল সৃষ্টি-কার্যাদি হইয়া থাকে।

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোশ্বেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

—গীঃ ৯।১০

অর্থাৎ হে অর্জুন, প্রকৃতি আমারই শক্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার চিদ্বিলাস সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যাক্ষতা আছে জানা যায়। সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রোজ্জুত হয়। (ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে—শ্রীভগবান্ দূর হইতে

প্রকৃতিতে যে ঈক্ষণ করেন, রমাদেবী সেই ঈক্ষণ প্রকৃতিতে সংযোগ করিয়া দেন। Direct সাক্ষাৎ বা সরাসরি ঈক্ষণ নাই।)

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে,—

ভক্তিব্যোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেহমলে।

অপশ্রুৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥

—ভাঃ ১।৭।৪

অর্থাৎ ভক্তিব্যোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সমাগ্রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তিদম্বিত (পূর্ণপুরুষ অবতারী স্বয়ং ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন।

‘অপাশ্রয়াম্’ শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—

“অশ্রু অপ অপরঃ পশ্চিমভাগ এব আশ্রয়ো যন্তাস্তাং (ভাঃ ২।৫।১৩) বিলজ্জমানয়া যন্ত স্তাতুমাক্ষা-পথেহমুন্মেষতানেন তন্তা ভগবৎ পৃষ্ঠদেশাশ্রয়ত্বেনোক্তেঃ।”
সুতরাং এই বহিরঙ্গ মায়ার ভজন ও পূর্ণ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কখনও এক হইতে পারে না।

অন্তরঙ্গা যোগমায়া — বিশুদ্ধস্ব পরিণতিরূপা চিহ্নজি। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাবাস বা অন্তঃপুর শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে ইনি কৃষ্ণদাসীরূপে কৃষ্ণের রাসাদিলীলায় নানাভাবে সেবা পরায়ণা, মধ্যমাণস পরব্যোমে যোগমায়াবির অবস্থিতি নাই। বাহ্যাবাস দেবীধামে জীবগণের রক্ষয়িত্রী জগন্ময়ী। ইহারই দাসীরূপে মায়া এই দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী। সর্ব্বোপরিস্থ গোলোক-ধাম ও তন্নিম্নস্থ হরিধাম পরব্যোম—অপ্রাকৃত চিহ্নজি-বিভূতি বিশিষ্ট ধাম, তাহা ‘ত্রিপাদৈশ্বর্য্য’ নামে আখ্যাত আর মায়িকবিভূতিযুক্ত দেবীধাম—‘একপাদ’ নামে প্রসিদ্ধ। (চৈঃ চঃ মধ্য ২১শ পঃ ও পাদোত্তর-ধাণ্ডে ত্রিপাদবিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীভগবান্ ত্রিগুণাতীত, তাঁহার (তদ্রূপবৈভব) চিদ্ব্যমও তদ্রূপ ত্রিগুণাতীত, সেখানে ত্রিগুণময়ী মায়াবির কোন বিক্রম নাই—

“প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ

সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-

রনুভ্রতা যত্র সুরাসুরাচ্চিতাঃ ॥ —ভাঃ ২৯।১০

অর্থাৎ “সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অতীত রাগদ্বৈষাদি ত’ দূরের কথা, সেখানে লৌকিক স্রষ্টাধাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুরবন্দিত ভগবৎপার্বদগণ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন।”

অপ্রাকৃত চিক্রাম বৃন্দাবনে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার অবতন ঘটন পটায়সী চিহ্নলিপি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই [‘যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ’ (ভাঃ ১০।২৯।১)] সর্বলীলোৎসবমুকুটমণি রাসোৎসবে সম্প্রবৃত্ত হন। “কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজ-গোপীগণের পতি, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ নিজ নিজ পত্নী কন্যাদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বস্থিত মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি কোন হিংসা প্রকাশ করেন নাই।” যথা — “নাস্ম্যন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তস্ত মায়ায়া। মন্তমানাঃ স্বপার্ষ্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ।” (ভাঃ ১০।৩০।৩৭) এই ‘মায়া’ সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিতেছেন—“* * * মায়ায়া যোগমায়ায়া এব ন তু বহিরঙ্গ মায়ায়া। ভগবৎপরিবারেষু তন্ত্ৰা অধিকারীভাবাৎ তন্মোহিতানাঞ্চ ভগবদ্বৈমুখ্যাত্মাবশুস্তা-বাৎ। তেষাং গোপানাস্ত ভগবদ্বৈমুখ্যাত্মাদর্শনাৎ * * *।” অর্থাৎ ‘মায়ায়া’ বলিতে যোগমায়াদ্বারা, বহি-রঙ্গা মায়াকর্তৃক নহে। ভগবৎপরিবারে গুণময়ী মায়ায় কোন অধিকার নাই। বিশেষতঃ গুণময়ী মায়া-মোহিত জীবগণের পক্ষে ভগবদ্বৈমুখ্যতা অবশুস্তাবী। কিন্তু ব্রজগোপগণের ভগবদ্বৈমুখ্যতাই দৃষ্ট হয় না।

শ্রীব্রজার ক্ষীরসমুদ্রতে সমাধিস্থ অবস্থায় সমুচ্চারিত আকাশবাণীও এইরূপ :—

“বিশ্বোমায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।

আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্যার্থে সন্তবিশ্রুতি ॥”

—ভাঃ ১০।১২৫

[অর্থাৎ (“অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের একই মায়া শক্তির স্বরূপভেদে ‘উন্মুখমোহিনী’ ও ‘বিমুখমোহিনী’ —এই দুইটি স্বরূপ। উন্মুখমোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী—অন্তরঙ্গা শক্তি ‘যোগমায়া’ নামে খ্যাতা, আর বিমুখ-মোহিনী মায়া অখিলেশ্বরী বহিরঙ্গা জড়মায়া নামে কীর্তিতা। একই মায়ায় এই দ্বিবিধ স্বরূপ-দ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ সম্মোহিত।”) “যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয়বিধ জগৎ মুক্ত, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত কার্যার্থে অর্থাৎ উন্মুখ-মোহিনী যোগমায়া স্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভা-কর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখ-মোহিনী জড়মায়া স্বরূপের দ্বারা কংসাদিবঞ্চনরূপ কার্য্যসাধনার্থ প্রাজুর্ভূত হইবেন।”]

সুতরাং দ্বিবিধ কার্য্যের প্রথম কার্য্য—দেবকী-সপ্তমগর্ভাকর্ষণ ও যশোদাস্বাপনাদি গুণাতীত যোগমায়ায় কার্য্য। দ্বিতীয় কার্য্য—দেবকীকন্যারূপে যে কংসবঞ্চন-কার্য্য, ইহা গুণময়ী মায়ায় কার্য্য, যোগমায়ায় নহে; কেননা যেখানে ভগবদ্বৈমুখ্যতা, সেইখানেই বহিরঙ্গা গুণময়ী মায়ায় অধিকার। এই মায়া কংসহন্ত হইতে আকাশে উখিত হইয়া অষ্টভুজারূপে আত্মপ্রকাশ পূর্বক কংসকে সাবধান করেন। ইনিই বিষ্ণুবা-সিন্দুররূপে ভূতলে বহুস্থানে বহু নামে পূজিত হইয়া মনুষ্যগণের বিভিন্ন কান্ডসারে বরদাত্তা হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত ২৩শতী চণ্ডীতে ইহারই বাক্য—

“বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভে সন্তবা।

ততন্তৌ নাশশিঘ্রাষি বিষ্ণ্যাচলনিবাসিনী ইত্যাদি।”

[অর্থাৎ আমি বৈবস্বতমন্তরীর অষ্টাবিংশ চতুর্য়ুগে দ্বাপরের শেষভাগে নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করতঃ বিষ্ণ্যাচলে বাস করিব ও সেই অনুরক্ষকে নাশ করিব।]

রাসলীলাদি সিদ্ধিনিমিত্ত ভগবৎপ্রেমসীগণের পতি স্বরূপ প্রভৃতি মোহনকার্য্য যোগমায়ায়ই, মায়ায় নহে; কেননা তাঁহাদিগের ভগবদ্বৈমুখ্য নাই, মায়ামোহিত

জীবেরই ভগবদ্বেমুখ্য অবশুস্তাবী। শ্রীভগবান্ যোগ-
মায়াকে আশ্রয় করিয়াই রাসাদিলীলা প্রকট করিয়া
থাকেন। দুর্ঘোষনাদি ও শাৰাদি অম্মুরগণ শ্রীভগ-
বানের বিশ্বরূপ ও গুরুভাবনত্বাদি দর্শন করিয়াও
'এটা ঈশ্বর নহে, কিন্তু ধৃষ্ট যাদব' এইরূপ বুদ্ধিধারা
ভগবদ্বেমুখকে যে মোহনকার্য্য, ইহা মায়াই কার্য্য,
যোগমায়ার নহে—বিমুখমোহনকার্য্য মায়াধারা এবং
উন্মুখমোহনকার্য্য যোগমায়াধারা ইহা সংঘটিত হয়। আবার
বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবিশিষ্ট শ্রীনন্দযশোদাদির বিশ্বরূপ
ও বরুণলোকাদি দর্শনান্তে বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্যাহেতু
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সম্বন্ধেও যে সম্ভবরাহিত্য-ঐশ্বর্য্যের অনন্ত-
সন্ধানলক্ষণরূপ যে মোহনকার্য্য, তাহা না যোগমায়ার,
না মায়ার কার্য্য, পরন্তু তাহা প্রেমেরই এমন এক
অত্যন্ত স্বভাব যে, তাহা ভগবদ্বেশ্বর্য্য-জ্ঞানকে সম্পূর্ণ-
রূপে আবৃত করিয়া চিন্ময় মমতা-রজ্জ্বদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে
দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া প্রতিক্ষণ তাঁহাতে নবনবায়মান
স্নেহাতিশয্য উৎপাদন করতঃ তন্মাপুৰ্ণ্যাস্বাদ-মহাসমুদ্রে
ভক্তজনকে নিমজ্জিত করে। প্রেম এইরূপই অসাধারণ
লক্ষণজ্ঞাপ্য হইয়া থাকে।

মুদভক্ষণলীল শ্রীকৃষ্ণের মুখ ব্যাদান মাত্র মাতা যশোদা
তন্মুখবিবরে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া তাঁহাতে
ঐশ্বর্য্য ভাবোদয় হেতু সম্ভববুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ
তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলে—“বৈষ্ণবীং ব্যতনো-
ন্মায়াং পুত্রেস্নেহময়ীং বিভুঃ” (ভাঃ ১০।৮।৪৩) অর্থাৎ বিভু
শ্রীকৃষ্ণ তখনই পুত্রেস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করি-
লেন—“মা যশোদা বিদিতত্বা হইয়া আমাতে মমতা
ছাড়িয়া দিলে কে আমাকে লালন পালন করিবে,
ইহা ভাবিয়া কৃষ্ণ তাঁহাতে (মা যশোদায়) পুত্রেস্নেহরূপ
প্রেমবিশেষ বিস্তার করিলেন। মোহন-সাধন্য্য-হেতু
তাহাকে ‘মায়া’ বলা হইয়াছে। সেই পুত্রেস্নেহময়ীমায়া
দ্বারা কৃষ্ণ মাতাকে প্রেমাক্ষা করিয়া ফেলিলেন। পুত্রে-
স্নেহময়ত্ব বাৎসল্যাগ্রেমের অসাধারণ লক্ষণ। সুতরাং
ইহাও শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর যোগমায়া বা মায়ার কার্য্য
না বলিয়া প্রেমেরই কার্য্য বিশেষ বলিয়া প্রতিপাদন
করিয়াছেন। (ভাঃ ১০।১২।৪ শ্লোকের চক্রবর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।)

নন্দব্রজকুমারীগণ অগ্রহায়ণ মাসে হবিষ্যন্ন ভোজন
করিয়া কাত্যায়নীপূজারত আচরণ করিয়াছিলেন।
তাঁহারা অকর্ণোদয়কালে যমুনাজলে স্নান করিয়া জল-
সমীপে বালুকাময়ী কাত্যায়নীপ্রতিমা নিষ্কর্ণ পূর্ব্বক
ধূপদীপগন্ধপুষ্পতৈলবেতাদি দ্বারা দেবীর উপাসনা করি-
তেন। তাঁহাদের পূজার মন্ত্রই ছিল এইরূপ—

“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিষ্ঠাধীশ্বরী।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।”

— ভাঃ ১০।২২।৪

অর্থাৎ “অগ্নি মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরী
কাত্যায়নী দেবি! তুমি নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমার
পতি কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি।”

“ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্ৰুঃ কুমারিকাঃ”—ঐ
অর্থাৎ এইরূপ মন্ত্র জপ করিতে করিতে ব্রজকুমারীগণ
পূজা করিতে লাগিলেন।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ
করিয়াছেন—“হে কাত্যায়নি, নন্দগোপনন্দকে আমার
পতি কর, এহলে যদি কাত্যায়নি দেবী বলেন যে—
‘কুরু’ বা কর এই শব্দদ্বারা আমাতেই তোমরা স্বাতন্ত্র্য
অর্পণ করিতেছ কেন? আমি তদর্থ তোমাদের পিতা-
মাতাকে সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্ত প্রেরণ করিব মাত্র,
সুতরাং তোমরা ‘কারয়’ অর্থাৎ করাও বা ‘দেহি’
অর্থাৎ দাও—এইরূপ শব্দ প্রয়োগ কর। পাছে দেবী
ইহা বলেন, এই আশঙ্কায় অত্যন্ত বৈকল্যের সহিত
‘মহাযোগিনি’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহা
বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের
সংযোগ তুমিই শীঘ্র সম্পাদন করিয়া দাও। পিত্রাদি-
ব্যবধানোপদ্রবে আর প্রয়োজন নাই। আমরা অত্যন্ত
উৎকণ্ঠাবতী হইয়া পড়িয়াছি, ক্ষণকালবিলম্বও আমা-
দের পক্ষে অসহনীয়। বিশেষতঃ সম্প্রতি কৃষ্ণের
এখনও উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, এজন্ত তাঁহার
পিতামাতা হয়ত’ বলিয়া বসিতে পারেন, আমাদের
গোপালের এখনও বিবাহযোগ্যকাল উপস্থিত হয় নাই।
হে দেবি! মুখ্যবিবাহবিধি অনুসরণ ব্যতীত কেবল
গান্ধর্ব্ববিবাহবিধানানুসারেও কৃষ্ণকে আমার পতি কর,

ইহাই অর্থ। ‘অধীশ্বরী’ শব্দ দ্বারা বলিতেছেন—হে দেবি, তুমি অধীশ্বরী, আমাদের বিবাহসংঘটনবিষয়ে তোমার অশঙ্কা কিছুই নাই অর্থাৎ তুমি সবই করিতে পার। যদি বল, কৃষ্ণে পতিভাববিশিষ্ট তুমি, তোমার পিতামাতার অজ্ঞাতত্বে তোমার অভীষ্ট কৃষ্ণাঙ্গসদ্ব্যক্তি প্রকারে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছি—হে মহামায়ে, তোমার মায়াদ্বারা আমার জনকজননীকে এমনভাবে মোহিত করিয়া রাখ, যাহাতে অল্প গোপের সহিত আমার বিবাহের কথা তাঁহারা যেন কখন চিন্তাও না করেন এবং আমার কৃষ্ণাঙ্গসদ্ব্যক্তিহীনও যেন কোনপ্রকারে জানিতে না পারেন। * * * সুতরাং সেই ব্রজকুমারিকাবন্দ্য চিহ্নজিবুতি স্বরূপভূতা যোগমায়ারই উপাসনা করিয়াছেন, বহিরঙ্গা মায়ার নহে। (শ্রীনারদপঞ্চরাত্নোক্ত ঋতিবিদ্যা সংবাদে যোগমায়া ও মহামায়ার কথা ইতঃপূর্বেই কথিত হইয়াছে।) আগমে কথিত আছে—‘সর্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু হৃগীধিষ্ঠাতৃ দেবতা’ অর্থাৎ সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রে হৃগী-দেবীই সেই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিহ্নজিবুতি কৃষ্ণভগিনী একানংশা নাম্নী যোগমায়াই ঐ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী। ব্রজকুমারীগণ সেই যোগমায়ারই উপাসনা করিয়াছেন। হৃগী, মহামায়া ইত্যাদি নাম-সাম্য দেখিয়া লোকের মনে ভ্রম উপস্থিত হয়, ইহাই জানিতে হইবে। অবশ্য ব্রজের লোকবৎ লীলত্বেহেতু মায়া-উপাসনাতেও কোন দোষ হয় না। কোন কোন অনন্তভক্ত অভিমাত্রী যদি ইহাতে অল্প প্রকার মনে করেন, তাহা হইলে জানিতে হইবে, তাঁহারা ব্রজকুমারীগণের প্রেমগন্ধসম্বন্ধের গন্ধবাহ (অর্থাৎ বায়ু)কেও স্পর্শ করিতে পারেন নাই—ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী লীলাপুষ্টিকারিণী অন্তরঙ্গা চিহ্নজি যোগমায়ার একটি অভাবনীয় অঘটনঘটনকার্য আছে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাসুখ সম্পাদনার্থ কৃষ্ণের অজ্ঞাতসারেও মোহনকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

“মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপত্তিভাবে।

যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥

আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
হুঁহার রূপগুণে হুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম ছাড়ি’ রাগে হুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে—দৈবের ঘটন॥”

— চৈঃ চঃ আদি ৪১২-৩১

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

“আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অবিচিন্ত্যপ্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় আমার নিত্যপ্রিয়া গোপীদিগের হৃদয়ে উপপত্তির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রস-পুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্বুতরস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তিস্বরূপ হইয়াও গোপীগণও তাহা জানিতে পারিবেন না। আমার ও আমার গোপীগণের অদ্বুত রূপগুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলনসুখ উদ্ভিত হইবে। কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈবঘটনার ছায় উদ্ভিত হইবে।”

অন্তরঙ্গা যোগমায়া ব্যতীত বহিরঙ্গা মায়ার এই প্রকার অঘটনঘটনপটীয়াসীত নাই। সুতরাং যোগমায়া ও মায়ার কার্যকে একাকার করিলে তত্ত্বভ্রম উপস্থিত হইবে।

এই যোগমায়া—শ্রীধামবন্দ্যাবনে যেমন পৌর্ণমাসী-রূপে কৃষ্ণলীলাপুষ্টিকারিণী, শ্রীধাম নবদ্বীপে তদ্রূপ প্রৌঢ়ামায়া রূপে গৌরলীলাপুষ্টিকারিণী। শুদ্ধভক্তগণ ইহাদের আনুগত্য করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ইহাদের স্বকৃত্যভাবে আরাধনার কোন আদর্শ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—

‘যোগমায়াং সমাদিশং’,—

“গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপ-গোভিরলঙ্কৃতম্।

রোহিণী বসুদেবস্ত ভার্গ্যাস্তে নন্দগোকুলে।

অগ্রাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥

দেবক্যা জঠরে গর্ভে শ্বেষাধ্যাং ধাম মামকম্।

ওৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশ্য॥

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।

প্রাপ্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥
 অচ্চিগুপ্তি মনুষ্যাত্মাং সর্বকাম বরেশ্বরীম্ ।
 ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥
 নামধেয়ানি কুর্যন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি ।
 দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
 কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্তাকৈচি চ ।
 মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকৈচি চ ॥
 গর্ভসংকর্ষণং তং বৈ প্রাহঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি ।
 রামেতি লোকরমণাদ্যং ভদ্রং বলোদ্ধর্য্যং ॥
 সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথৈতোমিতি তদ্বচঃ ।
 প্রতিগৃহ পরিক্রমা গাং গতাতং তথাকরোং ॥

— ভাঃ ১০।২।৬-১৪

[অর্থাৎ “বিশ্বাত্মা ভগবান্ও তদনুগত নিজজন
 যাদবগণের কংস হইতে ভয় উদ্ভিত হইয়াছে জানিতে
 পারিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন। হে জগৎ-
 পূজ্য সর্বমঙ্গলে, তুমি গোপ, গোপী ও গোগণ-
 সুশোভিত ব্রজে গমন কর। সেই নন্দ গোকুলে বসু-
 দেবমহিষী রোহিণী দেবী বাস করিতেছেন। বসু-
 দেবের অত্যাচার পত্নীও কংসের ভয়ে ভীতা হইয়া
 সেই স্থানের নিভৃত প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।
 (তুমি সেই স্থানে গমনপূর্বক) দেবকীর উদরে আমার
 দ্বিতীয় স্বরূপ বা আশ্রয় সংকর্ষণ, যিনি (অংশে) শেখ-
 সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন, তাঁংকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া
 অত্যা অলক্ষ্যে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর।
 হে ভদ্রে! তৎপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রস্ব
 স্বীকার করিব এবং তুমিও নন্দরাজমহিষী যশোদার
 গর্ভে আবির্ভূতা হইবে। প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমাকে
 অর্থাৎ তোমাং বিমুখমোহনকারী স্বরূপকে সর্ববিধ
 প্রাকৃত কাম ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্বভোগ ও
 বরপ্রদাত্রীরূপে জানিয়া বিবিধ উপহার ও বলির দ্বারা
 পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার স্থান নির্দেশ
 এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা,
 কৃষ্ণা, মাধবী, কন্তাকা, মায়া, নারায়ণী, জৈশানী, শারদা
 ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে। গর্ভসংকর্ষণহেতু
 রোহিণীনন্দন এই ভূতলে সংকর্ষণ নামে অভিহিত

হইবেন। আরও গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দ
 বিধানহেতু ‘রাম’ এবং বল্যধিক্য-হেতু অর্থাৎ সন্ধিনী-
 শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহত্বনিবন্ধন ‘বলভদ্র’ নামে কীর্তিত
 হইবেন। ভগবানের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া
 ‘তাঁহাই করিব’ বলিয়া যোগমায়া ভগবানের বাক্য
 স্বীকার পূর্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নন্দ-
 গোকুলে আগমন করিয়া ভগবান্নিদেশানুযায়ী কার্য্য
 করিলেন অর্থাৎ দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া
 রোহিণীতে স্থাপন করিলেন।”]

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—‘ত্বং যশোদায়াং
 ভবিষ্যসি উৎপত্তসে মাত্রং যশোদায়াং পুত্রীত্বং সম-
 বাপ্যাদীন্যন্তজ্ঞেয়স্বয়ি স্তায়ামপি সা বাৎসল্যং ন করি-
 য়তে। অলক্ষ্যবিগ্রহেতেনৈব তব ব্রজে বস্তুমান্যাদিত্য
 ভাঃ।’ ৯ ॥ ‘তবাংশভূতাং মায়াং বসুদেবেনানেষ্যমাংসং
 কংসং বঞ্চয়িত্বা বিজ্ঞাদিস্থানেষু প্রভবিষ্যন্তীং নরা আরা-
 ধয়িষ্যন্তীত্যাহ,—অচ্চিগুপ্তীতি। যতঃ সর্বকামানাং লোকা-
 নাং বরাং শ্রেষ্ঠামীশ্বরীম্ ॥’ ১০ ॥ ‘কুর্যন্তি করিষ্যন্তি।
 তদেবমিনানীং মদবতারেণ বদবতারেণ চ লোকাঃ
 কেচিদবৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছাত্রাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাঃ ॥’ ১১-
 ১২ ॥ ‘তথৈতি পুনরপোমিতি অত্যাচারেণ তদীয়ং
 বচঃ প্রতিগৃহ, গাং পৃথিবীং, তৎতদনন্তরং ॥’ ১৪ ॥

অর্থাৎ ‘যশোদার গর্ভে সমাগরূপে পুত্রীত্ব প্রাপ্ত
 হইবে’ ইহা না বলিয়া ‘যশোদার গর্ভে উৎপন্ন
 হইবে মাত্র’ ইহা বলিবার কারণ এই যে, তুমি
 (যোগমায়া) যশোদার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিলেও
 যশোদা তোমাকে বাৎসল্য করিবেন না, যেহেতু তুমি
 অলক্ষ্য বিগ্রহ স্বরূপেই ব্রজে বর্তমান থাকিবে, ইহাই
 ভাবার্থ। ‘তোমার অংশভূতা যে মায়া, যাহাকে
 বসুদেব (নন্দালয় হইতে মধুবায কংস-কারাগারে)
 লইয়া আসিবেন, তিনি কংসকে বঞ্চনা করিয়া বিজ্ঞাদি
 স্থানে বিরাজ করিবেন। (প্রাকৃত কামনা-বাসনা-পরায়ণ)
 মনুষ্যগণ সর্ববিধ কামবিশিষ্ট লোকসকলের শ্রেষ্ঠা অধী-
 শ্বরী তোমাকে (অর্থাৎ তোমার বিমুখমোহনকারিণী
 স্বরূপকে) (বিবিধ উপচার-দ্বারা) পূজা করিবে।
 অতএব হে দেবি, ইদানীং আমার ও তোমার অবতার-

হেতু লোকসকলের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব ও কেহ কেহ শাক্ত হইবে অর্থাৎ জাগতিক ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ শাক্ত এবং মতুপাসকগণ বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইবেন। * * শ্রীভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযোগমায়া পরমাদরে তাঁহার বাক্য অঙ্গীকারপূর্বক পুনরায় স্বীকৃতিসূচক ‘ওম্’ এইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করতঃ পৃথিবীতে গমন করিলেন এবং তদনন্তর ভগবন্নিদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন।”

এইরূপে শ্রীভগবান্ ও তন্নিজজন-বাক্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রীযোগমায়া শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীনা ও আজ্ঞাকারিণী, আবার তাঁহার লীলা-সৌষ্টব সম্পাদনার্থ তাঁহার আজ্ঞাসারেও সেবাতৎপরা। কৃষ্ণপ্রেমময়ী ব্রজকুমারীগণ শ্রীনন্দনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্তই সেই যোগমায়া কাত্যায়নীরত-পরায়ণা, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাহ্যাতীত আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাহ্যার লেশমাত্রও তাঁহাদের নাই। সূতরাং তাঁহাদের দেবীপূজা কৃষ্ণপূজাই।

কিন্তু বিভিন্ন কামনাবাসনাপরায়ণ মনুষ্যগণের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাহ্যামূলে ধূপদীপনৈবেদ্যাদি দ্বারা যে সর্বকামবর প্রদা সর্বকামবরেশ্বরী দেবীপূজা, তাহাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাহ্যামূল্য কৃষ্ণপূজার সহিত একাকার করিলে চলিবে কেন?

সম্মুখীনা যোগমায়াকে কৃষ্ণ সাক্ষাদভাবে আদেশ করিলেন এবং তিনি সেই আদেশ অবনতমস্তকে শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ আজ্ঞাপালন-রতা হইলেন। মহামায়া বা গুণময়ী মায়া ত’ তাঁহার সম্মুখে আসিতেই বিলজ্জমানা—অপাশ্রয়া। সূতরাং যোগমায়া ও মহামায়ার function বা কার্য্য এক নহে।

‘যা দুর্গা সা এব কৃষ্ণঃ যঃ কৃষ্ণঃ সা এব দুর্গা’—এস্থলে এই দুর্গা—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি—যোগমায়া। ‘শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ’ বিচারানুসারে, ইহা সত্যই। গুণময়ীমায়াকেও কৃষ্ণ ‘মম মায়া’ই বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা অপাশ্রিতা। তথাপি ইচ্ছাশক্তিপ্রধান শক্তিমত্ত্বের ইচ্ছাধীনই শক্তি। ‘ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরা-

চরম্।’ ‘ছায়েব যন্ত ভুবনানি বিভতি দুর্গা ইচ্ছানুরূপমপি যন্ত চ চেষ্টেতে সা।’ ইত্যাদি বাক্য প্রণিধানযোগ্য। চণ্ডীতে ‘নারায়ণী’, ‘বিষ্ণুমায়া’ ইত্যাদি শব্দ বৃথা প্রযুক্ত হয় নাই, ইহার বাঙ্গলা সাবধানে অনুধাবনীয়।

‘কৃষ্ণভজনও যাহা কালীভজনও তাহা’, ইহা বলিয়া মনুষ্য-সমাজে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ নীতি অনুসারে উদারতা প্রদর্শিত হইলেও ‘যেদ্যাদেবতাভক্ত্যা * * যজন্ত্যবিধিपूर्वकम्’, ‘দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি * * যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্’ ইত্যাদি শ্রীভগবৎক্যোর সার্থকতা কোথায় থাকে? সাধা, সাধক ও সাধন-বিচারে অধিকারানুযায়ী তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদি শাস্ত্রে উপাস্ত, উপাসনা ও উপাসক বিচারে কখনই স্বৈরাচার প্রদর্শিত হয় নাই। সকলেই কৃষ্ণ বা বিষ্ণু-তত্ত্বকেই চরমোপাস্ত বলিয়াছেন। কেনোপনিষদে স্বয়ং শ্রীউমাদেবী শ্রীবিষ্ণুরই পরমতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া ‘তত্ত্বং উপাসিতব্যম্’ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীবিষ্ণুকেই বননীয় বা ভজনীয় বলিয়াছেন। বেদে শ্রীবিষ্ণুকেই ‘পরম’ এবং অগ্নিকে ‘অবম’ বা কনিষ্ঠ এবং অগ্নি দেবতাকে ‘তদন্তরা’ বলিয়াছেন। ঋগ্বেদোক্ত নিত্য আচমনীয় মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদই দিব্যাহুরিগণের সর্বদা দর্শনীয় বস্তু বলিয়া কীর্তিত হন। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত ‘চণ্ডীমাংসো—‘যোগমায়া হরেঃ শক্তিব্যা সম্মোহিতং জগৎ’ ইত্যাদি বাক্যে ‘বিষ্ণুমায়া’র কথা বলা হইয়াছে। ‘শক্তি’ বলিলে কোন ‘বস্তু’ বুঝায় না, ‘বস্তুর’ ধর্ম্মই শক্তি। সূতরাং সেই শক্তিকেই সকলের মূল কি করিয়া বলা চলে? কোন চৈতন্যস্বরূপ বস্তু প্রথমে স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ‘শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ’ এই বিচারানুসারে সহজেই বুঝা যায় যে, শক্তিমান্ পুরুষ এক বস্তু, শক্তি তাঁহারই ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম্ম। শক্তিকে শক্তিমান্ বস্তুর অভেদবিচারে চৈতন্যরূপিনী, ইচ্ছাময়ী, ত্রিগুণাতীতা ইত্যাদি বলিলে দোষ হয় না। কিন্তু ‘শক্তি’র স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে গেলেই সিদ্ধান্ত-বিরোধ সংঘটিত হয়। পুরুষের ইচ্ছায় শক্তির কার্য্য

দেখা যায়। পরমচৈতন্যরূপ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই সর্বো-
 ন্তর, তাঁহারই ইচ্ছায় শক্তি চৈতন্যময়ী, ইচ্ছাময়ী প্রকৃতি।
 তাঁহাকে শক্তিমত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্রা করিয়া কোন পরিচয়
 দেওয়া যাইতে পারে না। চিংকার্যে তিনি চিচ্ছক্তি,
 অচিং কার্য বা জড়কার্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়া।
 ষ্ঠোত্থতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে— পরাশ্রয় শক্তি-
 বিবিধৈব শ্রুতে অর্থাৎ বেদে পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের
 পরা শক্তির বিবিধত্ব শ্রুত হয়। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্যাদি
 সেই শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছাধীন। ত্রিগুণময়ী জড় মায়ায় কার্য,
 শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীনারায়ণ হইতে স্বতন্ত্রা বিষ্ণুমায়া বা নারা-
 যণী বলিয়া কোন পরিচয় থাকিতেই পারে না। এই-
 জ্ঞত্ব পূর্বেই বলা হইয়াছে—গীতায় শ্রীভগবান্ ‘ময়াধ্যক্ষেণ
 প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন।
 এই তত্ত্ব স্বীকৃত হইলে শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন কলহকোলা-
 হল থাকে না। শক্তির ব্রহ্মাবিস্মৃৎস্বের জননীত্ব
 ও শুভ-নিশুভাদি দৈত্যনাশকত্ব যেসকল রূপক পরিচয়
 আছে, তাহা মূলবস্তুকে স্বীকার না করিলে সমস্তই
 নিরর্থক হইয়া যায়। মূলবস্তু শ্রীভগবদিচ্ছাতেই মায়ায়
 ভগবদবহির্মুখ জীবকে দণ্ড দিবার ক্ষমতালাভ, আবার
 কৃষ্ণরূপায় শুদ্ধজ্ঞানোদয়ে জীব সেই মায়াপাশ হইতে
 মুক্ত হইয়া কৃষ্ণের চিচ্ছক্তির অন্তর্গতক্রমে চিদানন্দ-
 লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন।

মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্বত্বজ্ঞান।

জীবেরে রূপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ ॥

শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান।

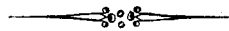
কৃষ্ণ মোর প্রভু, জ্ঞাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥

—চৈঃ চঃ

বৈষ্ণবগণ চিচ্ছক্তিস্বরূপিনী শ্রীরাধিকার আত্মগত্যা
 কৃষ্ণভজনপরায়ণ, এজ্ঞত্ব তাঁহারাই শুদ্ধ শাক্ত। শ্রীশ্রীল
 ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—“শাক্ত বৈষ্ণবে আমরা
 কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না
 করিয়া কেবল মায়াশক্তিতে বাঁহাদের রতি, তাঁহার
 শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন অর্থাৎ কেবল বিষয়ী।
 শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীদুর্গাদেবী বলিয়াছেন—‘তব বক্ষসি
 রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।’
 [অর্থাৎ ‘বৃন্দাবনধামে আমি চিংস্বরূপে তোমার
 বক্ষাবিলাসিনী, অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীরাধিকা।’]

“দুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে, শক্তি দুই
 নন, একই শক্তি, চিংস্বরূপে রাধা ও জড়স্বরূপে
 জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নিগুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও
 সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি।” —জৈবধর্ম

সুতরাং কৃষ্ণ বা বিষ্ণুভজন ও মায়ায় ভজন এক নহে।
 ‘বাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ায় অধিকার’। সব একা-
 কার করিতে গেলে নিজেই বঞ্চিত হইতে হইবে।
 শাস্ত্রবাক্যে অনাদর করিয়া মনুষ্যসমাজে বাহবা লইবার
 জ্ঞত্ব যেসকল সাম্যবাদ প্রচার-প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহা
 মুড়ি মিছরীর সমন্বয়-চেষ্টার স্থায় বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র।
 সচ্ছাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত
 নিঃশ্রেয়সের অধিকারী হওয়া যাইবে।



শ্রীবিজয়াদশমী-কৃত্য

শ্রীবিজয়াদশমী সুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়
 হিন্দুসমাজে পরমমঙ্গলময়ী তিথি বলিয়া বিচারিত
 হইয়া থাকেন। শ্রীমগ্নপ্রভু এই শুভদিনেই শ্রীপুরী-
 ধাম হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য
 ১৬৯৩-৯৪)। পঞ্জিকাতেও এইদিকে লিখিত থাকে—
 গোবামিমতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। বৈষ্ণবস্বত্ব-
 তে

রাজ শ্রীহরিভক্তিবিনাসের পঞ্চদশ বিলাসের শেষাংশে
 লিখিত আছে—

সীতা দৃষ্টেতি হনুমদাক্যং শ্রদ্ধাকরোৎ প্রভুঃ।

বিজয়ং বানরৈঃ সাক্ষিং বাসরেহস্মিন্ শমীতলাৎ ॥

অর্থাৎ ‘আমি সীতাকে দেখিয়াছি’ শ্রীহনুমানের
 এই বাক্য শ্রবণানন্তর ঐদিবস (আশ্বিন মাসে শুক্ল-

পক্ষীয়া দশমী তিথিতে) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বানরকুলসহ মিলিত হইয়া শমীতরুমূলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সর্বত্র বিজয় অর্থাৎ উৎকর্ষেচ্ছ ব্যক্তির বৈষ্ণবগণ-সহ মিলিত হইয়া এই বিজয়োৎসব করা কর্তব্য—
“কর্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্কং সর্বত্র বিজয়াখিনা।”

— হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২।৭৪

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে এই বিজয়োৎসবের বিধি এইপ্রকার লিপিবদ্ধ আছে—

লীলাবশে রঘুবংশে অবতীর্ণ—জগন্নাথার্থ্য আবির্ভূত সেই দেবদেব সর্বাভরণভূষিত, অসি-তুণ-ধনুর্কাণধারী-রক্ষঃকুলহন্তা সীতাপতি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে রাজোপচারে পূজা করতঃ রথে আরোহণ করাইয়া শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইবে। অতঃপর ভক্তকুলের অভয়প্রদ শমী-বৃক্ষ সীতাকান্তকে পূজা করিয়া শমীবৃক্ষের অর্চনা করিবে। শমীপূজার মন্ত্র এইরূপ—

“শমী শময়তে পাপং শমী লোহিত কণ্টক।

ধরিত্ব্যর্জুন-বাণানাং রামস্ত প্রিয়বাদিনী॥

করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।

তত্র নিবিরলকত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥”

অর্থাৎ শমী পাপ হরণ করেন, শমী লোহিতকণ্টকে পরিপূর্ণ, শমী অর্জুন-বাণের ধরিত্রী ও রামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাকালে সুখে যে যাত্রা করিব, হে রামপূজিতে, তুমি আমার সম্বন্ধে তাংগতে নিবিরলকত্রী হইও।

— এই মন্ত্রে শমীবৃক্ষের পূজা করিয়া শমীমূলস্থ আদ্র মৃত্তিকা অক্ষত (আতপতণ্ডু)-সহ

লইয়া গীতবাদিত্র সহকারে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহে লইয়া যাইবে। এই সময়ে কোশলেন্দ্রের প্রীত্যর্থ কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বা রক্তমুখ বানরের চেষ্টা অনুসরণ করিবেন এবং ভূতলে রাক্ষস, দৈত্য, শত্রু-কুল নির্জিত হইয়াছে, রামরাজ্য রামরাজ্য রামরাজ্য—এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমা আনয়নপূর্বক তাঁহার নিজসিংহাসনে স্থখে সংস্থাপন করিবে। অতঃপর প্রভুর নীরাঞ্জন করতঃ তচ্চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নমস্কার বিধানপূর্বক বৈষ্ণবগণসহ মহাপ্রসাদ বস্ত্রাদি ধারণ করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসববিধি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত বিধানানুসারে কথিত হইল। ইহা সাধুগণের আনন্দজনক।

বঙ্গদেশে এই উৎসবের প্রচার নাই বলিলেই চলে, শক্তিপূজার আনুযজিকরূপেই ইহা গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পুরীধামে এই উৎসব সম্পাদনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—

“বিজয়া দশমী লক্ষা বিজয়ের দিনে।

বানর-সৈন্য কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে॥

হনুমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।

লক্ষাগড়ে চড়ি’ ফেলে লক্ষা ভাঙ্গিয়া॥

‘কাঁহারে রাবণা’ প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।

জগন্নাথ হরে পাপী মরিমু সবংশে॥

গোপাঞ্জির আবেশ দেখি’ লোকে চমৎকার।

সর্বলোক ‘জয়’ ‘জয়’ করে বার বার॥”

— চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫

পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিবিনাস তীর্থ মহারাজের নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ

গত ২ পদ্মনাভ (৪৯০ শ্রীগৌরাঙ্গ), ২৪ ভাদ্র (১৩৮৩), ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) শুক্রবার কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে অপরাহ্ন ৩টা ২০ মিনিটে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যরিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আমাদের সতীর্থ পরিব্রাজক-কাচার্ঘ্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ ভক্তিবিনাস তীর্থ মহারাজ নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। [ইনি অস্বনীয়

গুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রীক শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটকালে তদনু-কম্পিত শিষ্যরূপে শ্রীমৎ-কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিহারের প্রায় ষাটশ বৎসর পরে ইনি ত্রিদিগ্বিশ্বাস-বেষ আশ্রয় পূর্বক

ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবিলাস তীর্থ নামে আত্মপরিচয় প্রদান করেন।

ইনি ১০০০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯৩ খৃঃ) চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে বাসন্তীপূজারভূমিদবসে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গস্থ যশোহর জেলার অন্তর্গত চাঁচুরী পুকুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইংরাজী হাইস্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি পোষ্ট অফিসে কাৰ্য্য গ্রহণ করেন। পরে ১৯২০ সালের মে মাসে ইনি মেশোপটেমিয়ায় গমন করিয়াছিলেন।

পঠদশা হইতেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পায়। তিনি পাহাড়ী বাবা, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ প্রভৃতি বহুস্থানেই ধর্ম্মানুসন্ধিৎসা লইয়া গমনাগমন করিতে ছিলেন, কিন্তু কোথায়ও অহৈতুক আত্মধর্ম্মের অনুশীলন দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে শ্রীভগবচ্চরণে সদগুরুলাভের জন্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার জ্ঞানৈক শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে, আমরা বংশপরম্পরায় যখন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত, তখন আমাদের সেই ধর্ম্ম বরণই শ্রেয়ঃ সাধক হইবে। তিনি (উক্ত আত্মীয়) তাঁহাকে একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণের তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে ঐ ধর্ম্ম তাঁহার তাদৃশ রুচিকর না হইলেও তিনি উক্ত আত্মীয়ের অনুরোধক্রমে একবার শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করিতে যান।

১৯১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর, ১৩২২ সালের ৩০শে কা্তিক শেখ রাস্ত্রে পরমারাধ্য পরমগুরুদেব ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত কোলদ্বীপে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রভূষে শ্রীপাদ পরমানন্দ বিহারত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপে আসিয়া দেখেন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিপ্রদান ব্যাপার লইয়া স্থানীয় ভেকধারী বাবাজীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এই সময়ে তথায় যশোহরের হীরলাল গোস্বামী মহাশয়, শ্রীবন-

মালী দাস প্রভৃতি এবং তৎসহ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাতুষণ প্রভুও আসিয়া পৌছান। শ্রীল প্রভুপাদ সকল বাদান্তবাদ প্রশমিত করিয়া ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২২; ১৭ই নভেম্বর, ১৯১৫ উত্থান একাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নে সংস্কার দীপিকার বিধানানুসারে স্বহস্তে নূতন চড়ায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান পূর্বক অপরাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ বিহারত প্রভু উক্ত সমাধির সেবাকাৰ্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণার্থ কুলিয়ায় গমন করেন। তথায় শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাতুষণ ও শ্রীনিশিকান্ত মৌলিক মহাশয়-দ্বয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার মুখে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে আসেন এবং তন্মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত মৌলিক মহাশয় তখনই প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিলেন, তাঁহার দীক্ষার নাম হইল—শ্রীনরোত্তমদাসাধিকারী, শ্রীবিদ্যাতুষণ প্রভুও ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন।

১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীগোরা-বিভাববাসরে পরমারাধ্য প্রভুপাদ বৈদিক বিচারে ত্রিদিগুসন্ন্যাস গ্রহণলীলা প্রকাশ করেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-গান্ধার্বিকাগিরিধারী বিগ্রহ স্থাপন ও আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সালের নবেম্বর মাসে কলিকাতা ১নং উন্টাডিজি জংসন রোডে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ আসন স্থাপন পূর্বক বিপুল উত্তমে সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে থাকেন। এই শ্রীভক্তিবিনোদ আসনেই ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গরাধাগোবিন্দ শ্রীমুর্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখাস্বরূপে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাতুষণ প্রভুকে ঐ সকল মঠের সেক্রেটারী

রূপে সেবাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার অর্পণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালাবধি (১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত) শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু গৃহস্থাপ্রশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিস্ফারের প্রায় ষাটশ বর্ষ পরে ১৯৪৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে পরমা-রাধ্য প্রভুপাদের সমাধিসমীপে আমাদের প্রবীণ গুরুভ্রাতা (অধুনা নিত্যধামপ্রাপ্ত) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিকট তিনি ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেশ আশ্রয় করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নামে পরিচিত হন। তদীয় সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ তৎকালে হোমকার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও সমুদ্র-পারে বিলাতেও প্রচার-প্রসার, মঠ-মন্দির-স্থাপন, শ্রীমুক্তি-প্রতিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চা সংস্থাপন, শ্রীনবদ্বীপধাম-শ্রীগোড়মণ্ডল-শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-প্রবর্তন, শ্রীধাম-মায়া-পুর-কলিকাতা-ঢাকা-পাটনা-কান্দী-প্রয়াগ-কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে সংশিক্ষাপ্রদর্শনী উদ্বোধন, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ-সাপ্তাহিক গোড়ীয়-মাসিক সজ্জনতোবাবী-ইংরাজী হারমণিষ্ট-হিন্দীভাগবত-উৎকলীয় পরমাখী-অসমিয়া কীর্ত্তন প্রভৃতি সাময়িক পারমার্থিক-পত্র পরিচালন, সংস্কৃত-বাংলা-ইংরাজী-হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, শ্রীধামমায়াপুর-কুরুনগর-কলিকাতা-ঢাকা-কটক প্রভৃতি স্থানে মুদ্রাযন্ত্রস্থাপন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানস্থিত মঠ-মন্দিরাদির দৈনন্দিন সেবা পরিচালন, বিভিন্ন সময়ে অহুষ্ঠেয় শ্রীকৃষ্ণ-কাক্ষ-স্মরণ-মহোৎসব এবং তত্ত্বপলক্ষে মহাপ্রসাদবিতরণোৎসবাদি অসংখ্য সেবাকার্য্যে কায়-মনঃ-প্রাণে সহায়তা করিয়া শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদের প্রচুর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ সতীর্থগণও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতারূপে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-বিস্ফারের পর দৈবানুরোধে আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে আমাদেরিগের প্রতি পূর্ববৎ (অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালের তায়) স্নেহ-

শ্রীতি-পরায়ণ না দেখিতে পাইলেও আমরা তাঁহাকে সর্বদাই জ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বীয় মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছি।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব তাঁহার অসুস্থলীলাভিনয়কালে প্রত্যহ তাঁহার সংবাদ পাইবার জন্ত বিশেষ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটলীলাবিস্ফারদিবস (২৪শে ভাদ্র) প্রাতেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীমঠের কোন জরুরী সেবাকার্য্য-বশতঃ তাঁহার গোয়াড়ী কুরুনগরস্থ শাখামঠে যাইতে হয়, তথায় সন্ধ্যায় তাঁহার (শ্রীল তীর্থ মহারাজের) অপ্রকট সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ প্রমুখ সেবকগণ সমভিযাধারে প্রসাদী মালা-চন্দনাদিসহ মোটরযান যোগে প্রথমেই শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ গমন করেন—তথায় রাত্রির প্রথমভাগেই শ্রীল তীর্থ মহারাজের কলেবর কলিকাতা হইতে মোটরযান-যোগে শ্রীধামে পৌছিতে পারেন, ইহা অনুমান করিয়া। পরে রাত্রি ১০-৩০টা হইতে ১১-৩০ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কলিকাতার কোন সংবাদ না পাইয়া ঈশোত্তানস্থ মঠে চলিয়া আসেন। সারারাত্রির জন্ত একখানি রিক্শ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে কলিকাতার মোটর আসিবা মাত্রই সংবাদ পান—এই উদ্দেশ্যে। যাহা হউক কলিকাতার মোটর ১১ সেপ্টেম্বর ভোর ৫ টায় শ্রীচৈতন্যমঠে পৌছিয়াছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সংবাদ পাইবামাত্র কতিপয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবক সমভি-যাধারে রিক্শযোগে শ্রীচৈতন্যমঠে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ প্রভৃতি। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ বোধায়ন মহারাজ ১০ সেপ্টেম্বর রাত্রিতেই ঈশোত্তান হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে গিয়া-ছিলেন এবং সারারাত্র তথায়ই অবস্থান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে সতীর্থগণ শ্রীল তীর্থ মহারাজের শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া

তাঁহাকে প্রসাদী মালাচন্দনাদি দ্বারা সজ্জিত করেন এবং সেবকগণসহ কীর্তনমুখে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক তৎসান্নিধ্যে উপবিষ্ট হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার সেবকগণ সমন্বয়পযোগী বৈষ্ণবগুণাখ্যচক বিবিধ মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন করিতে থাকেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ কএকজন সেবকসহ আসেন। তাঁহারাও প্রসাদী মালাচন্দন দান ও বৈষ্ণবমহিমাখ্যচক পদাবলী কীর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ গোঁস্বামী মহারাজের মঠ ও শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের মঠ হইতেও সেবকগণ আসিয়া পূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ মহারাজের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করেন। নিত্যধামগত শ্রীমদ্ কেশব মহারাজের মঠ হইতেও বহু বৈষ্ণব আগমন করেন ও সংকীর্তনাদি সমবেতভাবে করিতে থাকেন।

১০ই সেপ্টেম্বর পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজের অপ্রকট-সংবাদ শ্রবণমাত্র দক্ষিণকলিকাতাত্ত্ব শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিবিশয় বামন মহারাজ প্রমুখ বহু সেবক প্রসাদী মালাচন্দনাদিসহ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গিয়া শ্রীল তীর্থ মহারাজের শ্রীঅঙ্গে প্রসাদী পুষ্প-মালাদি অর্পণ পূর্বক তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজও অসুস্থাবস্থায় শ্রীগৌরানন্দমন্দির হইতে শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবক পাঠাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ সতীর্থ বৈষ্ণবগণ বিরহ-ব্যঞ্জক মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র অবিশ্রান্তভাবে কীর্তন করিতেছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ তথায় বিবরনবদনে উপবিষ্ট ছিলেন। রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের দ্বিতলোপরিস্থ ঠাকুর ঘরের সম্মুখেই শ্রীল তীর্থ মহারাজের খাট রাখা হইয়াছিল। অগণিত বিরহবিহ্বল নরনারী

ভক্তবৃন্দ অজস্র পুষ্পমালাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাদের এজগতের শেষ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছিলেন। সকলেরই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। দুইখানি বড় ত্রিপলমণ্ডিত লরী এবং ৩ খানি বাস কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার জন্ত রিজার্ভ করা হইয়াছিল। একখানি লরী পুষ্পমালা পতাকাদি দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া তাহাতে পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজের খাট রাখা হইয়াছিল। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ ভক্তগণ তাহাতে মৃদঙ্গকরতালাদি সংযোগে উচ্চস্বরে অবিশ্রান্তভাবে কীর্তন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় লরীখানিতেও ঐরূপ অবিরাম কীর্তন চলিয়াছে। লরী ও বাস রাত্রি ১২ টায় রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করে। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে মুহূর্ত্তঃ জয়গান করিতে থাকেন। ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনিসহ উচ্চকীর্তন-মধ্যে পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজের খাটসহ শ্রীঅঙ্গ দ্বিতল হইতে নিম্নতলে নামাইয়া বরাবর লরীতে উঠান হয়। এ মর প্রপঞ্চ হইতে চির-বিদায়—বড়ই মর্ম্মস্তদ হৃদয়বিদারক দৃশ্য। শ্রীমদ্ব্যাপ্তভু ও শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদের “হৃৎ মধ্যে কোন্ হৃৎ হয় গুরুতর। রায় কহে কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা হৃৎ নাহি দেখি পর।” — এই পয়ারটির মর্ম্মার্থ এই সময়েই বিশেষভাবে অনুধাবনের বিষয় হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজের লরীর একটু অনুব্রজ্য্য করিয়া রাত্রি প্রায় ১২ টায় শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে ফিরিয়া আসেন।

১১ই সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় লরী ও বাস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পৌছায়। ভক্তগণ ক্রন্দন করিতে করিতে মহাসংকীর্তন ও বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের খাট লরী হইতে অবতারণ করেন। তাঁহার খাট লইয়া শ্রীমায়াপুরের সকল মন্দিরই পরিক্রমা করাইয়া পরিশেষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন ভজন-কুটার সমক্ষে লইয়া আসা হয়। সমাধির আয়োজন

হইতে থাকে। কিন্তু ভজনকুটীর-মধ্যে সমাধি দিবার কথা শুনিয়া পূজাপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-দেব অত্যন্ত আশ্চর্য্যাম্বিত হন ও বিশেষভাবে আপত্তি উত্থাপন করেন। গ্রামবাসী সজ্জনগণও উহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। বিশেষতঃ শুন্য গেল—শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাঁহার প্রকটকালেই শ্রীল প্রভুপাদের সমাধির পূর্বদিক্স্থ ভূখণ্ডে তাঁহার সমাধির ব্যবস্থা করিবার স্পষ্ট নির্দেশও দিয়া গিয়াছেন এবং তদনুসারে পূর্ব-রাত্রেই (অপ্রকটরাত্রে) ঐ ভূখণ্ডের গোলাপবাগিচা উৎপাটিত করিয়া স্থানটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়াও রাখা হইয়াছিল। তৎসঙ্গেও ডাঃ শ্রীমদ্বিদানন্দ দাস পূজাপাদ মাধব মহারাজকে ‘মহারাজ, আর হুংখ দিবেন না’ বলিতে বলিতে এবং ‘ডাক্তার চ্যাটার্জির একান্ত ইচ্ছা’ প্রভৃতি অজুহাত দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার সঙ্কল্পে দৃঢ়তা প্রদর্শন করায় এবং দূর হইতে মোজাইক করা মেজে খোঁড়া আরম্ভ হইয়াছে — শব্দ পাইয়া পূজাপাদ মাধব মহারাজ আর সেখানে কালক্ষেপ নিস্ত্রয়োজন বুঝিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ঈশোত্তানস্থ মঠে ফিরিয়া আসেন। তখন বোধ হয় বেলা ১১টা। আন্দাজ হইবে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের ভৃত্যহুভৃত্যহুত্রে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মবেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রাচীন স্মৃতিমন্দিরে — তাঁহার ভজনকুটীর মধ্যে — বিশেষতঃ যেখানে বসিয়া প্রভুপাদ শতকোটি-মহামন্ত্র জপাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই ভজনমন্দির মধ্যে তচ্ছিন্নের সমাধিদান কার্য্যটি কখনই

সমীচীন হয় নাই। ঐ গৃহের উভয়পার্শ্বে, শ্রীরাধা-কুণ্ডতটে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের উভয় পার্শ্বে (অর্থাৎ পূর্ব বা পশ্চিম অংশে) প্রচুর মনোজ্ঞ স্থান থাকা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতিভবনের স্মৃতি লুপ্ত বা প্রতিহত করিবার চেষ্টা মাদৃশ কতিপয় ভৃত্যহু-ভৃত্যের হৃদয়ে খুবই বেদনা-দায়ক হইয়াছে। শ্রীগুরু-দেবের আসনে শিষ্যকে বসাইবার চেষ্টায় কখনই শিষ্যের মর্য্যাদা সমৃদ্ধ হয় না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। নিত্যধামপ্রবিষ্ট শ্রীল তীর্থ মহারাজও ইহাতে সুখানুভব করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

আমাদের জ্যেষ্ঠ সতীর্থের বিরহে আমরা সকলেই কাতর; কিন্তু ঐ সমাধিস্থাননির্দেশ ব্যাপারটি আমাদের আরও হৃৎখদায়ক হইয়াছে।

পূজাপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে দক্ষিণকলিকাতায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বিশেষ বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীল তীর্থ মহারাজের জন্ত বিরহবেদনা প্রকাশ করেন এবং রাত্রেও শ্রীমঠের সঙ্কীর্ণন-ভবনে সভাস্থলে তাঁহার গুণগাথা কীর্তন-মুখে জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

“রূপা করি’ কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ।

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ ॥”

পূজাপাদ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বাভীপ্সিত ধামে অবস্থান পূর্বক আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত সকল অপরাধ — জটীবিচ্যুতি নিজগুণে ক্ষমা করুন, ইহাই তচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।



প্রাচৈতন্য-বর্ষা

“চেতোদর্পণমার্জ্জনঃ ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণঃ
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিভরণং বিজ্ঞাবধূজীবনম্।
আনন্দানুদিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণায়ুভাস্বাদনং
সর্বাস্বল্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩।

২৫ কশব. ৪১০ শ্রীগোবিন্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বুধবার ; ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

{ ১০ম সংখ্যা

সজ্জন-স্থির

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

আত্মার ধর্ম অচঞ্চল। মন ও দেহের ধর্ম পরিণামশীল। অনিত্য পরিণামশীল বস্তু কখনই স্থির নহে। পরিবর্তনশীল বস্তুর প্রতি আত্মা স্থাপন করা যাইতে পারে না। দেহ নিত্য নহে, মনও অনিত্য বস্তু হইতে স্বীয় অনুশীলনীয় বৃত্তি সংগ্রহ করে সুতরাং তাহার উভয়েই অস্থির।

তাৎকালিক বৃত্তির তাড়নায় দেহ ও মন নানাপ্রকার প্রারম্ভের আবাহন করে। চাঞ্চল্য রহিত হইলে নিত্য-ধর্ম স্থিরতা আত্মায় উপলব্ধি হয়। ভগবন্তের পরিণামশীল অসম্বন্ধে প্রবৃত্ত হন না। ভগবৎ সেবায় চিত্তবৃত্তি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবকে অস্থির ধর্ম পরিত্যাগ করে না। যে কালে মনোরথ অস্থির বস্তুর সেবার ধাবিত হয় তৎকালাবধি তাহার নিত্যত্বের বা স্থিরতার সম্ভাবনা নাই। হরিসেবাপর সজ্জন সকল সময়েই স্থির। স্থির বস্তু ভগবান স্থির প্রকৃতি সজ্জনের অনুকূল অনুশীলনের বস্তু।

পতঞ্জলী ঋষির যোগদর্শন আলোচনা করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে কৃত্রিম উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। আবার ঈশ্বর প্রণিধান কলে চিত্ত স্থির হয়। শমদমাদির অভ্যাস কলে যে স্থিরতার উদ্দেশ্য করা হয় তাহা পরিণামশীল ও অস্থিরতার পূর্ব-

বৃত্তি। বাস্তবিক স্থিরতা, নিত্যবস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে অল্প অনিত্য বৃত্তির যোগে সম্ভাবনা হয় না।

অজ্ঞাভিলাষী কর্মী বা জ্ঞানী কেহই স্থির নহেন। তাহার নিজ নিজ অভাবে সর্বদাই অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জগৎ বিভিন্ন কালনিক অনিত্য অস্থিরতার আবাহন করেন মাত্র। আপনাদিগকে অভাবগ্রস্ত হুঃখী জ্ঞানে স্ব স্ব বাঞ্ছিত বস্তু লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান। বিশেষতঃ সাধন ও সাধো বৈষম্য থাকিলে অস্থিরতাই শেষ ফল হয় অর্থাৎ উপায় উপায়ের পাথক্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে।

শ্রীগৌরমন্দের একদিন শ্রীরঘুনাথ দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন —

“স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধকুল।”

সকল কার্যোই স্থিরতার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য বিশিষ্ট না হইলে ভক্তি সূচুতা লাভ করে না। অন্যায় ধর্মে অনিত্য ও অস্থিরতা আছে। সজ্জনগণ তাহাতে প্রমত্ত নহেন। সজ্জনগণ সকল অমুষ্ঠানেই ধীর। সজ্জনগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের আদর্শ।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রস-কীর্তন)

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা-গানের প্রণালী কি ?

উঃ—“গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্বপ্রায়ে গান করা উচিত; বিশেষতঃ সাধুদিগের প্রথা এই যে, গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করেন না।”

—‘সমালোচনা’, সং: তোঃ ২১৬

প্রঃ—সাধকের পক্ষে কিরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করা উচিত ?

উঃ—“যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাগ্যাদিই শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমুদ্রিক্ত করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।”

—চৈঃ শিঃ ৩২

প্রঃ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে সঙ্গীতের পারিপাট্য কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

উঃ—“শ্রীশ্রীনিবাস-আচাৰ্য্য প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীনিবাস-আচাৰ্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্রামানন্দ, — এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইহারা কীর্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহানরোহ-পাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধ।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সং: তোঃ ৩১২

প্রঃ—‘মনোহরসাহী’, ‘গরাণহাটী’ ও ‘রেণেটী’ গানের প্রচলন কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

উঃ—“শ্রীশ্রীনিবাস আচাৰ্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জল করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতদ্বিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান-পদ্ধতির

নাম — ‘মনোহরসাহী’ গান। শ্রীনরোত্তমদাস রাজসাহী জেলার গরাণহাটী বা গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতদ্বিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান-পদ্ধতির নাম ‘গরাণহাটী’ গান। শ্রীশ্রামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্তিত গীত-পদ্ধতিকে ‘রেণেটী’ গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচাৰ্য্য-দিগকে উৎসাহ দিবার জন্ত শ্রীনিবাস আচাৰ্য্যকে — ‘প্রভু’ পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে — ‘ঠাকুর’ পদ ও শ্রীশ্রামানন্দকে — ‘প্রভু’ পদ দিয়াছিলেন।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সং: তোঃ ৩১২

প্রঃ—মহাজন-পদে অরসজ্ঞ ব্যক্তির অক্ষর সংযোগ করা অসুচিত কেন ?

উঃ—“মহাজনের বাক্যে রসভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাঞ্চে-কঞ্জেই রসভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সং: তোঃ ৩১২

প্রঃ—রস-কীর্তন-ব্যবসায়ীর মূল্য কতদূর ও তাহার কীর্তন কি বৈষ্ণবের শ্রোতব্য ?

উঃ—“ইহারা (ব্যবসাদার লীলা-রস-গায়কগণ) সকলেই নামে রসিকমাত্র; তাহারা রসবোধ-শূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাবী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিণী, রংটং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত জীলোক ও মূর্থ লোক-দিগকে রজন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটি কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্থলোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অঙ্কুরে পরিপূর্ণ।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সং: তোঃ ৩১২

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনধিকারীর পক্ষে যে রসকীর্তন নিষিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কিরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছেন ?

উঃ—“জগতে অধিকাংশ ক্ষয়্যই বিকৃত; তাহার রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেষ্টাচার করিয়া থাকে। যে-পর্ধ্যন্ত এই কুপস্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্ধ্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গান্ধীর্বা থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত'দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যথার্থে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্ত-রসের গান হওয়াই উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব-মাত্র উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রস-গান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত-ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, তাহাতেও

বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিভাস্ত কলির কার্য্য।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সঃ ভোঃ ৬২

প্রঃ দেহারামী ব্যক্তি অপ্রাকৃত-লীলার কথা শ্রবণে কি গতি লাভ করে?

উঃ—“যে-সকল ব্যক্তি স্থূল দেহগত সুখকে বহু-মানন করতঃ চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না; কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অলীল বলিয়া মিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া-ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন।”

— চৈঃ শিঃ ৭৭



সুপ্রাচীন ঋগ্বেদে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-কথা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীনন্দকৃষ্ণপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলাধ্বীতটে শ্রীদারু-ব্রহ্মরূপে বিরাজমান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কথা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে দশম মণ্ডল, ১৫৫তম সূক্ত তৃতীয়া ঋকে এইরূপ উল্লিখিত আছেঃ—

“অদো যদারু প্লবতে সিন্ধোঃ পাবে অপুরুষম্।

তদা রভস্য দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥”

বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীসায়নাকর্ষা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে (১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির কথা প্রত্ন হয়) উক্ত ঋগ্বেদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

“অদো বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানমপুরুষং নির্দ্বাতা পুরুষেণ রহিতং যদারু দারুণ্যং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতা-শরীরং সিন্ধোঃ পাবে সমুদ্রতীরে প্লবতে জলশোপরি বর্ততে তদারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয়কেনাপি হস্তমশকা হে স্তোতঃ সারভব আলম্বয় উপাসন্যেত্যর্থঃ। তেন দারুণ্যেন দেবেনোপাস্তমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরনীয়মুক্তকণ্ঠং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ ॥”

অর্থাৎ “দূরবর্তী স্থানে বর্তমান (অধোক্ষজ) নির্দ্বাতা পুরুষ-রহিত (অপৌরুষেয় — স্বয়ম্ভু) যে দারুণ্য পুরুষোত্তম-নামক ভগবদ্বিগ্রহ বিরাজমান, হে অমর স্তবকারিন্, সেই দারুণ্যকে আশ্রয় কর এবং তাঁহার উপাসনা-দ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-লোকে গমন কর।”

উৎকলধণ্ডে (বঙ্গবাসী সংস্করণ ১১৩) উক্ত ঋগ্বেদ-মন্ত্রটি একটু অত্যাচারে দৃষ্ট হয়—

“য এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হপৌরুষ।

তম্পাস্ত দুৱারীধ্যং মুক্তিং যতি সুহৃদ্বাভাম্ ॥”

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদভাগবতা-মৃত গ্রন্থে শ্রীজগন্নাথদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“দারুণ্য জগন্নাথো ভগবান্ পুরুষোত্তমো।

ক্ষেত্রে নীলাচলে ক্ষারার্ণবতীরে বিরাজতে ॥

মহাবিভূতিমান্ রাজ্যযৌৎকলং পালয়ন্ স্বয়ম্।

ব্যজয়ন্ নিজমাহাত্ম্যং সদা সেবকবৎসলঃ ॥

তস্মাৎ পাতিতং লক্ষ্যং স্বয়ং ভুক্তা দয়ালুনা।
 দত্তং তেন স্বভক্তেভ্যো লভ্যতে দেবভূক্তভম্ ॥
 মহাপ্রসাদসংস্পৃষ্টং তৎস্পৃষ্টং যেন কেনচিত্।
 যত্র কুত্রাপি বা নীতমবিচারেণ ভুজ্যতে ॥
 অহো তৎক্ষেত্রমাহাশ্রয়ং গদ্যভোহপি চতুর্ভুজঃ।
 যত্র প্রবেশমাশ্রয়ে ন কস্তাপি পুনর্ভবঃ ॥
 প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষে তন্মিন্নেবেক্ষিতে জনৈঃ।
 ফলং শ্রাদ্ধবমশ্রোয়মাশ্চর্য্যং পূর্বমশ্রুতম্ ॥

* * * *

দূরাদদর্শি পুরুষোত্তমবক্তৃচন্দ্রো
 ব্রাহ্মদিশালনয়নো মণিপুণ্ড্রভালঃ।
 স্নিগ্ধাভ্রকান্তিরকুণাধরদীপ্তিরমো-
 হশেষপ্রসাদবিকসংস্মিতচন্দ্রিকাচাঃ ॥”

—বৃঃ ভাঃ ২।১।১৫৯-১৬৩, ১৬৭

অর্থাৎ নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে লবণসমুদ্র-
 তটে দারুব্রহ্ম শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেব বিরাজমান্ আছেন।
 তিনি মহাবিভূতিমান্। স্বয়ংই উৎকলরাজ্য পালন
 এবং সর্বদা সেবকবৎসলরূপে নিজমাহাশ্রয় প্রকাশ
 পূর্বক সেবকগণকে রূপা করিয়া থাকেন। স্বয়ং
 লক্ষ্মীদেবী তাঁহার অন্ন পাক করেন। পরম করুণাময়
 প্রভু নিজে সেই অন্ন ভোজন করিয়া ভক্তগণকে
 প্রসাদ দিয়া থাকেন। তাহাতেই ভক্তগণ ঐ
 দেবভূক্ত অন্ন লাভ করিতে পারেন। প্রভুর
 সেই প্রসাদান্নের নাম ‘মহাপ্রসাদ’। তাহা যে
 কেহ স্পর্শ করিলে বা যে কোন স্থানে নীত হইলেও
 (ব্রাহ্মণাদি নির্বিশেষে) সকলেই অবিচারে (নির্বি-
 কার চিত্তে) ভোজন করিয়া থাকেন। অহো!
 শ্রীজগন্নাথদেব বা তদন্ন মহাপ্রসাদের মহিমা দূরে
 থাকুক, সেই ক্ষেত্রের মাহাশ্রয় এইরূপ যে, তথায়
 গদ্যভো চতুর্ভুজরূপে দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ-
 মাত্র কাহাকেও আর পুনর্জন্ম লাভ করিতে
 হয় না। আরও এক অত্যন্ত অশ্রুতপূর্ব কথা এই
 যে, সেই প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীজগন্নাথদেবকে এই
 চক্ষুর্বারা দর্শন করিলেই জন্ম সফল হয়। শ্রীপুরু-
 ষোত্তমদেবের শ্রীমুখমণ্ডলে বিশাল নয়নবৃগল শোভা

পাইতেছে, ললাটফলকে মণিময় তিলক বিরাজিত,
 শ্রীঅঙ্গকান্তি নববনসম, অরুণাধরের দীপ্তি শ্রীমুখমণ্ডলের
 রমণীয়তা-ব্যঞ্জক। মৃদুহাস্যরূপ চন্দ্রিকায় উক্ত রমণীয়
 মুখমণ্ডলকে আরও অধিক রমণীয়রূপে প্রকট করিয়া
 আপামর সাধারণ সকল লোকের প্রতি মহাপ্রভু
 শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ বিতরণ করিতেছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার ‘শ্রীলীলাস্তবে’
 লিখিয়াছেন — অচলব্রহ্ম বা দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবই
 সচলব্রহ্মরূপে শ্রীনীলাচলবিভূষণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। অচল
 ও সচল প্রভুকে তিনি এইরূপে স্তব করিতেছেন:—

“শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে।

দারুব্রহ্মান্ বনশ্রাম প্রসাদ পুরুষোত্তম ॥

প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ লবণাক্তিতামৃত।

গুটিকোদর মাং পাহি নানাতোষণপুন্দর ॥

নিজাধর সুধাদায়িরিদ্ভুগ্নপ্রসাদিত।

সুভদ্রালালনব্যগ্র-রামানুজ নমোহস্ত তে ॥

গুণ্ডিচা রথযাত্রাদি মহোৎসব বিবর্দ্ধন।

ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথমগুনম্ ॥

দীনহীন-মহানীচ-দয়াদ্রীকৃতমানস।

নিত্যানুতন মাহাশ্রয়াদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥ নমঃ ॥”

ইহার পরেই শ্রীসনাতন শ্রীক্ষেত্রবিহারী শ্রীগৌর-
 হরিকে স্তব করিতেছেন—

“শ্রীমচৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরান্ধসুন্দর।

শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥

আজাহুবাহো স্মেরাত্ত নীলাচলবিভূষণ।

জগৎ-প্রবর্তিত-স্বাত্তভগবন্মাকীর্তন ॥

অদ্বৈতাচাৰ্য্য-সংস্রাঘিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক।

রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ববৈষ্ণববান্ধব ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রোজ-প্রেমানুত-মধ্যস্থে।

নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিত্ কিং স্মরিস্যসি ? নমঃ ॥”

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে
 শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্ন
 কলেবররূপে বর্ণন করিতেছেন—

“মহানন্দে সর্বলোক ‘জয় জয়’ বলে।

আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে ॥

‘আপনে শ্রীজগন্নাথ জাসিরূপ ধরি’ ।
‘নিজে সংকীৰ্ত্তন-ক্ৰীড়া করে অবতরি’ ॥”

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।১২৬, ১৬৫

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

“সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি হই ভাই ।
‘হুইজনে রূপা করি’ কহেন গোস্বামি ॥
‘দারু’-‘জল’-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি ।
‘দরশন’-‘দ্বানে’ করে জীবের মুক্তি ॥
‘দারুব্রহ্ম’ রূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ ‘জলব্রহ্ম’ সম ॥
সার্বভৌম, কর দারুব্রহ্ম আরাধন ।
বাচস্পতি, কর জলব্রহ্মের সেবন ॥”

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৩৩-১৩৬

“জগন্নাথ হন কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ ।
কিন্তু ইহা দারুব্রহ্ম—স্থাবরস্বরূপ ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা ।
কৃষ্ণ একত্বরূপ হুইরূপ হঞা ॥
সংসার-তারণ-হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি ।
তাঁহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি ॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার ।
গৌর জঙ্গম রূপে কৈলা অবতার ॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার ।
সবদেশের সবলোক নারে আসিবার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা ।
সবলোকে নিস্তারিলা জঙ্গমব্রহ্ম হঞা ॥”

—চৈঃ চঃ অ ৫।১৪৮-১৫০

শ্রীভগবান্ কখনও বিভিন্ন মূর্তিতে নিজ পরিকর ও ধামসহ অবতীর্ণ হন, কখনও বা নিত্য অর্চ্য-বতার নিজ নিজ ধামসহ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়া তথায় নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন । শ্রীনীলাচলক্ষেত্র—সাক্ষাৎ ভূবৈকুণ্ঠ । তথায় শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপে নিত্য বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার দর্শনদানে জগজ্জনকে নিস্তার করিতেছেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“যতপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম ।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো নিত্যসন্নিধান ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্যসন্নিধান ।
নীলাচলে পুরুষোত্তম ‘জগন্নাথ’ নাম ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্ডারে শ্রীমধুসূদন ।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দন ॥
বিষ্ণুকাঙ্ক্ষীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে ।
ঐছে আর নানা মূর্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২০।২১২, ২১৫-২১৭

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

“সমুদ্রোত্তরে তীরে আশ্তে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুণ্যাজশরীরভূৎ ॥”
অর্থাৎ সমুদ্রের উত্তরতীরে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পূর্ণা-নন্দময় ব্রহ্ম দারুণ্যাজে মূর্তরূপে বিরাজ করিতেছেন ।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

“নীলাদ্রৌ চোৎকলে দেশে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
দারুণ্যাস্তে চিদানন্দো জগন্নাথব্যমূর্তিনা ॥”
অর্থাৎ উৎকলদেশে নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে চিদানন্দময় জগন্নাথনামক মূর্তি দারুণ্যে বিরাজিত ।
তদ্ব্যয়ামলেও ব্যক্ত হইয়াছে—

“ভারতে চোৎকলে দেশে ভূষর্গে পুরুষোত্তমে ।
দারুণ্যপী জগন্নাথো ভক্তগানামভয়প্রদঃ ॥
নরচেষ্টামুপাদায় আশ্তে মোক্ষককারকঃ ॥”
অর্থাৎ ভারতবর্ষে উৎকলদেশে ভূষর্গ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুণ্যপী ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব ভক্তগণের অভয়প্রদ-রূপে নরবৎচেষ্টা দ্বারা সকলকে সংসার-ভয় হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন ।

এইরূপ বহু শাস্ত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মাধাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে । শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রহ্মেন্দ্রানন্দরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছেন—

“ভূজে সর্বো বেণুঃ শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
হৃক্লং নেত্রাস্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্বন্দ্বাবনবসতি লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥”

সম্বন্ধতত্ত্ব ও গোপনকথা

[মহোপদেশক শ্রীমদ্বল্লভবিহারী ব্রহ্মচারী বি-এস.সি., বিহারব্রহ্ম, ভক্তিপ্রাঙ্গী]

(৬)

বন্ধজীবকুলে কেবলমাত্র যৌন সম্পর্কই দেখা যায় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতিও মাত্র তৎসম্পর্কিতই। যৌন-প্রীতির উদয় হইতে ফলকাল সময়ও লাগে না; দৃষ্টিমাত্রই সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধমাত্রই প্রীতির উদয় হয়। “লোকে ব্যাঘ্রামিষমতসেবা নিত্য হি জন্তোর্ন হি তত্ত্ব চেদানা। ব্যাঘ্রহিত্তিস্তে বিবাহযজ্ঞস্বগ্রহহারে নিবৃত্তিরিষ্টা।” (ভাঃ ১১।৫।১১)। [জগতে জীসদ, আমিব-ভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্ত্বদ্বিধয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যাবায় নাই। তবে তত্ত্বদ্বিধয়ে বিবাহ, সুরাগ্রাদির যে বাবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা জীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে, ঐ সকল নিয়মও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার জন্তই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে।] দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, যেমন বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই নবপরিণীতা বধূটার স্নেহ মমতা লাভ হয় এবং তৎসহিতই যেন আকস্মিকভাবে স্বশুর-শাশুড়ী, শ্যালক-শ্যালিকাদির মধুর স্নেহ-সম্পর্কও স্থাপিত হয়, যেমন সন্তান ভূমিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে মমতার উদয় হয় ইত্যাদি। ভাবিতেই পারা যায় না এত স্নেহ, এত প্রীতি, এত মমতা ছিল কোথায়? কেবল যৌন সম্বন্ধই এই জাতীয় স্নেহ উদ্ভেকের একমাত্র কারণ। জগতে এই জাতীয় প্রেম(?) বা প্রীতি খুব সস্তায় মিলিলেও ইহার পরিণাম কিন্তু বড়ই দুঃখময় ও নৈরাশ্রময়। অপর পক্ষে ভক্ত ও ভগবানের প্রীতির সম্বন্ধটী অযোনিসম্ভব হওয়ার অর্থাৎ সমুহ বৈকুণ্ঠ বিষয়টী শ্রবণজ, কীর্তনজ ও স্মরণজাদি হওয়ার “শব্দযোনিহাং” “শব্দমুক্তিমান” আদি বিশেষণ পদযুক্ত হওয়ার তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করা বা তাঁহাদিগকে প্রীতি করা শুদ্ধ-শ্রবণবিহীন বন্ধজীবের পক্ষে অসম্ভব

ব্যাপার। অথচ শাস্ত্রসমুচ্চয়ে বলিতেছেন, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও প্রীতি সহজ বা সহজাত এবং তাহা পরম সুন্দর ও পরম সুখময়। “নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্যা কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥” (চৈঃ চঃ) “মদগুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্কগুণাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহমুখো॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হুদাহতম। অহৈতুক্যাবাহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষাত্মে॥” (ভাগবত) [আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্কচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের তায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষাত্ম-স্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা।] “যদি হয় যোগ না হয় বিরোগ। বিরোগ হইলে কভু না জিয়য়।” (চৈঃ চঃ) — “রসবর্জ্য রসোহপশু পরং দৃষ্টা নিবর্ততে॥” (শ্রীগীতা) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সমুহ দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জীবের ঈশ্বর প্রীতি ছাড়া যাবতীয় প্রীতিই ঔপাধিক প্রীতি এবং তাহার একটা মাত্রা বা সীমা আছে এবং তাহার যোগ বিরোগও আছে। কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতি জীবে স্বতঃসিদ্ধ হওয়ার, কোন কারণবশতঃ (জীবের অণুই নিবন্ধন জীব শ্রীভগবন্মায়াধ্যাসিত হইলে) তাহা সাময়িকরূপে আবৃত থাকিলেও প্রেম প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ লাভ করিলে অর্থাৎ প্রেমময় শুদ্ধভক্তের সঙ্গে শ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানে স্বাভাবিকী ভক্তির উদয় হয় এবং তাহা একবার উদিত হইলে আর কখনও নিবৃত্ত হয় না, অধিকন্তু উক্ত প্রীতি বা প্রেম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়; উহার বেগও প্রবল; যথা ‘মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহমুখো’। তজ্জন্ত জীবগণকে সময়ান্তরে ঔপাধিক প্রীতি পরিত্যাগ করতঃ ঈশ্বর-প্রীতি করিতে দেখা গেলেও, ঈশ্বর-প্রীতি-যুক্ত কোন ব্যক্তিকেই ঈশ্বর প্রীতি ছাড়িয়া ঔপাধিক

প্রীতিতে দ্বিগীয়রার স্বরূপ হইতে দেখা যায় না। এহেন সর্বাকর্মী ইন্দ্র-প্রীতি বা শ্রীভগবৎপ্রেমার স্বরূপ লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন এবং প্রেমের স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অন্তরঙ্গি। প্রেমের অর্থও ভূমিকার উৎকর্ষ সাধনে তত্ত্ব ভগবানের পরম্পরার মিলন ও রিচ্ছেদের অত্যাশঙ্কতার ষট্ভূমিকায় প্রীতির সহিত অভীষ্টের নাম, ঋণাদির কীর্তনই চরম পরাক্রাণময়। উহা অর্থও ভাবময়। সঙ্কীর্তন বলিতে ইহাকেই বুঝায়। শ্রীনামের প্রকাশই প্রেমের প্রকাশ এবং শ্রীনামের অপ্ৰকাশে প্রেমেরও অপ্ৰকাশাঙ্গ। শ্রীনামের অপ্ৰকাশে পরতত্ত্বের রূপ, গুণাদি লক্ষণই অপ্ৰকাশিতই থাকিয়; যায় এবং নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, নির্বিশেষবাদাদি বাবস্তীর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ জীবচিন্তকে অবরোধ করে, গ্রাস করে। তাহাতে বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বরূপ ও স্বরূপ হইতে জীবকে চিরতরে বঞ্চিতই থাকিতে হয়। তজ্জন্ত শ্রীনামোচ্চারণই মাত্র ভক্তিব্যোগের স্বরূপ লক্ষণ। ভক্তিব্যোগের স্বরূপ লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পূর্ণ লক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রেম প্রাপ্তি পর্যন্ত সকলই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। তদ্ব্যতিরিক্ত ভক্তিব্যোগের অপর কোন লক্ষণ নাই। বেদশাস্ত্র বলেন, “ওঁ অহম্ জ্ঞানন্তো নাম চিদ্ধিবক্তনং মহন্তে বিষ্ণো! স্তমন্তি ভজ্যমহে ওঁ তৎসং।” (ঋগ্বেদ) [হে বিষ্ণো! তোনার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক উচ্চারণাদি মাংসাত্ম্য না জ্ঞানিয়াও যদি তাহার ঈশ্বরাত্ম্য অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাকরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তথাপি আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই ঈশ্বরস্বয়ম্ভিত পদার্থ সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ।] ‘চিদ্ধিবক্তন’ শব্দে চিদ্ধাঙ্গপ্রকাশকারী অর্থও করা যায়। শ্রীভক্তিবিনোদ ভাষা —

“প্রেমের বলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করিলে প্রকাশ।

ঈশ্বর বিকশিত পুনঃ, দেখায় নিজরূপ-গুণ,
চিত্তাহরি’ লয় স্বরূপাংশ।

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে যোরে যায় লঞা,
দেখায় যোরে স্বরূপ-বিলাস।...”

শ্রীভাগবতশাস্ত্রও বলেন — “এতাবানিব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিব্যোগো ভগবতি তন্ময়ঃ গ্রহণাদিভিঃ ॥ [নামসংকীর্তনাদিহারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিব্যোগ, তাহাই এই জগতে জীব সকলের ‘পরম ধর্ম’ বলিয়া কথিত হয়]। “শুধু স্তবদ্রাবি রথান্নপাণেজ্যমানি কস্ম্যপি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেন্দ-সদঃ ॥” [ভগবান্ শ্রীহরির ত্রিলোক-কীর্তিত স্তম্ভল জন্ম, কর্ম এবং তদ্বিষয়ক নামসমূহের কীর্তন করিয়া অনাসক্ত ও অচঞ্চলভাবে সর্বত্র বিচরণ করিবেন।] “সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়চরাঃ। নমস্তস্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥” (গীতা) [তাঁহারা (মহাআগণ) কাল, দেশ ও পাত্রের শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারশূন্য হইয়া সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কীর্তনরত, আমার স্বরূপ গুণাদি নির্ণয়ে যত্নবীল এবং অপতিত-ভাবে একাদেশাদি ও নাম গ্রহণাদি নিয়ম পালনকারী হইয়া আমার প্রতি নমস্কারাদি সর্ববিধ ভক্তি আচরণ করতঃ ভবিষ্যতে আমার সহিত নিত্য সহযোগের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিব্যোগদ্বারা আমাকে উপাসনা করেন]।

“হর্ষে প্রভু কহে — শুন স্বরূপরামরায়।

নাম সংকীর্তন — কলৌ পরম উপায় ॥

সংকীর্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।

সেই ত’ সুরমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম-সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ।

সর্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

সংকীর্তন হইতে পাপ-সংসার নাশন।

চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তিসাধন-উদগম ॥” (১৫: ৮:)

“চেতঃপূর্ণমার্জনম্... ... শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥” (ঐ)

শ্রীনাম সংকীর্তনের এতাদৃশ মহিমা সচ্ছাত্তসমূহে নিপিবদ্ধ থাকিলেও এবং জনসাধারণে তাঁহার বহুল প্রচার বা প্রসার হইলেও কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী-শ্রেণীর কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সিদ্ধির উপায়রূপে তাহা ব্যবহৃত হইলে তাহা হইতে প্রেমকল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তিব্যোগের আশ্রয়েই জীব-জগৎ শ্রীনামরস আরাধন করিতে পারেন এবং

তখনই মাত্র বেদবিহিত কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির তুচ্ছতা জীবের হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয়। কোন বিষয়ের তুচ্ছতা যতক্ষণ পর্যন্ত অল্পভূত না হয়, ততক্ষণ তাহা ত্যাগ করা কঠিন বা অসম্ভবও বটে। কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির মধ্যে জীবের সংসার বাসনা কোথাও উপ্ত, কোথাও স্পষ্টাকারে থাকিয়াই যায় কিন্তু শুদ্ধভক্তের আশ্রয়ে শ্রীনামোচ্চারণে জীবের যাবতীয় অশুভের মূল সংসার-বাসনাও চিরতরে নিশ্চল হইয়া যায় এবং তখনই মাত্র কর্ম, জ্ঞান, যোগের তুচ্ছতা যথার্থতঃ উপলব্ধির বিষয় হয়। “কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিংশপূরা। কাশপুষ্পায়তে দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোংখাত-
 দ্রংষ্ট্রায়তে। বিখং পূর্ণস্থায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তমঃ” (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত) [যে শ্রীমদ্ব্যগ্রভূর কারুণ্যকটাক্ষলক্ষ বৈভববিশিষ্ট হরিজনগণের নিকটে যোগিগণারাধা পরমপদ কৈবল্য নরকতুল্য, কামী স্বধর্মনিষ্ঠের ফলস্বরূপ স্বর্গ মিথ্যা অকিঞ্চিংকর খপ্প, যথেষ্টাচারী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিবরিগণের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ উৎপাটিত-দম্ভ-কালসর্পসদৃশ, জগৎ কৃষ্ণানন্দময় এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সর্বোচ্চপদারূঢ় দেবগণের লোভনীয় পদবীও কীটপদবীর তুল্য দৃষ্ট হয়, আমরা সেই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব করি।] শুদ্ধা ভক্তির আশ্বাদন-কালে এমন কি কর্ম, জ্ঞানাদির স্বভিত্তিও ভক্তের হৃদয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ভীতির সঞ্চার করে। শ্রীপুরুষোত্তম ধামের বৃহস্পতিতুল্য রাজপুত্রপুত্র শ্রীসার্বভৌমের চিত্তের পরিবর্তনের কথা আলোচনা করিলেই তাৎপর্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনের পূর্ব পর্য্যন্তই জ্ঞানবাদ ব্যাখ্যাকালে ‘মুক্তি’ আদি শব্দের বহমানন করিতেন কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরণ দর্শনের পর তিনি শ্রীমদ্ব্যগ্রভূতের সুপ্রসিদ্ধ “তত্তে-
 হ্নুকস্পাং……মুক্তিপদে স দায়ভাক্” শ্লোকের পঠনকালে ‘মুক্তিপদে’ পাঠ-স্থলে ভীত সমস্ত হইয়া ‘ভক্তিপদে’ পাঠ উচ্চারণ করিলেন। মহাপ্রভু পাঠ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিত উত্তরে নিবেদন করিলেন, প্রভো! ‘মুক্তিপদে’ শব্দ উচ্চারণ

করিতেও ঘৃণা, লজ্জা, ভয় উৎপন্ন হইতেছে। প্রভো! তোমার রূপায় আমার চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, এখন বুঝিয়াছি “অরসজ্জ কাক চুবে জ্ঞান-নিষ্কলে। রসজ্জ কোকিল ধায় প্রেমাত্ম-মুকুলে”। অভাগিয়া জানী আশ্বাদয়ে শুদ্ধ জ্ঞান। কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্য-বান্”। তাকিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি। সেই মুখে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’”। কাঁহা বহিন্মুখ তাকিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে। কাঁহা এই সঙ্গসুখা-সমুদ্র-তরঙ্গে” (চৈঃ চঃ)। পণ্ডিত সার্বভৌমের নিবেদনের তাৎপর্য্য এই যে, এতদিন যাবৎ কেবল ‘জ্ঞান’ ‘অনন্ত’ ‘ব্রহ্ম’ ‘মুক্তি’ আদি শব্দ ব্যাখ্যাদিতে ব্যথা কালক্ষেপণ করিয়াছি, ইহাতে লাভ কিছুই হয় নাই অধিকন্তু হৃদয়ের শুষ্কতাই বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ সার্বভৌমের চিত্তের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সুখী হইলেন, মনে মনে হাস্য করিলেন; শ্রীসার্বভৌমকে ‘মুক্তিপদ’ শব্দের অর্থ শুনাইলেন, মুক্তিঃ পদে যত স মুক্তিপদঃ অর্থাৎ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অনন্তমুক্তি বিরাজিত, তিনিই মুক্তিপদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। কাজেই পাঠান্তরের কোন প্রয়োজন ছিল না মহাপ্রভু হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন। অতএব হরিনামই করিতে হইবে কিন্তু হরিনাম করিতে হইলে শুদ্ধ ভক্তসঙ্গের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। তদ্ব্যতীত অসাধু সঙ্গতে কখনও হরিনাম হয় না, নামের মত কিছু উচ্চারণ হইলেও শুদ্ধনাম, যাহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, তাহা জিহ্বায় কীর্তিত হন না; নামাপরাধ কীর্তন হয় মাত্র। নামাপরাধের মধ্যে নামাংশ কিছুমাত্রও নাই যেমন অন্ধকারে আলোকের কিছুমাত্র অংশও নাই। নামাভাসের মধ্যে নামাংশ কথঞ্চিৎ পরিমাণে থাকিলেও নামাভাসও কভু নাম নহে।

শ্রীমদ্ ভাগবতের বিচারে ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী, কর্মী, জানী ও যোগীর সঙ্গও অসংসঙ্গ মধ্যেই পরিগণিত। “কর্মণাং পরিণামিতাদ্যকিরিঞ্চাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নস্বরং পশ্চদদৃষ্টমপি সৃষ্টবৎ” (ভাঃ ১১।১৯।১৮), “যমাদিভির্যোগপঠৈঃ কামলোভহতো মুহঃ। মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাক্রান্তা ন শাম্যতি” (ভাঃ ১।৬।৩৬),

“নাশং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাভূতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥” (ভাঃ
১০।৯।২১) শ্লোকগুলি এতৎ প্রসঙ্গে অবশ্যই আলোচ্য।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এতাদৃশ অসমোঁকি মহিমাবিত
শ্রীনাথের উচ্চারণকারীর ভূমিকা নির্দেশ করতঃ
বলিলেন, “যেখানে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তার
লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ রামরায়॥ তৃণাদপি সূনীচেন
তরোরিব সহিসুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ॥” [“উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণা-
ধম। ছই প্রকারে সহিসুতা করে বৃক্ষসম॥ বৃক্ষ যেন
কাটিলে কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলেহ কারে
পানি না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে, তাবে দেয় আপন
ধন। স্বর্ঘ্য রুটি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ উত্তম
হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবৈ সম্মান দিবে
জানি ‘কৃষ্ণ’ অধিষ্ঠান॥ এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম
লয়। শ্রীকৃষ্ণ চরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥”] চৈঃ চঃ।
অর্থান্তরে শ্রী হরি সর্বদা কীর্তাধা বস্তু এবং সমাগরূপে
তিনি একমাত্র সংকীর্তন-ভক্তি লভ্য। ভক্তিদেবীর
সম্ভাবে সংকীর্তনকারীর হৃদয়ের আদ্রভাব তৃণের দীন-
তাকে, তরুগণের সহিসুতাকে এবং বৈদিক পণ্ডিত-
গণের সমদর্শিতা ও মানদবৃত্তিকেও [বিখ্যাবিনয়সম্পন্নে
ব্রাহ্মণে গবি হস্তি। শুনি চৈব স্থপাকে চ পণ্ডিতঃ
সমদর্শিনঃ॥ — গীতা] অতিক্রম করিয়া যায়। তজ্জন্ম
কীর্তনের অল্পবয়স ফলেই ভক্তিভরে সংকীর্তনকারী
ভক্তের হৃদয়ের পার্থিব আবেশের সকল সম্ভাবনাই
অন্তর্হিত হয়।

সংকীর্তনমধ্যে ক্ষণে অভীষ্ট বিগ্রহগণ প্রকাশিত
হ’ন আবার ক্ষণে তাহা অপ্রকাশিত হইলেও শ্রীনাম
কিন্তু অধঃরূপেই কীৰ্ত্তিত হইতে থাকেন। সম্ভোগ-
পর রাস, গান, নৃত্য, কীর্তনের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের
অন্তর্দ্বানেও বিরহকাতর গোপরামাগণ কীর্তন করিতে-
ছেন, “তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিত্রীড়িতং কন্ধ্যা-
শম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিহা
জনাঃ॥ (ভাঃ) [তোমার কথামৃত তদীয় বিরহকাহ্নর
জনগণের জীবন স্বরূপ। প্রহ্লাদ, প্রব প্রভৃতি ভক্ত-

গণও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। উহা
প্রারক ও অপ্রারক পাপ-বিনাশক, শ্রবণমাত্রে
মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং কীর্তনকারিগণ
কর্তৃক বিস্তৃত। স্মরণ্যং যে ব্যক্তি উহা কীর্তন করেন
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা॥ “ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ
প্রাপন্ত্যশ্চ চিত্রধা। কৃষ্ণঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শন
লালসাঃ॥” ভাঃ [শ্রীশুকদেব কহিলেন,—“হে রাজন্,
কৃষ্ণদর্শনে লালসাস্থিত হইয়া গোপিকাকুল এইরূপ
নানাপ্রকার গান ও বিলাপ করিতে করিতে সুমধুরস্বরে
রোদন করিতে লাগিলেন।] তখন রোক্তমান।
সংকীর্তকারিণী গোপীগণের মধ্যে হান্তবদন, গীত-
বসন, বনমালী সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত
হইলেন। (তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মানমুখাশুজঃ।
পীঠাশ্বরধরঃ শ্রুতী সাক্ষাৎসম্মতঃ॥ (ভাঃ ১০।৩২।২)
প্রথময় সংকীর্তন মধ্যে শ্রীভগবানের এই জাতীয়
আবির্ভাব ও অন্তর্দ্বান ইহা চিত্রসেরই প্রকার বিশেষ।
এতাদৃশ শ্রীভগবতীলা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বলা
বাহুলা হইবে না যে, সংকীর্তন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাদির বা
শ্রীবিগ্রাদির যে প্রকাশ তাহা কেবল শ্রীনাম প্রভুরই
চিহ্নিলাস বৈভব প্রকটন মাত্র। ইহাতে মাত্র শ্রীনামে-
রই স্বরাট্টব এবং শ্রীবিগ্রাদির প্রকাশকে তাঁহারই
(শ্রীনাম প্রভুরই) লীলার অঙ্গ বা অংশ বিশেষ জ্ঞান
হয়। “সুদিতাশ্রিত-জনান্তিরাময়ে রম্যচন্দন-সুখ-স্বরূ-
পিণে। নাম গোপকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্বপুং
নমো নমঃ॥” (শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক) হে নামরূপিন্ শ্রীকৃষ্ণ!
আপনি আশ্রিত জনগণের সম্ভাপরাশির বিনাশক,
রমণীয় ঘনচিৎসুখস্বরূপ, গোপকুলানন্দপ্রদ ও পূর্ববিগ্রহ।
আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (“হে নাম!) তুমি কৃষ্ণ,
পূর্বপুং রসের নিদান। তব পদে পড়ি তব গুণ কবি
গান॥” (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) “নিখিলশ্রুতিমোলি-
রত্নমালাহ্রাতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত। অগ্নি মুক্তকূলৈরু-
পান্তমানং পবিত্রাং হরিনাম সংশ্রামি॥” (শ্রীকৃষ্ণনামা-
ষ্টক) — নিখিল শ্রুতিগণের শিরঃস্থিত রত্নমালায়
প্রভানিকর দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মনথের শেষ সীমা
নীরাজিত হইতেছে এবং মুক্তকুল নিরন্তর তোমার

উপাসনা করিতেছেন। অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি। বাচ্য ও বাচক দুইরূপেই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত আছেন। তন্মধ্যে বাচক স্বরূপই অধিক রূপাময়। একমাত্র বাচকস্বরূপ শ্রীহরিনাম সংকীর্তন হইতেই নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় অর্থাৎ অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্যাদি সকল ভক্তি যাজনই শ্রীনামসংকীর্তনাত্মক ভক্তির অধীন। তজ্জন্তু শ্রীহরিনাম সংকীর্তনকারীকে আর পৃথকরূপে অর্চনাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চনাদি ভক্তির বিবিধ অঙ্গ যাজনের সিদ্ধিদশায় কেবল শ্রীনামমহিমাদির কীর্তনই ভক্তের হৃদয়স্পর্শী হয়। [এতৎ প্রসঙ্গে চারিযুগের সাধনপদ্ধতি ও তত্তৎ যুগের মহামন্ত্রগণের মহিমাও বিশেষরূপে আলোচ্য।] সিদ্ধান্ততঃ বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ সমূহের অঙ্গীকরণে শ্রীনামকীর্তনকেই একমাত্র বিচার করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতে হইবে না যে শ্রীনামভজনকারীর আর অর্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা হইলে নামকীর্তনকারীর হৃদয়েও মায়াবাদরূপ অসদ্বৃত্তি থাকিয়াই যাইবে, চরমে শ্রীকৃষ্ণনামকে Impotent (ক্লীব) মনে হইবে, চিত্তটা শুকতায় ভরিয়া যাইবে। কেননা, কৃষ্ণকীর্তনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে অমুরাগ প্রাপ্ত হওয়া এবং সেই অমুরাগের সহিতই তাঁহার অর্চনাসেবা, বন্দনসেবা, দাস্তসেবা, সখ্যাসেবা, ও তাঁহাতে আত্মনিবেদনাদিসেবা করা, যাঁহার সাধন-ভক্তি কৃতিসাধ্য (ইন্দ্রিয়সাধ্য) হইলেও সিদ্ধিদশায় যাহা হইতে মাত্র প্রেমফলই লভ্য হয়, যাহা পরম সুখময়। অতএব শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদিকে ‘কিছুনা’ বলিয়া তাচ্ছিল্যভরে উড়াইয়া দিয়া কেবল নাম করিলেই হইবে বলা ধৃষ্টতা প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। ইহাকে নামানুরাগ বলে না, বস্তুতঃ ইহা নামাপরাধ কীর্তন মাত্র। “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষ্য ভগবন্তং ভজন্তে” (ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরধৃত সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা)। তজ্জন্তুই সংকীর্তন-মূর্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভু শাস্ত্রোল্লিখিত বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের মধ্যে “সাম্বুদঙ্গ”, ‘নামকীর্তন’, ‘ভাগবতশ্রবণ’। ‘মথুরা-

বাস’, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই গুণ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ॥ তার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ শ্রীনাম সংকীর্তন। নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন ॥” —উপদেশ করিয়াছেন। আবার, “এক অঙ্গ সাধে কিংবা সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥” উপদেশও আছে। যদিও অপরাপর যুগে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নববিধা ভক্তির এক এক অঙ্গ নিষ্ঠাসহকারে যাজনেই এক এক ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—যেমন শুক, পরীক্ষিত, গুহ্লাদ, পুথু, হনুমান্, বলি মহারাজাদির নাম উল্লেখযোগ্য কিন্তু সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ কলিযুগের বিবিধ ভক্তিসাধকগণের পক্ষে সহজে সিদ্ধি লাভের জন্ত অর্চনাদি সর্ববিধ ভক্তিসাধনে কীর্তনাত্মক ভক্তি সংযোগের সহিতই করার জন্ত শ্রীভাগবতশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। “যজ্ঞঃ সংকীর্তন প্রারৈর্ধজন্তি হি সুমেধসঃ।” প্রাট্যে অর্থে প্রাচুর্যেণ অর্থাৎ সংকীর্তন-বহুল যজ্ঞের দ্বারা।

“যতপাশা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য।

তদা কীর্তনাত্মা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্।

যজ্ঞঃ সংকীর্তনপ্রারৈর্ধজন্তি হি সুমেধসঃ ইতি।

তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমত্যন্ত প্রশস্তম্ ॥”

(ভাঃ ৭।২১৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ দীক্য)

[যতপি কলিকালে অপার আটটি ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তথাপি সে-সকল কীর্তনাত্মক ভক্তির সংযোগেই সাধন করিতে হইবে। শ্রীমদ্ ভাগবতে কথিত হইয়াছে—“সুধীগণ সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।” তাহাতে স্বতন্ত্রভাবে নামসংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতাও বর্ণিত হইয়াছে।]

শ্রীনারদাদি সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ জীবকল্যাণার্থে শ্রীনামের সহিত প্রণবাদির যোগে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ করতঃ স্বাধা, স্বধা পদ প্রকাশ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মপর্যন্ত নিবেদনাত্মক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং ভজনের বিধিমাৰ্গ প্রদর্শন করাইয়াছেন। অধিকারী মহাশ্রুগণের পক্ষে রাগ ও বিধি সকলটাই সুন্দর হইলেও অনধিকারীর পক্ষে বিধিই একমাত্র শ্রেয়ো-

লাভের উপায়। অনর্থযুক্ত সাধকগণ এবম্ব্যক্ত বিধি দ্বারা কৰ্ম্মাপণাদি শিক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হইয়া আত্মপর্য্যন্ত নিবেদন করতঃ শুদ্ধ ভক্ত্যাশ্রয়ী হইয়া অহরহঃ প্রেমযোগে প্রেমনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভাব হৃদয়ে অনুভব করিবেন। প্রেমভক্তির ইহাই লক্ষণ। “বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা রত দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগবশুবর্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে, লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥” (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)। এমতাবস্থায় প্রেমিক ভক্তগণ কেবল সর্বোপাধ্যায়িক শ্রীভগবদ্ভ্যাসমূহের কীর্ত্তনমুখেই শ্রীভগবৎ-প্রেমাস্বাদন করিতে করিতে অধিল কাল যাপন করেন। কিন্তু যাবৎকাল প্রেমযোগ প্রাপ্তি না হয়, তাবৎকাল প্রেমসাধনপর চেষ্টাগুলির মধ্যে কৃতি (ইচ্ছিত)-সাধ্য ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাবৎকালইমাত্র বিধির প্রয়োগ। আবার ইহাও স্মর্তব্য যে, রাগমার্গীয় স্বাধীনতার মধ্যে রাগহীন জনের অবৈধ উচ্ছৃঙ্খলতা ত' নাই-ই অধিকন্তু বৈধশৃঙ্খলতারও অতীত ভূমিকার এক মগ্ন সুখময়তা রহিয়াছে তাঁহাতে। এইজন্যই “রাগহীন জন (অর্থাৎ অনধিকারীজন) ভঞ্জে শাস্ত্রের আজ্ঞায়”—ইহাই স্মৃতি। উচ্ছৃঙ্খলতার নাম ‘অনুরাগ’ বা ‘রাগ’ নহে অথবা শ্রীহরিভজনও নহে। ইহা অপরাধ ও পাপ সঞ্চয় মাত্র। “শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধি বিনা। ঐকান্তিকী হরেভক্তি রূপাণ্যৈব কেবলম্॥” “যঃ শাস্ত্র-বিধিযুঃস্বভ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিরবাপ্নোতি

ন সুখং ন পরাং গতিম্॥” (গীতা ১৬।২০) “বিধি-হীনমস্টায়ং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥” (গীতা ১৭।১০)। মন্ত্রহীন ব্যক্তির শ্রীভগবদর্চনের অধিকার হয় না এবং মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত চিত্তের জড়বিষয়প্রবণতা কাটাইয়া উঠিবার সহজ পন্থাও আর নাই। তজ্জন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীও গাহিয়াছেন—“কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥” (চৈঃ চঃ) মহাজনগণের শুভানুধ্যায়িতা হইতে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রোচ্চারণেরও অত্যাৱশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রেমপ্রাপ্তিতে ভাবসেবা লভা হইলে, তখন স্বাস্থ্য, স্বধাদি পদযোগে মন্ত্রসমূহের অনুচ্চারণে প্রত্যাবাস-জনিত কোন দোষও প্রেমিক ভক্তকে স্পর্শ করে না, তাহাও সত্য। তখন শ্রীনামোচ্চারণ বা শ্রীনাম-স্মরণ-মুখেই প্রেমিকভক্ত শ্রীভগবানের যাবতীয় সেবা করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কেবল শ্রীনাম-উচ্চারণমুখে অগণিত ভক্তবৃন্দ লইয়া শ্রীগুণিচামার্জন-লীলা বিশেষ প্রবিধানযোগ্য। শ্রীনামোচ্চারণ বা শ্রীনাম-স্মরণ সৰ্ব্বাবস্থারই নিত্য সাধন ও সাধ্য এবং শ্রীমন্তোচ্চারণ শ্রীনামরস প্রাপ্তিরই সাধন বিশেষ মাত্র।

‘নাম বিনা কিছু নাহিক আর

চৌদ্রবন মাঝে॥’ (শ্রীভক্তিবিনোদ)

শ্রীনামই বস্তু। শ্রীনামের অনুশীলনই বস্তুর অনুশীলন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে বস্তুশাস্ত্রিকতা।



প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিময়ুখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—কর্ত্ত্ব কি?

উঃ—‘অহং করোমি’—ইহাই কর্ত্ত্ব বা অঙ্কার।

আর ‘কি করোমি’—এই তত্ত্বমানই ক্রিয়াকর্ত্ত্ব আনুগত্য, দাস্ত, ভক্তি বা সেবা।

ভক্তির কর্ত্ত্ব নহে, তাহা দাস্ত বা দাস্তময়। কিন্তু

কর্ত্ত্ব জিনিষটি প্রভুত্বময়, ভোক্ত্বময়, দস্ত বা স্বতন্ত্রতা।

জগদীশ্বরই একমাত্র কর্ত্ত্ব। একমাত্র প্রভু, একমাত্র

ভোক্তা, একমাত্র সেবা ও একমাত্র উপাস্ত। এতদ্ব্যতীত

সকলেই তাঁহার অধীন বা সেবক। শাস্ত্র বলেন —

“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা।

যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥” (চৈঃ চঃ)

“পরমেশ্বরং বিনাংং তং কর্তেতি ভ্রান্তিঃ।

নাংং কর্তা ন কর্তা তং কর্তা যন্ত সদা শ্রুতঃ ॥”

“অহং প্রভোজ্যঃ সেবকোহস্মি সেবা

মে প্রভূর্ভগবান্ সপরিষ্কর এব।”

স্বস্বধিকারী ব্যক্তিই কর্তা অভিমানী। কিন্তু কৃষ্ণস্বধিকারী ভক্ত দাসাভিমানী।

ভক্ত কর্তা নহে, কর্তা ভক্ত নহে। ভক্ত ভগবৎ-কিষ্কর, কিন্তু কর্তা মায়াধর কিষ্কর, প্রভু-অভিমানী, স্বপর-স্বধাষেধী।

ভক্ত গুরুকৃষ্ণের আজ্ঞাচ্যুতী, কিন্তু অভক্ত (কর্তা) স্বেচ্ছাচারী বা স্বতন্ত্র।

ভক্ত শরণাগত, কিন্তু কর্তা অশরণাগত ও দাস্তিক। কর্তা হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী। কিন্তু দাস বা ভক্ত ভোগীও নন, ত্যাগীও নন, তিনি অলুপ্ত গুরুকৃষ্ণের সেবারত। কৃষ্ণধীন জীব কোনদিন কর্তা হইতে পারে না, কিন্তু মায়াধর নফর হইয়া সে নিজেকে কর্তা মনে করে মাত্র। তাই গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

‘অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মততে’।

কর্তা মূঢ়, অশান্ত ও নিকোঁধ; কিন্তু ভক্ত বুদ্ধিমান ও শান্ত। কর্তা দুঃখী কিন্তু ভক্ত সুখী। শাস্ত্র বলেন—

“কৃষ্ণভক্ত নিকাম অতএব শান্ত।

ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত ॥”

ভক্ত নিকাম কিন্তু কর্তা সকাম।

প্রঃ— নন্দ শব্দের অর্থ কি ?

উঃ— বৈষ্ণবোত্তম (ভাঃ ১০।৫।১ টীকা) বলেন—
নন্দরতি স্বরূপি জগৎ ইতি শ্রীনন্দ।

প্রঃ— বিষ্ণুই কি সকলদেবতার মূল ?

উঃ— নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন — (ভাঃ ১০।৪।৩৯)

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ।

শ্রীধরস্বামীটীকা — দেবানাং মূলং বিষ্ণুঃ স চ যত্র ধর্মস্তত্র আস্তে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন — (১০।৪।৪২)

বিষ্ণু সকল দেবতার অধ্যক্ষ। সর্বাস্ত্রধামী, হৃদয়-গুণাবাসী শ্রীবিষ্ণুই শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা-গণের মূল অর্থাৎ আদিকারণ।

প্রঃ— ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ করিলে কি হয় ?

উঃ— ভক্ত-বিদ্বেষ করিলে মৃত্যু নিকটবর্তী হয়।

ভক্তের প্রতি হিংসা করিলে মৃত্যু তা’ হয়ই উপরন্তু অনেক অনর্থ বা সর্বনাশ ঘটয়া থাকে। মহতের অবমাননায় মায়াধরের আয়ুঃ, ধন, যশঃ, ধর্ম, কল্যাণ সবই নষ্ট হইয়া যায়। (ভাঃ ১০।৪।৩১)

প্রঃ— বিশ্বেশ্বর বলিতে কি কৃষ্ণ ?

উঃ— নিশ্চয়ই। বিশ্বস্ত্র ঈশ্বরঃ নিরস্ত্রা যঃ সঃ কৃষ্ণঃ।
বিশ্বের নিরস্ত্রা বলিয়া কৃষ্ণই বিশ্বেশ্বর।

(বৈষ্ণবোত্তমী ভাঃ ১০।৫।১৩)

প্রঃ— স্বস্বধবাঙ্গাই কি জীবের সর্বনাশের কারণ ?

উঃ— নিশ্চয়ই। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঙ্গা বা স্বস্বধম্পূহাই জীবের ব্যাধি, সংসার ও শত্রু।

‘স্বস্বধতৃষ্ণা হি সংসারঃ’। স্বস্বধবাঙ্গাই কাম। এই কাম জিনিষটি যড়রিপুর অগ্রতম একটি প্রধান রিপু। এই রিপু বা শত্রুকে জয় করা দরকার। সাধু গুরুকৃপা সম্বল করিয়া এই কাম-রিপুকে দমন বা সংযম করিতে না পারিলে হরিভজন অসম্ভব। কাম জিনিষটি অভক্তি, ভীষণ ভক্তিশাধক, ভক্তির বিপরীত কথা। ‘যাহা কাম, তাহা নাহি রাম’ শাস্ত্র বলেন—

‘আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঙ্গা তাকে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥’ (চৈঃ চঃ)

কাম জিনিষটি দুঃসঙ্গ ও জীবের মহাশত্রু। এই শত্রুকে অবহেলা করিতে হইবে না, কামরিপুকে প্রশ্রয় দিতে হইবে না পরন্তু গর্হণ করিতে হইবে, দমন করিতে হইবে, স্বস্বধবাঙ্গরূপ কামকে দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কাম, ক্রোধ, লোভ সবই দুঃসঙ্গ, সবই জীবের শত্রু ও ভক্তিনাশক। সাধুগুরুর সঙ্গ ও কৃপা দ্বারাই ইহাদিগকে জয় করিতে হইবে।

শাস্ত্র বলেন —

‘সাধুসঙ্গকৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।

কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি’ শুদ্ধভক্তি পায় ॥’ (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র আরও বলেন —

‘সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর অন্য বস্তু নাই॥’

সঙ্গ অর্থে আশ্রয়, প্রীতি, আসক্তি, আহুগতা, অহুসরণ, অহুগমন।

‘মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥’

সাধুগুরু অর্থে সদগুরু বা ভক্তগুরু। স্বস্বখম্পূহা ও ভগবৎস্বখম্পূহা — এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত কথা। প্রথমটি অন্ধকার, অপরটি আলো। ‘কাম অকৃতমঃ, প্রেম নিখিল ভারৱ।’

শত্রু ও রোগকে ছোট, সামান্য ও তুচ্ছ মনে করিতে নাই। কামাদি শত্রুগণকে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ জ্ঞান করিলে তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া জীবের সর্বনাশ করে ও করিবে। এজন্য বুদ্ধিমান ভজনেচ্ছু সজ্জনগণ এই সব মারাত্মক শত্রু হইতে সাবধান হন। নতুবা পুনরায় জন্মান্তর ও সংসার অনিবার্য।

শাস্ত্র আরও বলেন —

‘সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তরে, মারা তাহারে ছাড়য়॥’ (চৈঃ চঃ)

সদগুরুর শ্রীমুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া স্বস্বখোন্মুখ বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাহ্যবিশিষ্ট বদ্ধ জীব আমরা যদি কৃষ্ণোন্মুখ হই অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছাবিশিষ্ট হইতে পারি, কৃষ্ণস্বখবিধানের প্রবৃত্তি বা ম্পৃহা যদি আমাদের জাগে, তবেই আমরা সংসার হইতে—স্বস্বখম্পূহারূপ কামের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শুদ্ধভক্ত হইতে পারিব। নতুবা আমাদের কামনা-বাসনারূপ মারাত্মক ব্যাধি সাড়িবে না। এজন্য জন্মজন্মান্তর আমাদের কষ্টই পাইতে হইবে। জীব জড়বস্তু নহে, পরন্তু চেতন। চেতন মাত্রেরই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া থাকিবে। তবে জীবের ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াকে ভোগোন্মুখ না করিয়া সেবোন্মুখ করিতে হইবে, এগুলিকে স্বস্বখম্পূহী না করিয়া কৃষ্ণমুখী করিতে হইবে, কৃষ্ণসেবায় লাগাইতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। তাই নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

“কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদেবী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।

মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।”

আমাদের নিজ-ইন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা-বিশিষ্ট করিতে হইবে। এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছাময়ী ভক্তিবীজ গুরুদ্বীপ কৃষ্ণের কৃপায় লাভ হইয়া থাকে। এজন্য গুরুর বোলআনা হইয়া নিষ্কণ্টে তাঁহার সেবা প্রীতি ও আদরের সহিত করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করিতেই হইবে। গুরুকৃপায় ভক্তিবীজ লাভ না হইলে, হৃদয়ে কৃষ্ণস্বখবিধানম্পৃহা না জাগিলে কাম কিছুতেই যাইবে না। মহাভাগ্য ফলেই গুরুকৃপায় এই ভক্তিবীজ লাভ হয় এবং তৎফলে কাম ও কামবীজ ধ্বংস হয়। তাই শাস্ত্র বলেন—

‘ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥’ (চৈঃ চঃ)

বীজ অর্থে বাসনা (শ্রীজীব প্রভু)

প্রঃ— শ্রীকৃষ্ণজন্মের কয়দিনে পূতনা বধ হইয়াছিল?

উঃ— বৈষ্ণবতোষণী (ভাঃ ১০।৬৪) বলেন—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ৩৪ দিবসে রাত্রে পূতনা বধ হইয়াছিল।

প্রঃ— শিষ্য অযোগ্য হইলেও কি কৃষ্ণ নিজ প্রিয়-ভক্ত গুরুর সম্পর্কে সেই অধম শিষ্যকেও আত্মসাৎ করেন?

উঃ— হাঁ। সদগুরুর শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যকে কৃষ্ণ নিজ প্রিয়জনের সম্পর্ক দেখিয়াই নির্বিচারে কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবৎনিম্নক সার্বভৌম-জামাতা অমোঘ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শাস্ত্র বলেন—

সার্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিম্নকমমোঘকম্।

অঙ্গীকুর্ষন্ ক্ষুণ্টাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্তাম্॥

ভগবান্ শ্রীগৌরান্ধদেব সার্বভৌমগৃহে আহার করিয়া সনিম্নক অমোঘ বিপ্রকে নিজভক্ত সার্বভৌমসম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়া নিজ ভক্ত-বশ্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। অমোঘ বিপ্র ভগবান্ শ্রীগৌরান্ধদেবের নিম্ন

করিয়া তৎপরদিবস কলেরা রোগে আক্রান্ত
হইয়া মরণাপন্ন হইলে শ্রীগৌরানন্দমহাপ্রভু কৃপাপূর্বক
তাহাকে রক্ষা করেন। মহাপ্রভুর অপার কৃপা ও ক্রমা
দেখিয়া অমোঘ নিজ গালে চড়াইতে থাকিলে মহা-
প্রভু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন—

“প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।

সার্কভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর মেহপাত্র।

সার্কভৌমগৃহে দাস-দাসী যে কুকুর।

সেহো মোর প্রিয়, অন্ত জন বহু দূর।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ অধ্যায়)

প্রঃ—কৃষ্ণ কত বর্ষবয়সে তৃণাবর্ত অমুরকে বধ
করেন?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ দিনে পূতনা বধ, তিন মাসে
শকটাসুর বধ এবং এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত দৈত্যকে
বধ করেন। (ভাঃ ১০।৭ম অধ্যায়)

প্রঃ—হিংসাকারী থলের কি গতি হয়?

উঃ—পরের অনিষ্টকারী থল ব্যক্তি নিজ পাপের
ফলে সত্ত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ভাঃ ১০।৭।৩১)

প্রঃ—কে শীঘ্র ভগবানের কৃপা পায়?

উঃ—উত্তম হইয়া যে নিজেকে হীন মনে করে,
সেই দীন ব্যক্তিকেই ভগবান সানন্দে আত্মসাৎ করেন।
শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসনাতনকে বলিয়াছেন—

‘উত্তম হঞা হীন করি’ মান আপনারে।

অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমারে উদ্ধারে॥’

(চৈঃ চঃ ম ১৬ অঃ)

মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুকেও বলিয়া-
ছেন (চৈঃ চঃ ম ১৬) —

“স্থির হঞা গৃহে যাও, না হও বাতুল।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল॥

মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাঞ্ছে লোকব্যবহার।

অচিরায় কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥”

শাস্ত্র আরও বলেন—

‘দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।

কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥’

প্রঃ—কৃষ্ণের সংসার কি?

উঃ—যেখানে সকলেই গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্ত ব্যস্ত,
তাহাই কৃষ্ণের সংসার। সেখানে কৃষ্ণই একমাত্র কর্তা
বা প্রভু, আর সকলেই কৃষ্ণের সেবক বা দাস।
কৃষ্ণের সংসারে কাহারও স্বস্বখবাহার লেশমাত্রও
নাই। নিষ্কাম ভক্তগণই কৃষ্ণের সংসারে সংসারী।
কৃষ্ণকে লইয়াই তাঁহাদের যা কিছু সব। কৃষ্ণের সংসারে
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য ন তু স্বসুখে বা অপর কাহারও সুখে।
সেখানে কৃষ্ণের ইচ্ছিততর্পণই সকলের উদ্দেশ্য। তথায়
পৃথক্ উদ্দেশ্য কাহারও না থাকায় সকলের সকল কার্য্যই
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপূর্ণ। এজন্ত কৃষ্ণের সংসারে হিংসা,
দ্বेष, শত্রুতা, পরস্পর মনোমালিন্য, মতভেদ প্রভৃতি
কিছুই নাই। সেখানে আছে কেবল কৃষ্ণসুখসন্ধানের
ঐক্যতান এবং আনন্দময় মধুর মিলন। তাই শাস্ত্র
বলেন—

“কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি’ অনাচার।

জীবে দয়া, নামে রুচি সর্ব্বধর্ম্মসার॥”

স্বস্বখবাহারপূর্ণ অনাচার পরিভ্যাগ করিয়া অহঙ্কণ
গুরুকৃষ্ণসুখসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণের সংসার কর।

আত্মোদ্বিগ্নপ্রীতিবাহা বা কামই অনাচার। ভক্তিই
আচার। অভক্তিই অনাচার। আচারে বা ভজনে
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য, কিন্তু অনাচার বা অভক্তি নিজ-
সুখতাৎপর্য্যময়ী।

যেখানে অনাচার বা স্বপন-সুখসন্ধানস্পৃহা,
সেখানেই মায়া সংসার বা বন্ধন। কিন্তু কৃষ্ণের সংসারে
বন্ধন বা দুঃখের কোন কথা নাই। সেখানে কৃষ্ণের
সহিত ভক্তগণের নিত্য সম্বন্ধ; তাই তথায় বন্ধন বা
দুঃখের লেশমাত্রও নাই, সেখানে আছে কেবল আন-
ন্দের পাথার বা প্রাবন।

কৃষ্ণের সংসারে সকলেই কৃষ্ণনামে রুচিপরায়ণ,
সকলেই শ্রীনামকীর্তনে উন্মত্ত। শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ণনই তথা-
কার মহোৎসব। সেই কৃষ্ণভক্তগণ জীবের প্রতি
বিশেষ কৃপালুচিত। জীবগণকে কৃষ্ণের প্রতি ও কৃষ্ণ-
নামের প্রতি উন্মুখ করাই, কৃষ্ণনামে জীবকে রুচিবিশিষ্ট
করাই তাঁহাদের জীব দয়া।

ভক্তির সংসার, কৃষ্ণসেবায় সংসারই — কৃষ্ণের সংসার। কৃষ্ণের সংসার হলো সুখের সংসার, কিন্তু মায়া-সংসার হলো দুঃখময়। কৃষ্ণের সংসারে প্রভু একজন, তিনি — কৃষ্ণ, আর মায়া-সংসারে প্রভু অনেক, সেখানে সকলেই প্রভুত্বকামী, প্রভু অভিমানী, কর্তা অভিমানী। কৃষ্ণের সংসারে আছে সর্বত্র সেবা দর্শন, গুরুদর্শন। আর মায়া-সংসারে ভোগ্যদর্শন প্রবল।

প্রঃ— অধোক্ষজ মানে কি?

উঃ— অধোক্ষজ মানে জড় ইঞ্জিয়জ্ঞানের অগোচর, অতীন্দ্রিয়।

“অধঃকৃতং অতিক্রান্তং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। শকটশ্চ শ্রীভগবদ্রথাপতনাদিনা শকটাক্ষশ্চ অধঃ পুনর্জাত ইব ইত্যেবং শকটভঞ্জনানন্তরং ব্রজে কৃষ্ণ অধোক্ষজ-নাম্না প্রসিদ্ধঃ। (ভাঃ ১০।৮২ বৈষ্ণবতোষণী) ‘শকটাক্ষাদধঃ স্কটাতং পুনরিব জাতঃ। (১০।৯১৩ ব্র টীকা)

প্রঃ— ভক্তগণ নিজ আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্তর গৃহস্থান কেন?

উঃ— শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (ভাঃ ১০।৮।৪)

মহাচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্! কর্তে নাশ্রম্য কচিৎ।

সংসারাসক্ত মনুষ্যগণ নিজ জীপুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্তই সতত ব্যস্ত। ভক্তগণ সেই সব দীন-চেতা গৃহস্থগণের মঙ্গলের জন্তই আশ্রম ত্যাগ করিয়া

তীর্থাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

‘মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।

নিজ কার্য নাই তবু যান পরের ঘর ॥’ (চৈঃ চঃ)

শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা—রূপা-পারবশ্যং সনৎকুমার-বামনা-দিনাং পরমপূর্ণানামপি পৃথু-বলি প্রভৃতি গৃহাগমনশ্চ দৃষ্ট-ত্যাং ইত্যাহ—মহতাং স্বাশ্রমাং অন্যত্র বিচলনং গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় পরমমঙ্গলায় কর্তে সমর্থং ভবতি। তদেব তেধামপেক্ষিতাম্। নৃণাম্ ইতি গৃহিণ্যপি মধ্যে নৃণামেব, ন তু দেবাদীনাম্। নৃষপি মধ্যে গৃহিণ্যমেব, ন তু ব্রহ্মচর্যাদীনাম্। তত্রাপি দীনং তৃণাদপি হর্ভগশ্চ তেতো। যেসাম্ ইতি তেষু এর মহৎকৃপাধিকা সম্ভবাং, ন তু উত্তমশ্চ কঠোরবক্তচেতসাম্।

প্রঃ— ভগবান্ শ্রীহরিও কি অন্যত্র ভক্তাঙ্গ অপেক্ষা কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন?

উঃ— হাঁ। শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্ত শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—

‘নাং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।

মন্ত্ৰজাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥’

শাস্ত্র আরও বলেন—

‘ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ণন ॥

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥’

(চৈঃ চঃ)

স্বধামে শ্রীপাদ কীর্তনানন্দ ব্রহ্মচারী

গত ১০ পদ্মনাভ, ৪৯০ শ্রীগৌরাঙ্গ; ১লা আশ্বিন, ১৩৮৩; ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ শনিবার কৃষ্ণ-দশমী তিথিতে রাত্রি-শেষে ৩টা ১৯ মিনিটের সময় আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ কীর্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু বড়িশা ১৫নং পাঁচকড়ি ঘোষ লেনস্থ (কলিকাতা-৮)

‘শ্রীকৃন্দাবন আশ্রমে’ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে স্বাভীষ্ট ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাত্রি ২২টার সময় হইতে তিনি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের পাঙ্কায়ুগল বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

২রা আশ্বিন অপরাহ্নে তাঁহার কলেবর বড়িশা

আশ্রম হইতে লরীযোগে প্রথমে শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আনা হয়। তথায় প্রসাদী মালাচন্দন লইয়া তাঁহাকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে আনয়নপূর্বক তথায় ঔদ্ধৈহিক শেব কৃত্য সম্পাদন করা হয়। পূজাপাদ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মথারাজের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অমুরাগ ছিল, তাই সপ্তাহ পরেই তিনি তাঁহার (শ্রীল তীর্থ মথারাজের) অমুরজ্যা করিলেন।

শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত ইহার বন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ইহার পূর্বাশ্রম ছিল বরিশাল জেলায়। ইংরাজী হাইস্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি মিলিটারী সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৯১৮ সালে শ্রীমদ বিদ্যাভূষণ প্রভুই তাঁহাকে বন্ধু বুদ্ধক্ষেত্র হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে লইয়া আসেন। অনতিকাল

বিলম্বে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ইনি শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারীপাদপদ্মসেবার আত্মোৎসর্গ করেন। কলিকাতা শ্রীগোড়ীয় মঠেই (প্রথমে ১নং উল্টাডিক্কি জংসন রোডে, পরে ১৯৩০ সাল হইতে বাগবাঙ্গায় শ্রীগোড়ায় মঠে) ইনি মঠজীবনের অধিকাংশ সময় অস্থান পূর্বক সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদন করিয়াছেন। শ্রীমঠের বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট নানানভাবে কৃতজ্ঞ।

অন্তিম সময়ে পরমারাধ্য গুরুপাদপদের শ্রীপাত্তক্য বক্ষে ধারণ পূর্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দচরণাবিনন্দ স্বরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। তিনি আমাদিগকে অমায়্যায় রূপা করুন, যাগাতে আমরাও তুর্গং নিঃশ্রেষস বরণ করিতে পারি।



লোকান্তরে শ্রীমধুসূদন সাহা

শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদিগ্ব্যতি শ্রীমদ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মথারাজের শ্রীচরণাশ্রিত বীরভূমজেলাস্তগত বোলপুর নিবাসী শ্রীযুত প্রবোধ কুমার সাহা (দীক্ষার নাম শ্রীপ্রগতপাল দাসাধিকারী) মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ মধুসূদন সাহা গত ২রা ভাদ্র (১৩৮৩), ইং ১৯শে আগষ্ট (১৯৭৬) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনবমীতিথিতে শ্রীনন্দোৎসব বাসরে সন্ধ্যা ৭টা ১২ মিনিটে ঐ বোলপুর নগরে ইংলোকে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব — সকলের মায়ামমতা চিরতরে ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে। এই শ্রিয়দর্শন মিষ্টভাবী পরোপকারী যুবকটি বোলপুর সহরের প্রায় সকলেরই সুপরিচিত। সহরের পূজাপার্কণ সভাসমিতি প্রভৃতি যাবতীয় জনহিতকর অমুষ্ঠানে এবং বিপদ-আপৎ কালেও মধুসূদন নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া আবালাবুদ্ধবনিতা সকলেরই চিত্ত

আকর্ষণ করিয়াছে এবং স্নেহ ও প্রীতিভাজন হইয়াছে। বোলপুর রেলময়দানে সপার্বদ পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবকে আনয়নপূর্বক শ্রীচৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারার্থ বিরাট সভার আয়োজনাদি পারমাধিক বাপারেও শ্রীমান্ মধুসূদন ক একবৎসর আগ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছে। এবৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগোরক্ষনোৎসব কালেও মধুসূদন শ্রীধাম মায়াপুর ক্রেশোতানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে থাকিয়া শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ এবং ভগবদ্ধামসেবার ও ভগবৎকথা শ্রবণের বহু সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। এজন্ত বোলপুর সহরবাসী সকল সজ্জন ও মহিলা এবং আমরাও সকলে তাঁহার আকস্মিক মহাপ্রস্থানে অত্যন্ত মর্ষবেদনা অনুভব করিতেছেন ও করিতেছি। এমন কোন পাষণ্ড হৃদয় ব্যক্তি নাই যে তাঁহার অভাবে তাঁহার প্রাণ একটুও কাতর

হয় নাই। [কিন্তু অপরিহার্য জগদ্ব্যাপারে ভয়শোকমোহে মুহুমান না হইয়া ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। লীলাময় শ্রীভগবানের এই জন্ম-স্থিতিভঙ্গ লইয়াই যতকিছু জগদ্ব্যাপার—যতকিছু মায়ায় খেলা। “কন্তু কে পতিপুত্রোত্তা মোহ এব হি কারণম্।” (ভাঃ ৮।১৬।১৯)

“অতএব মায়ামোহ ছাড়ি’ বুদ্ধিমান্।

নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥”

শ্রীমদ্রাধু শ্রীশচীমাতাকে সাঙ্গনা দিয়া বলিতেছেন—

“(প্রভু বলে — মাতা ছুঁখ ভাব কি কারণে ?।

ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে ? ॥

এইমত কাল গতি, কেহ কারো নহে।

অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে ॥

ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।

সংযোগ বিরোগ কে করিতে পারে আর ? ॥

অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।

হইল সে কাহা, আর ছুঁখ কেনে তার ? ॥”

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৮০-১৮৩

“কে কাহার বাপ, প্রভু কে কা’র নন্দন।

সবে আপনার কর্ম করয়ে ভুজ্ঞন ॥

যতদিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।

আছিলঙ, এবে চলিলাম অন্তপুরে ॥”

—চৈঃ ভঃ মধ্য ২৫।৩৩-৩৪

আমরা প্রণতপাল প্রভু ও তাঁহার ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মীকে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘শোকশাতন’-গীতি ও উক্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২৫শ অধ্যায় বিশেষভাবে আলোচনার জন্ত অনুরোধ করিতেছি। শুদ্ধভক্ত তত্ত্ব চিন্তা করিয়া শোকাদি তমোধর্ম্মের বন্ধীভূত হন না। ভক্তিভাক্ জনগণেরই প্রারম্ভ ও অপ্রারম্ভ — উভয়বিধ কর্ম্ম নিঃশেষে দক্ষীভূত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতী কথাই শোকসমুদ্র শোষণকারিণী।]

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ভক্তত্বসহ বোলপুর শ্রীমৎ প্রণতপাল প্রভুর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া গত ১২ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট রবিবার শুক্লবৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানানুসারে শ্রীভগবৎপ্রসাদদ্বারা শ্রীমান্ মধু-হৃদনের সাক্ষতশ্রাদ্ধকাৰ্য্য সম্পাদন পূর্বক তদীয় পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠানিক কৃত্যস্বরূপে যথাবিধানে বৈষ্ণবহোম-কাৰ্য্যও সম্পাদিত এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে পরমাদরে যথাশক্তি মহাপ্রসাদও বিতরণ করা হইয়াছে।

মধুহৃদনের গুণাক্ত স্থানীয় সজ্জনগণ তাহার পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশ্যে বোলপুর শান্তিনিকেতনে শোকসভার অধিবেশন করিয়া তাহার গুণাবলী কীর্তন করতঃ তাহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও শ্রীভগবচ্চরণে তদীয় আত্মার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন। স্থানীয় সংবাদপত্রেও মধুহৃদনের দেহত্যাগ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমান্ মধুহৃদন বাংলা ১৩৬২ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার শ্রীএকাদশীদিবস মধ্যাহ্ন ১২টার জন্মগ্রহণ করে। ঐ সালের মাঘমাসে মহাপ্রসাদদ্বারা তাহার শুভ অন্নপ্রাশন সম্পাদিত হয়। পিতামাতা উভয়েই পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, সেও তচ্চরণাশ্রিত হইয়া ভগবদ্ভজনে করিতে করিতে দেহ-রক্ষা করিলে খুবই আনন্দের বিষয় হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যে সদগুরুচরণাশ্রিত হইয়া ভজনে করিবার ভাবী ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করতঃ দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হইবার নহে। পরমকরণ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে অবশ্যই তচ্চরণে আকর্ষণ করিবেন। পরজন্মে সে হয়ত কোন ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ পূর্বক ভক্তিপরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া ভক্তিময় জীবনযাত্রার সৌভাগ্য বরণ করিবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

কোন: ৪৬-৫২০০

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড,

কলিকাতা — ২৬

২৫ কেশব, ৪২০ শ্রীগোরাঙ্গ;

১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩; ১ ভিসেম্বর, ১৯৭৬

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন, —

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিতালীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্শদ ও অধস্তনবর ভারতবাসী শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ও শ্রীমন্ত্ৰিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে অত্র শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক তিথিতে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আগামী ২৬ নারায়ণ, ১৭ পৌষ, ১ জানুয়ারী (১৯৭৭) শনিবার হইতে ৩০ নারায়ণ, ২১ পৌষ, ৫ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ভক্ত্যঙ্কানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভা-মণ্ডপে পাঁচটি ধর্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন ও নামসঙ্কীর্তন হইবে।

১৮ পৌষ, ২ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণ স্মরণ্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরিউক্ত ধর্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে স্বাক্ষবে যোগদান করিলে পরম উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব। ইতি —

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর

ত্রিদণ্ডিভিক্ত শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমারাপুর
জিলা : নদীয়া

২৫ কেশব, ৪২০ শ্রীগৌরাম্ব ;

১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ ; ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিভক্তি ও শ্রীমুক্তিদয়িত মাদব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকমে অত্র শ্রীমঠ হইতে আগামী ২২ গোবিন্দ, ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২৮ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও ২২ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ শনিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। পর পৃষ্ঠায় পরিক্রমা ও উৎসবের বিস্তৃত পঞ্জী দ্রষ্টব্য।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবাঙ্কব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠান সমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাত্মক ফললাভ ঘটয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমুক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী

২২ গোবিন্দ, ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার—শ্রীনবদীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-কীর্তনোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার ধর্মসভা।

২৩ গোবিন্দ, ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তরীপ পরিক্রমা। শ্রীধামমায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচাধ্যাভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুবারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৪ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ মঙ্গলবার—শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোক্রমদ্বীপ ও শ্রীমধাদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোক্রম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধাদ্বীপ আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ বুধবার—পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। মধ্যাহ্নে যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১ টায় শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়া-মাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিজ্ঞাননগর গমন ও অবস্থান।

২৭ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ বৃহস্পতিবার—অর্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্শ্ব শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিজ্ঞাননগর, শ্রীবিজ্ঞানবিশারদের অালয় ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিজ্ঞাননগরে অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ শুক্রবার—বন্দন, দাস্ত ও সখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদক্রমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমন্দির তপস্বীস্থল, শ্রীমোদক্রম দ্বীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুবারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধা-মদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীধামমায়াপুর ঈশোত্তানে প্রত্যাবর্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহুৎসব (চাঁচর)।

২৯ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ শনিবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণ-মাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী সভা ও শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিজ্ঞাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিকু (৪৯১ শ্রীগৌরান্দ), ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতনোদর্পগমার্জ্জনং ভব-মহানাবাগ্ধি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচস্ত্রিকাবিত্তরণং বিভাবমুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণানুভাসাদনং
সর্বানুপপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৮৩। { ১১শ সংখ্যা
২ নারায়ণ, ৪৯০ শ্রীগোবিন্দ ; ১৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

সজ্জন-বিজিত-ষড়্‌গুণ

[ওঁ বিকুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ষড়্‌গুণ বলিতে ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা এই ছয় বিরোধী-গুণই ষড়্‌গুণ।

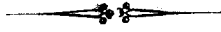
এই ছয়টা গুণ অনাত্মার ধর্ম। অনাত্মা বলিতে দেহ ও মনকে বুঝায়। চেতনবৃত্তি বা আত্মবৃত্তি যেকালে জড় বা অনাত্মার অন্তর্শীলনে প্রভুত্ব করে, সেইকালে তাদৃশ চেতনকে মন বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মন জড়বস্তুরে অস্মিতার সংযতায় মমত্বারোপ করে। প্রকৃতির রাজ্যে তিনটি গুণের বিক্রম দেখা যায়। গুণসমূহ হইতে সকল অনিত্য কর্মের উদয় হয়। চেতনবৃত্তি গুণের দ্বারা চালিত হইলে কর্ম-ফলের ভোক্তা হন। যেকালে মন কর্মফলের বাধ্য থাকে, তখন তাহাকে ষড়্‌গুণ-জিত বলা যায়। কলভোগ রাহিত্যে বা কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে তিনি সাধু হইতে পারেন। সেকালে তাঁহার জড়-ভোগস্পৃহা আদৌ থাকে না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ ছয়গুণের অধীন নহেন। ঐ আগন্তুক গুণগুলি অনাত্ম-বস্তুর উপর বিক্রম প্রকাশ করে। সজ্জনের উপর ষড়্‌গুণের আধিপত্য নাই।

সজ্জন অন্তর্কর্মফলভোগী মানবের চায় জড়দর্শনে একই রকম পরিদৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি আত্মবিশ্ব কৃষ্ণা-শ্রয়বুদ্ধি দ্বারা ভোগে অসংশ্লিষ্ট। তাঁহার বৃত্তি নিত্য হরিসেবাময়ী। কর্মী বা জ্ঞানী উভয়কেই ষড়্‌গুণের বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু সজ্জন কখনও ষড়্‌গুণের বাধ্য নন। সজ্জন জানেন যে, আত্মা নিত্যধর্মবিশিষ্ট, আগন্তুক অনিত্য ধর্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ ও মনকে যে গুণ-সমূহ বিকার উৎপন্ন করায়, তাহা সজ্জনের বুদ্ধি স্পর্শ করে না, তিনি ঐ ছয় গুণ হইতে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

যেখানে সজ্জন পরিচয়ে কাম ক্রোধাদির বিকট নৃত্য দেখা যায়, সেখানে দ্রষ্টৃ-সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যের প্রতি সজ্জন-বিষয়িণী শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। আবার তাদৃশ হিংসা বেধের তাণ্ডব নৃত্যের ছলনার ভক্তদেখিজনে সজ্জনের তাদৃশ ব্যবহার বিজিতষড়্‌গুণ সজ্জনের উদ্দেশ্যের বাধ্যতাকারক নহে। গুণগুলি দেহ ও মনের বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া আত্মবিশ্ব সজ্জনের সম্পত্তি নহে। জ্ঞানীর শান্ত অবস্থায় ঐ গুণষট্‌ক অব্যক্ত থাকিলেও পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র হইয়া প্রাকৃত বিকৃতি উৎপন্ন করে। সজ্জন কৃষ্ণেকশরণ বলিয়া কোন বিকার

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তজ্জন্মই পরমহংসের
এই শ্রীমদ্ভাগবত বা পারমহংস সংহিতা সজ্জন নিম্ম-
সরগণের বা বিজিত বড়ুণের-ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন।
সজ্জন বিজিত-বড়ুণ, একথা জানা হইলেই বদ্ধজীবও
সজ্জন হইতে পারেন। যেকালে তিনি সজ্জনের ধারণা

সংকীর্ণ বুদ্ধিতে বিচার করেন, তৎকালাবধি বিজিত-
বড়ুণ কি অবস্থা, তিনি বুদ্ধিতে সমর্থ হন না।
বিজিত-বড়ুণ সজ্জনগণের অমল পাদপদ্ম দেখিবার
যোগ্যতা হইলে জীবও সজ্জন হন।



শ্রীভক্তিবিনোদ-বানী

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

প্রঃ—ভক্তির অঙ্কুল বিষয় স্বীকার ও প্রতীকূল
বিষয় বর্জনে দৃঢ়তার আবশ্যকতা কি ?

উঃ—“ভক্তির অঙ্কুল স্বীকার এবং প্রতীকূল
পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্ন আবশ্যক।
সংসারী জীবের অনেক সময়ে অনেক ভজন-প্রতীকূল
ব্যাপার ঘটে; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তাপূর্বক সেগুলি
পরিত্যাগ না করিলে সাধনের বিষ উপস্থিত হইয়া
অভীষ্টলাভে বিলম্ব ঘটায়।”

—‘সাধন’, সং. তো: ১১৫

প্রঃ—প্রাতিকূল্য বর্জনে কাহাকে বলে ?

উঃ—“ভগবদ্ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত কিছুই ভোজন
করিব না, ভগবদ্ভাগবতরূপ মন্দির ও স্থানাদি ব্যতীত
আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদগন্ধ ব্যতীত আর কিছু
জ্ঞান লইব না, ভগবদ্ভাগবত-কথা ব্যতীত আর কোন
কথা শুনিব না, হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট শরীরকে ভগবদ্-
ভাগবত-সম্বন্ধস্থ ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত
কিছুই ধ্যান, বিচার ও আশ্বাদন করিব না, তদ্বিষয়
ব্যতীত অস্ত্র কাব্য-গীতাদি বলিব না” — এইরূপ সকলই
প্রাতিকূল্য-বর্জন। — ‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সং. তো: ৪১২

প্রঃ—প্রাতিকূল্য বর্জনকারীর প্রতিজ্ঞা কি ?

উঃ—“তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ-সঙ্গ না করিব।

গৌরাক্ষ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥” — শঃ

প্রঃ—কিরূপ লোকের সঙ্গত্যাগ বিধেয় ?

উঃ—“বেদানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি

নাই; সেরূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান
হইয়াছে।”

—‘কুটিনাটী’, সং. তো: ৬৭

প্রঃ—হৃৎসঙ্গ ও স্তম্ভ নিষ্কারণের বিচার কি ?

উঃ—“ভগবৎসম্মুখ পূণ্যবান্ ও পাপী—উভয়ই ‘হৃৎসঙ্গ’,
ভগবৎসাম্মুখ্য-প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তিও ‘স্তম্ভ’ বলিয়া
জানিতে হইবে।”

—‘জনসঙ্গ’ সং. তো: ১০১১

প্রঃ—কাহাদের সঙ্গকে ‘সংসঙ্গ’ বলা যায় ?

উঃ—“ধন, পাণ্ডিত্য, জাতি বা বর্ণ ইত্যাদি যতই থাকুক,
তৎসম্পন্ন বহির্মুখ লোকের সঙ্গ সর্বদা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ
করিবে এবং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিরই সঙ্গ করিবে। চারি
প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া অনেকে কৃষ্ণোন্মুখ বলিয়া পরিচয়
দেন; তন্মধ্যে যাহারা সরল ও নিরূপট, তাহারা
সংসঙ্গ। চারি প্রকার এইরূপ — (১) কর্ম-ধর্ম-সাপেক্ষ
ভক্ত, (২) কর্ম-ধর্ম-নিরপেক্ষ পক্ষযোগী, (৩) অপক্ষযোগী,
(৪) তত্ত্ববেশধারী।”

—আঃ. বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—অসংসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের ফল কি ?

উঃ—“অসংসঙ্গের সঙ্গ করিলে ঘোর-সংসাররূপ-
ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসং, কেই বা সং—এ বিষয়
বিচার না করিয়াও সঙ্গকল অবশ্য লাভ হয়। সাধু-
লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গরূপ ফলোদয় হয়।”

—‘সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার’,

দসজিনী (কেতবাসিনী) সং. তো: ১৫১২

প্রঃ—বিষয়ী ও মায়াবাদী—ইহারা কি কৃষ্ণভক্ত ?

উঃ—“বিষয়-বিমুঢ় আর মায়াবাদী জন।

ভক্তিশূন্য হুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥” — শঃ

প্রঃ—মারাবাদী ও বিষয়ীর মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত
শ্রাঘ্য ?

উঃ—“সে ছ’য়ের মধ্যে বিষয়ী তব ভাল।

মারাবাদী সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল।” —শঃ

প্রঃ—ব্যবহারিক কার্যে বহির্গুণগণের সঙ্গ কতটুকু
করা যায় ?

উঃ—“ভগবৎবহির্গুণ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন
না; ব্যবহারিক কার্যে তাহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য
হইবে, সেই সেই কাণ্ড পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার
করিবেন। কার্য সমাপ্ত হইলে আর তাহাদের
সহিত ব্যবহার রাখিবেন না।

—‘তত্ত্বকর্ম্যপ্রবর্তন’, সং. ভোঃ ১১।৬

প্রঃ—কি চিত্তবৃত্তিতে সঙ্গ হয় ?

উঃ—“অসত্তের প্রতি দান ও অসত্তের নিকট হইতে
গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবেই ‘অসৎসঙ্গ’
হইয়া পড়ে। অসৎ ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার
সহিত যে কর্তব্য-কর্ম্য আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্তব্য-
বোধে করিবে। পরম্পরের গুঢ় কথা জল্পনা করিবে
না; গুঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়।
নিত্যন্ত সংসারী বান্ধবদিগের মিলনে আবশ্যক-বার্তা মাত্র
করিবে; হৃদয়ের সহিত প্রীতি তখন না করাই ভাল।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সং. শেঃ ১১।১১

প্রঃ—বহির্গুণগণের সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃত্বাব-
লম্বনীয় নয় ?

উঃ—“কোন সভায় একত্র উপবিষ্ট হওয়া বা
নৌকারোহণে একত্র নদী পার হওয়া, এক-ঘাটে স্নান
করা বা এক-বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে ‘সঙ্গ’
বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব-
সহকারে ব্যবহার করার নামই ‘সঙ্গ’। বহির্গুণজনের
সহিত তজ্রপ সঙ্গ করিবে না।” —চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—ভক্তি-প্রতিকূল বড়বেগ সাধকের কি অনিষ্ট
করে ?

উঃ—“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—
এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্বদা উদ্ভিত হইয়া
বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগের বচনের প্রয়োগের

দ্বারা, মানবের বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথের দ্বারা,
ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়-বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা,
জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়,
তিক্ত-ভেদে বড়বিধ রস-লালসার দ্বারা, উদ্ভয়ের বেগ
অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন-প্রয়াসের দ্বারা, উপহ্বের বেগ
অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-সংযোগ-লালসারদ্বারা মনকে অসম্বিস্ময়ে
আবিষ্ট করে; সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন
হয় না।” —পীঃ পঃ ১

প্রঃ—শুক-চন্দন-বনিতা-ভোগাদির সুখ নিত্য, —
না অনিত্য ?

প্রঃ—“স্ত্রী-সন্তোষ, আহার, গাত্রমার্জন, অন্তঃস্পন্দন,
সুগন্ধিসেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা
অত্যন্ত অনিত্য, ভোগ হইবামাত্রই দুঃখের উদয় হয়।
মত্তপাত্রী ও বেথোগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দন-কানন, উর্বশী-মেনকা
অমরার নৃত্য ও ভোগ এবং অমৃত পানেই বা কি নিত্য-
সুখ আছে? সেই সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-সুখের কাল্পনিক
উৎকৃষ্ট-মাত্র।” —তঃ হঃ ২।৭

প্রঃ—দ্রব্যাসক্তি ভক্তির বিঘ্নকর কেন? উহা
কিভাবে দূরীভূত হয় ?

উঃ—“দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ
যত্ন করা উচিত। গৃহদ্বারে, ব্যবহার্য্য দ্রব্যে, অলঙ্কার-
বস্ত্রে, গর্বে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ-শরীরে,
ভোজ্য-স্তুতে, বৃক্ষ-পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গ-
সিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্র-পানে,
তাষ্মল-ভোজনে, মৎস্ত-মাংসাদিতে এবং মাদকবস্তুতে
এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক
হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্তাদির গোষ্ঠে ভগবৎ-
প্রসাদাদিতে আদর করে না। ধূম্রপানে মুহুমুহু স্পৃহা-
দ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি আনন্দন
এবং দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়।
নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই
বিবোধ্য। বহুযত্ন-পূর্বক সেই সকল আসক্তি ত্যাগ না
করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল
দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ-চেতীর

দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করা চাই। ভগবদ্বক্তৃ-
সম্মত ব্রতচারণের দ্বারা ঐ সকল দূষীভূত হইয়া থাকে।”
—‘সঙ্গত্যাগ’, সং: তো: ১১।১১

প্রঃ—ভোগ্যদ্রব্য-সঙ্গ কি কি? অমুকল্প-বিধানেন
কোন কোন দ্রব্যের সঙ্গত্যাগ ও সঙ্কোচ করিবার বিধি
আছে? কিরূপে দ্রব্যসঙ্গত্যাগ হইতে পারে?

উঃ—“ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার—অর্থৎ প্রাণরক্ষক ও
ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্যই প্রাণ-রক্ষক এবং
মৎস্ত, মাংস, তাম্বুল, মাদক-দ্রব্য, তাম্রকূটাদির ধূম্রপান—
এই সমস্তই ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে—ইন্দ্রিয়-তোষক
দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না।
(ব্রতদিনে) যতদূর সাধ্য প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও
পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে
অমুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্য
সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে,
তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনু-
কল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগ-
প্রবৃত্তির ধর্মী ভ্যাসই ব্রতের একাদ। যদি এক্রপ মনে হয়—
‘কণ্ঠে-দৃষ্টে অল্প ত্যাগ করিয়া আবার কলা সেই
দ্রব্য ঘণ্টেই ভোগ করিব’, তবে ব্রতের তাৎপর্য
সিদ্ধি হইবে না; কেন না, ক্রমে-ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ
সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্ত ব্রতসকল
নিবীত হইয়াছে।” —‘সঙ্গত্যাগ’, সং: তো: ১১।১১

প্রঃ—কোন ব্যক্তি অদর্শনীয়? কাগদের সঙ্গ
বিধেয়?

উঃ—“গুরুর প্রতি অপরাধী তুর ব্যক্তিগণকে কখনও
দেখিবে না। গুরুও বৈষ্ণবে ধাঁধারা একনিষ্ঠ, এক্রপ
পুরুষদিগের সহিত সর্বদা সঙ্গ করিবে।”

—‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ৪২, সং: তো: ৭।৪

প্রঃ—বৈষ্ণব-নিম্নকের প্রতি মহাভাগবতের ব্যবহার
কি?

উঃ—“বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিম্নে হিংসা করি’।

ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে’ তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥”

—ক: ক: ‘প্রার্থনা’ (লালসাময়ী)—৭

প্রঃ—ভক্তির প্রতিকূলচরণকারীর প্রতি শরণাগতের
ব্যবহার কি?

উঃ—“বাধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।

প্রতীপজনেরে আসিতে না দিব,

বাধিব গড়ের পারে॥” —শ:

প্রঃ—লোকাপেক্ষায় সত্যে ঐকান্তিকতা পরিত্যাগ
করা কি উচিত?

উঃ—“বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা
করিয়া নানা-স্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়।”

—‘সাদ্ব্যুত্তি’, সং: তো: ১১।১২

প্রঃ—কাহাদের সহবাস উচিত নহে? বিষয়াতুরগণ
যদি বৈষ্ণব-চিহ্নধৃক হ’ন, তবে তাহাদের সঙ্গ কি বিধেয়?

উঃ—“দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে
না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ
করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না।”

—‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ৪৬, সং: তো: ৭।৪

প্রঃ—জড়-বিদ্যায় অহুরাগ ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

উঃ—“জড়-বিদ্যা যত, মায়ায় বৈভব,

তোমার ভঞ্জে বাধা।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,

জীবকে করয়ে গাধা॥” —শ:

প্রঃ—ভক্তি-প্রতিকূল ও ভক্তির অমুকুল বিদ্যাকে
কিরূপভাবে বর্জন ও বরণ করিতে হইবে?

উঃ—“ভক্তি বাধা যাঁহা হ’তে, সে বিদ্যার মন্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ’র হিয়া,

বিনোদের সেই সে বৈভব॥”

—ক: ক: ‘উপদেশ’—১০

প্রঃ—বিজ্ঞব্যক্তি কি বৃদ্ধকালের জন্ত হরিভজন
হুগিত রাধেন?

উঃ—“জীবন-সমাপ্তিকালে, করিব ভজন,
এবে করি গৃহ স্রব।

কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,

এ দেহ পতনোন্মুখ॥”

—ক: ক: ‘প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলক্ষি’—৪

প্রেমবন্ত ভগবান্

পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

অখিলরসামৃতমূর্তি রসিকেন্দ্রমৌলি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাস্রিত ভক্তবৃন্দের নিকট তত্ত্বদ্রসোচিত বিভিন্ন লীলাবৈচিত্র্য প্রকট করিয়া তাঁহাদিগকে কতই না আনন্দ দিয়াছেন এবং অত্যাপিও দিতেছেন! তিনি যে সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণ আনন্দময় ভূমা বস্তু, তাঁহার শ্রীপাদপদুই ত' সকল চিদানন্দের মূল আকর স্থান—অশোক-অভয়-অমৃতের মূলাধারই ত' সেই চরণকমল। নাগে স্তব্ধমস্তি ভূমিব পরমং স্তব্ধম্—এই বেদবাক্য সাধুগুরুমুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও ত' শুনিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, ইহাই ত' বহিরঙ্গা মায়ার খেলা। তথাপি শ্রীশ্রীগুরুমুগত্যে শ্রীগোপীনাথ-পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি—

(হে) গোপীনাথ! আমি ত' মূৰখ অতি।

কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিলু,

তাই হেন মম গতি ॥

(কিন্তু) গোপীনাথ! তুমি ত' পণ্ডিতবর।

মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অধেষিবে,

এ দাসে না ভাব পর ॥”

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার সংগৃহীত পঞ্চাবলী গ্রন্থে শ্রীভগবানের বালালীলার কতিপয় শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তন্মধ্য হইতে কএকটি শ্লোক রসিক ভক্তবৃন্দের আশ্বাদনার্থ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। আমরা গুরুবর্গের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি—সার্বদ্বিতীয় রসাস্বাদনস্থান বৈকুণ্ঠ—‘অখোকজ’ভূমিকা এবং তত্পরিত্ব পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণ ছাদশরসাস্বাদনস্থান গোলোক বৃন্দাবনই—‘অপ্রাকৃত’ভূমিকা। এখানে শ্রীভগবানের যাবতীয় লীলাবিলাস প্রাকৃততৎৎ প্রণীত হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,

নরবগু তাঁহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেগুকের, নবকিশোর নটবর,

নরলীলার হয় অরূপ ॥

লীলাময় শ্রীহরির নিত্যব্রজের নিত্যলীলা ভোম-ব্রজে বৈবস্বত মঘন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্গুণের ষাপরের শেষভাগে আরও অধিক চমৎকারিতার সহিত প্রকাশিত হন। [কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর, ইহার দ্বিগুণ ষাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা এবং চতুর্গুণ সত্য—এই চারিযুগের বর্ষদমষ্টি ৪৩২০০০ বৎসর, ইহাকে এক মধ্যযুগ বলে। ৭১ মহাযুগ এক এক মনুর ভোগকাল। চৌদমনুর রাজত্বকাল ব্রহ্মার একদিন বা এক কল্প। প্রতিকল্পে শ্রীকৃষ্ণ একবার জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রকটবিহার করেন।]

সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম পরাংপর আনন্দময় ভগবান্ আজ মাতা যশোমতী দেবীকে গব্যাহরণ লীলার দ্বারা আনন্দ প্রদান করিতেছেন:—

“দূরদৃষ্ট-নবনীত-ভাজনং

জানুচংক্রমণজাতসম্ভবম্।

মাতৃভীতি-পরিবর্তিতানং

কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে ॥”

অর্থাৎ যিনি দূর হইতে নবনীত-পাত্র দর্শনপূর্বক জানু চংক্রমণ দ্বারা (অর্থাৎ হানাগুড়ি দিয়া) তথায় যাইবার জন্য সম্ভবযুক্ত বা উগ্ৰযুগ হইয়াও মাতার তাড়ন ভয়ে ভীত হইয়া বদনকমল পরিবর্তিত করিয়াছিলেন, সেই কোন আশ্চর্য্য কেশবসম্বন্ধি শৈশবকে অর্থাৎ আশ্চর্য্য শৈশবসম্পন্ন কেশবকে আমি ভজনা করি।

সংযুক্ত নবনীতমস্তিকমণিস্তস্তে স্ববিদ্বাদগমং

দৃষ্টা মুক্ততয়া কুমারমপরং সঙ্কিস্তয়ন্ শঙ্কয়া।

তন্নিজং হি ভবান্ ময়াত্র ভবতো ভাগঃ সমংকল্পিতো মা মাং সূচয় সূচয়েত্যনুন্নয়ন্ বালো হরিঃ পাতু বঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নবনীত চুরী করিতে করিতে নিকটবর্তী মণিস্তস্তে স্বীয় প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিয়া বালাভাবে

মুক্তা-হেতু তাহাকে অপর একটি বালক মনে করিয়া বড়ই শঙ্কিত হইলেন, কেননা সে যদি তাঁহার মাকে বলিয়া দেয়, তাহা হইলে ত' মায়ের নিকট অত্যন্ত প্রহার খাইতে হইবে! তাই মাতৃভয়ে সেই প্রতিবিশ্বকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—অহে দেখ, তুমি আমার হিতকারী মিত্র। অতএব এই অপহৃত নবনীতে তোমার আমার সমভাগ কল্পিত হইবে। মাতৃসমীপে তুমি আমাকে প্রকাশ করিও না, আমাকে প্রকাশ করিও না, মাতার প্রহারের ভয়ে ইহা বলিতে বলিতে যিনি সেই প্রতিবিশ্ব-প্রতি অনুন্নয় করিতেছিলেন, সেই বালকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীভগবানের লীলাশক্তির এমনই অবিচ্ছিন্ন মহাপ্রভাব যে, সর্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবানেরও একরূপ পরম মুক্তা সম্ভব হইতেছে! অবশ্য শ্রীভগবদিচ্ছায়ই তাঁহার লীলাস্বথবিধানার্থ লীলাশক্তি এইরূপ মোহোৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় স্বয়ং শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভুস্বরূপ বলিয়া কথিত—

“দধিমথন-নির্নাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে

নিভৃতপদমগারং বল্লগীনাং প্রবিষ্টঃ।

মুখকমল-সমীরেরাশু নির্দোষ্য দীপান্

কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥

সর্বো পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কণীদাম ধ্বজা

কুঞ্জীভূয় প্রপদগতিভিন্নমন্দমন্দং বিদ্রুত।

অক্লোভজ্যা বিহসিতমুখীবারয়ন্ সমুখীনাম্

মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥”

অর্থাৎ যে নবনীতচৌর শ্রীহরি রাত্রিশেষে ব্রজ-গোপীগণের দধিনির্ম্মলন শব্দে জাগরিত হইয়া চৌধ্য-বৃত্তিধারা নবনীত ভক্ষণার্থ নিঃশব্দ পদসঙ্কারে ব্রজ-গোপিকাগণের গৃহে প্রবেশ পূর্বক মুখকমলসমীরধারা অর্থাৎ ফুৎকুতিধারা (ফু' দিয়া) শীঘ্র দীপ নির্দোষ করতঃ নবনীত ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই বালকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

কোন এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে কটিদেশস্থ কিঙ্কণীর রজ্জু ধারণপূর্বক তাহার শব্দ নিবারণ করতঃ এবং

চৌররীত্যনুসারে সঙ্কুচিত শরীরে (কুঁজো হইয়া) পাদাগ্রগতিধারা (পদচারণের কোন শব্দ না হয়, এইভাবে) মন্দমন্দ হস্ত সংহারে তথা নেত্রভঙ্গী-ধারা সমুদ্বৃতি হস্তমুখী গোপাঙ্গনাগণকে নিবারণ করিতে করিতে (অর্থাৎ তোমরা মাকে বলিও না, এইরূপ ইসারা করিতে করিতে) মাতার পশ্চাদভাগে গিয়া হৈয়ঙ্গবী অর্থাৎ সংযোজাত নবনীত হরণ করিয়া-ছিলেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার বাল্যলীলায় এইরূপ বালকোচিত চাতুর্ধ্যধারা বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ মাংগাপিতা ও অস্ত্রাত্ত ব্রজবাসিগণকে নিরন্তর আনন্দ দান করিয়া-ছেন! কখনও বা আধ-আধ বুলিতে গান গাহিয়া, কখনও বা কত ভঙ্গী সংহারে নৃত্য করিয়া ব্রজ-বাসিগণকে কত সুখ দিয়াছেন! শ্রীশ্রী নন্দ বাবার পাত্ৰকাই বা কত ভঙ্গীতে মাথায় বুক করিয়া আনিয়া বাবার মুখের কত চুষন খাইয়াছেন এবং তাহাতেই যেন নিজেকে কতই না কৃত কৃতার্থ মনে করিয়াছেন অথবা তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেমের নিকট অন্তরে অন্তরে পুনঃ পুনঃ কতই না ঋণ স্বীকার করিয়াছেন! ব্রজবাসী যে তাঁহার নিত্যলীলা-পরিকর, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিকী প্রীতি, তাঁহাদেরও কৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি। এই প্রীতিমাধা সেবাই ভক্তি, সেই ভক্তিই জীবকে কৃষ্ণের কাছে লইয়া যায়, কৃষ্ণকে দর্শন করায়, কৃষ্ণ ভক্তিবশত, ভক্তিরই প্রশস্তি সর্বশাস্ত্রে গীত হইয়াছে। আমাদের জড়বিষয়ে—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-দিতে কতই না প্রীতি! মহাজন বলিতেছেন—

“বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছেয়ে আমার।

সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥”

‘সেই মত’ দূরের কথা, তাহার শতাংশের এক অংশ প্রীতিই বা আমাদের কোথায়? যদিও সেবা-পূজাদির অভিনয়ে কিছু প্রীতি দেখাইতে যাই, তাহার মধ্যে ত' থাকে কেবলই নানাপ্রকার জাগতিক কামনা বাসনা মিশান! পাঁচ পয়সার পূজা দিয়া পাঁচ লাখ টাকার প্রার্থনা জানানাইয়া দিই! ভক্তরাজ প্রহ্লাদ

ইহাকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বলিয়াছেন
—বণিগ বৃত্তি:—

‘যন্ত আশিষ আশান্তে ন স ভূতাঃ স বৈ বণিক’।

—ভাঃ ৭।১০।৪

অর্থাৎ হে অধিল গুরো, করুণাময়, আপনার
নিকট হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে,
সে আপনার ভূতা নহে, সে ত’ বণিক—ব্যবসাদার—
“যতস্তভ্যাং কিঞ্চিৎ পত্রপুষ্পনৈবেদ্যাদিকং দত্ত্বা হস্ত্যশ্ব-
রথাদিমতীং সম্পত্তিং ব্রহ্মজ্ঞাদিপদং বা জিঘৃক্ষতি।”
অর্থাৎ তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ পত্রপুষ্পনৈবেদ্যাদি ভোগ
দিবার অভিনয় করিয়া হস্তী-অশ্ব-রথাদিমতী বিপুল
সম্পত্তি অথবা ব্রহ্মাইজ্ঞাদির পদ গ্রহণেচ্ছু হয়।

শ্রীভগবান্ তাঁহার শুদ্ধভক্ত প্রহ্লাদকে বর দিবার
জন্ত বিশেষ ইচ্ছুক হইলে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

“যদি দাতাসি মে কামান্ বরাংস্বং বরদর্ষভ।

কামানাং হৃদসংরোহং ভবতস্ত বৃণে বরম্॥”

—ভাঃ ৭।১০।৭

অর্থাৎ হে বরদর্ষভ (বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ),
আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার
নিকট এই বরই প্রার্থনা করি যে, যাঁহাতে আমার
হৃদয়ে (ভক্তীতর) কোন কাম-বাসনার উদ্ভবই না হয়,
এমন বর প্রদান করুন।

আত্মেল্লিক্সিত্তিবাঙ্গার লেশ-মাত্র থাকিলেও তাঁহাকে
শুদ্ধ কৃষ্ণপ্ৰীতি বলা হয় না এবং তাঁহাতে কৃষ্ণকে
বশও করা যায় না। “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি
মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তিধন না দেন রাখেন লুকাইয়া॥”

— চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ। শুদ্ধভক্তি—শুদ্ধপ্ৰীতিমূল্য
ভক্তি জগতে বড়ই সূহৃদভা। আবার কৃষ্ণপ্ৰীতি কাম
বা কৃষ্ণভক্ত গুরু-বৈষ্ণবে প্ৰীতিরই অনুগামিনী। এই
জন্তই ভক্তবর শ্রীরঘুপতি উপাধায় বলিয়াছিলেন—
“অহমিহ নন্দং বন্দে যশ্চালিন্দে পরং ব্রহ্ম।” পরং
ব্রহ্ম পরাংপর কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া
যাঁহাকে আনন্দ দিবার জন্ত তাঁহার অলিন্দে হামা-
গুড়ি দিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অর্থাৎ সেই কাম

নন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়াই বস্তুতঃ আরাধকের
আরাধনাচাতুর্য। এই জন্ত শ্রীগৌরপ্রিয়তম শ্রীল নরোত্তম
ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—“কিরূপে পাইব সেবা মুঞি
দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র
রতি না জন্মিল॥” ইত্যাদি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও
লিখিয়াছেন—“ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্ত-
ভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল॥ এই তিন সেবা হৈতে
কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে কুকারিয়া কয়॥”
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬৬০-৬১। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও
লিখিতেছেন—“ভক্তের পদধূলি-গ্রহণ, ভক্তের পদজল-
গ্রহণ এবং ভক্তের অধরাযূত গ্রহণ—এই তিনটিই
সর্বসাধনের বল-স্বরূপ।” (অঃ প্রঃ ভাঃ) সুতরাং
এই সাধনবলক্রমে বলবান্ না হইতে পারিলে হীনবল
সাধকের পক্ষে কৃষ্ণপ্ৰীতি সুদূর পরাহতা। কাম-
প্ৰীতিই কৃষ্ণপ্ৰীত্যাৰ্জনে একমাত্র সহায়। তদ্বিষয়ে
উদাসীন থাকিলে কৃষ্ণপ্ৰীতি বা প্রেমধনে অবশ্যই
বঞ্চিত হইতে হইবে। কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্ৰীতির নামই
কৃষ্ণপ্রেম। ব্রজের এই নিগূঢ় প্রেমসম্পদ বিতরণের
জন্তই স্বয়ং সেই ব্রজেন্দ্রমন্দনই আশ্রয় শ্রীরাধাভাবকাস্তি-
সুবলিত হইয়া গৌররূপে অবতীর্ণ। তাই ঠাকুর
মহাশয় আমাদেরকে সজাগ করিবার জন্ত গাহিতেছেন—

“গোরা পুঁছ না ভজিয়া মৈলু।

প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইলু॥

অধনে যতন করি’ ধন তেয়াগিলু।

আপন-করম দোষে আপনি ডুবিলু॥

সংসজ ছাড়ি’ কৈলু অসতে বিলাস।

তে কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ ফাঁস॥

বিষম বিষয়-বিষ সতত পাইলু।

গৌরকীর্তনরসে মগন না হৈলু॥

কেন বা আঁছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।

নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥”

দিনে দিনে দিন ফুরাইল, আয়ুঃ সূর্য অস্তমিত-প্রায়।
এখনও আমাদের মন যে কি সুখের আশায় শ্রীগুরু-
বৈষ্ণবানুগত্য ছাড়িয়া তাঁহাদিগের মনোহরীষ্ট সেবার

উদাসীন হইয়া ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করিতে চাহে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। “আত্মৈব হ্যাত্মনো বদ্ধরাশ্রয় রিপু-রাশ্রয়ঃ” (গীঃ)। কার্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত কৃষ্ণসেবানু-মনই প্রকৃত বন্ধুর কাণ্ড্য করে, নতুবা কৃষ্ণকার্যবহির্ভূত অসংস্কলোলুপ বহির্বিশ্রাবিষ্ট মন পরমশত্রুরূপে আমাদিগকে বিপথে চালিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে বঞ্চিত করিয়া দেয়। সাধুগুরু-রূপাবিনা জড়বিষয়-বিদুষিত হুই মনকে শিষ্ট করা সংপথে চালিত করিয়া প্রেমরতনধনের অধিকারী করা কখনই সম্ভব হয় না। মহাশক্তি কার্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক অল্পশক্তি বা শ্রীগুরু-গৌরুরূপাশক্তিশূন্য বৈষ্ণবপ্রায় বা বিষয়গণের সহিত দল গঠন পূর্বক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানাদি দ্বারা লাভপূজাপ্রতিষ্ঠা যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইলেও চিরাত্মপিত কৃষ্ণ-প্রেমধনে বঞ্চিত হইতে হয়। সজ্জশক্তিঃ কলৌযুগে ব্যাঘ্র সমীচীন হইলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক জড়বিষয়াসক্ত জীবগণের সহিত সজ্জাঙ্ক হইলে কৃষ্ণের বিষয়লোলুপতাই প্রবলা হইয়; মহাবদান্ত শ্রীগৌর-হরির মহাদান শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধনে বঞ্চিত হইতে হইবে। সুতরাং সাধু সাবধান! হুই মনকে বৈষ্ণব সাজ্জাইবার জন্ত বাস্ত হইতে হইবে না—“প্রভু সনাতনে পরম যতনে শিক্ষা দিল যাহা চিত্ত সেই সব ॥ সেই ছাটি কথা ডুল না সর্বথা উঠেঃস্বরে কর হরিনাম-রব। ফলু আর যুক্ত বদ্ধ আর মুক্ত, কভু না ভাবিহ একাকার সব ॥ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাধিনী ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত' বৈষ্ণব। সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব ॥”—এই সকল মহাজন-বাক্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে সঘনে অনুধাবন করিতে থাকিলে জীব অবশ্যই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবেন।

কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া তাঁহাকে নিরন্তর দর্শনকালে নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ চক্ষুর পলক-সৃষ্টিকর্তা বিধাতাকে পধ্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন—

(ভাঃ ১০।৮২।৩৯)

“অতপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।

অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥

কোটি নেত্র নাহি দিল, সব দিল ছুই।

তাঁহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুক্তি ॥”

—চৈঃ চঃ আঃ ১।১৫০-১৫১

দিবাভাগে কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার অদর্শনে গোপীগণের ক্রটি অর্থাৎ ক্ষণাধিকালও যুগসম বলিয়া মনে হয়, আবার দিনান্তে যখন তাঁহার কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিতে যান, তখন তাঁহার দর্শনকালে নিমেষমাত্র কালের ব্যবধানও তাঁহাদের পক্ষে অতীব অসহনীয় হওয়ায় তাঁহার পক্ষনিষ্ঠতা বিধাতাকেও বিবেকহীন বলিয়া জান করেন।

(ভাঃ ১০।৩১।১৫)

আবার প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের যে কমল-সুকোমল চরণযুগলকে গোপীগণ তাঁহাদের সুকোমল বক্ষে ধারণ করিতেও ভীতা হইতেন—পাছে তাহা যদি কার্কশ-জন্ত ঐ কোমল চরণের প্রকৃত স্পর্শপ্রদ না হয়, সেই সুকোমল চরণে দিবাভাগে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে তাহা কত তীক্ষ্ণ ও সূচ্য শিলাখণ্ড দ্বারা ব্যথিত হইয়া থাকে মনে করিয়া গোপীগণের হৃদয় অত্যন্ত বেদনা-বিহ্বল হইয়া উঠে।

(ভাঃ ১০।৩১।১৯)

অর্থাৎ যেখানে প্রীতি প্রাবল্য, সেখানেই হৃদয়ের বেদনা-বিধুরতা অত্যন্ত প্রবলা হইয়া উঠিবে। প্রীতির তারতম্য অনুসারে ভক্তিরও তারতম্য বিচারিত হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে বলিলেন—

ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্নংস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥”

(ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। (“অমৃতত্বায়” শব্দের ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন—মোক্ষায়, কেহ বলিয়াছেন—শান্ত কল্যাণায়, কেহ বা বলিয়াছেন—নিত্যপার্ষদত্বায়। কল্পতে যোগ্যো ভবতি। মদাপনঃ—মৎপ্রাপ্তিঃ, মৎসাক্ষাৎকারঃ। দিষ্ট্যা—‘তৎতু মন্তাগোঠৈনব’ ব্যাখ্যাও হইয়া থাকে। ভক্তি—শ্রবণ কীর্তনাখ্যা।) হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।”

সুতরাং স্নেহ-প্রীতিমাধা ভক্তিই ভগবান্কে পাইবার একমাত্র উপায়। এই ভক্তিও পাইবার উপায় এইরূপ বলা হইয়াছে—

“কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়শুণ্য হয়।

সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।

ভক্তিকল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥

মহৎকুপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয় ॥

‘সাধুসঙ্গ’ ‘সাধুসঙ্গ’—সর্বশাস্ত্রে কর।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৫, ৪৯, ৫১, ৫৪

“কোন ভাগ্যে কোন জীবের ‘শ্রদ্ধা’ যদি হয়।
তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় ‘শ্রবণ কীর্তন’।

সাধনভক্ত্যে হয় ‘সর্বানর্থনিবর্তন’ ॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি ‘নিষ্ঠা’ হয়।

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাণ্ডে ‘কুচি’ উপজয় ॥

কুচি ভক্তি হৈতে হয় ‘আসক্তি’ প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্গুর ॥

সেই ‘রতি’ গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’ নাম।

সেই প্রেমা ‘প্রয়োজন’ সর্বানন্দধাম ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩



রাজা মহারাজার ঠাকুরবাড়ী ও শ্রীমঠমন্দির

[মহোপদেশক শ্রীমদ্ভট্টলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্ সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী]

পূর্বসময়ে রাজা মহারাজা ও জমিদারগণ ন্যূনাধিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিপোষক ছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের বা জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাবর্গের কল্যাণ কামনায় প্রয়োজনবোধে রাজ্যান্তর হইতেও সদ্‌ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ মধ্যাদা সহকারে নিজ রাজ্যে আনিয়াছেন। তাঁহাদের সেবার নিষ্কর জমি, বিত্ত, সম্পত্তি আদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছেন। প্রতিদানে শাস্ত্রাভ্যাসতৎপর সদাচারী ব্রাহ্মণগণ কেহ বা রাজমন্ত্রীরূপে রাজস্ববর্গকে সংমন্ত্রণাদির দ্বারা রাজকার্যের সৌকর্য্য বিধান করতঃ তাঁহাদিগকে প্রজারঞ্জক করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ বা দেবসেবার সর্বদক্ষীণ পবিত্রতা রক্ষা করিয়া প্রজাবর্গের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক-মান সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং কেহ বা অধ্যাপনাদির দ্বারা কোমলমতি রাজপুত্রগণের তথা প্রজাবর্গের সন্তানগণের মধ্যে সংশিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন। এইভাবে এককালে ব্যাপ্তি ও সমষ্টি জীবনের অপরিহার্য্য অংশরূপেই ব্রাহ্মণগণকে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে শাস্ত্রাভ্যাস তৎপরতার অভাবে ব্রাহ্মণগণের

নিরপেক্ষতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মান হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের হ্রাস দেখা যায়। তখন সংশিক্ষার অভাবে ক্ষত্রিয় রাজপুরুষগণের চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ মলিন হইলে এবং শাসনাভাবে বৈশ্য ও শূদ্রগণ ছরাচারী হইলে সমাজের সমূহ পতন ঘটে। ক্রমশঃ রাজা, মহারাজা ও ঠাকুরবাড়ীর মানও কমিয়া যায়। তথাপি পুরাতনের জরাজীর্ণ কাঠামো একেবারে পরিত্যাগ করা মানবীয় সংস্কারে সম্ভবপর না হওয়ায় এখনও গতানুগতিকরূপে পুরাতন অসংস্কৃত দেবালয়ে ধূপ, দীপ জলিতেছে ও কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে, নূতন মন্দিরও নিষ্প্রতি হইতেছে এবং তাহাতে ব্রাহ্মণাদি রাখিয়া পূজাও চলিতেছে। ক্ষত্রিয়গণ রাজকার্য্য করিতেছেন, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বৃত্তি ব্যবসায়ও তদ্রূপই অর্থাৎ চারিবর্গের চারি আশ্রমের গুণগত কার্য্য কিছু কিছু দেখা গেলেও তাহা প্রায়শঃই প্রাণহীন। বর্তমান ভারতীয় সমাজ বা হিন্দুসমাজ বলিতে সংক্ষেপে ইহাই বুঝায়।

সাধুগণ পরহৃৎ ধুঃখী। প্রাচীনকাল হইতেই

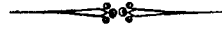
তঁাহারা সর্ববর্ণ ও আশ্রমের পূজ্যস্থানীয়। কোথাও বিশেষ আবেশ না থাকায় তঁাহাদের গতিও সর্বত্র অব্যাহত। ভগবান্ বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত লোকসমূহের পবিত্রতা সংরক্ষণে তঁাহারা স্বেচ্ছায় সর্বত্র বিচরণশীল। বিশেষ আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণের অপেক্ষাও তঁাহারা করেন না। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বহুল ক্লেশকর ও সমস্ত-পূর্ণ দেবিয়া অর্থাৎ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকাদি জীবন বিপন্ন দেবিয়া তঁাহাদের উপকারার্থে পৃথিবীর বহুলাংশেই তঁাহারা বর্তমানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। তঁাহারা লুপ্তচীর্ণ উদ্ধার, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সেবাপ্রকাশ ও শ্রীনামপ্রেম-প্রচারাদি বিবিধ ভক্তিমূলক কার্য্য করিয়া জনগণকে আন্তিক্য ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তদুদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে তঁাহারা শ্রীমঠমন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। শ্রীমঠ মন্দির কিন্তু রাজা মহারাজার বা কাহারও ঠাকুরাডী মাত্র নহে। ইহা সর্বের নিকাম সাধুগণ কর্তৃক সেবিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাহাতে পারমাধিক অধ্যাপকবর্গ (মঠাধীশ শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্ত্য আচার্য্যবর্গ) ও পারমাধিক বিদ্যাধিগণ (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসিগণ) সর্বদা বাস করেন। তাহা গৃহস্থ সজ্জনগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ভিক্ষাদ্বারা পরিচালিত হয়। জাতিধর্ম-নিবিশেষে পরমার্থশিক্ষার আশায় তাহাতে সকলে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীমঠ মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ অধিকার তঁাহাদের নাই। তবে শ্রীমঠের কার্য্যাবলীর মধ্যে অশাস্ত্রীয় কিছু দেখিতে পাইলে তঁাহারা মঠ-কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞাই জ্ঞাত করাইতে পারেন। বলা বাহুল্য হইবে না যে, মঠবাসিগণের মধ্যে কেহই বেতন-ভোগী নহেন। পরন্তু সকলে পরমার্থ লাভের আশায় স্বেচ্ছায় ও বিনাসর্তে শ্রীআচার্য্য-সমীপে উপনীত। শ্রীআচার্য্যদেব শাস্ত্রবিহিত উপায়ে স্নেহের সহিত তঁাহাদের সকলকে নিয়ন্ত্রণ ও পালন করিয়া থাকেন। বিধিবহির্ভূত কার্য্যে মঠবাসিগণ কেহই রুচিবিশিষ্ট নহেন। যদি কদাচিত্ কোথাও শাস্ত্রবহির্ভূত রুচি মঠবাসী কাহারও মধ্যে দেখা যায়, তবে তঁাহাকে

সহায়ভূতিশীল মঠপরিচালক অথবা মঠকর্তৃপক্ষই নিয়ন্ত্রণের যত্ন করেন। ইহাই বস্তুতঃ পক্ষে মর্যাদাসংরক্ষণ-পার ও মঙ্গলজনক। জনসাধারণের লৌকিক কার্য্যে মঠ-বাসিগণ কোন প্রকার মন্তব্য না করিলেও পরমার্থবিচার-প্রাধিগণকে তঁাহারা অবজ্ঞাই বিনাসর্তে শাস্ত্রবিহিত সংযত সর্বদাই প্রদান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রবহির্ভূত কার্য্যে অরুচি দেখা দিলে মঠবাস আংশিকরূপে সিদ্ধই হয়। সেইক্ষেত্রে জনসাধারণের অশাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রতি-রোধকারী মঠবাসী কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীকে কখনও অমিত্র জ্ঞান করিতে হইবে না। পরন্তু পরম বান্ধব জ্ঞানে তঁাহাদের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইলে স্ব-পর কল্যাণই হইবে। ইহাতে সজ্জনতার বা কাহারও কোন মর্যাদার হানিও হইবে না, অধিকন্তু সজ্জনতা ও মর্যাদা তাহাতে বৃদ্ধিই হইবে। যেমন কলিপঞ্চকের স্থান বিচারে শ্রীভাগবত শাস্ত্র বলিয়াছেন, — ‘দ্যুং পানং স্ত্রিয়ঃ শুনা যজ্ঞাধর্ম্মশতবিরঃ।’ অর্থাৎ (১) ভাস, পাশা, জুয়া, দাণ্ডাখেলা, (২) মাদক দ্রব্য, চা, বিড়ি, সিগারেট, তামাক, মদ্য, গাঁজা, ভাজ, আফিম ইত্যাদি পান করা, (৩) অবৈধ জীসঙ্গ অর্থাৎ বৈধপত্নী ব্যতিরেকে ভোগবুদ্ধিতে অপর জীগণের সহিত মিলা, প্রীতি করা ও প্রজন্ম করা; (৪) জীব-হিংসনাদি যেমন মৎস্ত, মাংস, ডিম্বাদি ভক্ষণ করা ইত্যাদি অসৎ কার্য্য যে-স্থানে হয়, তাহাতে কলি বাস করে। ‘কলি’ অর্থে কলহ, বিবাদ, অশান্তি, পাপ অবর্ম্ম আদিকে বুঝায়। এইজন্ত সাধুগণ কলিপঞ্চক হইতে সর্বদা বহুদূরে অবস্থান করেন এবং শ্রদ্ধালু জনগণকে তাহাই উপদেশ করেন। ইহা অতি অশুভ স্ব-পর কল্যাণকর। অনেক ক্ষেত্রে শ্রীমঠমন্দিরের প্রবেশের মুখেই প্রায় স্থানেই লেখা দেখিতে পাওয়া যায় “ধূমপান নিষেধ” “ধূমপান করিবেন না।” শ্রীমন্দিরে সম্মুখভাগে শ্রীবিগ্রহ দর্শনচ্ছু সজ্জনগণকে সেবাগরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত স্থানে স্থানে লেখা থাকে “জুতা পায়ে বিগ্রহ দর্শন নিষেধ” “এইস্থানে জুতা রাখুন” “শ্রীমন্দিরের উপরে উঠিবেন না” ইত্যাদি। ইহা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্তই। কেননা, সকলে সকলের হিতটা বুঝেন না, শুচিতা

ও অশুচিতার জ্ঞানও সকলের নিকট হইতে আশা করিতে পারা যায় না, বিশেষতঃ পরমার্থ বিষয়ের অভিজ্ঞতা সকলের ত'—নাইই। তজ্জন্ত নিজহিতে সাবধান, এমনকি সদাচারী ভক্তসম্প্রদায়কে যদিও কিছু বলিবার প্রয়োজনই হয় না, তথাপি সর্বসাধারণে শিক্ষা বিস্তারের আশায় তাঁহারাও সাধুগণের নিমন্ত্ৰণ

মানিয়াই চলেন। কেননা, শ্রেষ্ঠজনের আচরণই ত' অপরাপর জনসাধারণ পালন করেন—মান্ত করেন।

শ্রীভগবদ্ভিগ্রহণকে পুতুল বা খেলনা মনে না করিয়া শ্রীভগবৎস্বরূপ বা অর্চ্যবতার জ্ঞান করিলে স্বাভাবিকরূপেই শ্রীবিগ্রহের মধ্যাদা প্রদান করতঃ তাঁহাদের দর্শন ও পরিক্রমণাদি করিতে পারিবেন এবং তৎফলে বিধর্মিগণেরও শ্রীবিগ্রহে মধ্যাদাবোধের উদয় হইবে।



কিনাশ্চর্য্যমতঃ পরম্

[অধ্যাপক শ্রীবিভূপদ পাণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণ-তীর্থ]

দ্যুতকীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণ যখন বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদা তাঁহারা অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে জলানুসন্ধানে উত্তত সহদেব এক উন্নত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া অনতিদূরে এক স্নচ্ছতোয়া সরোবর দেখিতে পাইয়া জলগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তথায় জলসান্নিধ্যে উপবিষ্ট এক বক মনুষ্য-ভাষায় বলিয়াছিলেন—‘আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল স্পর্শ করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।’ তখন সহদেব বকের সেই বাক্য অবহেলা করিয়া জল স্পর্শ করিয়ামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতার কিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া নকুলকে প্রেরণ করেন। তাহারও সেইপ্রকার বিলম্ব দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অর্জুন ও ভীমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই বক-রূপধারী ধর্ম্মের কথা অবহেলা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং জলানয়নে গমন করিয়া ভ্রাতৃগণের এই অবস্থা দর্শন করিয়া বিস্মিত হন। তিনিও জলগ্রহণে উত্তত হইলে সেই বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—‘কা চ বার্তা কিনাশ্চর্য্যং কঃ পশ্যঃ কশ্চ মোদতে। এতান্ামে চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥’ এই প্রশ্নগুলির অন্ততম হইল—‘জগতে আশ্চর্য্য কি?’ তত্বতরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

‘অহংহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।

শেষাঃ স্থিরত্মিচ্ছন্তি কিনাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥’

অর্থাৎ প্রত্যহ জীবগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও বাঁহারা অবশিষ্ট রহিয়া যাইতেছে, তাহারা মনে করিতেছে, তাহারা স্থির থাকিবে অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু হইবে না। এতদপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে!’ প্রকৃতপ্রস্তাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে এই উক্তির সত্যতা বোধগম্য হইবে।

পৃথিবীতে একটি জীবও বাঁচিয়া থাকিতেছে না। পার্থিবদ্রব্যমাত্রই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ধনশালী, ধনহীন, বিদ্বান্, মুর্থ, রূপবান্, রূপহীন, গুণবান্, গুণহীন, রাজা, প্রজা কাহারও মৃত্যুর কবল হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। সকলকেই মরণপথ-যাত্রী হইতে হইতেছে। জগৎধাসীর বিস্ময়সৃষ্টিকারী বড় বড় কূটনৈতিক রাষ্ট্রনেতা, অপরাপর হৃদ্বর্ষ বীর-যোদ্ধা, নব নব তত্ত্ব আবিষ্কারকারী বৈজ্ঞানিক—কেহই চিরকাল জীবন ধারণ করিতেছে না। বিশাল সমৃদ্ধিশালী নগর, বিরাট অস্ত্রভেদী অট্টালিকা, সুশোভিত রাজপথ, উন্নতিশীল স্থানসমূহ কালের করাল কবলে চলিয়া যাইতেছে। এইসব লক্ষ্য করিয়াও কাহারও চৈতন্য হইতেছে না। সকলেই চাহিতেছে আরও অধিক দিন বাঁচিবে, আরও অধিক ভোগ

করিবে। তাহারা যেন মরিবে না, ভোগ্যবস্তুসমূহ অটুট থাকিবে, তাহারা ভোগই করিতে থাকিবে। রাষ্ট্রনেতৃগণ দেখিতেছেন—রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তথাপি তাঁহারা নিজরাষ্ট্রের মর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্ত এত ব্যস্ত যে, ত্যায়, নীতি, ধর্ম, এমনকি সাধারণ মাননীয় গুণসমূহকে বিসর্জন দিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গ্রাস করিয়া অথবা সেইগুলিকে নিজ নিজ কূটনৈতিক বুদ্ধিবলে নিজ মতাবলম্বী করিয়া রাজ্যের সীমা অথবা গোষ্ঠী বৃদ্ধি করিতে সর্বদা তৎপর। পৃথিবীতে এমন একটি রাজনৈতিক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যে, বিশ্ব-মানব সর্বদা সম্বৃত্ত হইয়া রহিয়াছে কখন কিপ্রকার বিবাদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। অথচ রাষ্ট্রনেতৃগণ মনে করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের গৌরব—ইহাই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। মুহূর্ত্তকালের জন্তও পৃথিবীর অনিত্যতার কথা চিন্তা করিতেছেন না।

এই অধিককাল বাঁচিয়া থাকিব, পার্থিব বিষয় ভোগ করিব—এই আশায় মানুষ কি-না করিতেছে? বাসোপযোগী একটি সাধারণভাবে গৃহ নির্মাণ করিলে স্বয়ং এবং পরিবারস্থ সকলেই স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিবে, কিন্তু সে নির্মাণ করিতে চাহিতেছে—অভ্র-ভেদী সোধ। যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহার স্তম্ভভাবে জীবিকা নির্বাহ হইবে, সেই পরিমাণে সে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তদপেক্ষা অধিক অর্থ পাইতে এবং উদ্ধৃত্ত অর্থ কোথাগারে সঞ্চিত রাখিতে চাহিতেছে! এই আশা! পূরণের জন্ত সে অসহুপায় অবলম্বনেও কুণ্ঠিত নহে। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যথা খুশী বিনাধিকার সে তাহা করিয়া যাইতেছে। চোরাকার-বার, কালবাজার, খাতি ও ঔষধাদিতে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের মিশ্রণ, প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, অর্থের নিমিত্ত নরহত্যা প্রভৃতির তাণ্ডব নৃত্যে আজ সমগ্র পৃথিবী বিপদগ্রস্ত। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে সাধারণ মানুষ। কেহই ভাবিয়া দেখিতেছে না—ইহার পরিণাম কি? অবশ্য সদ্ভাবে অজ্ঞিত উদ্ধৃত্ত অর্থ, বিশেষ প্রয়াসে নিম্নিত অট্টালিকা প্রভৃতি

ভগবৎসেবায় অথবা ভক্তসেবায় নিয়োজিত হইলে কল্যাণকর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, অসহুপায় সঞ্চিত অর্থাদি কখনও সংকর্মে নিয়ো-জিত হয় না।

শুধু বর্তমানকালে কেন, স্মৃতির অতীতে দৃষ্টিপাত করিলেও সেই একই ব্যাপার লক্ষিত হইবে। প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজ রাবণ দেখিতেছেন—প্রত্যহ এক-জন দুইজন করিয়া তাঁহার সৈন্ত সেনাপতি জ্ঞাতি, পুত্র প্রভৃতি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিতেছে, তথাপি যুদ্ধজয়ের আশা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অভিমানী দুষ্টোদধন দেখিতেছেন—বীরাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অগণিত সৈন্ত, সেনাপতি এবং ভ্রাতৃগণ কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হইতেছেন, তথাপি পাণ্ডবজয়ের আশা এবং রাজ্যাভোগের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিরণ্যকশিপু, কংস প্রভৃতি কি জানিতেন না যে, মৃত্যু একদিন আসিবেই? তথাপি তাঁহাদের কাধ্যাবলী তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়াছে কি? হিটলার, মুসোলিনী, তোজো প্রভৃতি আধুনিককালের রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ বহু রাজ্য জয় করিয়াও বাঁচিয়া থাকেন নাই। জেতা, বিজেতা সকলকেই কালের স্রোতে তুণের ত্যায় ভাসিয়া যাইতে হইয়াছে, সকলকেই ইহ-জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। এইসব দেখিয়া শুনিয়াও মানুষ চার আরও বাঁচিবে, আরও ভোগ করিবে!

কেন এই মোহ! কেন এই বাঁচিয়া থাকিবার হৃদমনীয় বাসনা! কেন মানুষ তাহার জীবনের পরিণাম চিন্তা করিতেছে না! অবশ্য কোন কোন সময়ে আধিব্যাধি-প্রপীড়িত হইলে মানুষের সাময়িক বৈরাগ্য আসে। কিন্তু সেই আধিব্যাধি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেই পুনরায় পূর্বমোহ ফিরিয়া আসে। চিন্তাশীল ব্যক্তি অথবা ঐহাদের এই জগতের অনিত্যতা সন্মুখে একটু বোধ জাগিয়াছে, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন—মানুষের এইপ্রকার মোহের কারণ কি? মানুষ স্বকৃত কর্মফলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মহাভাজন লাভ করিয়াও ভগবৎ-বিমুখতার ফলে স্বরূপ-বিস্মৃত হওয়ায় নিজের যাহা প্রকৃত প্রয়োজন তাহা বর্জন পূর্বক অল্প অপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাপ্তির জন্ত দ্বাধিত হইতেছে। ফলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া জীবের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং ভগবান্কে ভুলিয়াছে বলিয়াই তাহার এইপ্রকার স্বরূপ-ভ্রান্তি আসিয়া যাইতেছে।

জীব ভগবানের শক্ত্যাংশ। সে তটস্থ বলিয়া অন্তরঙ্গা শক্তির দিকে উন্মুখ হইয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ অনুসন্ধানে বৃত্ত হইতে পারে। আবার যখন সে স্বীয় স্বভাবের অপব্যবহার করিয়া শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃত-স্বরূপ পাদপদ্মের স্পর্শীতল ছায়া হইতে স্থলিতপদ হইয়া অঘটনঘটন-পটীয়নী পরম দুস্তরা ত্রিগুণাভ্যাস দৈবীমায়ার করালকবলে নিপতিত হয়, তখন সে তাহার নিত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপাতঃ রমণীয় পার্থিবসুখ-নিমিত্ত বৃত্ত করিয়া থাকে। এই বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব জীবের প্রতি অত্যন্ত অধিক এবং তাহার জীবকে মোহিত করিবার ক্ষমতা অতিশয় প্রবল। সে আপাতমুখর বিষয়সমূহের দ্বারা জীবকে এক্রূপভাবে ভুলাইয়া রাখে যে, সে তাহার প্রভাব পরিহার করিতে না পারিয়া এই জগৎকে ভোগ করিয়া সুখ লাভ করিতে চায়। জীব সচ্চিদানন্দ ভগবানের অণু অংশ বলিয়া সুখই তা' তার প্রয়োজন। কিন্তু যে সুখের জন্ত সে লাগান্নিত হইতেছে তাহা অনিত্য এবং তাহার পরিণাম আদৌ কল্যাণকর নহে, এই তত্ত্ব সে মায়ার প্রভাবেই বিস্মৃত হয়।

এই মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—“মামেব যে প্রপণ্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।” তাহা হইলে শ্রীভগবানের শরণাগত হইলে মায়ার কবল হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে স্বরূপেব স্থিতি হইবে। তখন জীব নিজের প্রকৃত প্রয়োজন কি তাহা বুঝিতে পারিবে এবং সেই

প্রয়োজন প্রাপ্তির নিমিত্ত সচেষ্ট হইবে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়া যায়, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণকৃপায় পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন। উপজিয়া বাড়ে লতা ‘ব্রহ্মাণ্ড’ ভেদি যায়। ‘বিরজা’ ‘ব্রহ্মলোক’ ভেদি’ পরব্যোম পায়॥ তবে যায় তত্‌পরি ‘গোলোক-বৃন্দাবন’। ‘কৃষ্ণচরণ’ কল্পরূপে করে আরোহণ॥” জীবসকল আপন আপন কৰ্ম্মমুত্রে নানাজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। এই কৰ্ম্মপ্রবাহের মধ্যে কোন না কোন সময়ে ভক্ত্যুগ্ৰহী স্বকৃতিপ্রদ কৰ্ম্ম করিয়া বসিতেছে। সেই ভাগ্যোদয়ে সেই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবদ্বিষয়ে রুচি লাভ করে। রুচিবিশিষ্ট হইলে সে ভগবানের সন্তোষবিধানের নিমিত্ত ভজনক্রিয়া আরম্ভ করে। ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে তাহার ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ প্রকৃত ভক্তিপদবাচ্য হয়। দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত ভক্ত্যঙ্গ যাজনের ফলে সেই ভক্তি ক্রমশঃ রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। এই প্রেমই তাহার প্রকৃত প্রয়োজন। তখন তাহার এমন অবস্থা হয় যে, তাহার নিকট যোগিগণ-কাম্য পরমপদ কৈবল্য নরকতুলা, সকাম কাম্যগণের স্বপ্ননিষ্ঠার ফল-স্বরূপ স্বর্গ মিথ্যা অকিঞ্চিংকর আকাশ-কুসুমের তায় এবং যথেষ্টাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়গণের হৃদমনীষ ইন্দ্রিয়গণ উৎপাতিতদন্ত কালসর্পসদৃশ মনে হয়; সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণানন্দময়, ব্রহ্মাইহ্ম-পদাদি কীট-সদৃশ তুচ্ছ মনে হয়। তখনই জীব বাঁচিয়া থাকিতে চায় কেবলমাত্র ভগবানের সন্তোষ বিধান করিয়া নিত্যনবনবায়মান আনন্দ লাভ করিতে। তখন সে ‘শেষাঃ স্থিরতঃ মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।’ এই শ্লেষোক্তির পাত্র হয় না। সর্বপ্রকার মোহ তাহার দূরীভূত হয়।



শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে উর্জ্জবত, দামোদরব্রত বা নিয়মসেবা-পালন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যমিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোত্তানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ ও ভারত-ব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের অধ্যক্ষ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগু গৌড়ামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্রে এই বৎসর শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে গত ১৭ই আশ্বিন (১৩৮৩), ইং ৪ঠা অক্টোবর (১৯৭৬) সোমবার শ্রী একাদশী তিথি হইতে ১৬ই কার্তিক, ২রা নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত শ্রীকার্তিকব্রত, উর্জ্জবত, দামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা নিয়মিতভাবে প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধবিকা-গিরিধারী-জিউর সময়োচিত সেবাপূজা ভোগরাগ আরাট্রিকাদি, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাди, শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা-জিউর শ্রীমু্তি দর্শন, বিভিন্ন দিনে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সমভিযাহারে শ্রীক্ষেত্রের বিভিন্ন মঠ মন্দির সরোবর সমুদ্রাদি তীর্থ দর্শন, পরিক্রমণ ও তত্ত্বতীর্থের মহিমা বর্ণন, বাসযোগে শ্রীসাক্ষী-গোপাল ও শ্রীভুবনেশ্বরাদি তীর্থক্ষেত্রে দর্শন এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট বিশিষ্ট পর্ক দিনে মহোৎসবাদি সম্পাদন-মুখে নিব্বিয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অগ্গত বৎসরের ছায় এবংরও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পাদদেশে শ্রীগোপবন্ধু প্রতিমুত্তির সান্নিধ্যে পূজাপাদ শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের নির্দেশানুসারে বিরাট সভাসমুপ নিশ্চিত হয়। তথায় ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর রবিবার হইতে প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠকীর্ত্তন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতাди হইতে থাকে। তন্মধ্যে ২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর বুধবার হইতে ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীপুরীধামে শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দিবসপঞ্চক-ব্যাপী বিরাট ধর্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। কিন্তু প্রথম দিবসত্রয় (১৩।১০ হইতে ১৫।১০) উক্ত সভাসমুপে এধং শেষ দিবসদ্বয় (১৬।১০ ও ১৭।১০) নিরন্তর

বারিবর্ষণ-হেতু শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী বাগারিয়া ধর্ম-শালাতেই সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূজাপাদ আচার্য্যদেব শেঠ তুলারাম সুজনমল বাগারিয়া ধর্মশালার (১৯৬১ সালে স্থাপিত) কর্তৃপক্ষের নিকট উপর তাল ও নীচের তালার ২০।২৫ খানি কামরা চাহিয়া লইয়া তথায় প্রায় দেড়শত পুরুষ ও মহিলা ভক্তের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ত্যাগী ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল আচার্য্যদেবেরও তথায় থাকিবার পৃথক ব্যবস্থা হইয়াছিল। ধর্মশালার কর্তৃক্ষ বিশেষ সজ্জন, তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারি-গণের ব্যবহারও সৌজন্যপূর্ণ। এই ধর্মশালাটি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের খুব নিকটে অবস্থিত বলিয়া আমাদের সকলেরই প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দর্শনের খুবই সুযোগ সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল।

আমরা গত ১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর রবিবার শুভবিজয়া দশমী দিবসে অপরাহ্ন ৩-৪৫ মিঃ এ পূজাপাদ আচার্য্যদেবের সহিত রিজার্ভ বাসযোগে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধবিকা-গিরিধারী-জগন্নাথদেবের জয়গান করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শুভযাত্রা করি। প্রথমে আমরা ছিলাম ৩৯ মুর্ত্তি, ক্রমশঃ চতুর্দিক হইতে ভক্তবৃন্দ যোগদান করায় সংখ্যা শতাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

একাদশী দিবস সকাল প্রায় ৬টার আমরা শ্রীপুরী ষ্টেশনে পৌছাই। তথা হইতে প্রাইভেট মোটর ও রিজার্ভ বাস যোগে বাগারিয়া-ধর্মশালার যাওয়া হয়। এইদিবস হইতেই নিয়মসেবা আরম্ভ। অপরাহ্নে ধর্ম-শালাতেই পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। পূজাপাদ আচার্য্য-দেব 'ভজন-রংগ' গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে নিমিনবযোগেন্দ্রসংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। পূর্কালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলার প্রথম অধ্যায় লইতে পাঠের ভার দেওয়া হইয়াছিল শ্রীমদ্

ভক্তিশ্রমোদ পুরী মহাবাজের উপর। প্রভাতে মঙ্গলারাত্রি-
কের পূর্বে গুরুপরম্পরা, গুরুষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতন্ত্র,
শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
পত্ন্যাহ্বাদ এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-
কৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের ১ম যামসেবার কৃষ্ণভঙ্গ-
লীলার ১ম শ্লোক ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
পত্ন্যাহ্বাদ ও মহামন্ত্র কীর্তিত হইলে মঙ্গলারাত্রিক
আরম্ভ হয়। অষ্টধামেই শিক্ষাষ্টকের ও শ্রীগোবিন্দলীনা-
মৃতের সাহাবাদ অষ্টশ্লোক কীর্তন করা হয়। পরবর্ত্তী
বৈঠকে পূর্বাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ্যরম্ভের পূর্বে
শ্রীদামোদরাষ্টক ও ২য় যাম সেবার কীর্তন হয়, পরে
৩য় যামসেবার কীর্তন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ভোগারতি
কীর্তন হইয়া থাকে। অপরাহ্নে শ্রীগীতা পাঠ বা
বক্তৃতার পূর্বে ৪র্থ যামসেবার কীর্তন এবং পাঠ বা
বক্তৃতার অন্তে ৫ম যামসেবার কীর্তন হয়। সন্ধ্যায়
আরাট্রিক কীর্তনের পর ৪র্থ বৈঠকে শ্রীভাগবতপাঠা-
রম্ভের পূর্বে ৬ষ্ঠ যামসেবার এবং পাঠের পর ৭ম ও ৮ম
যামসেবার কীর্তন করা হইয়াছে। পূজাপাদ আচার্যা-
দেব প্রভাতে মঙ্গলারাত্রির পূর্বে ও সন্ধ্যায় শ্রীভাগবতা-
রম্ভের পূর্বে প্রায়ই ভজন-রহস্য আলোচনা করিয়াছেন।
পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের ভক্ত থাকায় পূজাপাদ
ত্রিদিগ্‌মুখী শ্রীপাদ হরীকেশ মহারাজকে পূর্বাহ্নে,
অপরাহ্নে অথবা রাত্রে প্রয়োজনানুসারে হিন্দী ভাষায়
বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ
মহারাজকে মধ্যে মধ্যে এবং শ্রীল আচার্যাদেবকে প্রায়
প্রত্যহ্নই হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা বা বক্তৃতা দিতে হইয়াছে।

১৮ই আশ্বিন (১৯০৭) দ্বাদশীদিবস পূঃ আচার্যা-
দেব সংকীর্তনগোষ্ঠিসহ আমাদিগকে লইয়া শ্রীল শুভ-
পাদের আবির্ভাবপীঠে যান, তথায় কিছুক্ষণ কীর্তনান্তে
প্রণতিজ্ঞাপন পূর্বক ধর্মশালায় ফিরিয়া আসা হয়।

২২শে আশ্বিন (১৯০৭) শনিবার সকালে আমরা
সংকীর্তনশোভাযাত্রাসহ শ্রীধামপরিক্রমায় বাহির হই।
আমরা সর্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দগান্ধার্বিকাগিরিধারী এবং
পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবকে বন্দনা করিয়া প্রথমে শ্রীল
প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থলীতে যাই, তথা হইতে

ক্রমশঃ অরুণভাস্কর পশ্চাৎ হইতে শ্রী'পতিতপাবন'
জগন্নাথদেবকে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্বক 'স্বৈতগঙ্গা' তীর্থে
যাই ও তীর্থজল মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীমৎ মাধব,
শ্রীবিষ্ণুমাধব তথা শ্রীশিবা দিব্য দেবতা দর্শনান্তে শ্রীসার্ব-
ভৌমভবনে বা শ্রীগঙ্গামাতা মঠে গমন করি, তথায়
শ্রীমন্দিরে শ্রীরাধারসিকরায়, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধা-
বিনোদ, শ্রীরাধা-রাধামোহন, শ্রীমহাশ্যাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন
করি। এখানে পূজাপাদ আচার্যাদেব হিন্দীভাষায়
শ্রীমহাশ্যাম ও শ্রীসার্বভৌমমিলন-সংবাদ কীর্তন করেন।
এস্থান হইতে আমরা শ্রীরাধাকান্তমঠে যাই। গভীর
সন্ধ্যাে কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-রাধাকান্ত-
জিউর অপূর্ব শৃঙ্গারদর্শনান্তে শ্রীসিদ্ধবকুলে যাই, তথায়
নামাচার্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের ভজনকুটী, ঠাকুরের
শ্রীমূর্তি, শ্রীসিংহদেব, শ্রীষড়ভুজ মহাপ্রভু এবং অপূর্ব
সিদ্ধবকুল বৃক্ষরাজ দর্শনপূর্বক ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন
করি।

২৩শে আশ্বিন রবিবার সকাল প্রায় ৩। ঘটিকায়
আমরা শতাব্দিক ভক্ত সমভিব্যাহারে সঙ্কীর্তনমণ্ডলিসহ
প্রথমে স্বর্গদ্বারে যাই। তথায় সমুদ্রজল স্পর্শন ও
প্রণতিজ্ঞাপনান্তে আমরা ঐ সমুদ্রতটস্থিত মন্দিরদ্বয়ে
শ্রীশেষশায়ী ও শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা জিউর
শ্রীমূর্তিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাচীন
ভজনকুটীতে প্রণতিজ্ঞাপন করি। তৎপর শ্রীপুরুষোত্তম
গোড়ীয় মঠ মন্দির, নামাচার্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের
সমাধি মন্দির, শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠ, শ্রীল সিদ্ধান্তী
মহারাজের মঠ, শ্রীল গোবিন্দী মহারাজের শ্রীগোর-
গোবিন্দ আশ্রম, শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের শ্রীচৈতন্য
আশ্রম, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীটোটা গোপীনাথ মন্দির
ও শ্রীযমেশ্বর মহাদেব দর্শনান্তে আমরা ধর্মশালায়
প্রত্যাবর্তন করি।

অত্র বৈকাল হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-পাদদেশস্থ
নবনির্মিত সভামণ্ডপে পাঠ, কীর্তন ও বক্তৃতাতির ব্যবস্থা
হয়।

২৪শে আশ্বিন সোমবার প্রাতে পরিক্রমায় বাহির
হইয়া আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দোলমঞ্চ দর্শনপূর্বক

মার্কণ্ডেয় সরোবরে যাই। তথায় প্রথমে শ্রীপাদশ্রী মঠের পক্ষ হইতে পরিচালিত সেবা শ্রীজগন্নাথ শ্রীবলরাম ও শ্রীমুভদ্রা জিউকে দর্শন ও প্রণামান্তে শ্রীমার্কণ্ডেয় সরোবরের জল স্পর্শ করি, অনেকে স্নানও করেন। শ্রীল হুবীকেশ মহারাজ এস্থানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। অতঃপর শ্রীমার্কণ্ডেয়শ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজনাদি করি। তদনন্তর শ্রীদুর্গাদেবীর মন্দিরে দুর্গা দেবী দর্শন ও তৎসমীপে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা-মূলে তাঁহাকে প্রণতি জ্ঞাপন করি। অতঃপর নির্গমন পথের বামপার্শ্বস্থ প্রাচীন জীর্ণ প্রকোষ্ঠে বারাহী প্রভৃতি শক্তিমূর্তি দর্শন করি। এখান হইতে আমরা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়া যাইতে যাইতে পশ্চিমধ্যে শ্রীকপাল-মোচন শিবদ্বারে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক কিছু দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীপরমানন্দ পুরী গোবিন্দমীর কূপ দর্শন করি। এই কূপে সাংক্ষ্য গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এক ভক্তিমতী কথা এই কূপটির সংস্কার বিধান করিয়াছিলেন। এখনও কূপাভ্যন্তরে কূপগাত্রে একটি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উহাতে কূপ সংস্কারীর নাম ও তারিখাদি খোদিত আছে। এই কূপ জল আমরা সকলেই মস্তকে ধারণ ও পান করি। এস্থান হইতে আমরা শ্রীলোকনাথ শিব মন্দিরে গমন করি। প্রথমে শ্রীপার্বতী কুণ্ডোদকে আচমন করতঃ সেই কুণ্ডোদক মস্তকে ধারণ করিয়া পরে শ্রীলোকনাথ দর্শন করি। লোকনাথের প্রতিনিধি লিঙ্গই দর্শন করিতে হয়। মূল লিঙ্গ সন্ধ্যাসর জল-মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন বলিয়া কথিত হয়। বৎসরে একদিন-মাত্র—শ্রীশিবচতুর্দশী দিবস নাকি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীলোকনাথ, শ্রীযমেশ্বর, শ্রীমার্কণ্ডেয়শ্বর, শ্রীকপাল-মোচন ও শ্রীনীলকণ্ঠদেব—এই পঞ্চ শিব শ্রীজগন্নাথ দেবের পঞ্চ প্রতিনিধিস্বরূপ। ইহাদিগকে আবার শ্রীজগন্নাথদেবের দেওয়ান বলে। ইহাদিগকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ চন্দনযাত্রাকালে নরেন্দ্রসরোবরে জল-বিহার করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীলোকনাথ দর্শন পূজন ও প্রণামাদি করিয়া শ্রীপার্বতীদেবী দর্শন করি। উভয়কেই আমরা পরমবৈষ্ণব ও পরমাবৈষ্ণবী বিচারে তাঁহাদের

নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করি। শ্রীপাদ হুবীকেশ মহারাজ শ্রীলোকনাথ মহিমা কীর্তন করেন। আমরা শ্রীলোকনাথ মন্দির হইতে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীকপাল-মোচন মহাদেব দর্শন ও পূজা করিয়া আসি। তথায় মণিকর্ণিকা জল স্পর্শ ও পার্বতী দেবীকে প্রণতি জ্ঞাপন-পূর্বক আমরা ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করি।

২৫শে আশ্বিন মঙ্গলবার সকালে আমরা পূজনীয় আচার্য্যদেবের আত্মগত্যে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠকে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক নরেন্দ্র সরোবরে যাই, তথায় অনেকেই স্নানাদি সম্পাদন করেন। আমরা মস্তকে জল ধারণ ও আচমন পূজা বন্দনাদি করিয়া আঠারনালাহ শ্রীমন্ন্যপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে গমন করি। তথায় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সর্বাগ্রে শ্রীপাদপীঠাঙ্কার বোড়শোপচারে পূজা বিধানপূর্বক ফলমূল-মিষ্টান্নাদি ভোগরাগ নিবেদন করিলে শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীপাদপীঠাঙ্কার পূজা বিধানপূর্বক পুষ্পাজলি অর্পণ করেন। তৎপর শ্রীপাদ হুবীকেশ মহারাজ, শ্রীঠাকুরদাস প্রভু, শ্রীপার্বীমোহন প্রভু ও শ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ শিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দ ক্রমশঃ উক্ত শ্রীপাদপীঠে পুষ্পাজলি সমর্পণ করেন। শ্রীপাদপীঠ-মন্দির সংলগ্ন জমিতে দুইটি নারিকেল গাছ আছে, তাহা হইতে প্রচুর নারিকেল পাড়ান হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি শ্রীপাদপীঠে ভোগ লাগাইয়া অবশিষ্ট ধর্মশালায় লইয়া আসা হয়। ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তনকালে আমরা শ্রীরায়রামানন্দ ভবন ও তাঁহার শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান দর্শন করিয়া আসি। প্রথমে শ্রীমন্দির দর্শন করি। মন্দিরের প্রথম প্রকোষ্ঠে দর্শন করি—চতুর্ভুজ শ্রীগোপীনাথ মূর্তি (দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ এবং নিম্ন দুই হস্তে বংশী) বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতাদেবী; পরবর্তী প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্ন্যপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ, তৎপরবর্তী প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব, শ্রীমুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ দেব—এই প্রকোষ্ঠ-সম্মুখে বাহিরে শ্রীগুরুজী বিরাজিত। আমার ইহা-দিগকে দর্শন ও প্রণামান্তে উদ্যানাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীহনুমান্জীকে দর্শন ও প্রণাম করি। অতঃপর তথা হইতে সকলে ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করি।

২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার সকালে আমাদের পরিক্রমা বাহির হয়। আমরা প্রথমে ইন্দ্রদ্বায় সরোবরে যাই। অনেকে তথায় স্নান করেন। আমরা আচমনাদি করিয়া শ্রীরাধাগোপীনাথ, শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী, মহারাজ ইন্দ্রদ্বায় ও মহারাজী গুণ্ডিচা দেবী, দশহস্ত শ্রীহনুমান্জী, শ্রীবদরীনারায়ণজী প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেব দর্শন করিতে যাই, কিন্তু মন্দিরের দ্বার বন্ধ, পূজারী তখনও আসেন নাই, আমরা বাহির হইতে প্রণতিজ্ঞাপন করতঃ শ্রীনৃসিংহমন্দিরে যাই, ভক্তবৎসল শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ মূর্তি দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির বার চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করি। অতঃপর শ্রীগুরুড় পশ্চাতে পুনরায় প্রণতিজ্ঞাপন পূর্বক আমরা গুণ্ডিচা মন্দিরে যাই। এখানে গেটে যাত্রীপিছু ১০ পয়সা করিয়া ভেট দিয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হয়। সন্ন্যাসীদের অবশ্য ভেট লওয়া হয় না। আমরা গর্ভমন্দিরে গিয়া রত্ন-বেদী দর্শন করি, ভোগরন্ধনের উনানসমূহও দর্শন করিলাম, শুনিলাম এক একটি উলুনে উপযুপরি পাঁচটি হাঁড়ি বসে। যাহা হউক আমরা গুণ্ডিচামন্দির বার চতুষ্টয় পরিক্রমা করিয়া পূর্ববৎ সংকীর্তন-সহযোগে ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করি। শ্রীপাদ হরীকেশ মহারাজ ইন্দ্রদ্বায়সরোবরতটে ও গুণ্ডিচামন্দিরে তত্ত্বতীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

২৮শে আশ্বিন আমরা চক্রতীর্থ পরিক্রমা করি। প্রথমে আমরা বেরি হনুমান্ মন্দিরে যাই; এই শ্রীরামদাস-বর বজ্রাঙ্গলী মহাবীরজী সমুদ্রের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে আছেন ‘কাণপাতা’ হনুমান্, তিনি সমুদ্রের গর্জন প্রভু জগন্নাথের বিশ্রাম-স্থল ভঙ্গ না করে, এজন্ত সমুদ্রকে সতর্ক করিয়া কাণ-পাতিয়া আছেন। শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীহনুমান্জীকে প্রণাম করিয়া আমরা শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরে যাই। তথায় মধ্যস্থলে শ্রীচক্রনৃসিংহ, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীঅনন্তনৃসিংহ এবং বাম পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ বিরাজিত আছেন। আমরা শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক তথা হইতে তন্নিকটস্থ চক্রতীর্থে চক্রমন্দিরে যাই। এই চক্রসান্নিধ্যে একটি স্বয়ং পরিসর

সুমিষ্ট উদকপূর্ণ হ্রদ ছিল। আমরা প্রতিবারেই সেই জলে আচমন করিতাম ও সেই জল মস্তকে ধারণ করিতাম। কিন্তু এবার দেখিলাম তাহা শুষ্ক। বালু খুঁড়িয়া একটু জল পাওয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহাই আমরা মস্তকে ধারণ করিলাম। পার্শ্বেই সমুদ্র, আমরা অনেকেই এখানে সমুদ্র স্নান করিলাম। কর্ণবিবরে অনেক বালু ঢুকিয়া গেল। শ্রীহনুমান্ মন্দিরে শ্রীপাদ হরীকেশ মহারাজ শ্রীবেরি হনুমান্, শ্রীলক্ষ্মী মন্দির ও শ্রীচক্রতীর্থ মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। আমরা চক্রতীর্থ হইতে ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করি।

এইরূপে আমাদের শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান দর্শনীয় তীর্থস্থান-সমূহ কীর্তন-মুখে পরিক্রমা হইয়া গেলে আমরা ১লা কার্তিক (১৮।১০।৭৬) শ্রীসাক্ষি-গোপাল ও শ্রীভুবনেশ্বর দর্শনার্থ গমন করি। ২২ জন যাত্রীর জন্ত দুইখানি বাস রিজার্ভ করা হয়। সকাল ৭। টায় বাস ছাড়ে। কিন্তু অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। আমরা ভিজিতে ভিজিতেই শ্রীসাক্ষিগোপাল দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া ভুবনেশ্বর যাত্রা করি। ভুবনেশ্বরে পৌছিয়া বিন্দুসরোবরে কেহ কেহ স্নান, কেহ কেহ বা তীর্থজল মস্তকে ধারণপূর্বক আচমনাদি করিয়া শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনেচ্ছু হইলে জানা গেল ভোগ উঠিয়াছে, একটু পরে দর্শন মিলিবে। আমরা তখন অগ্রে শ্রীভুবনেশ্বর মন্দিরে যাই। তথায় সর্বাগ্রে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করি। ভুবনেশ্বর হরিহর মূর্তি, এক পার্শ্বে তুলসী-দল, অপর পার্শ্বে বিষ্ণুদল দিয়া পূজা হয়। শ্রীশিব এবং শ্রীগুরু শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম বলিয়া তাঁহাদিগকে ভগবদাভিন্ন কলেবর বলা হয়। আমরা দর্শন, পূজন ও স্তবাদি করিয়া শ্রীগোপালিনী শক্তি, শ্রীদামোদর, শ্রীগণেশ প্রভৃতি দেবমূর্তি দর্শন করিয়া শ্রীঅনন্তবাসুদেব মন্দিরে যাই। শ্রীজগন্নাথ বলদেব সুভদ্রাই শ্রীবাসুদেব অনন্তদেব ও লক্ষ্মীরূপে বিরাজিত। এখানেও শ্রীসুদর্শন আছেন। নাটমন্দিরে শ্রীগুরুড় স্তম্ভ আছেন। আমরা দর্শন, প্রণাম ও শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণাদি করিয়া প্রায় ১২। টায় বাসে উঠি। পুরীতে পৌছিতে ২টা ও

প্রসাদ পাইতে ওটা বাজিয়া যায়। অল্প রুপিতে ভিজিতে ভিজিতে দর্শনাদি করিতে হইয়াছে।

পরমপূজনীয় শ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় শ্রীপুরুষোত্তম ধামের প্রায় সকল প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থানই ভালভাবে দর্শন হইয়াছে। শ্রীসাক্ষীগোপাল ও শ্রীভুবনেশ্বরও সকলেই বিভিন্ন সময়ে দর্শন করিয়া লইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দির বাগাড়িয়া ধর্মশালায় নিকটেই অবস্থিত থাকায় শ্রীদামোদরব্রতপালনকারিভক্তবৃন্দ প্রায় প্রত্যহই কমলনয়ন শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। সমুখামৃত-দ্রবসংযুক্ত ভগবৎকথামৃতপানের সৌভাগ্য লাভই সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া জানিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডাঠাকুর শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া প্রত্যহই আমাদেরকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানজল পাওয়াইহেন।

১৯শে আশ্বিন (৬:১০:১৭৬)—রাজমহেন্দ্রী, ওয়াশিংটনের ও বহরমপুর (গঙ্গাম) হইতে শ্রীপাদ আনন্দ পণ্ডা (শ্রীপাদ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ দাসাধিকারী), শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী (সন্ধ্যাস নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ) ও আরও ২১ জন ভক্ত পূজ্য-পাদ আচার্যদেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা স্বর্গদ্বারস্থ শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠে আগামী ২১শে আশ্বিন, ইং ৮১০:১৭৬ শুক্রবার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীল আচার্যদেব ও আমাদের সহিত দেখা করিয়া তাঁহারা স্বর্গদ্বারে চলিয়া যান।

২০শে আশ্বিন (৭:১০:১৭৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈদান্ত ষামন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈদান্ত নারায়ণ মহারাজ সপরিবার শ্রীল আচার্যদেবকে আগামীকল্য তাঁহাদের শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া যান। সগীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈদান্ত শ্রোতী মহারাজ ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অধিবাস কৃত্যাদি সম্পাদন করেন। অল্প রাত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ তাঁহার সুদর্শন-

চক্র লইয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। আমরা অনেকেই চক্র দর্শন ও স্পর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি কৃপাপূর্বক আমাদের কুদর্শন ঘুটাইয়া সুদর্শন দান করেন।

২১শে আশ্বিন (৮:১০:১৭৬)—অল্প স্বর্গদ্বারস্থ শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈদান্ত শ্রোতী-মহারাজের পৌরোহিত্যে পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গরাধা-বিনোদবিহারীজিউর প্রতিষ্ঠাকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে আমরা কথায় নিমন্ত্রিত হইয়া প্রসাদ পাই। অপরাহ্ন ৬ঘটিকায় সমুদ্রতটস্থ মঠপ্রাঙ্গনে শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে পদ্বী শ্রীরথ বলেন, পরে শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ স্বরীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ ভাষণ দিয়া বাগাড়িয়া ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করেন। অল্প সকালে কলিকাতা হইতে দাক্ষিণাত্য-তীর্থযাত্রী ৬১ মুক্তি আসিয়া পৌঁছান।

২২শে আশ্বিন (৯:১০:১৭৬) সভামণ্ডপ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ২৩শে আশ্বিন ১০:১০:১৭৬ রবিবার হইতে তথায় পাঠ কীর্তন বক্তৃতাদি চলিতে থাকে। ২৪শে আশ্বিন ১১:১০:১৭৬ সোমবার পদ্বী শ্রীসদাশিব রথ মহোদয় উৎকল ভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীতুলসী আরতি কীর্তন অল্প প্যাণ্ডেলেই হয়। ২৫শে আশ্বিন ইং ১২:১০:১৭৬ রাত্রে কটকের শ্রীরঘুনাথ মিশ্র মহোদয় উৎকল ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন। বক্তৃতাতির শেষে শ্রীতুলসী আরতি কীর্তন প্যাণ্ডেলেই হয়।

শ্রীপুরীধামে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ২৬শে আশ্বিন, ১৩৮৩; ইং ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭৬ বুধবার হইতে ৩০শে আশ্বিন ১৭:১০:১৭৬ রবিবার পর্যন্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টিকায় যে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার প্রথম তিনটি অধিবেশন শ্রীজগন্নাথমন্দির-সিংহদ্বারের সন্নিকটস্থ সভামণ্ডপেই অনুষ্ঠিত হয়, শেষ দুইটি অধিবেশন বর্ষার জল সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই, বাগাড়িয়া

ধর্মশালাতেই সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা ঐ সভাপঞ্চক সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়ের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশকৃত স্বহস্তলিখিত বিবরণ নিয়ে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিলাম:—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী ঙ্গ ১০৮শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অধ্যক্ষতায় পুরীধাম গ্রাণ্ড বোডস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ১৩ই অক্টোবর বুধবার হইতে ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সন্নিকটে ও শ্রীগোপবন্ধু প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সভ্যমণ্ডপে এবং রুষ্টির জগৎ ১৬ই ও ১৭ই অক্টোবর বাগাড়িয়া ধর্মশালায় প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বিশেষ ধর্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। ধর্মসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ওড়িয়া রাজ্য সরকারের আইন-মন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ বিসোয়ায়াল, ওড়িয়া রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও নগর-উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ রথ, বাকি কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়, শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিত ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিমোদ পুরী মহারাজ এবং পুরীর জেলাধীশ শ্রীঅমূল্য রতন নন্দ। পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথ এবং পুরীধাম প্যাটনামা এডভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র ধর্মসভার প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে যথাক্রমে প্রধান অতিথিরূপে বৃত্ত হন। ধর্মসম্মেলনে অভিভাবন প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ঙ্গ শ্রীমদ্বক্ত্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ, পূজ্যপাদ পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিবৃন্দেব শ্রোতী মহারাজ, পূজ্যপাদ পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তি-বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিমন্দের নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিচারক ভক্তিশাস্ত্রী, কটকের

প্রাক্তন এম-এল-এ পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র এবং অধ্যাপক শ্রীমদ জগদীশ পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীমদ্বিক্রপদ পাণ্ডা বি-এ, বি-টি কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে—‘শ্রীজগন্নাথতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু’, ‘বিশ্বশান্তির উপায়’, ‘শ্রীগীতার শিক্ষার সারমর্ম’, ‘শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে পার্থক্য’, ‘কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন’। বিভিন্ন দিবসীয় ভাষণ সাধারণতঃ উৎকল, হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

ধারাক্রিষ্ট মনুষ্যগণ গুরুতর শস্ত্রহানির আশঙ্কায় পুনঃ পুনঃ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নিকট আগমন করতঃ আবেদন জানাইতে থাকিলে তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক বলেন—“করুণায় শ্রীজগন্নাথদেব যখন ষ্ঠরূপ বিধান করেন, তাহা হিতকর বৃত্তিতে পারিলে ক্ষোভের কারণ থাকিবে না। আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকায়, বর্ত্তমানে যাহা সংঘটিত হইতেছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য বিধানে অসমর্থ হইয়া আমরা দুঃখী হই।”

আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমা করিতে থাকিলে বর্ষণ আরম্ভ হয়। মন্দির অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকটিত হয়।

২৯শে আশ্বিন, ইং ১৬১০৭৬ শনিবার শ্রীবল্লাষ্টমী শুভবাসরে আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির অভ্যন্তরে মৃদঙ্গ-মন্দিরাদিসহ নৃত্যকীর্ত্তন করিবার অনুমতি পাই। আমাদের পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া মহাশয় আমাদের সঙ্গে লইয়া চলেন। মন্দিরে রওনা হইবার প্রাক্কালেই শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ব ভক্তিবেন্দ্যন্ত নারায়ণ মহারাজ তাঁহাদের মঠের বহু সেবকসহ ধর্মশালায় আসিয়া আমাদের সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করেন। সুরতাং বহু ভক্ত সমাগমে সকলের সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনিসহ শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁস-মৃদঙ্গ-মন্দিরাদিধ্বনি আজ শ্রীধামের ও শ্রীমন্দিরের গগন-পবন মুখরিত করিয়া

তুলিয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে নাট্যমন্দিরে গুরুভৃত্তের পুরোভাগে মৃদঙ্গমন্দিরাধ্বনিসহ সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্চ কীর্তনধ্বনিতে শ্রীনাট্যমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমন্দিরের চক্রবেড়ও কীর্তনমুখে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। সকলেই শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজিউর শ্রীবিগ্রহ প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়াছেন। আমাদের সঙ্কীৰ্তন-সজ্জা শ্রীমন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বারিবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। বহুদিন পরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। আমরা ভিজিতে ভিজিতে পরিক্রমা করিলাম। অচ্য বৃষ্টির জল প্যাঙেলে সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। এজন্ত বাগাড়িয়া ধর্মশালাতেই সভার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠের সেবকগণ আমাদের সহিত ধর্মশালায় আসেন এবং কীর্তন বিশ্রাম করাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিস্কুড়ি প্রসাদ সন্মান করতঃ স্বর্গদ্বারস্থ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত মঠসেবক স্বকণ্ঠগায়ক শ্রীমান্ মুকুন্দ দাস শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরে 'রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে' এই গীতিটি কীর্তন করিয়া বৈষ্ণবগণকে প্রচুর সুখদান করেন।

৩০শে আশ্বিন, ১৭১০।১৭ ববিবার দিবসও বৃষ্টির জল প্যাঙেলে সভা হইতে পারে নাই, পূর্ষদিবসেয় ত্রায় বাগাড়িয়া ধর্মশালায় সভার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। দিবসপঞ্চকব্যাপী বার্ষিক সভা অচ্য হইয়াই সমাপ্ত হয়।

৩১শে কার্তিক, ২০।১০।১৬ বুধবার দক্ষিণদেশীয় তীর্থ পরিক্রমার যাত্রী ৬৮ জন (তন্মধ্যে মঠসেবক

১৪ মূর্তি) সকালে দ্বাদশীর পারণ করিয়া রিজার্ভ Tourist Coachএ শ্রীপুরীধাম হইতে দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। পরম পূজাপাদ শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার কৃতী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের উপর তাঁহাদের পর্যাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। অচ্য আকাশ পরিস্কার, সকাল হইতে আর বৃষ্টি হয় নাই দেখিয়া অপরাহ্ন হইতে শ্রীমন্দিরপাদদেশস্থ সভামণ্ডপেই পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ৪ঠা কার্তিক সভাধিবেশনের পর শ্রীতুলসী পরিক্রমণান্তে এখানকার Pandelএর Function সমাপ্ত করিয়া দিয়া Pandel ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ধর্মশালাতেই পূর্ববৎ পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতাদি সকল অনুষ্ঠান হইতে থাকে।

৫ই কার্তিক ২২।১০।১৩ শুক্রবার—অচ্য সিংহদ্বার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বহুংসব দেখিলাম। পাটকাঠি গুচ্ছে (কতকগুলি পাটকাঠি গোছা করিয়া বাঁধা হয়, তাহাকে আমাদের দেশে 'কাঁড়ু' বলে) অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহাকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চক্রের দিকে তুলিয়া ধরিয়া ঐসকল জলন্ত কাঠিকাগুচ্ছ একস্থানে স্তৃপীকৃত করা হয়। দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে, অতি স্নন্দর দৃশ্য। অতঃপর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখা গেল বাইশ পহাচের ছই পাশ্বে এবং মন্দির প্রাঙ্গণে সর্বত্র পার্বণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক অনেক রাত্র পর্যন্ত এই শ্রাদ্ধকৃত্য করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

মেদিনীপুর জেলাভূগত কাঁথি শ্রীভাগবতমঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদভক্তিবিচার যথাবার মহারাজের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিআচার বৈষ্ণব মহারাজ তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে উক্ত মঠের শাখা শ্রীধামমায়াপুর দৈশোত্থানস্থ শ্রীভাগবত মঠে বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ ইং ১৪।১২।১৬ মঙ্গলবার সকাল ৮ ঘটিকায় প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নিরন্তর শ্রীহরিনাম পরায়ণ ও বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তৎপর দিবস তাঁহার বিরহ উৎসবে শ্রীধাম-বাণী বৈষ্ণববৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। আমরা তাঁহার বিরহে ব্যথিত হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে করিতে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ও শ্রীধামে সমাধিলাভ জনিত সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছি।

প্রাচৈতন্য-বর্ণা

“চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিছাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বস্বাস্তপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

১৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮৩। { ১২শ সংখ্যা
২৪ মাঘ, ৪৯০ শ্রীগোবিন্দ ; ১৫ মাঘ, শনিবার ; ২৯ জামুয়ারী, ১৯৭৭।

সজ্জন-মিতভুক্ত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

অধিক বা ন্যূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। সজ্জন পরিমিত ভোজন করেন। যিনি অধিক বা ন্যূন ভোজন করেন তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের ভোজন হয়। সজ্জন কখনও অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না, মায়াবাদীর ত্রায় তিনি কল্মষবৈরাগ্যের আরাহন করেন না। হঠযোগীর ত্রায় প্রসাদ গ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণ প্রসাদের মিতভোজী।

আত্মপ্রসাদ-সেবায় অমিত-ভোজন নাই। হৃদয় শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয় তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুকি বিচার করিয়া যে ভোজনাদি হয় তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবে মিতভোজন একটি বিশিষ্ট পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অত্যন্ত-আসক্ত অধিক ভোজী এবং ভোজন-বিরত বিরক্ত উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

“আধিকো ন্যূনতয়াঞ্চ চাবতে পরমার্থতঃ।” শুদ্ধ বৈরাগী— যাহাকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলে তাহার মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামী বলেন, “অত্যাহারঃ প্রয়াসচ্চ প্রজ্ঞো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গচ্চ লৌলাঞ্চ বড়্ভির্ভক্তি-বিনশতি॥”

“জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিম্রোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥” জিহ্বা বেগ ও উদর বেগ প্রত্যেক সজ্জনেরই প্রশমন কর্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি গোস্বামী হইতে পারেন না। অত্যন্ত লোভের বশবর্তী হইয়া যাহারা অধিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় যিনি প্রয়োজনীয় প্রসাদ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন, তাঁহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পশুভোজন, মৎস্য কুন্দাদি ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা যায় না। মাদক দ্রব্যাদি সেবীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোষ্ঠামিগণ অহিফেন ও ধূমপানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

ভক্তি-প্রাতিকূল্য

প্রঃ—ভক্তগণের জীবনযাত্রার বিধি কি? আধিকা ও ন্যূনতায় কি অন্ত্রবিধা হয়?

উঃ—“ভাল-ভাল ভোগ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্ত যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবন-যাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। আবার উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীরের রক্ষা হইবে না।”

— ‘অত্যাহার’, সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ—দেবতাস্তরের নিন্দা ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

উঃ—“অন্তদেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ; * * * তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন, — কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্নভিন্ন দেশে যে-সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয়, সে-সমুদয়কে সম্মান করিবেন; যেহেতু তত্তল্লিঙ্গদ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্ভাব শিক্ষা করিতে । অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, অকিঞ্চনতা-বুদ্ধি ধ্বংস হইয়া যায়, — চিত্ত আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকে না।”

— চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—বৈষ্ণব-চিহ্নধ্বক ও বৈষ্ণবাভিমানী কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যজ্য?

উঃ—“বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব-অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে,—

(১) যাহারা কেবল ধূর্ততা-পূর্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে। (২) কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্ত যাহারা বৈষ্ণব-আচার্যাদিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। (৩) অর্থ-লোভে, প্রতিষ্ঠা-লোভে বা কোনপ্রকার ভোগ-লোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।” — চৈঃ শিঃ ৩।২

প্রঃ—মায়াবাদীর সঙ্গ কি কর্তব্য?

উঃ—“মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্তব্য নয়।”

— ‘ভক্তিপ্ৰাতিকূল্যবিচার’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৪৭

প্রঃ—মায়াবাদীতে ভাব-বিকার দৃষ্ট হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে না?

উঃ—“মায়াবাদীর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়।”

— ‘মায়াবাদী কাণ্ডকে বলি?’ সঃ তোঃ ৫।১২

প্রঃ—ভক্তিবিশিষ্টধ্বগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

উঃ—“তব কই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত, পাতই নানাবিধ ফাঁদ।

সো সবু বঞ্চক, তুয়া ভক্তিবিশিষ্টধ্ব.

ঘটাওয়ে বিধম পরমাদ ॥

বৈমুখ বঞ্চনে, ভটসো সবু.

নিরমিল বিবিধ পসার।

দণ্ডবৎ ছুরতঃ, ভক্তিবিনোদ ভেল.

ভকত-চরণ করি’ সার।” শঃ

প্রঃ—বহুজন-সাধ্য ধর্ম-কার্য ভক্তি-প্রতিকূল হইলে তৎসম্বন্ধে কি কর্তব্য?

উঃ—“বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সে রূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে-কার্য্যের উত্তম করা শ্রেয়ঃ নয়; কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আশ্রম, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহৎ-ব্যাপার কার্য্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।” — চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—সাধক কি মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে পারেন?

উঃ—“মদ্য, গাঁজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত’ কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়; এই সকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তামাকের ধূমপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয়; এমত কি, তাহার জন্ত অসংসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।” — চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—উত্তম ভোজনাদি ও আসব-পানাদিতে লোভ অথবা পাপ-জনক ও পুণ্যময় বস্তুতে আসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

উঃ—“ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন ও ধূম্র-আসবাদি সেবায় যে লোভ থাকে, সেই লোভ দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। পাপ-বস্তুতেই হউক, বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর লোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্বমঙ্গলের হেতু।”

—‘লৌল্য’, সং: তোঃ ১০।১১

প্রঃ—বিষয়-লোকের মনস্তৃষ্টি-সাধনার্থ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে কি ?

উঃ—“কেবল সংসারী-লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের উদয় হইবে, তাঁহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ-চেটেতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগোরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্ত সেই সকল সংসারী লোকের নির্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাহাদিগের মনস্তৃষ্টি-সাধনের জন্ত শ্রীগোরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা অতীব অশ্রদ্ধায়।”

—‘শ্রীগোরাঙ্গ-সমাজ’, সং: তোঃ ১১।৩

প্রঃ—জিহ্বা-লালসা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

উঃ—“জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট।”

—‘বৈধা’, সং: তোঃ ১১।৫

প্রঃ—দ্যুতক্রীড়া কি কি ? তাহা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

উঃ—“যে-স্থলে অপ্রাণী বস্তুর দ্বারা ক্রীড়া হয়, তাহাই দ্যুতক্রীড়া-স্থান। তাস, পাশ, সতরঞ্চ, দশ-পঁচিশ, বাঘ-বন্দীরূপ যতপ্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সকল স্থানকে ‘দ্যুতক্রীড়া’-স্থান বলা যায়। অধুনাতন ‘লটারি’ গৃহকেও দ্যুতক্রীড়া স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুৰ্যোধন, শকুনি প্রভৃতি রাজত্ববর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যুতক্রীড়া-স্থানে

জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অর্থ-লাভের জন্য বিষম কলহ ও সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে, সে-সকল স্থানে অনেকের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বিধের নাশ হইতেছে। এই সকল ক্রীড়ায় যাঁহারা রত হয়, তাঁহারা ভয়ঙ্কর আশ্রয় ও কলহ-প্রিয়তা লাভ করে; তাঁহাদের দ্বারা কোন ধর্ম-কর্ম হইতে পারে না।”

—‘কলি’, সঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সং: তোঃ ১৫।১

প্রঃ—পশু-পক্ষী-পালন কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

উঃ—“পশু-পক্ষীর প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না।”

—‘ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৩৭

প্রঃ—‘মাৎসর্য’ কাহাকে বলে ? মাৎসর্য ও প্রেম কি পরস্পর বিরোধী ?

উঃ—“পরস্পরে হিংস্র ও পরহিংস্র স্ত্রী হওয়ার নাম — ‘মাৎসর্য’। ‘মাৎসর্য’ ও ‘প্রেম’—পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য, সেখানে প্রেম নাই এবং যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য নাই।”

—‘ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব’, সং: তোঃ ৪।৬

প্রঃ—‘মাৎসর্য’ সকল রিপূর প্রধান কেন ?

উঃ—“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটি মাৎসর্যের অন্তর্ভূত। ক্রোধে কাম আছে, লোভে ক্রোধ ও কাম আছে, মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে, মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে এবং মাৎসর্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে।”

—‘মাৎসর্য’, সং: তোঃ ৪।৭

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম নির্য্যৎসর-ধর্ম কেন ?

উঃ—“জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবারূপ বৈষ্ণবধর্ম একদিকে এবং মাৎসর্য আর একদিকে অবস্থিতি করে।”

—‘মাৎসর্য’, সং: তোঃ ৪।৭

প্রঃ—জীবের মুক্তি ও বন্ধন কি ?

উঃ—“নির্য্যৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্যই জীবের বন্ধন।”

—‘মাৎসর্য’, সং: তোঃ ৪।৭

বর্ষশেষে বিজ্ঞপ্তি

দেখিতে দেখিতে 'শ্রীচৈতন্যবাহী' পত্রিকার ষোড়শ-বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদিগ্বিষতি শ্রীমন্তকি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ পত্রিকার সম্পাদক-সজ্জকে সর্বদাই শ্রোতপারম্পর্য্য — সদ্গুরুপরম্পরাগত সত্বপদেশ অনুসরণের সংপরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থরাজকে প্রমাণ-শিরোমণিরূপে স্বীকার করায় আমরা শ্রীভাগবত এবং তদনুগত গোস্বামিগ্রন্থসিদ্ধান্তকেই যাবতীয় কুরাকান্তবাস্ত-ভাস্কররূপে বহমানন করিয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতই বেদকল্পতরুর প্রপঞ্চফলস্বরূপ। ইহা আবার শ্রীশুকমুখামৃত-দ্রবসংযুক্ত, শ্রীব্যাসশিষ্যপ্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময় ও হৃৎ-অষ্ট প্রভৃতি কঠিন হেয়ংশবর্জিত বলিয়া তরল পানযোগ্য পরমোপাদেয় বস্তু। ভাগবতশ্রীতিরসজ্ঞ রসবিশেষ-ভাবনাচতুর পরমমুক্ত ভক্তবৃন্দই ইহার নিত্যকাল সেবায় অধিকারী। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ভক্তি-যোগসমাধিলব্ধ ফল এই শ্রীভাগবত। সর্ববেদবেদান্তে-তিহাসপুরাণাদি শাস্ত্রসিদ্ধি মন্বন করিয়া এই শ্রীভাগবতরূপ অমৃতের উদ্ভব হইয়াছে। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্র-লিপ্সা-দোষচতুষ্টয়-দৃষ্ট মানবমেধা অনন্তকাল পরিশ্রম করিয়াও কখনও শাস্ত্রের সারমর্ম্ম নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারে না। বক্রগণী ধর্ম্মের প্রমোত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্র বিভিন্ন—এমন কোন মুনি নাই, যাহার একটি ভিন্ন মত নাই—কথায় বলে — নানামুনির নানামত। ধর্ম্মের মর্ম্মরহস্ত গুহায় অর্থাৎ মহাজনের হৃদয়গুহায় নিহিত, এজ্ঞ মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পথবিচারে অনুসরণীয়—‘মহাজনো যেন গত্যঃ সঃ পস্থাঃ’। আরোহণস্থা অবলম্বনে বেদ ও তদনু-গত সচ্ছাত্র প্রদর্শিত সুপথ নির্ধারণ করা যায় না।

মহাভারত (আদি ১।৫।৬৭) ও মহাসংহিতায় বলা হইয়াছে —

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।”

অর্থাৎ মহাভারতরামায়ণেতিহাস ও পুরাণাদি দ্বারা বেদার্থ স্পষ্টীকৃত করিবে। বেদার্থ-পূরণহেতুই ‘পুরাণ’ — ‘পূরণাং পুরাণম্’। নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে —

“বেদার্থাদধিকং মন্ত্রে পুরাণার্থং বরাননে।

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বৈ পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥

পুরাণমন্ত্ৰা কৃত্বা তির্ধ্যগ্‌যোনিমবাপুয়াৎ।

সুদান্তোহপি সুশান্তোহপি ন গতিঃ ক্চিদাপুয়াৎ ॥”

অর্থাৎ হে বরাননে, আমি বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি, বেদ সকল নিঃসংশয়িতভাবে পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত, পুরাণকে স্বীকার না করিলে তির্ধ্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয়। সুদান্ত সুশান্ত হইলেও কখনও সন্ধানি লাভের আশা নাই।

কন্দপুরাণে প্রভাসপথেও উক্ত হইয়াছে—

“বেদবন্নিশ্চলং মন্ত্রে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বৈ পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বিভেত্যন্নশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।

ইতিহাসপুরাণৈশ্চ নিশ্চলোৎসং কৃতঃ পুরা ॥”

অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি পুরাণার্থকে বেদের ন্যায় নিশ্চল মনে করি। বেদসকল নিঃসন্দ্বিগ্নভাবে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নশ্রুত অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি হইতে বেদ ভ্রমপ্রাপ্ত হন যে, ইতিহাস-পুরাণদ্বারা তিনি পূর্ব্বে নিশ্চল হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে চালিত করিবে অর্থাৎ তাঁহার অর্থ বৈপরীত্য সংঘটন করিবে।

গুরুত্বপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, মহা-ভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং বেদার্থ সংবর্দ্ধক বলিয়াছেন।

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ

মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-ভক্ত্যঙ্গকে প্রধান বলিয়া কীর্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গকেই সর্বপ্রধান বলিয়াছেন। (তন্মাদেকেন মনসা, তন্মাদ ভারত সৰ্বাখ্যা, তন্মাৎ সৰ্বাঅনা রাজন্ এবং এতন্নিব্বিভমানানানং.....হরেনামানুকীৰ্তনম্, যত্জৈঃ সঙ্কীৰ্তনপ্রায়ৈৰ্বজন্তি হি স্মেধসঃ, কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণুং, কলেদৌষমিধেঃ রাজন্, নামসঙ্কীৰ্তনং যন্ত ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোক আলোচ্য।) গোস্বামিগণও নাম-সঙ্কীৰ্তনেরই অত্যন্ত প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন, এক নামসঙ্কীৰ্তন হইতেই সর্বসিদ্ধি—পঞ্চম পুরুষার্থপ্রেম পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে, তথাপি অন্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনেচ্ছ হইলে কীর্তনাখ্য ভক্তি সংযোগেই তাহা অন্তর্ভুক্ত, ইহাই বিশেষভাবে সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। একই সচ্চিদানন্দরূপ তব্ব নাম ও নামী—এই দুইরূপে আবির্ভূত। নামই চিন্তামণি-স্বরূপ—সৰ্বা দীপ্তপ্রদাতা, যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ—চৈতন্যরসবিগ্রহ, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, নাম-নামী অভিন্ন তত্ত্ব। তথাপি অভিন্ন হইলেও বাচ্য নামী হইতে বাচক-স্বরূপ নামের করুণাই অধিক। সৰ্বতোভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে নামই রূপাপূর্বক তদাশ্রিত জনকে তাঁহার রূপগুণাদি দর্শন করান, তাহার চিত্ত হরণ করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে কৃষ্ণ সমীপে লইয়া গিয়া নিজস্বরূপ-বিলাস দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীল তপনমিশ্র-প্রসঙ্গে শ্রীমন্নহাপ্রভুর উক্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

“শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।

যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য।

সাধা-সাধন-তত্ত্ব যেকিছু সকল।

হরিনামসঙ্কীৰ্তনে মিলিবে সকল।

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাস্কুর হবে।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে।”

— চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১৪৩, ১৪৭

হরিনাম ব্যতীত যে গতান্তর নাই, তাহার সর্বজনবিদিত প্রমাণ-স্বরূপ বৃহন্নারদীয়-পুরাণোক্ত “হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা।” শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, আবার নামও কিরূপ নাম, তাহা সুস্পষ্ট করিয়াই

অভিব্যক্ত করিয়াছেন—

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—এই শ্লোক নাম বলি’ লয় মহামন্ত্র।

বোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥”

পুনরায় ঐ শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“(আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।)

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥’

প্রভু বলে, ‘কহিলাম এই মহামন্ত্র’।

ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥

ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্বক্ষণ বল’ ইথে বিধি নাহি আর॥”

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীসনাতন প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গে ঐ মহামন্ত্র নাম-ভজনেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন এবং দশাপরাধ-শূন্য হইয়া সেই নামভজনফলেই প্রেমসম্পদ লাভের কথা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন—

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীৰ্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১

ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তও লিখিয়াছেন—

“নাম বিহু কলিকালে ধর্ম নাহি আর।”

—চৈঃ চঃ আদি ৩।৯৯

“নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।

সর্বমন্ত্রসার নাম, — এই শাস্ত্র-মর্ম॥”

—চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৪

“কৃষ্ণনামের ফল ‘প্রেমা’ — সর্বশাস্ত্রে কয়।”

—চৈঃ চঃ আদি ৭।৮৬

শ্রীমন্নহাপ্রভু ‘হরেনাম’ শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে জানাইয়াছেন— কলিকালে কৃষ্ণ ‘নাম’-রূপে অবতীর্ণ,

এই নাম-ভজন হইতেই সমগ্র জগতের সম্যক নিস্তার সংসাধিত হইবে। জ্ঞান, যোগ, তপঃ প্রভৃতি কর্ম কখনও কলিকলুষ বিনাশে সমর্থ হইবে না। কিন্তু ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ শ্লোকানুসরণে এই নাম গ্রহণেরই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হইয়াছে, নতুবা প্রেমধন লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে —

“তৃণ তৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।

আপনি নিরভিমানী, অস্ত্রে দিবে মান ॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।

ভৎসনা তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥

কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।

শুকাইয়া মবে, তবু জল না মাগয় ॥

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।

অযাচিতবৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে ॥

সদা নাম লবে, যথা লাভেতে সন্তোষ।

এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ।”

— চৈঃ চঃ আদি ১৭২৬-৩০

তৃণাপেক্ষা হীন দীন, সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন, অমানী ও মানদ হইয়া সর্বদা নামগ্রহণই ভক্তিধর্ম পোষক আচরণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১২।৬ষ্ঠ শ্লোকে) ভক্তিধর্মকেই পরম ধর্ম বলা হইয়াছে। যে ধর্মের অনুষ্ঠান হইতে অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত — অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণা অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধান-রহিত। (ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা-রহিত), অপ্রতিহতা (অর্থাৎ ঐসকল ও অগ্ৰাণ্য যাবতীয় বিষয় দ্বারা অনভিভূত)। ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মনু্যমাত্রেরই পরম ধর্ম। এইরূপ ভক্তিধর্ম যাজনেই যাবতীয় অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্ম প্রকৃত সুপ্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ অত্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত অথচ অন্তঃকূল্যাক্রমী শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-কেই উত্তমভক্তি বলিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের রূপ। হইতে লভ্য হয়। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ এই অনুশীলন দেহাদির বৃত্তিরূপে আবির্ভূত হয়। অন্তঃকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন বলিতে

শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর অথচ প্রতিকূলতাশূন্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্তভাবে অনুশীলন—বৃত্তিতে হইবে। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন—অম্বর-সহ যুদ্ধরসান্বাদন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হইলেও তাহাতে অম্বরগণের ঘেষরূপ প্রাতিকূল্যভাব থাকায় সেখানে ভক্তিরসেব উদয় হইতেছে না, পরন্তু শুনহৃৎপানরত অতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে পরিতাগ পূর্বক মাতা যশোদার চুল্লীর উপরিস্থ উৎসিচ্যমান ছদ্ম উত্তারণার্থ গমন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হইলেও সেখানে মা যশোদার কোন প্রাতিকূল্যভাব না থাকায় তাহা ভক্তিরসের পোষক হইল। সুতরাং প্রতিকূলতা-শূন্য অন্তঃকূল্যভাবই শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের বিবক্ষিত। আবার ‘অভিলাষ’ শব্দের পরিবর্তে ‘অভিলাষিতা’ এই ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে নিত্য অভিলাষযুক্ত ব্যক্তির স্বভাবটিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্বভাবার্থ-ছোতনার্থ ব্যাকরণে ইন্ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ কোনও ভক্তের কদাচিৎ অকস্মাৎ মরণসঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি যদি তৎকালে ‘হে ভগবন্ তোমার ভক্ত আমাকে এই বিপত্তি হইতে রক্ষা কর, এইরূপ বিপত্তি-ত্রাণের প্রার্থনাও করেন, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু তাঁহার বৈবশ্ব বশতঃ তাৎকালিক স্বভাব-বিপর্যায়ই ঐরূপ প্রার্থনার কারণ হইয়াছে, উহা তাঁহার স্বাভাবিক ভাব নহে, ইহাই বোধ্য।

বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনকেই জ্ঞানকর্ম্মাত্মনাবৃত বলা হইয়াছে। এহলে ‘জ্ঞান’ বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান অর্থাৎ যে জ্ঞানে মায়াবীশ দৈশ্বর ও মায়াবশ জীবে নিত্য ভেদ স্বীকৃত না হইয়া জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ স্থাপন-প্রয়াস আছে, তাহাই শুদ্ধ বা কেবলা ভক্তির আবরণ-স্বরূপ, নচেৎ ভজনীয় তত্ত্বানুসন্ধান জ্ঞান তাঁহার স্বরূপজ্ঞান এবং কৃষ্ণ, জীব ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞানানুসন্ধিৎসাকে আবরণ বলিয়া নিরাকরণ করা হয় নাই। ঐরূপ, ‘কর্ম্ম’ বলিতে স্মার্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি আত্মোজ্জ্বল তপর্ণমূলক কর্ম্ম, পরন্তু ভজনীয় কৃষ্ণ ও কাম্য বস্তুর পরিচর্যাাদি—‘কর্ম্ম’ হইলেও উহা কৃষ্ণানুশীলনরূপ বলিয়া সর্বথাই আদরণীয়। ‘আদি’ শব্দে কল্প বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির

অভ্যাসকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ সকল ভক্তিবর্ণ্যাবরক বা শুদ্ধভক্তিবোধক জ্ঞানকৰ্ম্মকেই বিশেষভাবে নিরাকৃত করা হইয়াছে, বস্তুতঃ ভক্তিবর্ণ্যপোষক জ্ঞানকৰ্ম্মাদি নিরাকরণীয় নহে, ইহাই বৃত্তিতে হইবে। ভক্তির আবরণ বলিতে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যাছেন—বিধিশাসন অর্থাৎ শাস্ত্র শাসনানুসারে, নিত্যকৰ্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হইবার ভয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক যে কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদিতে প্রবৃত্তি, তথা ভক্ত্যাদিরূপ ইষ্টপ্রাপ্তির সাধন-স্বরূপে শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্যকৰ্ম্মে প্রবৃত্তি। এই দুইটিই শুদ্ধভক্তির আবরণ স্বরূপ। সুতরাং উহা ত্যাজ্য। কিন্তু লোকসংগ্রহার্থ কোনও মহাত্ম্যব ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধা রহিত হইয়া পিতাদি শ্রাদ্ধেরও অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার শুদ্ধভক্তির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

কায়মনোবাক্যে অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণাদি নববিধ ভক্তির অনুষ্ঠানই উত্তম অনুশীলন, কিন্তু তাহা যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপ্রদ হয়, ইহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা তাহা প্রাণশূন্য হইয়া পড়িবে।

“অন্ত্যবাস্তা, অন্ত্যপূজা ছাড়ি’ জ্ঞান কৰ্ম্ম।

আনুকূল্যে সৰ্ব্বেন্দ্রিয়্যে কৃষ্ণানুশীলন ॥

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।

পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥”

—চৈঃ চঃ

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—

“সৰ্বৌপাধিবিনিম্মুক্তং তৎপরত্বেন নিৰ্ম্মলম্।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিকচ্যতে ॥”

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদোক্ত ভক্তি-হৃত্রের সহিত ইহা সমার্থবোধক। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—‘তৎপরত্বেন’—আনুকূল্যেন, ‘সৰ্বৌপাধিবিনিম্মুক্তং’—অন্ত্যভিলাষিতাশূন্য, ‘সেবনং’—অনুশীলনং, ‘নিৰ্ম্মলং’—জ্ঞানকৰ্ম্মাচ্ছনাবৃত্তম্—অত উত্তমত্বং স্বত এব উত্তমং।

অর্থাৎ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়্যদ্বারা সৰ্ব্বেন্দ্রিয়্যনিয়ামক শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যভিলাষ-বর্জিত নিৰ্ম্মল সেবাই উত্তম ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহুতি দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

সালোক্যসাষ্টি সামীপ্যসাক্ষৈপ্যকল্পমপ্যুত।

দীপমানং ন গৃহস্তি ধিনা-মং সেবনং জনাং ॥

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্মান্তিক উদাহতঃ ॥”

(ভাঃ ৩২৯।১১-১৪ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ মাতঃ! শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানে ফলাভিসন্ধান-রহিত, ব্যবধানশূন্য যে ভক্তি, এরূপ ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ, সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাহিলেও আমার সেবা ব্যতীত সে-সকল কিছুই গ্রহণ করেন না। এইরূপ ভক্তিযোগই আত্মান্তিক ভক্তি বলিয়া কথিত।

এস্থলেও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অহৈতুকী—অন্ত্যভিলাষিতা-শূন্য, অব্যবহিতা—জ্ঞানকৰ্ম্মাচ্ছনাবৃত্তা (ব্যবধানই—জ্ঞান-কৰ্ম্মাদি আবরণ), সালোক্যাদি পণ্ডের দ্বারা অহৈতুকী শব্দের ব্যাখ্যা আরও স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। “সামুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘণা, লজ্জা, ভয়। নরক বাঙ্করে তব সামুজ্য না লয় ॥” শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত এইরূপ সামুজ্য-মুক্তির নামও ত’ শুনিতে পারেন না, এমন কি—বৈকুণ্ঠের সাষ্টি (সমান ঐশ্বৰ্য্য), সাক্ষ্য (সমান চতুর্ভুজাদি পার্শ্বদ-রূপ), সালোক্য (সমান লোকে বাস) এবং সামীপ্য (সমীপে অবস্থিতি)—এই মুক্তিচতুষ্টয় তাঁহারা দিতে চাহিলেও নিতে চাহেন না। ইহাই শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য।

এই শুদ্ধভক্তির বহুবিধ অঙ্গের মধ্যে সপার্ষদ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু নাম-সংকীৰ্ত্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ বলিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনের সর্বতোভাবে জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। শ্রীগৌরপার্ষদ-প্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীবৃন্দভাগবতামৃত গ্রন্থরত্নে লিখিয়াছেন—

“কৃষ্ণস্ত নানাবিধ-কীৰ্ত্তনেষু

তন্মাম-সংকীৰ্ত্তনমেব মুখ্যম্।

তৎপ্রেম-সম্পজ্ঞনেন স্বয়ং দ্রাক্

শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥”

—বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৮

ঐ টীকা :—

তত্র চ শ্রীভগবান্নাম-সংকীৰ্ত্তনমেব সেব্যমিত্যাশয়ে-নাহঃ—কৃষ্ণস্যেতি। নানাবিধেষু বেদপুরাণাদি পাঠ-কথা-

গীত-স্তুত্যাदिভেদেন বহুপ্রকারকেষু কীর্তনেষু মধ্যে তন্তু
কৃষ্ণস্য নাম-সংকীর্তনমেব মুখ্যম্। কুতঃ? দ্রাক অবিলম্বে-
নৈব তস্মিন্ কৃষ্ণে প্রেমসম্পদো জননে আবির্ভাবেন স্ব-
মন্তনৈরপেক্ষ্যনৈব শক্তিং সমর্থম্। ততস্তস্মাক্তোক্তোর্থানা-
দিত্তি বা। তৎ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনমেব শ্রেষ্ঠতমং মতং
সদ্বিত্তিমাভির্বা।

মূলানুবাদ—“শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ কীর্তনের মধ্যে
তাঁহার নাম-সংকীর্তনই মুখ্য। কারণ তাঁহার নামসং-
কীর্তনই শীঘ্র প্রেমসম্পৎ উৎপাদনে সমর্থ। অতএব
উহাই ভক্তিপ্রকার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং পণ্ডিতগণ এই-
রূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।”

টীকার মন্যানুবাদ—“সুতরাং শ্রীভগবান্নাম-সংকীর্তনই
পরম সেব্য—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের
নানাবিধ কীর্তনের মধ্যে নামসংকীর্তনই মুখ্য। ‘নানা-
বিধ কীর্তন’ বলিতে বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত ও
স্তুত্যাदिভেদে বহুপ্রকার কীর্তনমধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণের
নাম-সংকীর্তনই মুখ্য। কি কারণে মুখ্য? শ্রীকৃষ্ণনাম-
সংকীর্তন অবিলম্বেই সেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমসম্পৎ জননে
(আবির্ভাবনে) স্বয়ংই—অন্ত নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ
অন্ত কাহারও অপেক্ষা না করিয়া বা সহায়তা
না লইয়াই সমর্থ। অতএব উহা ধ্যানাদি অগ্নাত
ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ইহাই সাধুগণ বিচার
করিয়াছেন এবং আমাদেরও তাহাই মত।

“মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্মোদয়ঃ স্বপরহর্ষদঃ।

তৎ প্রভোর্থানতোহপি স্তান্নামসংকীর্তনং বরম্॥

নামসংকীর্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।

বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষক মন্তব্যং॥”

—বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৩-১৬৪

অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়েই নামের মুখ্য উদয় (ক্ষুভ্রি)
এবং নাম উচ্চেষ্টার কীর্তিত হইলে নিজের ও পবের
উভয়েরই সুখদায়ক হয়। পরন্তু ধ্যানে কেবল নিজের
সুখ হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও
নাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ।

নাম সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্পৎ লাভের বলিষ্ঠ
ও শ্রেষ্ঠ সাধন। কারণ ইহা পরমাকর্ষক মন্তব্যং।

“তদেব মন্ততে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।

ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সট্টবাব্যভিচারতঃ॥”

—বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫

অর্থাৎ তজ্জাত ভক্তিরসরসিকজনগণ নামসংকীর্তন-
কেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। কারণ
নামসংকীর্তনই অব্যভিচারতঃ ভগবৎপ্রেমসম্পত্তি
উৎপাদন করিয়া থাকেন।

টীঃ ‘অহো কিং বক্তব্যম্ শ্রেষ্ঠং সাধনমিতি, সাধা-
মপি তদেব কৈশ্চিন্মন্ততে’ ইত্যাহুঃ—তদেবেতি, নাম-
সংকীর্তনমেব, ইত্যাদি।

অর্থাৎ নামসংকীর্তনই যে শ্রেষ্ঠসাধন, তদ্বিরয়ে আর
অধিক কি বলিব? ভক্তিরস-রসিকগণ হইকেই সাধা
বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। (শ্রীমদ্ব্যাহু শ্রীতপন
মিশ্রজীকে নামসংকীর্তনই সাধ্য ও সাধন এইরূপ
উপদেশ করিয়াছেন।)

শ্রীমদ্ব্যাহু স্বয়ং মাতা শ্রীশচীদেবীকে উপলক্ষ্য
করিয়া তাঁহার নাম ও অর্চাবিগ্রহরূপ দুই জন্মের কথা
জানাইয়া বলিতেছেন—

“আরো তুই জন্ম এই সংকীর্তনারন্তে।

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥

মোর অর্চামূর্তি মাতা তুমি সে ধরনী।

জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী॥”

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।১।৪৭-৪৮

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার ‘গৌড়ীয়-ভাষ্যে’
লিখিয়াছেন—

“অর্চামূর্তি মূময়ী প্রভৃতি হইয়া থাকে আর ভগ-
বন্নাম শব্দাত্মক, সুগুণ শচীনন্দনের দুই অবতার—
অর্চাবতার ও নামাবতার। ‘কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-
অবতার।’ (চৈঃ চঃ আদি ১।৭।২২) —ইহাই গোব-
সুন্দরের বাণী। অর্চাবিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত
অভিন্ন—‘নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে
ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ’॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।৭শঃ অঃ)॥”

পরিশেষে আমরা সর্বাগ্রে শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে ভুলুপ্তি প্রণতি জ্ঞাপন

পূর্বক তন্মনোহরীষ্ট পালন বিষয়ে অসমর্থ আমরাগের
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কৃত যাবতীয় ক্রটি-বিচ্যুতি জ্ঞা
ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীপত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকা
বা পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণকেও আমরা
আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন পূর্বক প্রার্থনা

জানাইতেছি যে, সম্বৎসরব্যাপী শ্রীচৈতন্যদেবের মঙ্গল-
ময়ী বাণী পরিবেশন কার্যে আমাদের পক্ষ হইতে
কোন ক্রটি বিচ্যুতি ঘটয়া থাকিলে তাঁহারা যেন তাহা
কৃপাপূর্বক সংশোধন করিয়া লয়েন ও আমরাগকে
জানান, তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যতে তদ্বিষয়ে
সাবধান হইতে পারি।



শ্রীশ্রীনামসংকীৰ্তন

জয় গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ।
জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-প্রিয় অতি ॥ ১ ॥
জয় গৌর নিত্যানন্দ, জয় গদাধর ।
জয়াদেত শ্রীনিবাস বৈষ্ণব-প্রবর ॥ ২ ॥
জয় শচী জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ।
জয় জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন ॥ ৩ ॥
শ্রীশচীর স্নেহপাত্র জয় শ্রীঈশান ।
মহাপ্রভু-মন্দিরের নিত্য সেবক হন ॥ ৪ ॥
জয় যোগপীঠ জয় শ্রীমায়াপুর ।
যেথা অবতীর্ণ হইলা গৌরাজ্ঞ ঠাকুর ॥ ৫ ॥
শ্রীবাস-অঙ্গন জয়, কীর্তন মহারাস ।
মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে করিলা প্রকাশ ॥ ৬ ॥
অদ্বৈতভবন জয় গদাধর অঙ্গন ।
মুরারি-ভবন জয়, সীতা রাম দর্শন ॥ ৭ ॥
গৌর-আনা প্রভু জয় শান্তিপুৰ-নাথ ।
গৌরশক্তি গদাধর গৌরাজ্ঞের সাথ ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্যমঠ জয় মূলমঠ হন ।
জগদগুরু প্রভুপাদ করিলা স্থাপন ॥ ৯ ॥
গৌরাজ্ঞের ব্রজলীলা অভিনয় স্থান ।
গান্ধবিকা-গিরিধারী-গৌর বিজয়মান ॥ ১০ ॥
মাধবেন্দ্র পুরী জয় শ্রীঈশ্বর পুরী ।
কেশব ভারতী জয় শ্রীচৈতন্য হরি ॥ ১১ ॥
জয়-গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম সুন্দর ।
তাহার নিকটে ঈশোত্তান মনোহর ॥ ১২ ॥
গৌরাজ্ঞের মাধ্যাহ্নিক লীলা প্রিয় স্থান ।
সাদুগণ মঠ স্থাপি' গৌরগুণ গান ॥ ১৩ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-গোপীনাথ জয় ।
জয় রাধা-মদনমোহন-গৌর দয়াময় ॥ ১৪ ॥
জয় নবদ্বীপধাম ভক্ত ভগবান্ ।
কৃপা করি দেহ কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান ॥ ১৫ ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম করিয়া বন্দন ।
দাস যাযাবর করে নাম-সংকীৰ্তন ॥ ১৬ ॥

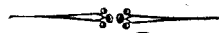
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোপাঞ্জির করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অতীষ্টপূরণ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নামসংকীৰ্তনং যন্ত সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।

প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥

- ভাঃ ১২।১০।২৩



শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে উর্জ্জ্বলত, দামোদরকৃত বা নিয়মসেবা-পালন

(পূর্ব প্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর)

৭ই কার্তিক—২৪।১০।৭৬ রবিবার—**শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব**। পূজাপাদ শ্রীল আচার্য-দেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সকাল সকাল প্রস্তুত হইয়া ধর্মশালার দ্বিতলোপরি ঠাকুর ঘরে যান। ৮।৪৭ মিঃ পর্যন্ত প্রতিপদ ছিল, ইহার মধ্যেই তিনি পূজা আরম্ভ করিয়া দেন। পূজারী শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার সহায়তা করেন। শ্রীশ্রী গিরিধারী ও শ্রীশালগ্রাম শিলার যথাবিধি অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সুসম্পন্ন হয়। শ্রীহরি-ভক্তি বিলাসের বিধানানুযায়ী গোময়ের পর্ষত করিয়া তাহাতে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের যথাবিধি পূজা বিধি হইয়াছিল। এদিকে বেলা ১০টা হইতে সভা আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ‘নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্’—এই স্তবটি স্মরণ-সংযোগে কীর্তন করেন। পূজাপাদ আচার্যদেব শ্রীগোবর্দ্ধন স্তবাদি ব্যাখ্যাসহ পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপরে উড়িষ্যার অনেক উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত সজ্জন নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। তাঁহাদিগকে অন্নকূটের বিচিত্র প্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ঠাকুর ঘরে বিবিধ বিচিত্র উপকরণ সমন্বিত অন্নকূট সাজাইয়াছিলেন—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল দাস ও শ্রীরাম-গোপাল দাস। অন্ন, পুষ্পান্ন, পুরী, কুশরাম, পরমাম্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন বড়া বড়ি প্রভৃতি, পিষ্টক, পায়স, মিষ্টান্ন, ফল মূল ডাব ইত্যাদি অসংখ্য উপচার ঠাকুর ঘরের মধ্যেই অতিসুন্দর-রূপে সাজাইয়া দেখুয়া হইয়াছিল। শ্রীমৎ পুরী মহারাজই ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন পূর্বক মাধ্যাহ্নিক ভোগাত্মিক বিধান করেন। সন্ধ্যার পর ধর্মশালায় একটি সভার অধিবেশন হয়। পূজাপাদ আচার্যদেবের নির্দেশানুযায়ী শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ‘হস্তায়মদ্রি রবলা হরি-দাসবর্ষাঃ’ ও ‘শৈলোহন্যীতি ত্রয়ং’ ইত্যাদি উক্তি-দ্বারা

শ্রীশ্রীগিরিরাজের একাধারে কৃষ্ণকায়-মিলিত স্বরূপ, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগিরিধারী সেবাদর্শ, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কথা প্রভৃতি কীর্তন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। নিয়মসেবার কীর্তনাদি পূর্ববৎ যথারীতি অকুণ্ঠিত হয়।

৮ই কার্তিক—২৪।১০।৭৬, সোমবার—অতঃ সন্ধ্যায় আমরা শ্রীভগবদ্দর্শনে যাই, কিন্তু কি আশ্চর্য, আনন্দ-বাঞ্চারে আজ এক কণিকা অন্নপ্রসাদও পাওয়া গেল না! শুনিলাম এখনও ভোগ হয় নাই, কেহ কেহ বলিতেছেন—আজ ভোগ হইতে রাত্রি ১০টা। কি একটা গোলমাল হইয়াছে। যাহাই হউক, সাংক্ষেপে শ্রীভগবানের সেবাপূজায় এরূপ বিশ্রোদ্ধব, আমাদের সকলেরই হৃদৈব-সূচক। “সর্বো দেবাঃ সর্বো পিতরঃ সর্বো মহাত্মাঃ বিষ্ণুনা অশিতমন্নস্তি, বিষ্ণুনাভ্যাতং জিহ্বস্তি, বিষ্ণুনা পীতং পিবস্তি, তস্মাদ্বিহাংসো বিষ্ণু পৃথুতং ভক্ষ-য়েয়ঃ।”—ইহাই বেদবাক্য। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথরূপে শ্রীভগবান্ প্রতিদিন ভোজন-নীলা করিয়া থাকেন, স্মরণ্য তাঁহার ভোগ-সম্পাদনে শৈথিল্য প্রদর্শন জগতের বিশেষ অমঙ্গল-সূচক। পরদিন ৯ই কার্তিক আবার শুনা গেল, গত রাত্রে নাকি শ্রীজগন্নাথদেবের শয়নই হয় নাই। ইহাও বড়ই মর্শ্বস্কন্দ। শুনিলাম প্রায়ই নাকি এই প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে!

১০ই কার্তিক—২৭।১০।৭৬ বুধবার—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী শ্রীমৎ পুরী মহারাজের নিকট কথা-প্রসঙ্গে সাংক্ষেপে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দির সান্নিধ্যে শ্রীবিমলাদেবীর নিকট কোন সময়ে ছাগবলি হয় শুনিয়া খুবই বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে শ্রীসাক্ষীগোপাল মন্দিরের এক প্রাচীন সেবকের নিকট উক্ত বলি সম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়া জানিলেন—শ্রীভূগাপূজার সময় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিনদিন রাত্রি ১১টার পর মন্দির-বেষ্টনীমধ্যে যখন এক বিমলা-

মন্দিরের সেবক ব্যতীত অস্ত্র কেহ থাকেন না, সেই সময়ে—শ্রীভীজগন্নাথদেবের শয়ন হইয়া যাইবার পর দুইটি করিয়া তিনদিনে নাকি ছয়টি ছাগ বলি হয়। এই বলি-প্রথা নাকি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীবিমলা মার মন্দিরের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণেই নাকি এই বলি সংঘটিত হয়। আমরা শুনিয়া ত' অবাঞ্চ! ভীজগন্নাথদেব নাকি বিমলা মার ভৈরব! ভীভগবানের চিহ্নজিৎ যোগমায়া শ্রীবিমলাদেবীকে ত্রিগুণময়ী মায়া-সাম্যে দর্শন সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। ভীধাম নবদ্বীপে শ্রীযোগমায়া প্রৌঢ়ামায়া বা পোড়ামারও তত্ত্ববিচারে একশ্রেণীর কর্মজড় স্মার্তগণ ঐক্য প্রাপ্তি প্রদর্শন করেন।

১৩ই কার্তিক - ৩০।১০।১৬ শনিবার—অতঃ শ্রীগোপা-
স্বামী ও গোষ্ঠাষ্টমী এবং শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী,
ধনঞ্জয় পণ্ডিত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর
তিথি-ভাব-তিথি। পূজাপাদ আচার্য্যদেবতের ত্রিভুজ
নিয়ম-
দেবার শ্রীভাগবত-পাঠ-নিয়ম পালন পূর্বক অতঃকার
তিথির বৈশিষ্ট্য কীর্তন করেন। অতঃকার তিথিতে
গোবৎসপল্লীল শ্রীকৃষ্ণ বড় বড় গোবদন চারণের অধিকার
প্রাপ্ত হইয়া 'গোপ' পদবীতে উন্নীত হন। নন্দব্রজে
গোপগণের আজ মহামহোৎসব। তাঁহারা গো-গণকে
নানারাগে রঞ্জিত করিয়া তৃণাদি ভক্ষণ করান। ছোট
ছোট বালকগণকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহাদের শ্রীদাম
সুদামাদি সখা-সাজাইয়া সভা করিয়া গোষ্ঠে গোচারণ
লীলাসূচক কীর্তনাদি করেন। পূজাপাদ আচার্য্যদেব
এই সকল কথা বলিয়া উক্ত শ্রীল গদাধরদাস গোস্বামী-
প্রমুখ আচার্য্যত্রয়ের চরিত্রায়িত সংক্ষেপে কীর্তন করতঃ
তাঁহাদের রূপা প্রার্থনা করেন।

১৪ই কার্তিক—৩১।১০।১৬ রবিবার—শ্রীজগন্নাথ
মন্দিরের পশ্চিম দ্বারে—যেদিকে প্রদর্শনী আছে, ঐদিকে
এক শ্রীহনুমান মূর্তি বিরাজিত আছেন, ইহাকে 'কাণ-
পাতা হনুমান' বলা হয়। ইনি চক্রবেড়ের মধ্যে
আছেন। দক্ষিণ-বরজার বাহিরে যে বিরাট হনুমান
মূর্তি আছেন, তাঁহাকেও কাণপাতা হনুমান বলা হয়।
পরিচয় দেওয়া হয়। চক্রবেড়ের ভিতরে বাহারা
আছেন, তাঁহারা নাকি প্রাচীন, আর অতঃকার মূর্তি

আধুনিক, ইত্যাদি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে।
রামেশ্বর, দ্বারকা, বদরীনাথ ও পুর্বী—ইহাই চারিধাম
বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু আচার্য্য শঙ্কর এই চারিটি
স্থানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পশ্চিমদ্বারের
একটি প্রকোষ্ঠে চারিধামের চারিমূর্তি প্রদর্শিত হয়।
দক্ষিণদ্বারের পার্শ্বে বারো ভাই হনুমান ও শ্রীবাসুদেব
রামানুজ দাস আচার্য্যের ভজন-কুটা দৃষ্ট হয়। ইহার
সমাধিমন্দির শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে স্বর্গদ্বারে যাইবার
পথের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। দক্ষিণদ্বারে বড়-ভুজ
মহাপ্রভুর পার্শ্বে যে শ্রীনৃসিংহ-মন্দির (যাহাকে সীমা-
চল নৃসিংহ বলা হয়) আছেন, তাহা শুনিয়াছি—উক্ত
শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাসজীর প্রতিষ্ঠিত। পরলোক-
গত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (রায়কাউন্ট্যান্ট জেনারেল)
মহোদয় ইহারই শিষ্য ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল
প্রভুপাদকে শ্রীল বাসুদেব রামানুজ দাসজী বিশেষ
শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখেও আমরা
তাঁহার প্রশস্তি-কীর্তন শুনিয়াছি।

১৬ই কার্তিক, ১৩৮০—২।১১।১৬ মঙ্গলবার—উৎসব-
একাদশী শুভবার। অতঃ আমাদের পরমারাধ্য পরম-
শুদ্ধদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী
পরমহংস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথি—“দামো-
দরোৎসব-দিনে প্রথমে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধান।
প্রপঞ্চলীলাপরিহারবস্ত্র বন্দে গুরুং গৌরকিশোর-
সংজ্ঞম্॥” এবং নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগোড়ীয়-
মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্য পরমপূজনীয় ত্রিদিগ্গোগোস্বামী
শ্রীশ্রীমদভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শুভ আবির্ভাবতিথি-
পূজা-বাসরও অতঃ। তাহাতে আবার শ্রীশ্রীকার্ত্তিকোৎসব-
কীর্তিদেবদেবী শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীদামোদর দেবের
শুভ উৎসব-পর্বও অতঃ সম্মিলিত—চাতুর্মাস্যব্রত-সমাধিও
অতঃকার শুভদিনে বিজ্ঞাপিত। স্মরণ্য অতঃকার
পূণ্যতিথি আমাদের সকলেরই বিশেষ পূজ্য। পূজা-
পাদ আচার্য্যদেব অতঃ প্রাতে সঙ্কীর্তনসহ আমাদের
সর্বপ্রথমেই লইয়া গেলেন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবি-
র্ভাবপীঠস্থলী বন্দনার্থ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—কএকটি
দুষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তি সদরদরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

পূজ্যপাদ মহারাজের শিষ্য শ্রীমান্ শ্রামসুন্দর ভিতর দিকে ছিলেন, তিনি ভগবদ্ভিচ্ছায় খুব ক্ষিপ্ততার সহিত চাবী সংগ্রহ করিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সঙ্কীৰ্ত্তনসহ বাটীন্ধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান বন্দনা করিয়া শ্রীজগন্নাথমন্দির সমক্ষে আগমন করি। তথায় সৰ্ব্বাগ্রে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া আমরা শ্রীমন্দিরের বহির্মণ্ডল পরিক্রমা করিলাম। দক্ষিণ দরজার নিকটবর্তী দক্ষিণপার্শ্ব মঠেও যাওয়া হইয়াছিল। শ্রীমঠের মহাস্তম্ভ দুই ভ্রাতাই আসিয়া পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবকে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এক ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত অনুব্রজ্য করিয়াছিলেন। আমরা দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বদ্বার পরিক্রমা করিয়া ধর্মশালার প্রত্যাবর্তন করি। একটু পরেই স্বর্গদ্বারস্থ শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠ হইতে মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমন্নারায়ণ মহারাজ, পর্যটক মহারাজ প্রমুখ ৫০ মূর্ত্তি সহ ধর্মশালার আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবের মাংস্ত্রা হৃদক কীর্ত্তন হইতে থাকে। পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজও আসিয়া কিছুক্ষণ পরে চলিয়া যান। বার্কাক্যবশতঃ অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। এদিকে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব অত্ন স্বহস্তে ঠাকুর ঘরে শ্রীবিগ্রহের অভিব্যেক ও পূজাদিকৃত্য সম্পাদনপূর্বক বস্ত্র, পুষ্প-মালা ও চন্দনাদি দ্বারা যথাযোগ্য মধ্যাদার সহিত সতীর্থ বৈষ্ণবগণের পূজা বিধান করেন। সতীর্থগণও পুষ্পমালা চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার প্রতিপূজা বিধান করিয়াছিলেন। সতীর্থগণের পূজা বিধানের পর শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠ ও অন্তান্ত গোড়ীয় মঠ হইতে সমাগত বৈষ্ণবগণকেও তিনি যথাযোগ্য সমাদর করতঃ বৈষ্ণবগণের বিশেষ অনুরোধে সুসজ্জিত উচ্চ-মানে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্য, সতীর্থ-শিষ্য ও শিষ্যগণের পূজা স্বীকার করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ৭৩ সংখ্যক দীপাবলী

দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের আরাট্রিক বিধান করিয়া ছিলেন। পূজাকালে অবিশ্রান্ত সংকীৰ্ত্তন চলিয়াছিল। মৃদঙ্গমন্দিরাদি বাত-ধ্বনিসহ সংকীৰ্ত্তন ও জয় জয় ধ্বনিতে ধর্মশালার আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়াছিল। অগণিত ভক্তবৃন্দের পুষ্পঞ্জলি প্রদান ও প্রণতিজ্ঞাপনাদি কৃত্য সমাপ্ত হইবার পর ফলমূল মিষ্টান্নাদি অন্নকন্নের ব্যবস্থা হয়। উড়িষ্যাদেশেরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন পূর্বক অন্নকল্প স্বীকার করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে বাগাড়িয়া ধর্মশালার আয়োজিত সান্ধ্য ধর্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন—পুরী জেলার জজকোর্টের প্রধান বিচারপতি—শ্রী জে, এন আচার্য্য। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পুরীর ধ্যাননামা স্যাড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র। উড়িষ্যার ষাণ্ড ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এবং পুরী ও ভুবনেশ্বরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুপূজাবাসরে মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইয়া পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সান্ধ্য-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে অভিভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীবিভূপদ পণ্ডা ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করিলে স্যাড্‌ভোকেট মিশ্র মহোদয় ইংরাজী ভাষায় এবং সভাপতি উৎকল ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ সংক্ষেপে শ্রীগুরুদেবের মাংস্ত্রা কীর্ত্তন পূর্বক ধন্যবাদ দান করেন। রাত্রি প্রায় ১০ টায় সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

আমরা পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের সহিত অত্ন রাত্রি প্রায় ১০½ টায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করি।

১৭ই কাতিক, ১৩৮৩—৩।১১।৭৬ বুধবার বাদশী—অত্ন আমাদের চাতুর্ন্যাত্তরতোদ্বার্পন-দিবস—নিয়মভঙ্গ-মহামহোৎসব। বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত অত্ন মহাপ্রসাদ সন্মান করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা-দেবীর অত্ন রাজবেশ দর্শন হয় অর্থাৎ সুবর্ণের হস্ত-পদাদি সুশোভিত হইয়া তাঁহার অপূর্ব সৌন্দর্য

প্রকট করেন। সকলকেই শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শাধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য শ্রীমন্নহাপ্রভুর “গোপীভর্তুঃ পদ-কমলয়োদাসদাসানুদাসঃ”—এই শ্রীমুখবাক্যানুসরণে ভূত-শুদ্ধি সম্প্রাপ্ত ভাগ্যবন্ত ভক্তবৃন্দই শ্রীভগবানের সেই রাতুল চরণকমল-স্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধ্যাত্তি-ধ্যাত্ত হইতে পারেন। নতুবা দেহাত্মাভিমানগ্রস্ত মাদৃশ বদ্ধজীব কোথায়, আর সাফাং শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহই বা কোথায়! তবে তিনি যদি কোন ভাগ্যবান্ ভক্তকে নিতান্ত অইহতুকী রূপা-বশতঃ তচ্চরণকমল স্পর্শ-সৌভাগ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ধ্যাত্তিধ্যাত্ত হইবেন সন্দেহ নাই। “যমৈবৈব ব্রহ্মতে তেন লভ্যন্ত্যশ্চৈব আত্মা বিব্র-হ্মতে তনুং স্বাম্”। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বাগ্যকে তাঁহার রূপাপাত্ররূপে বরণপূরক তৎসমীপে তাঁহার চিয়ম্বী তনু প্রকাশ করেন, তিনিই তদন্ত চিয়ম্ চক্ষুর্দ্বারা সেই চিয়ম্ বিগ্রহ দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রেমাজ্ঞানরঞ্জিত ভক্তচক্ষু দিয়াই শুদ্ধভক্ত সাধুগণ সর্বদা শ্রীশ্যামসুন্দরের অচিন্ত্যগুণস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। নতুবা ‘অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।’ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা প্রাকৃত সেবাবিমুখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাপার হন না, সেবামুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারাই তাঁহার গ্রাহ্য হইয়া থাকেন—“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবামুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ”।—ইহাই মহাজ্ঞান-বাক্য।

অতঃ পরে ধর্মশালায় সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুন্সেফ বাগ্যত্বর সপরিবারে সভায় যোগদান করেন। প্রথমে শ্রীপাদ জয়ীকেশ মহারাজ, পরে শ্রীল আচার্যদেব স্বয়ং ভাষণ প্রদান করেন। ডাক্তার শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীপুরুষোত্তম-মঠবাসী) প্রভু তল্লিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন। লেখাটি ভালই হইয়াছে। কীর্তনাদির পর সভা ভঙ্গ হয়।

১৮ই কার্তিক—১১১১৭৬ বৃহস্পতিবার—অতঃ সকালে বৃষ্টি হইতেছে। রাত্রিতে সভার অধিবেশন হয়, প্রথমে শ্রীমৎ পূবী মহারাজ, পরে শ্রীল আচার্যদেবের ভাষণ হইলে কীর্তনাদির পর সভা ভঙ্গ হয়।

১৯শে কার্তিক—১১১১৭৬ শুক্রবার—শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের আবির্ভাবপীঠের একটি একতলা ছোট ঘর মেরা-মত ও চূর্ণকাম করিয়া ঠাকুরঘরের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়। তাহাতেই অতঃ শুভক্ষণে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও অতঃ মঠসেবক-সমভি-বাগ্যারে শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর সেবা প্রকাশ করেন। ইহার নিয়মসেবাকালে বাগা-ডিয়া ধর্মশালায় সেবিত হইতেছিলেন, এখনও শ্রীশাল-গ্রাম ও শ্রীগিরিধারীজিউ এবং শ্রীল প্রভুপাদের আলখ্যাচ্চা ধর্মশালায় থাকিলেন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীরাসপূর্ণিমার পরদিবস পাট্টসহ শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলিকাতা মঠে শুভ যাত্রা করেন। সুতরাং ঐদিবস অর্থাৎ ১১১১৭৬ অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের আলখ্যাচ্চা, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগিরিধারীজিউ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীমন্দিররূপে কলিত গৃহে শুভবিজয় করিলেন। এখন হইতে এখানেই শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজাদি পরিচালিত হইবে।

১১১১৭৬ শুক্রবার তারিখে রাতে শ্রীল আচার্যদেব শ্রীমন্তাগবত পাঠ করেন। সঙ্কস্মানুরাগী সহৃদয় মুন্সেফ মহোদয় ও আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রোতা ছিলেন।

২০শে কার্তিক, ১৩৮৩—১১১১৭৬ শনিবার—শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা শুভবাসর। অতঃ শ্রীপুরীধামের রাজভবন হইতে মধ্যম রাজকুমার শ্রীমান্ অনঙ্গভীমদেব পূজাপাদ শ্রীল আচার্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভের জন্ত ধর্মশালায় শুভাগমন করেন। সুন্দরদর্শন, বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর মাত্র, দিল্লীতে বি-এ পড়েন। মধ্যাহ্নে তাঁহাকে প্রসাদ পাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করা হয়। আরও অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীল আচার্যদেবের পাট্টর ২৫ মূর্তি বৈষ্ণব প্রসাদ-সম্মানার্থ স্বর্গবার শ্রীনীলাচলগোড়ীয় মঠে আমন্ত্রিত হন। আমরা শ্রীপতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবকে বন্দনা করিয়া স্বৈতগঙ্গা, গঙ্গামাতা মঠ, শ্রীরাধাকান্ত মঠ, গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল দর্শনান্তে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রজল দর্শন, স্পর্শন ও প্রণতিবিধান পূর্বক ভক্তিকুটী শ্রীপুরুষোত্তমগোড়ীয় মঠ, নামাচার্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধিমন্দিরে

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব ও ভজন-স্থান বলিয়া আমাদের নিকট এস্থানের গুরুত্ব অত্যধিক। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব এইস্থানে অভ্যভেদী মন্দির ও মঠাদি প্রকাশ করিয়া ‘স্বুৎকলে পুরুষোত্তমাং’ এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন পূর্বক এস্থান হইতেই জগদগুরু শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদদের পরম মঙ্গলময়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পৃথিবীর সর্বত্র ঘোষণা করিবেন। তাঁহার সাধুচেষ্টা সর্বতো-ভাবে জয়যুক্ত হউন, ইহা আমরা শ্রীশ্রীগুরোগোবিন্দ-গান্ধর্বকাগিরিধারী এবং তদভিন্ন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

শ্রীপাদপদ্মে নিত্য প্রার্থনা করিতেছি।

আমরা সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীপুরুষোত্তমধাম ও ধামবাসী ভক্তবৃন্দকে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক বেদনা-বিহ্বলচিত্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে রাত্রি ৯-২০ মিঃ এ শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে বঙ্গদেশে যাত্রা করি।

২২শে কার্তিক—৮।১১।৭৬ সোমবার বেলা আনু্যাজ ৮-২০ মিঃ এ আমরা হাওড়া পৌছাই। অনেক মালপত্র লোকজন সামলাইয়া মঠে আদিয়া পৌছিতে আমাদের প্রায় ১০টা বাজিয়া যায়।



দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা—পৌষী পৌর্ণমাসী শুভবাগের দক্ষিণকলিকাতা-শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীশ্রীগুরোগোবিন্দ-রাধানয়ননাথ জিউ প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্ত ঐ তিথি উপলক্ষ্য করিয়া অত্র মঠে ঐ সময়ে দিবসপঞ্চকব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবংসরও ২১শে পৌষ, ১৩৮৩; ইং ১৮১৭ বৃষবার পূর্ণিমা তিথি। এতদুপলক্ষে নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়াম-কর্ত্তে উক্ত দক্ষিণ কলিকাতা মঠে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১৭ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী (১৯৭৭) শনিবার হইতে ২১শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী বৃষবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব সঙ্কীর্্তনশোভা-যাত্রাসহ রথযাত্রা, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদিমুখে মহাসমারোহে নির্বিয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৭ই পৌষ হইতে ২১শে পৌষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিদ্যজ্ঞানমণ্ডিতা মহতী ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। উহাতে যথাক্রমে আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—(১) ‘ধর্ম’—সমাজ ও বিশ্বের হিতকর অথবা অহিতকর; (২) শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্্তন; (৩) শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে জীবের কোন্টি

গ্রহণীয়?; (৪) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সর্বজীবকে শ্রীভিসূত্রে আবদ্ধ ও সুখী করিতে সমর্থ এবং (৫) শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়ার বৈশিষ্ট্য।

সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—যথাক্রমে (১) কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; (২) ঐ বিচারপতি—শ্রীমলিল কুমার হাজারী; (৩) শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমন্তকি ব্রহ্মক শ্রীধরমহারাজ; (৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই, জি, পি—শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী এবং (৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থা, কূটর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশ চন্দ্র সিংহ।

প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—যথাক্রমে—(১) ভূতপূর্ব এম্ এল্ এ—শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, কটক; (২) শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, স্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা; (৩) শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা; (৪) বঙ্গীয় সঙ্কত শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও (৫) অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা-শঙ্কর সেন শাস্ত্রী।

চতুর্থদিবস বিশিষ্টবক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি—শ্রীউপা-নন্দ মুখোপাধ্যায়।

পূজাপাদ মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যাদেব প্রতাহ, ত্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ দ্বিতীয় দিবস হইতে ও ত্রীপাদ ভক্তিবিকার যথাবর মহারাজ তৃতীয় দিবস হইতে এবং ত্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পূবী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসোধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ স্ববীকেশ মহারাজ, সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, বৃথাসম্পাদক শ্রীমদ্ভল্লভনিলয় ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রমুখ বক্তৃৎক বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়াছেন।

প্রতাহ সভার উপক্রম ও উপসংহার সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন—স্বকণ্ঠ গায়ক শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ।

রথযাত্রা

উৎসবের ২য় দিবস রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকার পর শ্রীশ্রীশঙ্কর-গৌরাদ-রাধানয়ননাথ জিউ বৃন্দাদেবীসহ সুরম্য রথে আরোহণ করেন। শ্রীমদ্ বামন মহারাজ ভোগ-রাগ ও আরাত্রিক বিধান করিলে পূজাপাদ মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যাদেবের শুভেচ্ছারূপে অগণিত নরনারী-ভক্ত-বৃন্দের উচ্চৈঃস্বরে সম্মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি মধ্যে রথ টানা আরম্ভ হয়। আমাদের কীর্তন সম্প্রদায় ৩ দলে বিভক্ত হন। রথের সম্মুখভাগে প্রথম দলে ত্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্তনবিনোদ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, তৎপরবর্তী ২য় দলে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং ৩য় দলে শ্রীমদ্ভল্লভনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, তৎপরোভাগে Bagpipe পাট্ট, তৎসম্মুখে হিন্দুস্থানী কীর্তন-সম্প্রদায়, তদগ্রে Shakur Band Party,

তদগ্রে পশ্চিমবঙ্গ Athletic Club এবং তৎপরোভাগে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের পতাকা। পূজাপাদ আচার্য্যাদেব ও শ্রীমদ্ ভক্তিমুহুদ বোধায়ন মহারাজ রথোপরি উপবিষ্ট ছিলেন।

রথারূঢ় শ্রীবিগ্রহগণ বিভিন্ন মাদলিক বাত-ধ্বনিসহ সংকীর্তন-শোভাযাত্রা সমভিব্যাহারে রথারোহণে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবান জনসাধারণকে তাঁহাদের দর্শনের ও রথাকর্ষণের সৌভাগ্য প্রদান করতঃ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় নির্বিঘ্নে শ্রীমন্দিরদ্বারে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীমদ্ বামন মহারাজ পুনরায় শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি ভোগরাগ ও আরাত্রিক বিধান করিলে তাঁহারা শ্রীমন্দিরে শুভ-বিজয় করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। রথানিয়মে সন্ধ্যারাত্রিক বিহিত হয়।

শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক

উৎসবের ৫ম দিবস ৫।১।১৭ বুধবার পূর্বাহ্ন ১০। ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীমন্দিরের বিগ্রহগণের যথাশাস্ত্র মহাভিষেক আরম্ভ হয়। পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিতে বেলা ১।১ টা বাজিয়া গিয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যাদেবের শুভেচ্ছারূপে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পূবী মহারাজ ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল, শ্রীনিবাস, শ্রীস্ববোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণের সহায়তায় অভি-ষেকাদি কৃত্য সম্পাদন করেন। এই সময়ে ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভল্লভনিলয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নাটমন্দিরে অবিশ্রান্ত ভাবে মহাসংকীর্তন করিয়াছেন। মঠ আজ লোকে লোকারণ্য। অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেশ

পরম পূজাপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-দেব অচ্ছ (২১শে পৌষ, ১৩৮৩; ৫।১।১৭ বুধবার) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা শুভবাসরে আমাদের সতীর্থ ত্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্তনবিনোদ ও ত্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুকে তাঁহাদের প্রার্থনা মত শ্রীলীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদকৃত সংস্কারদীপিকার বিধানানুসারে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমঠের ত্রিতলোপরিহু প্রশস্ত কক্ষে হোমাদি যাবতীয় কৃত্য সম্পাদিত হয়। পূজাপাদ আচার্য্যাদেবের শিষ্য অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্রপণ্ডা কাব্যাব্যাকরণ-

তীর্থ মহোদয় হোমাদি কৃত্য সম্পাদন-বিষয়ে আচার্য্য-দেবকে সহায়তা করিয়াছেন। ত্রীপাদ ঠাকুরদাস প্রভুর সন্ন্যাস-নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রবোধ 'মুনি' মহারাজ এবং ত্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজীর (যিনি 'মোহন প্রভু' বলিয়া খ্যাত, দীর্ঘ-কাল বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাদ মঠের মঠরক্ষকরূপে নানা সঙ্কটের মধ্যেও সেবাকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন) সন্ন্যাস-নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ 'ত্রিবিক্রম' মহারাজ। ত্রীপাদ মুনি মহারাজ আমাদের মঠটিকে ত্রিসন্ধ্যা সঙ্কীর্তন-মুখরিত করিয়া রাখেন।



যশড়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

কলিযুগপারনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর মাধ্যমিক-লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ ও ভারতবাসী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাণ্ডা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদায়িত্ব মাধব মহারাজের সেবানিষ্ঠামকত্বে নদীয়া জেলার চাকদহ-মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত শ্রীশ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত যশড়া গ্রামস্থ—উক্ত শ্রীমঠের অগ্রতম শাখা শ্রীগোবিন্দ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে গত ৮ই পৌষ (১৩৮৩), ইং ২০।১২।১৬ বৃহস্পতিবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ঠাকুরের বার্ষিক বিরহতিথিপূজা-মহোৎসব তদীয় মহিমাংশসনমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তৎপূর্বদিবস ৭ই পৌষ শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবতিথিপূজাবাসরে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথমন্দির প্রাঙ্গণ হইতে একটি নগর-সঙ্কীর্ণনশোভাযাত্রা বাহির হন। শোভাযাত্রার সম্মুখ-ভাগে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে দুইজন ভক্ত পাণ্ডুলন-বান্দা ('বান্দা' শব্দে চিহ্ন) শ্রীধর্মী বহন করিয়া চলিতে ছিলেন। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোপাল দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ কীর্তন ও মৃদঙ্গবাদনাদি সেবা তৎপর ছিলেন। শোভাযাত্রা শ্রীপাটের পশ্চিম দিগ্বর্তী শ্রীগঙ্গাতটস্থ বিশ্বাস পাড়ার মধ্যদিয়া ভাগীরথী রোড ধরিয়া ৩নং দুর্গানগর কলোনীতে নাম বিতরণ করিতে করিতে সোজা নরেন্দ্রপল্লী ঘুরিয়া কাঁঠালপুলিহু শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠে উপনীত হন। তথায় ব্রজের মহাবাহু সখা শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের সমাধিমন্দির বার-চৌষ্টয় পরিক্রমণান্তে মূল মন্দিরস্থ শ্রীমদ্বিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরেবতী বলরাম (এক সিংহাসনে) এবং (অপর সিংহাসনে) শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ-গণকে দর্শন ও প্রণাম করতঃ অগ্রসর হইয়া সিংহ-হাটের নিকট দিয়া নেতাজী সূভাষ রোড ধরিয়া চলিয়া

চাকদহ থানার পশ্চিম দিকস্থ রাস্তা দিয়া নূতনগ্রাম পল্লীতে পৌছান। তথা হইতে ক্রমশঃ নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীধর্মীঘরের বাহক ছিলেন—শ্রীধর্মীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমুক্তারাম রাজবংশী। শোভাযাত্রা পরিচালন করিয়াছিলেন শ্রীমান্ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং পথ-প্রদর্শক ছিলেন শ্রীমঠের বিশেষ শুভাহুধ্যায়ী—শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বা পাঁচু ঠাকুর মহাশয়। সন্ধ্যারাত্তিকের পর সভার অভিবেশন হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ 'ভক্তিবিশ্ব ভগবান' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

৮ই পৌষ পূর্বাহ্নে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাধিত্ব-কাঙ্গি সম্পাদন করেন। ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ বোধায়ন মহারাজ (শ্রীনারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়) মালসা-ভোগ সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। পূজারী শ্রীমান্ সুন্দর ব্রহ্মচারীজী অর্চনাদিবিষয়ে শ্রীমৎ পুরী মহারাজকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে দর্শনসভার অভিবেশন হয়। পূজাপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার সুমধুর কীর্তনে সভাস্থল মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমে ভাষণ দেন—কৃষ্ণনগর মঠ হইতে সমাগত ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ। অতঃপর যশড়া শ্রীপাটের প্রাচীন তথা ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের পরম পুত্র জীবন চরিত সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় ভাষণ দিয়াছিলেন—শ্রীমান্ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৎপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ—যে ভক্তিতে শ্রীভগবান্ বশীভূত হইয়া পড়েন, সেই শুদ্ধভক্তি লাভের ভজন-ক্রম সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। অনন্তর শ্রীপণ্ডিত ঠাকুরের স্মৃচক কীর্তনের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন—শ্রীপাটের ভূতপূর্ব সেবাইত—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গোস্বামী মহাশয়। তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন—স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান সলিল অধিকারী, ভক্তপ্রাণ শ্রীধ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅঘোর চন্দ্র কর্মকার প্রমুখ গ্রামবাসিবৃন্দ।

ভোগাষাট্রিকের পর সমবেত অগণিত নরনারী ভক্তবৃন্দ সপরিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ সন্মান করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পুনরায় ধর্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ দর্শনের ক্রমোৎকর্ষ বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভক্তিদর্শনের তারতম্য বর্ণন করিয়া নামসঙ্কীর্ণনেরই সর্বোত্তমতা প্রখ্যাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণকথক শ্রীসুস্মৃতি-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথকতা ছন্দে কথিত ‘শ্রীজগদীশ চরিতকথা’ ও ‘উৎসবের তাৎপর্য’ মনোজ্ঞই হইয়াছে।

এবংসর উৎসবে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। নদীয়া জেলা ও হুগলী জেলার বহুগ্রাম হইতে আগত বহু ভক্ত নরনারী মহাপ্রসাদ সন্মান করিয়াছেন। কাঁচড়াপাড়া হইতে শ্রীগোপালদাস নন্দী, শ্রীহরিদাস পাল প্রমুখ কতিপয় ভক্ত, কলিকাতা হইতে সঙ্গীক শ্রীকৃষ্ণদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাটগোপাল দাস প্রভৃতি, কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ হইতে শ্রীহিরণ্য চক্রবর্তী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, কৃষ্ণনগর ও শ্রীধামমায়াপুরস্থ মঠের কতিপয় ভক্ত, পায়রাডাঙ্গা-রাণাঘাট-হাবড়া প্রভৃতি স্থানের ভক্ত—এইরূপে বহু স্থানের বহু ভক্ত সমাগমে শ্রীজগন্নাথ মন্দির আজ সর্বক্ষণই কৃষ্ণকোলাহলমুখরিত ছিল।

মধ্যাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরন্ধন, পরিবেশন, কীর্তন ও মৃদঙ্গ-বাদনাদি বিভিন্ন সেবাকার্যে শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্ম-

চারী, শ্রীমদনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবীরচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি, অর্চনাদি সেবাকার্যে শ্রীসুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহাসন পুষ্পমালাদি বিমণ্ডিত করণাদি ও পুষ্পাদি সংগ্রহ-সেবায় ভক্ত শ্রীরমেন্দ্র নাথ রায়, ভাণ্ডার সংরক্ষণাদি ও বৈষ্ণব-সেবাকার্যে শ্রীরাইমোহন দাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীপরি-তোষ কুমার, শ্রীনবকুমারদাস প্রভৃতি বিশেষ উৎসাহ ও রুচিষ্ণু প্রদর্শন করিয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীনিমাই দাস বনচারী মঠোদয়ের শ্রীমঠের সর্ববিধ সেবাকার্যে বৃদ্ধা-বহায় ও অদম্য উৎসাহ সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার মঠসেবক শ্রীগোলোকনাথদাস ব্রহ্মচারীজীও উৎসবের দ্রব্য ও অর্থাদি সংগ্রহ-সেবাকার্যে প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। গ্রামস্থ যুবকবৃন্দের মধ্যে শ্রীঅজয় দালাল, শ্রীমধুসূদন বারিক, শ্রীরতন প্রামাণিক প্রমুখ সজ্জনগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন সেবায় উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ ও তন্নিজজনগণের কৃপাভাজন হইয়াছেন।

পরমপূজাপদ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচাধ্যা-দেবের শুভাগমন সকলেই বিশেষভাবে আশা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও এবার এই উৎসবে যোগদানের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আগরতলাস্থিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী সেবাকার্য পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে সহসা প্লেনযোগে তথায় যাইবার প্রয়োজন হয়। সেখানেও শ্রীজগন্নাথ, এখানেও শ্রীজগন্নাথ, ‘আবার শ্রীপুরীধামেও শ্রীজগন্নাথ তাঁহার বিভিন্ন সেবাচেষ্টাকে পরমাদরে অঙ্গীকার করিতেছেন। “ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়। অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি’ না চায়।” ভক্তবৎসল ভগবান্।



ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ-ବାଣୀ

ଓଡ଼ିଆ-ପାରମ୍ପାରିକ ମାସିକ



ହାସଡ଼ାବାଦୟ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଠର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

କାଳ୍ପନ ୧୦୮୨

୧୬ଶ ବର୍ଷ ୧ମ ସଂଖ୍ୟା



ସମ୍ପାଦକ

ବିନୟାସିନୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିବିଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ

ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ-ବାଣୀ

ଏକମାତ୍ର-ପାରମ୍ପାରିକ ବାସିକ



ଜୁଲାଇ ୧୯୮୨

୧୬ଶ ବର୍ଷ ୧ମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା

ହାୟଦ୍ରାବାଦସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମଠର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

ସମ୍ପାଦକ

ତ୍ରିଦଶିଦ୍ଧାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାନ୍ତବିଭାଗ ତୀର୍ଥ ମହାରାଜ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র পারমাণবিক মাসিক



বৈশাখ ১৩৮৩

১৬শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য চাঁদ মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদিব্যস্বামী শ্রীমন্তজিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমাণিক মাসিক



জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

হায়দাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদিগ্ভিমামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমাখিক মাসিক



আম্বাভ ১৩৮৩

১৬শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য সেউয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তকিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

ଶ୍ରୀଚିତ୍ର-ବାଣୀ

ଏକମାତ୍ର-ପାରମାର୍ଥିକ ମାସିକ



ଆରମ୍ଭ ୧୯୮୩

୧୬ଶ ବର୍ଷ ୬୪ ସଂଖ୍ୟା

ହାୟଦ୍ରାବାଦରୁ ଶ୍ରୀଚିତ୍ର-ବାଣୀ ମାସିକର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

ସମ୍ପାଦକ

ତ୍ରିଦଶିହାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିବିଜୟ ତୀର୍ଥ ମହାରାଜ

ଶ୍ରୀଚେତନ୍ୟ-ବାଣୀ

ଏକମାତ୍ର-ପାତ୍ରମାସିକ ମାସିକ



ଭାଦ୍ର ୧୩୮୩

୧୬ଶ ବର୍ଷ ୭ମ ସଂଖ୍ୟା

ହାୟଦାବାଦନ୍ତ ଶ୍ରୀଚେତନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

ସମ୍ପାଦକ

ତ୍ରିଦଣ୍ଡିହାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀବରାଜ ତୀର୍ଥ ମହାରାଜ

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমাণবিক মাসিক



আশ্বিন ১৩৮৩

১৬শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমুক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমাণবিক মাসিক



কাৰ্ত্তিক ১৩৮৩

১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্রক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রী চৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমাখিক মাসিক



পৌষ ১৩৮৩

১৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রী চৈতন্য গোড়ায় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমুক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রী চৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমাণবিক মাসিক



মাস ১৩৮৩

১৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রী চৈতন্য গোড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ব্রহ্মগুপ্তস্বামী শ্রীমুক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযতি শ্ৰীমন্ত্ৰিজিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযমী শ্ৰীমন্ত্ৰিজিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্ৰীকৃষ্ণানন্দ দেবশৰ্মা ভক্তিশাস্ত্ৰী, সম্পাদ্যবৈভবাচাৰ্য্য।

২। ত্ৰিদণ্ডিযমী শ্ৰীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্ৰিদণ্ডিযমী শ্ৰীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্ৰীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্ৰীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্ৰী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমদলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্ৰী, বিদ্যাবত্ত, বি, এম্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পোঃ শ্ৰীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ২৬-৫২০০

৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্ৰীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্ৰীগোড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলা, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গোহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্ৰীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্ৰীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৫৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, শ্ৰীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সর্বভোগ শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্ৰীগদাই গৌরান্ধ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বঙ্গাব্দে মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, বাৎসরিক ৩০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৫০ পং। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্যাব্যাহকের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আচারিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সজ্ঞ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্যাব্যাহকে জানাইতে হইবে। তদন্তার্থে কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্যাব্যাহকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সত্যীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাচ্য ত্রিভুজবতি শ্রীমন্তজিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সম্মিলনের অতীব নিকটে শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরাস্থগত তদীয় মাধ্যাত্মিক লীলাস্থল শ্রীশৈলোত্তর শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমাধিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মূল জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

উপোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সত্যীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সত্যীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- | | |
|--|----------|
| (১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিকলিকাক—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক | ১০ |
| (২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—ভিক | ১০ |
| (৩) কল্যাণকল্পতরু " " " " " " | ৮০ |
| (৪) গীতাবলী " " " " " " | ১০ |
| (৫) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন
মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক | ১৫০ |
| (৬) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) " " " " | ১০০ |
| (৭) শ্রীশিক্ষাপটক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর রচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— | ৫০ |
| (৮) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— | ৩০ |
| (৯) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত " " | ১২৫ |
| (১০) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE
AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE— | Re. 1.00 |
| (১১) শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখে দিষ্ট প্রকাশিত বাঙ্গলা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — " ৬০০ | |
| (১২) ভক্ত-প্রব—শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ শিখ মহারাজ সংকলিত— | ১০০ |
| (১৩) শ্রীনন্দদেব তত্ত্ব ও শ্রীমহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এম. এন. ঘোষ প্রণীত — " ১৫০ | |
| (১৪) শ্রীমদ্ভগবদগীতা শ্রীবিদ্যনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
মহাত্মবন্দ, অমর সম্বলিত ... — ১০০০ | |
| (১৫) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংকলিত চরিতামৃত) — | ২৫ |
| (১৬) একাদশীমাহাত্ম্য — — — — ২০০
(অতিমহৎ পৈরাগ্য ও মঙ্গলের মূর্তি আদর্শ) | |
| (১৭) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মূখোপাধ্যায় প্রণীত — — ২৫০ | |

দ্রষ্টব্য :— দিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাস্তুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কলিকাতা গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক 'শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়', শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকগোচাৰ্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিম্বুপাদ কর্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামাস্তব ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিবৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডের শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫২০০)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাবী প্রেস, ৩৭/১এ, মতিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬